অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী
চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা
ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড
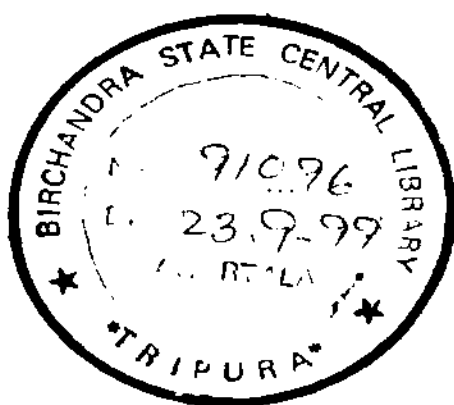
প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক
বাণীশিল্প ও শ্যামলীর পক্ষে
উত্তম চৌধুরী
প্রযত্নে বাণীশিল্প
১৪ এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
রাধাবল্লভ মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪, কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সহ সম্পাদক
অভয় সরকার

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

আশি টাকা

লেখকের ভূমিকা

ছয় খণ্ডের উপন্যাস 'সত্যাসত্য' লিখতে আমার বারো বছর লেগেছিল। সেই বারোটি বছর আমার যৌবনের সেরা অংশ। বয়স তখন পঁচিশ থেকে সাঁইত্রিশ। সেই বারো বছরের সাত বছর কেটেছিল পূর্ববঙ্গে। আর বাকীটা পশ্চিমবঙ্গে। অন্য দিক থেকে হিসাব করলে আট বছর শাসন বিভাগে। আর চার বছর বিচার বিভাগে।

বিচার বিভাগে যেতে আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না, যদিও সেই বিভাগেই অবসর বেশি। শাসন বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিল লোকজনের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার প্রচুর সুযোগ। লাটসাহেব থেকে আরম্ভ করে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত সকলের সঙ্গে মিশেছি। রাজা মহারাজা নবাব বাহাদুর থেকে আরম্ভ করে কৃষক প্রজা পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই ছিল আমার যোগাযোগ। পুলিশের তো কথাই নেই, টেররিস্টদের সঙ্গেও ছিল আমার সম্পর্ক। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেলে চড়ে, কখনো হাতীর পিঠে, কখনো হাউসবোটে, কখনো পালকিতে করে, কখনো টমটম গাড়িতে চেপে গ্রামে গঞ্জে সফর করেছি। একালের মতো ভালো রাস্তা ছিল না। মোটরের দৌড় বেশিদূর নয়। রাত্রে তাঁবুতে বাস করতে হতো। তাতেই ছিল আমার বিশেষ আনন্দ। একবার কিন্তু পদ্মার চরে তাঁবু খাটিয়ে নাকাল হতে হয়েছিল।

বাঁচব না লিখব? এই ছিল প্রশ্ন। যাঁরা জাত লিখিয়ে তাঁরা হয়তো বলতেন, লিখব। আমি জাত লিখিয়ে নই। আমি বলতুম, বাঁচব। আমি প্রাণ ভরে বেঁচেছি, সময় জুটলে লিখেছি। লিখতুম, প্রকাশকের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিতুম। ডাকযোগে প্রুফ আসত। প্রুফ ফেরৎ পাঠাতুম। বই শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে দেওয়া কোনো খণ্ডের বেলা হয়ে ওঠেনি। গোপালদাস মজুমদার অপেক্ষা করার পাত্র ছিলেন না। তাঁর অনুরোধ ছিল যখন যতটুকু লেখা হবে তখন ততটুকু প্রেসে দিতে হবে। লেখককে রিভিসনের সময় দিতে তিনি নারাজ। কাজেই ছয় খণ্ডের পাঁচটি খণ্ডই রিভাইজ করা হয়নি। ব্যতিক্রম প্রথম খণ্ড। সেটি ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কথা ছিল এই উপন্যাস পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হবে পাঁচ বছরের মধ্যে। কিন্তু আমার জীবনযাত্রা আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কোনো মতে 'দুঃখমোচন' অবধি লিখে আমি আর এগোতে পারিনে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকলে হয়তো পারতুম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে প্রমোশন দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রমাণ করতে চাই যে উক্ত পদের আমি উপযুক্ত। সেই যে মাথায় ভূত চাপে সে ভূত আর নামতে চায় না। আমি তিনটি বছর বন্য হংসীর পশ্চাদ্ধাবন করি। আমার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে আমাকে জজ করে দেওয়া হয়। জজের পদে দৌড়ঝাঁপ নেই। সময় মেলে। সময় পেয়ে আমি 'মর্ত্যের স্বর্গ' লিখি। সেই খণ্ডেই দাঁড়ি টানার কথা। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি কাহিনী ফুরায় না। তাই লিখি 'অপসরণ'।

মূল পরিকল্পনায় অন্তিম খণ্ডের নাম ছিল 'মর্ত্যের শর্ত'। বলা বাহুল্য, স্বর্গ আর শর্ত সমার্থক নয়। আমি লিখতে চেয়েছিলুম এক, হয়ে উঠল আর। কেন, তার কারণ খুলে বলি।

প্রাচীনদের বিশ্বাস এই মর্ত্যভূমি দু'দিনের জন্যে। এখানে কেউ স্থায়ীভাবে বসত করতে আসে না। মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যায়। অথবা নরকে। খ্রীস্টানদের মতে চির-কালের জন্যে। হিন্দুমতে যতদিন পুণ্যবল ক্ষয় না হয় ততদিন স্বর্গবাস, তার পরে পুনর্জন্ম। অথবা যতদিন পাপকর্মের ফল ভোগ সারা না হয় ততদিন নরকবাস, তার পরে পুনর্জন্ম। মর্ত্যে না এসে স্বর্গে বা নরকে যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষকে জন্মাতেই হবে, মরতেই হবে, তার পরে স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি। মর্ত্যের শর্ত হচ্ছে স্বর্গের জন্যে প্রস্তুতি। অনবরত পুণ্যসঞ্চয়।

পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক সম্বন্ধে প্রাচীনদের বিশ্বাস আধুনিকদের কাছে যুক্তিসহ নয়। আধুনিকরা সাধারণত সংশয়ান্বিত। কেউ কেউ সংশয়বাদী। আমিও ক্রমে ক্রমে সংশয়ান্বিত হই। যুগটা বিশ্বাসের পরিবর্তে মতবাদের। ইডিওলজির। মতভেদ থাকলেও সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, গান্ধীপন্থী প্রভৃতি সকলেই চান মর্ত্যভূমিতেই স্বর্গ গড়ে তুলতে। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো উপনীত।' মানুষ তার আপন শক্তিতে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করতে পারে এরূপ ধারণা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। মানুষের উপর বিশ্বাস-হারানো পাপ। বার বার ব্যর্থ হতে হতেই মানুষ স্বর্গ রচনা করবে। শ্রীঅরবিন্দ তো মনে করেন মানব একদিন অতিমানব হবে। বানর থেকে যেমন মানব তেমনি মানব থেকে অতিমানব। দেবতা বলতে পারা যাচ্ছে না, কারণ অতি-মানবেরও মৃত্যু আছে, সে দেবতার মতো অমর নয়।

ঈশ্বরের স্থান নিতে চায় মানুষ। হতে চায় মর্ত্যের নিয়ন্তা। মৃত্যুকে এড়াতে না পারলেও পেছিয়ে দিতে পারবে। বিজ্ঞান তাকে ব্যাধিমুক্ত করতে সক্ষম। জরাকেও পরাস্ত করতে।

ওদিকে প্রত্যেকটি ইডিওলজিই হচ্ছে ফাইটিং ইডিওলজি। স্বর্গ জয় করার জন্যে সংগ্রাম অত্যাবশ্যক। এ সংগ্রাম সাধারণত সহিংস। যুদ্ধ বা বিপ্লবে মানুষ যদি মরেই গেল তবে স্বর্গ ভোগ করবে কে ইহলোকে? তা হলে কি আবার সেই পরলোকের ভরসায় মরবে? না, তা নয়। মরতে হলে মরতে হবে উত্তরপুরুষের জন্যে। তারাই স্বর্গ ভোগ করবে। চিরকাল না হোক দীর্ঘকাল। না, নরক ভোগ নয়। নরক লুপ্ত হবে

শোষক শ্রেণীর নিপাতের সঙ্গে সঙ্গে। কিংবা প্রভু শ্রেণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু পূর্বপুরুষের মনোনীত স্বর্গ উত্তরপুরুষের মনের মতো হবে কি না কে বলতে পারে? পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষেরও এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। পিতার মনোনীত পুত্রবধূ পুত্রের মনের মতো নয়। তাই নিয়েই তো এই উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট। পূর্বপুরুষদের কাছে যা স্বর্গ উত্তরপুরুষের কাছে তা হয়তো সোনার খাঁচা। তখন সেই খাঁচা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজতে হয়। খাঁচাটাকে মেনে নিয়ে সোনাকে প্লাটিনামে রূপান্তরিত করেও মুক্তি নেই। ন বিত্তেন হি তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। আধুনিক সমাজপিতাদের চিন্তাটাই বিত্তময়ী চিন্তা। বিত্তহীনকে তাঁরা বিত্তবানে পরিণত করবেন, নিম্নবিত্তকে মধ্যবিত্তে, মধ্যবিত্তকে উচ্চবিত্তে। সকলেই উচ্চবিত্ত হলে সকলেরই স্বর্গসুখ।

তাই যদি হতো তবে বুদ্ধকে গৃহত্যাগ করতে হতো না। প্রেয়সী বধূকেও। আদরের পুত্রকেও। বিদ্যার জন্যে, বোধির জন্যে, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে, মোক্ষের জন্যে, স্যালভেশনের জন্যে, নির্বাণের জন্যে, মানুষের অন্তরাত্মা ব্যাকুল। স্নেহের জন্যে, প্রেমের জন্যে, বন্ধুতার জন্যে আকুল। সৃষ্টি না করে মানুষের তৃপ্তি নেই। কাব্যে, নাটকে, নৃত্যে, চিত্রণে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, প্রসাধনে সে তার সৃষ্টিশীলতার স্ফূর্তি চায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্ভর করে তার এই সৃষ্টিশীলতার উপর। তার পর মানুষকে দেওয়া হয়েছে করুণা ও বিবেক। নইলে সে অমানুষই থেকে যেত। যদিও জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে উন্নত। স্বর্গে কি দয়া মায়া, বিবেক বিবেচনা থাকবে না? বৈরাগ্যও থাকতে পারে।

মোট কথা, স্বর্গের সংজ্ঞা আমরা পুরোপুরি জানিনে। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। বিকাশের প্রক্রিয়া সমস্ত ক্ষণ চলেছে। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের। সামনে রয়েছে আরো কত শতাব্দী, সহস্রাব্দী। এই পৃথিবীও তো মানুষের একমাত্র বাসভূমি নয়। মানুষ মঙ্গলগ্রহে পদার্পণেরও তোড়জোড় করছে। আশা করছে সেখানেও প্রাণধারণের পরিবেশ পাবে। ইতিমধ্যেই মহাশূন্যে স্টেশন স্থাপন করা হয়ে গেছে

এত কিছুর পরেও প্রশ্ন উঠবে, "যা দিয়ে আমি অমৃত না হব তা নিয়ে আমি কী করব?" এর উত্তর মর্ত্যের স্বর্গ নয়। স্বর্গের স্বর্গও নয়। মৈত্রেয়ী দেবতার অমরত্ব চাননি। বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধের স্থান দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে। স্বর্গও তাঁর কাছে তুচ্ছ। বৈষ্ণবদের কাম্য স্বর্গ নয়, বৈকুণ্ঠ, যেখানে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা। কোনো কোনো ভাগ্যবান তা ইহলোকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। মৃত্যুর পূর্বেই। মৈত্রেয়ীও মৃত্যুর পূর্বেই অমৃত হতে চেয়েছিলেন। হয়তো ব্রহ্মাস্বাদ তাঁকে অমৃত করত।

আমি দার্শনিক সন্দর্ভ লিখতে বসিনি। 'সত্যাসত্য' দর্শন না হলেও একপ্রকার জীবনদর্শন। অপরিণত বয়সের, অপটু লেখনীর নিদর্শন। কিন্তু তখন যদি না লিখতুম আর কখনো লিখতে সাহস হতো না। এটা দুঃসাহসের কাজ। তেমন দুঃসাহস প্রথম যৌবনেই সম্ভবপর। উপন্যাসে যাঁরা পরিপক্বতার প্রত্যাশী তাঁরা নিরাশ হবেন। এপিক উপন্যাসের দাবী আমি নিজেই প্রত্যাহার করেছি। তবে এরই মণিকোঠায় নিহিত আমার যৌবন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রাসঙ্গিক

রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সত্যাসত্য-এর শেষ দুই খণ্ড—পঞ্চম খণ্ড মর্তের স্বর্গ ও ষষ্ঠ খণ্ড অপসরণ এবং পুতুল নিয়ে খেলা উপন্যাসটি। শেষোক্ত উপন্যাসটি সত্যাসত্য দ্বিতীয় খণ্ড যে-বছর প্রকাশিত হয় সেই বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু আমরা রচনাবলীর পূর্ববর্তী কোনো খণ্ডে তাকে স্থান দিইনি, কেননা সত্যাসত্য উপন্যাস-মালা একবার শুরু হয়ে যাওয়ার পর তা শেষ হওয়ার আগে অন্য কোনো উপন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করলে পাঠকের মনোযোগ ও ভাবের একাগ্রতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

রচনাবলীর এই খণ্ডে সত্যাসত্য উপন্যাসমালা সমাপ্ত হয় ও সেই সঙ্গে শেষ হয় বাদলের সত্যান্বেষণের প্রয়াস। বাদলের বহু বিশ্বাস একে একে গেছে, এখানে গেল তার রাজনীতিতে বিশ্বাস। বাদলের মতো মননসর্বস্ব মানুষের পক্ষে এই নেতিবাদ প্রাণ-ঘাতক, মরণের হেতু। সে কাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবে। 'এখন আমার চোখে আলোর রেখাটিও নেই। আঁধারের পর আঁধার তারপরে আঁধার, তার পরে আরো আঁধার। এই আঁধার পারাবার পার হব কী করে?' হয়তো বিশ বছর এর গর্ভে গর্ভ-বাস করলে সে এই আঁধার পারাবার পার হতে পারতো। উপন্যাসের বর্ণিত সময় সাঙ্গ হয়েছে ১৯২৯-এর শরৎকালে। এর চার বছর পর হিটলারের ডিকটেটরশিপ আরম্ভ হবে, বাদল তা সহ্য করবে কী করে, প্রতিকারে অক্ষম বলে মরতে বাধ্য হবে। তাহলে সে মিছিমিছি চার বছর বেঁচে থাকবে কেন? তাই ১৯২৯-এই সে মারা যায়। 'সুধীদা, আমি সরে দাঁড়ালুম। বিবর্তনের মিছিল চলছে, চলতে থাক, আমি তাতে নেই। আমার বিশ্বাস গেছে, বাকী আছে ইচ্ছা। বিশ্বাসহীন ইচ্ছা তো মিছিলের উপর খাটে না। তাই নিজের উপর খাটালুম। সরে দাঁড়ালুম। সরিয়ে নিলুম আপনাকে এই পদার্থ জগৎ হতে, ঘটনাশৃঙ্খল হতে, ভালোমন্দের দ্বৈত হতে। অপসরণ করলুম দায়িত্ব ও অধিকার হতে, ব্যর্থতা ও সিদ্ধি হতে, সর্ব ফলাকাঙ্ক্ষা হতে। চলতে থাক এই মিছিল, এই স্বপ্ন। আমি সরলুম।'

এক বিশ্বাস, এক আদর্শ থেকে অপর বিশ্বাস, আদর্শে প্রয়াণ মনের পক্ষে এক অস্ত্রোপচার, তাতে মনের ভেতরের কয়েকটা গ্রন্থি একেবারে ছিঁড়ে যায়, সে অবস্থা প্রায় অঙ্গচ্ছেদের মতন। দুচার দিন তার সম্পর্কে অজ্ঞান থাকা যায়, কিন্তু ক্রমেই ব্যথা-বোধ অঙ্কুরিত হয়, একদিকে সমস্ত চেতনা ছেয়ে যায় তার শাখাপ্রশাখায়, অন্যদিকে একটা অচেতন ভাব এসে ব্যক্তিকে বিমর্ষ ও অবসন্ন করে দিয়ে যায়। বারবার বিশ্বাস পালটানোর ফলে বাদলেরও সেই দশা। দুঃখমোচনের বাদল মর্তের স্বর্গেও দুঃখ-মোচনের উপায়ই অন্বেষণ করে, তবে এবার রাজনৈতিক ভাবে। কিন্তু জীবনের একটা পর্বে যদি সে অপরিপাচিত বিজ্ঞানের অজীর্ণে রুগ্ন হয়ে থাকে তো এখন সে অপরিপাচিত

রাজনীতির অজীর্ণে রুগ্ন। সে বোঝে না, কমিউনিজম একটা আর্থিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থামাত্র নয়, একটা জীবনাদর্শ, জীবনযাপনের ধারা। এতই ছেলেমানুষ যে সে বড়াই করে সে কমিউনিজমেরও সংস্কার সাধন করবে। নিজের বাণী আবিষ্কার করবে, যে-কথা বলবে সে-কথা হবে লাখ কথার এক কথা, বেশি নয়—একটা ছুটো কথা কিন্তু এমন কথা যে তার জন্য সমগ্র জগত উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

অন্নদাশঙ্কর নিজে শব্দ বাক্য ও আইডিয়ার শক্তি ও অমোঘতায় বিশ্বাসী। তিনি লিখেছিলেন, একটি শব্দও এত শক্তিমান হতে পারে যে হাজার বছর ধরে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, একটি বাক্যের জন্য হয়তো একটা যুগ অপেক্ষা করছিল, যেই ওটি উচ্চারিত হলো অমনি মানুষ পেয়ে গেল তার ভাবনার কণ্ঠস্বর, একটি আইডিয়াও ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচনা করতে পারে। সবই ঠিক কিন্তু বাদল এই ভুল করেছিল যে সে ওই শব্দ বা বাক্যের ধারক ও বাহক না হয়ে নিজেই হতে চেয়েছিল তার আবিষ্কারক। সুধী স্বাভাবিক ভাবেই এই ভুল করেনি। তার বিশ্বাস, গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের আইডিয়া শুধু ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবে তাই নয়, তা সমস্ত পৃথিবীর কাছে একটা আদর্শ হয়ে উঠবে। সে নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে এই আইডিয়ার প্রকাশ ঘটাতে চায়, নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে হতে চায় জনগণের জীবনের শরিক। সে জনগণের আত্মিক শক্তির বা না-এর জোরের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মনে পড়িয়ে দেয় তারাশঙ্করের রূপক গল্প শেষ কথা-কে। এই বিজ্ঞতা থেকেই সে বাদলকে বলেছিল, 'আমি তো মনে করি ইংলণ্ডেই হোক আর ভারতবর্ষেই হোক, ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টারি করাই তোর প্রকৃষ্ট জীবিকা। ছোট্ট একটি পত্রিকার সম্পাদক(ও) হতে পারিস, যদি লিখে তৃপ্তি পাস।'

নিঃসন্দেহে সুধী এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে উত্থিত যে প্রজ্ঞা সেই প্রজ্ঞার প্রভায় দীপ্ত। কিন্তু তার এই প্রাজ্ঞতা অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক/দার্শনিক পরিমণ্ডলে ততটা নয়, যতটা ব্যক্তি-সম্পর্ক ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে। এবং বস্তুত সমগ্র সত্যাসত্য উপন্যাসমালার গুরুত্বই আমার কাছে তার বৈদগ্ধ্যের জন্য ততটা নয়, যতটা তার মহত্ত্বের জন্য। লেখক এখানে বিজ্ঞান/অর্থনীতি/রাজনীতি/দর্শন নিয়ে যে-বিতর্কে পাঠককে জড়িয়ে পড়ার অবকাশ দেন তার চাইতে আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আবেগময়তা ও অনুভূতিপ্রবণতার লেখককৃত সূক্ষ্ম ও মহান চিত্রণ। আর সেই কারণেই বাদলের মৃত্যুদৃশ্য এত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠতে পারে।

মৃত্যু সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের নান্দনিক জিজ্ঞাসা চিরকালের। মৃত্যুমুহূর্তে, জীবনের প্রান্তবিন্দুতে এসে কে কী বলে যায়, সেই অন্তিম উক্তি সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসার পরিচয় আছে স্বত্যয়ন গল্পে। রহস্যময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষ

যে-বার্তা রেখে যায় তার কয়েকটির উল্লেখ আছে এই গল্পে। কেউ বলে, আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, এবার তবে আসি। নমস্কার। কেউ বলে, আমি হোমসিক। বাড়ির জন্যে আমার মন কেমন করছে। আর এখানে খেলা করতে ভালো লাগছে না। বাদলের অন্তিম উক্তি ছিল, আহা! এতকাল পরে···একটু···ঘুমিয়ে বাঁচি। কারও মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কে কী বলে সেই মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গও একাধিক গল্পে লেখকের বিবেচ্য হয়েছে এবং অন্যের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে লেখকের শোকপ্রকাশের অন্তত দুটি বাস্তব ঘটনা আমার উপস্থিতিতেই ঘটেছে। অসুস্থ পুত্রকে দেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে এসে ছেলের মৃত্যু-সংবাদ শুনে বাদলের বাবা আর্তনাদ করে বলেছিলেন, বাবুয়া? বাদল বাবুয়া? নেই? চলে গেছে? হায় হায় হায়। শোকপ্রকাশ তো শুধু মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নয়, নৈতিক প্রসঙ্গও। এবং বাদলের মৃত্যুও এক নৈতিক সূত্রে বাঁধা কেননা 'যে বাঁচায় সেই বাঁচে', বাদল যখন কারুকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে পারলো না, তখন সে নিজে বাঁচে কী করে?

জীবনশিল্পী সুধীর কাছে জীবনটা ছিল একটা আর্ট। আর্টের খাতিরে কোনো কবিতা কয়েক ছত্রে শেষ হয়, কোনো কবিতা কয়েক কাণ্ডে, আবার কোনো কবিতা অনেক পর্বে। সকলের জীবন যে মহাভারত হবে তার প্রয়োজন নেই। বাদলের জীবনও মহাভারত হল না। জীবনের দস্তুর ওই—তার পায়ে পায়ে মৃত্যু। বাদলের জিজ্ঞাস্য ছিল, কেন বাঁচবে? সুধীর উত্তর হল, বাঁচলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। সুধীর কাছে আরো জরুরি প্রশ্ন, কেমন ভাবে বাঁচবে। জীবন তো কত রকমেই যাপন করা যায়, কিন্তু যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত ও সুভদ্র ধারা কোনটি। যার মধ্যে জীবিকার কথাও আসে, কিন্তু আরো গভীর কথা হল—শান্তি ও ন্যায়, প্রজ্ঞা ও সামঞ্জস্য, আত্মপ্রকাশ ও পরমাত্মসংযোগ। সুধী যে নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হতে চায়, তার পদযাত্রা, গ্রামপর্যটন ও সাধারণ ভারতীয়দের চরিত্র পর্যবেক্ষণের দরুণ এ-বিষয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতা কীরূপ?

সুধীর বিদেশপ্রবাস তাকে তার দেশকে আগের চেয়ে ভালো বুঝতে শিখিয়েছিল, প্রবাসে মানুষের দেশবোধ তীব্র ও দেশদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে, তাছাড়া পশ্চিম থেকে না দেখলে দেশকে পুরোপুরি চেনাও যায় না। মাঝখানে কয়েক মাস দেশে ফিরে ও উজ্জয়িনীর জন্য দেশময় ঘুরে সুধী দেশের মতির সন্ধান পেল। মেয়েদের বর্ণাঢ্য সজ্জা, ললিত গমন, নিত্যকর্মের অবলীলা, অকপট আতিথ্য; পুরুষদের দাম্ভিক পাগড়ী, গম্ভীর মুখমণ্ডল, স্বল্পবাক্ শ্রম, ঈশ্বরনিষ্ঠ নির্ভাবনা সুধীকে প্রতিদিন নতুন বিস্ময়, অননুভূত আনন্দ যোগাতো। এদের জন্য তার করবার কী আছে? ওরা যা করবে ওদের নিজেদের দায়িত্বে করবে। সুধী বেশ বুঝতে পারছিল ভারতের শক্তি তার এইসব ছোটলোকদের চরিত্রমহত্বে। শাস্ত্রে ধর্মে লোকালয়ে বা অরণ্যে নয়। স্বার্থপর হয়েও কী নিঃস্বার্থ এরা,

কী কর্তব্যপরায়ণ, কী অগাধ পরিশ্রমী, কী একাগ্র বিশ্বাসী। এইসব সরল মানুষগুলিই আমাদের সমষ্টিদেহের সবল অস্থি। এদেরই বলে আমরা বলবান। অতিপরিচয়ের অসাড়তা ও নবপরিচয়ের অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে সুধী স্থায্য পরিচয়ে স্থির হচ্ছিল। তার দেশের ভেতরে রয়েছে দ্বন্দ্বের উপাদান, ভারতের এইসব আভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ যেন মীমাংসার মধ্যে বিরতি পায়। ভারতবর্ষ যেন তার ইতিহাসের তাৎপর্য বিস্মৃত না হয়। ভারতবর্ষের জীবনে যেদিন সন্ধিকাল আসে, ভারতবর্ষ সেদিন বুদ্ধের স্থায় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে, তারপরে সে আবার ঐশ্বর্য ভোগ করে বটে কিন্তু হর্ষবর্ধনের স্থায় অনাসক্ত ভাবে। ভারতের এই ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আধুনিককালেও প্রচ্ছন্নভাবে হস্তান্তরিত করে দিয়ে যেতে হবে, সুধীর এই বাসনা।

সত্যাসত্য উপন্যাস বিষয়ক যে-কোনো আলোচনায় সত্যসংক্রান্ত কয়েকটি সূত্র বিচার বা পরীক্ষার কথা আসবেই। উজ্জয়িনী একবার আক্ষেপ করে বলেছিল, হায়! সত্যের কি কোনো চেহারা আছে যা দেখলেই চেনা যায়! উত্তরে সুধী বলবে, প্রশ্ন করে কি সত্যের পাত্তা পাওয়া যায়? যে জানে সে আপনি জানে। চিত্তকে যে মুকুরের মতো মার্জিত রেখেছে সত্য তার চিত্তে বিনা আহ্বানে প্রতিফলিত হয়। পার্থিব মাপকাঠি দিয়ে সেই সত্যের পরিমাপ হয় না। তা সমস্ত সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতার উর্ধ্বে। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, সত্যের রূপ যে দেখেছে সে আশানিরাশার উর্ধ্বে। এই সত্য কঠিন, কঠোর, তবে বোধহয় নির্বিকার নয়। একবার কথা উঠেছিল, সত্য স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ না ক্লীবলিঙ্গ। সুধীর মতে সত্য সালঙ্কারা কন্যা, বাদলের মতে সত্য সালঙ্কারা কন্যাও নয়, বিভূতি পুরুষও নয়, তা নীরস, নিরেট, নির্বর্ণ ক্লীবলিঙ্গ। এই প্রসঙ্গে আসে উভয়ের প্রতিন্যাসের মৌলিক বিভেদের কথা। বাদলের প্রাণ যদি বলে, এটা সত্য, তার মন বলে, প্রমাণ কী? সুধীর ধ্যান যদি বলে, এটা সত্য, তার মন সেটা মেনে নেয়—মনকে সে সেইভাবে তালিম দিয়েছে।

তাই সুধীর সত্য যদি হয় চূড়ান্ত, বাদলের সত্য তাহলে আপেক্ষিক। মন নিত্য নতুন সত্যের সোপান বেয়ে কোন উর্ধ্বে চলেছে। যেটাকে অতিক্রম করছে সেটাকে ভুলে যাচ্ছে, সেটা একটা 'না', সেটা একটা অসত্য। অতীত অসত্য, বর্তমান সত্য, ভবিষ্যৎ বহুগুণ সত্য। বাদলের সত্য তাই প্রশ্ন করে, আপেক্ষিকতার টানাপোড়েনে দীর্ণ হয়। প্রশ্ন করে, মানুষের সত্যনিষ্ঠা কি মানুষের কমনসেন্সের উপর জয়ী হবে? প্রশ্ন করে, সত্য বড় না আদর্শ বড়? প্রশ্ন করে, বৃহত্তর বাস্তবের সঙ্গে ক্ষুদ্রতর বাস্তবের সম্বন্ধ কী? কিন্তু উজ্জয়িনী যেমন শেষদিকে দুয়ার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পেয়েছিল, দেখতে পাওয়া যায়, দুয়ার না খুলুক যদি দৃষ্টি খোলে, আর একবার দৃষ্টি খুললে আরো খুলবে, আরো খুলবে, আরো আরো খুলবে, সত্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে সত্যের রূপ—সেই প্রতিন্যাস

বাদলের নয়। নারী সত্যদর্শিনী হয়ে তবেই সতী হয়। সত্যের নিকষে যাচাই হয়েছিল বলেই উজ্জয়িনীর সতীত্বের মূল্য।

সত্যরূপ ও সত্যদৃষ্টি, উদ্দেশ্য ও উপায়, কেন ও কীভাবে, উভয়তই আবার, লেখকের মতে, নেতি নেতি করেও সত্যকে জানা যায়। 'দুরকম তথ্যই জেনেছি। সত্যটা কী সেটা কেমন করে জানবো ? অবশেষে নেতি নেতি করেই সত্যকে জানতে হয়। এমনি করে স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ হয়।' একটা অনুষঙ্গ ধরে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—তা হল স্বপ্ন। স্বপ্ন কি সত্য ? এক দিকে স্বপ্ন যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সত্য। অন্যদিকে স্বপ্ন-ভঙ্গের পর বোঝা যায়, এতক্ষণ যা ঘটছিল সব মিথ্যা, এইবার যা ঘটতে যাচ্ছে সব সত্য, আসল আলো লাগছে চোখে, আসল হাওয়া লাগছে গায়ে, জগত জাগছে আসল সুরে। আবার স্বপ্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেতনার রূপান্তর, স্বজ্ঞার দ্বারা তার অর্থবোধ হয়, সেক্ষেত্রে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরও তা সত্য। এই নেতি থেকে ইতিতে যে প্রবাহ তার ফলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক হিংসার, ঘৃণার, হত্যার তা আপাতভাবে মিথ্যা হয়েও শেষপর্যন্ত সত্যের জন্ম দিতে পারে বা প্রবাহের উৎক্রমের ফলে এর বিপরীতটাও ঘটতে পারে। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমাণ মিলবে।

সত্য নিয়ে যে-কোনো আলোচনার জন্য আমাদের যেতে হবে ক্রান্তদর্শী উপন্যাস-মালার আলোচনাতেও। লেখকের ভাষায়, 'একদিক দিয়ে দেখলে একে সত্যাসত্যের সিকোয়েল বলতে পারো। তবে এতে মহাত্মাজীকে এনেছি। যিনি মূর্ত সত্যাগ্রহী।' সুতরাং রচনাবলীর শেষদিককার খণ্ডে যখন ক্রান্তদর্শী অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তখন সত্য সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে।

উপসংহারে যে-কথা আগে বলেছি সে-কথাই আবার বলতে চাই। সত্যাসত্যের গুরুত্ব তার বৈদগ্ধ্যের জন্য ততটা নয়, যতটা তার মহত্বের জন্য। লেখকের সত্যদৃষ্টির জন্যও ততটা নয়, যতটা তাঁর কল্যাণবোধের জন্য। সেই কল্যাণবোধ যা সুধীকে দিয়ে অশোকার জন্য এই প্রার্থনা করিয়ে নেয় : কল্যাণ হোক তার, কল্যাণের পথ চিনে নিক নির্মল নয়নে, বেছে নিক নির্ভয় অন্তরে। কল্যাণ হোক তার, যদি ভুল করে তবুও, যদি ভয় পায় তবুও। তার প্রাণে যেন বেসুর রাগিণী না বাজে, আমার জীবন ব্যর্থ হল কি হল না সে-চিন্তা পরে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছিলাম, পুতুল নিয়ে খেলা যেন আগুন-নিয়ে খেলা-র সঙ্গে এক অর্থে ধারাবাহিকতার সূত্রে আবদ্ধ। এটা শুধু এই কারণে নয় যে উভয় উপন্যাসেরই নায়ক একই ব্যক্তি—কল্যাণকুমার সোম, বরং মূলত এই কারণে যে আগুন নিয়ে খেলার কার্য-কারণ সম্পর্কের ফলাফল এসে পড়েছে পুতুল নিয়ে খেলায়। আগুন যদি হয় প্রেম, পুতুল তাহলে হল প্রেমিকা, ফলে পুতুল নিয়ে খেলায় পাঠক স্বাভাবিক

ভাবেই প্রেমিকার বিভিন্ন টাইপ দেখতে পাবেন। এই দেখাটা কিন্তু অনেকটাই হবে সোমের দৃষ্টিকোণ থেকে।

লেখক সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে সোমের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : নটোরিয়াস, বাঙালী ক্যাসানোভা, আবার অন্যদিকে—বোকাটা। সে যেসব বাড়িতে মেয়ে দেখতে গিয়েছে সেখানকার বৃদ্ধেরা হয় অবিশ্বাসের হাসি হেসে তাকে বলেছেন, তোমরা অত্যাধুনিকরা আমাদের ক্ষ্যাপাবার জন্যে অযথা দুর্বৃত্ততার ভাণ করে থাকো। অথবা তার সম্পর্কে হতাশ সুরে জানিয়েছেন, না, আদৌ মনে হয় না যে বিলেত প্রত্যাগত। আর তার বাবা সে যে বিলেতে কাকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেছিল সেই কলঙ্ক শোধরাতে কাগজে তার বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সারা ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞাপনের সাড়া পেয়ে ছেলেকে পাত্রী দেখতে বেরিয়ে সেই সঙ্গে দেশ দেখা ও সময় কাটাবার ব্যবস্থা বাতলেছেন, বিশেষত যখন চাকরির নিকট সম্ভাবনা নেই। এ-ব্যবস্থাটাই এই উপন্যাসের স্প্রিং-বোর্ড বা পাদানি।

সোম পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছে—ব্যক্তিগত সূত্রটি এই হলেও আসলে কিন্তু পাত্রীর অভাব নেই, অভাব উপযুক্ত পাত্রের, সুতরাং সামাজিকভাবে সূত্রটি দাঁড়ায়—পাত্র খোঁজা। পাত্র সেখানে পরীক্ষক, পাত্রী পরীক্ষাধীনা। আর এই পরীক্ষার প্রহসন এমন যে পাত্রী পক্ষের প্রধানের মনে হয়—কোন্ পাপে এদেশে মেয়ের বাপ হয়ে জন্মেছি! আর এইভাবে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে বনফুলের কন্যাসু উপন্যাসের তুলনা টানা যায়।

অবশ্য সোমের ক্ষেত্রে পাত্রী খোঁজার ব্যাপারটি উপলক্ষ মাত্র, তার আসল অনু-সন্ধানের বিষয় প্রেম ও প্রেমিকা। তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে প্রেম সম্বন্ধে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে ওটা অন্য দশটা ধুয়ার মতো একটা ধুয়া। প্রেম অর্থে অসীম মমতা, অনন্ত সহিষ্ণুতা, অখণ্ড ধৈর্য, অবিরত স্বার্থত্যাগ নয়, দেহকে অবলম্বন করে নরনারীর পরস্পরকে ভালোবাসা। পরের দেহকে যে মেয়ে ভালোবাসতে জানে সে মেয়ের আপন দেহ স্বাস্থ্যবান, শুচি ও সুশ্রী না হয়ে পারে না, বিবাহ সেই ভালোবাসাকে জাগিয়ে রাখবে। কিন্তু তার চিন্তা ও প্রয়াসের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা ছিল যে, একদিকে রোমান্সের উপর তার অশ্রদ্ধা ধরে গেছিল, অথচ অন্যদিকে রোমান্সের সাহায্য ব্যতিরেকে বেশি বয়সের নারীকে বিবাহ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই আসতে হয় তার জীবনবোধের কথায়। মায়াকে কল্যাণ বলেছিল মায়া তার কাছে পাবে একটা পরিশীলিত বিদগ্ধ মন ও একটা অনুশীলিত অভিজ্ঞ দেহ। দেহ ও মনকে সে সবসময়ে জড়িয়ে বলেছে কেননা ভণ্ডামি সে সইতে পারে না কিন্তু তার এই মত—যাকে ভালোবাসা যায় তাকে বিয়ে করা যায়

না ও যাকে বিয়ে করা যায় তাকে ভালোবাসা যায় না—এ নেহাত কথার কথা কেননা এ-মত সত্য হলে তার অঙ্ক যুক্তিতর্কগুলো ভেঙে যায়। সমাপ্তিতে তার এই পরিকল্পনা: যে সে যাবে সাঁওতাল কোল ভীল কুকি নাগা জৈন্তিয়া খাসি চাকমা গারো খোন্দ গোন্দ জুয়াঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী রত্নের অন্বেষণে এও নিতান্ত অতিরঞ্জন। আসলে সে যেখানে যায় সেখানে কথায় ও কাজে রোমাঞ্চ ঘটায়, 'জীবনটাতে একটু নুন মাখিয়ে না দিলে ঐ আলুনী তরকারিটা কার মুখে রোচে?'

এই রোমাঞ্চকরতাই এই উপন্যাসের শৈলীর রহস্য। শিবানী, সুলক্ষণা, অমিয়া, প্রতিমা, মায়া: রোমাঞ্চকরতা ধাপে ধাপে চড়েছে। শিবানীদের বাড়ীতে যা ছিল ভাঁড়ামি (মকারি), সুলক্ষণার ক্ষেত্রে তা বেড়ে হয়েছে নাটকীয়তা, অমিয়ার বেলায় অসহায়তা, প্রতিমার বাড়িতে গিয়ে ফার্স আর মায়া পর্বের সমাপ্তি অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে। এই উপন্যাস প্রচ্ছন্ন ও প্রসন্ন হাস্যরস ও রসবোধে আবিষ্ট। কিন্তু একে কমেডি বা সিরিও-কমেডি বললেই সবটা বলা হয় না, এই উপন্যাস শেষ-পর্যন্ত অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণেই আক্রান্ত। এখানে নারী চরিত্রগুলি আঁকা হয়েছে লঘু স্বরে বা গাঢ় রঙে, একই সঙ্গে গভীর ও চপল ভঙ্গিতে, উৎকেন্দ্রিক বা আত্মকেন্দ্রিক রূপারোপে। চরিত্রগুলি হয় এসেছে পরিবেশের বা বিশেষ কোনো বক্তব্যের প্রতিনিধি হয়ে অথবা একক চরিত্র হিশেবেই।

শিবানী: তার দেহে এখনো লাবণ্যের বন্যা আসেনি। সে হচ্ছে সেই জাতীয় লতা যার বৃদ্ধি দ্রুত ও ঘন হলেও যে পুষ্পিতা হবার কোনো লক্ষণ দেখায় না। তার মুখভাব বড় সরল। দাঁড়ানোর ভঙ্গি ঋজু, সরল। বোঝা যায় এ মেয়ে খাটতে অভ্যস্ত। তার নত মুখ বিনত ভঙ্গি করুণার উদ্রেক করে।

সুলক্ষণা: সুগঠিতা সুমধ্যমা। অসামান্য বীণাবাদিনী, তার ধাত আলাদা, সে আর্টিষ্ট। কিন্তু সব শিক্ষিতা গুণী মেয়ের মতো তারও ছিল স্তবস্তুতির ক্ষুধা। তার সমস্যা হল আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতজনিত সমস্যা।

অমিয়া: মিস্ অমিয়া বোস, বি. এ. (অনার্স)। তার চোখে চশমা নেই, মুখ নিটোল, শরীর সুঠাম। রঙ মলিন শ্যাম, ত্বক মসৃণ তৈলাক্ত। প্রকৃতিতে প্রাণের চাঞ্চল্য নেই, আছে একটা নির্জীব জড়তা। বাড়ির পাহারা ও শাসন মিলে তার বিশিষ্টতা ও নিজস্ব ইচ্ছাকে বিনষ্ট করেছে।

প্রতিমা: ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের কৃত্রিমতা তাকে কৃত্রিম করেছে। সে সুন্দরী না হয়ে হয়েছে স্মার্ট। সেই সঙ্গে ফ্যাশানপ্রিয় আধুনিক হতে গিয়ে বেহায়া। ইংরেজি সে অনর্গল বলতে পারে বটে কিন্তু অর্গল থাকলে হয়তো বিশুদ্ধ থাকতো। থেকে থেকে রসিকতা করলেও সে বেরসিক, এতই নকলনবিশ যে মার মত ও কথাই তার মত ও কথা। ফর্ম ও কমফর্টকেই সে সবচেয়ে বড় বলে জানে। তার সম্পর্কে সোম ন্যায্যতই বলেছিল,

আপনাকে দেখে নিজে হাসতে পারি কিন্তু আপনাকে দেখিয়ে পরকে হাসাবো না।

মায়া : পিকেটিং করে সে জেলে ছয় মাস কাটিয়েছে বলে শরীর তার শীর্ণ শুষ্ক রুগ্ন নয়। বরঞ্চ তার নিটোল অঙ্গ অনাবশ্যক মেদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেনি। তার চোখ অসাধারণ দীপ্ত কিন্তু তার চরণ চপল নয়। আপনি সে সংহত, কিন্তু ঢেউ ওঠে তার চারদিকে। তার আছে প্রভূত মান, তাই সে পরাজিত হতে জানে না, কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ব নেই, তা বোধহয় তার কাম্যও নয়। নায়িকা হবার বৈশিষ্ট্য তার রয়েছে।

সোমের ব্যক্তিগত গতিপথ ধরে উপন্যাস এগোলেও, আগেই বলেছি, সামাজিক বিচারও এই উপন্যাসের অন্যতম প্রসঙ্গ, বিবেচ্য মেয়েদের নিজস্ব ভাবনা ও মেয়েলি ভাবনা। এই ভাবনা বিয়েকে কেন্দ্র করে, প্রেমকে কেন্দ্র করে নয়। যদিও এর সঙ্গে ওর চোখের দেখা ও চোখের দেখায় প্রেম হয়ে যেতে পারে বটে—অন্তত বাংলা উপন্যাসে তাই লেখে ও তাই পড়ে মেয়েরা জীবন সম্পর্কে এক অতিরঞ্জিত ও ফাঁপা ধারণা পায়, তবু গরিষ্ঠসংখ্যক মেয়ের বেলায় প্রধান সমস্যা হল বর ও ঘর জোটানোর সমস্যা। সমাজ-তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাকে এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করে দেখা একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে।

পুতুল নিয়ে খেলাতে স্বল্প হলেও লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে, বিশেষত আঙ্গিকগত ভাবে : পরিশীলিত শব্দচ্ছন্দে ও বাক্যবন্ধে, কলাকৌশলের সরস প্রয়োগে ও আগেই বলেছি, উপন্যাসের জন্য শৈলী নির্বাচনে। আর লেখকের রোমান্টিক চেতনা এবং রবীন্দ্র-নাথ ও নজরুল, বুদ্ধদেব বসু ও মণীন্দ্রলাল বসু, মীরাবাঈ ও নেসফিল্ডের নামোচ্চারণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত পরিমণ্ডলটি স্পষ্ট। যদি ধরে নিই এই পরিমণ্ডলে সোম বারবার রোমাঞ্চই ঘটাচ্ছিল তাহলে রসের নিবেদন স্থান, কাল, এবং নিবেদক ও গ্রাহকের ব্যক্তিত্ব অনুসারে সাড়া পায় বলে, সুলক্ষণা বা মায়া যাদের প্রতি তখন সে হৃদয়ে আবেগ অনুভব করেছে তারা তার নায়িকা নয়, তারা তার সম্ভবপর জায়া এবং সে হিশেবে তারা অমিয়া কি প্রতিমা কি শিবানীর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, নিকৃষ্টও নয়। ভাবগত ভাবে এই সমোজ্জ্বলতাই পুতুল নিয়ে খেলা উপন্যাসের প্রধান ও (রচনাকালের কথা মনে রাখলে) এক বিরল বৈশিষ্ট্য।

রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের মধ্য দিয়ে অন্নদাশঙ্করের রচনার একটি পর্ব শেষ হল। এই পর্বে বাদলের সত্যান্বেষণ ব্যর্থ হয়ে যায়, কল্যাণের প্রেমান্বেষণও ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ গাণিতিক হারজিত নয় বলে ব্যর্থতা এখানে নিছক ব্যর্থতা হয়ে থাকে না : 'ব্যর্থতায় সার্থকতার রং ফলে', 'সেই ব্যর্থতাও ভালো, সেই অভিজ্ঞতা অন্য কারো সাফল্যের সোপান হবে', 'জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না, জীবনবিধাতা হিসাবী কারিগর, তাঁর বাটালির একটি আঁচড়ও অকারণ নয়, ব্যর্থতার আশঙ্কা অমূলক।' প্রকৃতই ব্যর্থতা এখানে

সাফল্যের সোপানও হতে পারে, অন্নদাশঙ্করের কবিতাতেও সে-ইঙ্গিত স্পষ্ট :

১. অতিক্রান্ত পথে যত অশুদ্ধি রয়েছে / এ জীবন পরিণত তা দিয়ে হয়েছে।

২. উভয়ই সহায় তার—মঙ্গলামঙ্গল / রূপান্তর সাধনের যে জানে কৌশল।

৩. রাহু আছে, তবু নেই। আছে চাঁদ, পূর্ণিমাও আছে।

পূর্ণতা পরম সত্য আমাদের সকলের কাছে।

৪. দুর্যোগে সুযোগ করো, সঙ্কটে পুনরাস্থ হোক

মধ্যাহ্নের অন্ধকার ঢাকেনিকো দিনের আলোক।

জীবন অনেক বড়ো, সয় তার সব ক্ষয়ক্ষতি

রিক্ত হয়ে ফুরায়নি যা তোমার সম্ভাব্য সঙ্গতি।

শতবিধ সম্ভাবনা এখনো তো রয়েছে সম্মুখে

ব্যর্থতা কোথায় তার নতুন উৎসাহ যার বুকে?

তাই এরপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে লেখকের রচনার আর একটি পর্বে—মানুষের বিশ্বাস ও সামর্থ্য, প্রয়াস ও সাফল্য, সম্ভাবনা ও পরিণতির ভিন্নতর বর্ণনায়।

ধীমান দাশগুপ্ত

মর্তের স্বর্গ

পরিচ্ছেদসূচী

চরিত্র পরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	বাদলের স্ত্রী
সুজাতা গুপ্ত	উজ্জয়িনীর মা
অশোকা তালুকদার	সুধীর 'মনের খুশি'
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	সুধী-বাদলের বয়স্য
এলেনর মেলবোর্ন হোয়াইট	সুধীর 'আণ্ট এলেনর'
মাদাম দ্যুপোঁ	সুধীর ল্যাণ্ডলেডী
সুজেৎ	মাদামের মেয়ে
মার্সেল	মাদামের পালিতা কন্যা
সহায়	সুধীর বিহারী বন্ধু
মিটেলহলৎসার	সুধীর জার্মান আলাপী
বৃদ্ধ ব্লিজার্ড	কোয়েকার শান্তিবাদী
জন ব্লিজার্ড	তাঁর পুত্র
ক্রিষ্টিন	জনের স্ত্রী
সোনিয়া	জনের মেয়ে
তারাপদ কুণ্ডু	প্রসিদ্ধ দলপতি ও বহুরূপী
মার্গারেট বেকেট	বাদলের বান্ধবী
স্টেলা পার্টরিজ	বাদলের 'ভগিনী'
ললিতা রায়	উজ্জয়িনীকে এক সময় পড়াতেন

—আরো অনেকে—

দুই প্রশ্ন

অবশেষে মার্সেলের মায়া কাটিয়ে সুধী বাসা বদল করল। অঙ্গীকার রইল হপ্তায় একবার দেখতে আসবে ও শুধু হাতে আসবে না।

মাদামের মনে ক্ষোভ থাকার কথা নয়, কারণ সুধী তার এক বিহারী বন্ধুকে বদলি দিয়েছিল, আর মিটেলহলৎসারের উপর মাদামের যে বিরাগ সেটা তো ব্যক্তিগত নয়, সেটা জাতিগত। জার্মান হলেও লোকটা অমায়িক ও বেহালা যা বাজায় তা বেলজিয়ানেরও শোনবার মতো। মাদামের মনে ক্ষোভ ছিল না, তবু বলতে ছাড়ল না যে মানুষ মাত্রেই অকৃতজ্ঞ। সুধীর জন্যে সে যা করেছে তা মাসিপিসির চেয়ে কম কিসে ?

সুধী তা স্বীকার করল। "নিজের সুবিধের কথা ভাবলে এইখানেই থেকে যেতুম, মাদাম। আর ক'টাই বা মাস।"

রোজ সন্ধ্যাবেলা টেলিফোনে সুদীর্ঘ আলাপ ও মধ্যে মধ্যে একজনের আকস্মিক আবির্ভাব। দুই আর দুই যোগ দিলে যা হয় মাদাম তা জানত। "তা তো বটেই, তা তো বটেই। পরের জন্যেই জীবন। আহা, পর না থাকলে কি জীবন দুর্বহ হত না!" হাসি চাপল।

মাদামের অনুমান ভুল। তার প্রমাণ যে বাসায় সুধী চলল সে বাসায় টেলিফোন ছিল না। আর সে বাসা অশোকার পক্ষে এতটা দূরে যে আকস্মিক আবির্ভাবের সম্ভাবনা স্বল্প। বরং অনুমান করা যেতে পারত একজনকে এড়ানোই সুধীর অভিপ্রায়। কিন্তু তাও ঠিক নয়।

উজ্জয়িনীর সঙ্গে সুধীর কদাচ সাক্ষাৎ হয়, হলে সে যা বলে তা বৈপ্লবিক। সুধীর বিশ্বাস সেসব তার স্বকীয় নয়, শেখানো। মন্ত্রণার ধারা আধুনিক, কিন্তু মন একেবারে আদিম। মন্ত্রীদের অভিসন্ধি সিদ্ধ হলেই মন্ত্রের সাধন।

তার মা যদি অবহিত হতেন তবে সুধীর কী মাথাব্যথা ছিল! কিন্তু তিনি তাঁর "আপনার জন"দের নিয়ে সময় পান না। তাঁর ধারণা ছিল মেয়েকে একবার বাদলের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়ে দিলেই তাঁর কাজ ফুরাল। তারপর সে তার স্ত্রীর ভার নেবে, তিনিও ছুটি পাবেন। কিন্তু বাদলটা যে এত বড় অপদার্থ হবে তিনি তা কল্পনাও করেন নি। অর্থাৎ ছোটখাটো অপদার্থ হলে আশ্চর্য হতেন না। ছি ছি একটা আস্ত ঘটিরাম! আচ্ছা, এই সব ছেলে কি পাস করে আই সি এস হয়!

মেয়েটা হয়েছে একটা আপদ। বিয়ের পরও যদি তাকে আঁচলে বেঁধে বয়ে বেড়াতে হয় তবে বিবাহ শব্দের মানে হয় না। বিশেষভাবে বহন থেকেই না বিবাহ। শাস্ত্র বল, আইন বল, ব্যাকরণ বল, তার বেলা সব মুনির এক মত। সকলেই বাদলের বিপক্ষে

ও তার শাশুড়ীর স্বপক্ষে। বাদলের বন্ধু বলে সুধীর উপরেও তাঁর অনাস্থা এসেছিল। বাদল যখন শাশুড়ীর উপরোধ উপেক্ষা করল তখন বাদলের বন্ধুকেও তিনি উপেক্ষা করলেন। তাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেলেন, সে অনাহূত উপস্থিত হলে কোনোবার খেতে বলতেন, কোনোবার বসতেই বলতেন না। তবে সুধীর আসাযাওয়া এত কম ছিল যে সুধী এসব গায়ে মাখত না।

"সুধীদা যে!" তার দুই হাত ধরল উজ্জয়িনী। "কত কাল পরে! আমি তো ভেবেছিলুম তুমি আমাদের বয়কট করেছ। তারপর," সুধীকে বসিয়ে ও তার গায়ে হাত রেখে সুধাল, "কী খবর, বল। এত বিমর্ষ কেন? মুখে নেই হর্ষ কেন?" কানে কানে বলল, "বৌদি কিছু বলেছেন?"

"বাসা বদল করলুম।"

"বল কী!" উজ্জয়িনী যেন আকাশ থেকে পড়ল। "অসম্ভব! এ যে কিছুতেই হতে পারে না! বাসাবদল। এয়সা কাম কোই কভি নেহি কিয়া।"

মিসেস গুপ্ত ছিলেন না। চার জন মিলে তাস খেলছিল, তাদের মধ্যে ছিল দে সরকার। সুধীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে তাসের উপর রাখল ও অস্ফুট স্বরে বলল, "আসতে আজ্ঞা হোক, চক্রবর্তী ঠাকুর।"

মোনা ঘোষ খেলা দেখছিল। ফোড়ন কাটল, "হল না। হল না। বলতে হয়, সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে এয়ছা কাম কোই নেহি কিয়া।" এই বলে সিগরেট বাড়িয়ে দিল।

"মাফ করবেন। আমি খাইনে।"

"কী আফসোস। তবে আপনি খান কী! খৈনি না খিলি পান?"

তা শুনে নৃপতি ঘটক হো হো করে হেসে ওঠায় মোনা বলল, "হাসির কথা নয়, ঘোটক। সিরিয়াসলি বলছি। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ হলে কিছু একটা অফার করতে হয়। আমি তাই জানতে চেয়েছি দোক্তা না ধুঁয়াপত্তর।"

এবারকার হাস্যরোলে দুটি ইংরাজ তরুণীরও মৌনভঙ্গ হল। তাদের জন্য মোনা ঘোষ আরেক দফা শোনাল—তর্জমায়। ভালেরী বলল, "বুনু থাকলে সহজেই গোল মিটত। এক টিপ নস্য নিতে অবশ্য উনি আপত্তি করতেন না। করতেন নাকি, মিস্টার—"

উজ্জয়িনী পরিচয় করিয়ে দিল। "বাসাবদল ওর পক্ষে যথেষ্ট অঘটন। নস্য নিলে হয়তো দুর্ঘটনাই ঘটত।" রঙ্গ করল উজ্জয়িনী।

এতগুলি তরুণ তরুণীর হৈ চৈ হাসি মস্করা। দে সরকার কিন্তু অস্বাভাবিক নীরব। দৃষ্টি তার তাসে নিবদ্ধ। স্টেক রেখে খেলা হচ্ছে, দে সরকার সতর্ক খেলোয়াড়। তা বলে তাস এমন কিছু শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নয় যে এই ঘোর শীতেও কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দেবে। বোধ হয় ইলেকট্রিক আগুন তার পক্ষে অতিমাত্রায় গরম।

হাসির আরো উপলক্ষ্য জুটল। এবার সুধীকে নিয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে হাস্যকৌতুক এদের বয়োধর্ম। পাঁচ সাত জন সমবয়সী তরুণতরুণী একত্র হলে হাসির উপলক্ষ্য খুঁজতে হয় না। সবকিছুই উপলক্ষ্য। হঠাৎ উজ্জয়িনীর কী মনে পড়ল, সে বাইরে গেল ও কয়েক মিনিট পরে এক গ্লাস পানীয় হাতে করে ফিরল। তা লক্ষ করে সোনা ঘোষ হাঁকল, "ও কী ! আমরা বাদ গেলুম কোন অপরাধে ? হবে না, হতে পারে না, আমাদের না দিয়ে ওকে দেওয়া হতে পারে না।" ভদ্রলোককে সিগরেট খাওয়াতে যে ছিল অগ্রণী সেই কিনা অগ্রসর হয়ে গ্লাসটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল।

কিন্তু চোঁ করে খেতে গিয়ে তার মুখের চেহারা গেল বদলে। "ইস্ ! দু-ধ ! নিন, মশাই, আমি খাইনি। আমরা দুগ্ধপোষ্য নই।"

তার নাকাল অবস্থা সুধীকে সুদ্ধ হাসিয়ে তুলল। তবু দে সরকার নির্বিকার। বোধ হয় গরম দুধের আঁচ লেগে তার গাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল।

উজ্জয়িনী সুধীর কাছটিতে বসে কাঁধে হাত রাখল। "কোথায় উঠে গেলে ?"

"আর্লস্ কোর্ট। বেশী দূরে নয়, রোজ দেখা হবে। ভাবছি সন্ধ্যাবেলাটা তোমাদের সঙ্গেই কাটাব।"

উজ্জয়িনী যেমন পুলকিত হল তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠল দে সরকার। এতক্ষণ ঘামছিল, এবার কাশল। লক্ষ করে উজ্জয়িনী বলল, "আপনিও এক গ্লাস গরম দুধ খান না ? এক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দিই। কেমন ?"

"দুধের সঙ্গে কেন ? অমনি দিতে পারেন।" দে সরকার ধরা গলায় বলল।

"আমরাও। আমরাও।" একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ঘটক ও ঘোষ। যাকে বলে, এক কণ্ঠে। দুজনে মিলে এমন কাশতে লাগল যে কে বলবে এরা ক্ষয়রোগী নয়। ইংরাজকন্যারা ব্যাপার দেখে হাসবে কি কাশবে বুঝতে পারছিল না, হাসির বদলে কাশিটাই হয়তো হাল ফ্যাশন।

উজ্জয়িনী আনতে চলল।

সুধী ভাবছিল এই দলটিকে তাড়ানো সম্ভব নয়, আবার উজ্জয়িনীকে এদের দখল থেকে ছাড়ানো সোজা নয়। তবে কি রোজ এদের সঙ্গে মিলে সময় নষ্ট করতে হবে ?

এমন সময় অবতীর্ণ হলেন বুলুদা ওরফে ফাল্গুনী সেনগুপ্ত।

২

অবতীর্ণ কথাটা অপ্রযুক্ত নয়। কেননা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তিনি দুজনের স্কন্ধে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন, একখানা মজবুৎ চেয়ার বেছে আছাড় খেয়ে পড়লেন ও গদির গহ্বরে পাতালপ্রবেশ করলেন।

মীরা মজুমদার ও মণিকা মজুমদার দুই বোন বুলুদাকে নামিয়ে রেখে উজ্জয়িনীর খোঁজে নিখোঁজ হল।

যথারীতি মোনা বলল, "সিগরেট ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বুলু। "থ্যাঙ্কস্ ভেরি মাচ।" নিল বটে, কিন্তু ঠোঁট দিয়ে চাপতে পারল না, পড়তে দিল।

তার দশা দেখে মোনা সহানুভূতি জানাল। "দাওয়াই আসছে। সবুর।"

"কী আসছে ?"

"ব্র্যাণ্ডি।"

যেমন তেমন ব্র্যাণ্ডি হলে ক্লান্তি সারবে না বুলুর। মাথা নেড়ে ফরমাস করল, "কন্য়াক।"

বুলুর রুচির উপর অন্ধ বিশ্বাস ছিল ঘটক, ঘোষ ও আরো অনেকের। দুজনেরই মনে হল, তাই তো, কন্য়াক না হলে তৃষা মিটবে না কারো। উঠতে হল মোনাকেই।

কিন্তু মোনার কপালে যে ঠোনা ছিল তা কে জানত। কন্য়াক শুনে উজ্জয়িনী দুই চড় কষিয়ে দিল। "কন্য়াক খেলে নেশা হবে তোমার। চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হও। নইলে কন্য়াকের সঙ্গে কী মিশিয়ে দেব, জানো ?"

"কী ?"

"কুইনিন।" হেসে ঢলে পড়ল উজ্জয়িনী।

"তোবা, তোবা" করে সরে পড়ল মোনা ঘোষ।

মণিকা মেয়েটি নেহাৎ নাবালিকা। বব করা চুল, তাই বালকের মতো দেখায়। "বলতে গেলে কেন ? দিয়ে একবার মজা দেখা যেত।"

উজ্জয়িনী অন্যমনস্ক ছিল। "সত্যি, ভাই। আমি কারো সেবাদাসী নই। যাদের ভালো লাগে তাদের যত্ন করি, তা বলে কি যার তার মর্জি মানব ?"

"বাস্তবিক, ভাই।" মীরা জানাল সমব্যথা। তবে তার স্বরে সমব্যথা ছিল কিনা সন্দেহ। মোনা ঘোষের প্রবেশ কেবল কন্য়াকের জন্যে নয়, মীরার জন্যেও হয়তো।

উজ্জয়িনী ততক্ষণে আবার অন্যমনস্ক হয়েছিল। কী মনে করে বলল, "আমি ঘৃণা করি।"

মোনা বেচারা এমন কী অপরাধ করেছে যে তাকে একেবারে ঘৃণা করতে হবে, মীরা আশ্চর্য হল। তবে উজ্জয়িনী খেয়ালী মানুষ, কখন যে খুশি হয় কেন যে ক্ষেপে যায় তার দিশা পাওয়া দুষ্কর।

গরম গরম সসেজ ও চিপস্ সহযোগে পানীয় পরিবেশিত হল, যার যেমন রুচি। কন্য়াকও ছিল। ছিল ককটেলও। একমাত্র দে সরকারের বরাতে জুটল উজ্জয়িনীর স্বহস্তে
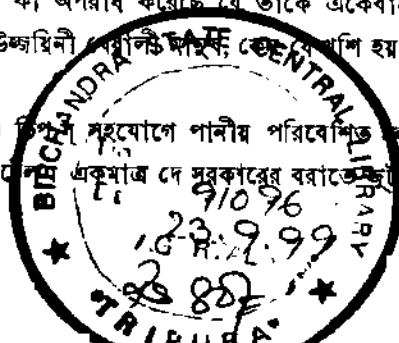
প্রস্তুত কবোষ্ণ ব্র্যাণ্ডি। কাঁচের গোলককে শীতল করতে করতে দে সরকার একবার সুধীর দিকে আড়চোখে চাইল, পরক্ষণে উজ্জয়িনীর চোখে চোখ রাখল। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।

ঘোনার ভরসা হচ্ছিল না স্পর্শ করতে। ভয়ে তার চেষ্টা পালিয়ে ফেরার। ঘটক যখন বলল, "টু ইউ, ঘোষ" তখন ঘোষ বেচারার কণ্ঠে ভাষা জোগাল না, সে তার গ্লাসটা কলের মতো উঠিয়ে কলের মতো নামিয়ে রাখল।

ইতিমধ্যে বুলু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। "ওহে দে সরকার। কতবার খেলা জিতেছ, আর কেন? নিজে একটু বিশ্রাম কর, অন্যের পকেটকে বিশ্রাম দাও।"

বুলুকে খেলায় বসিয়ে দে সরকার সুধীর পাশে আসন নিল। সুধাল, "বাসাটা ছেড়ে আফসোস হচ্ছে, তা ছাড়লেই বা কেন?"

"সে অনেক কথা।"

"কেমন জায়গা পেয়েছ?"

"ব্রেড—ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত যেমন হয়। এসো একদিন।"

"এক দিন কেন? আজকেই। আপত্তি আছে?"

সুধী উজ্জয়িনীকে ডাকল। "আজ তা হলে উঠি। কাল থাকবে তো?"

উজ্জয়িনী দে সরকারের সঙ্গে দৃষ্টি বদল করল। "থাকব।"

শীতের লণ্ডনের কিবা রাত্রি কিবা দিন। রাত্রে দিনের মতো আলো। দিনে রাত্রের মতো আঁধার। পথচারীর পোশাক দেখে ঠাওরাতে হয় রাত হয়েছে। কিন্তু ঘড়ি না দেখে ঠাহর হয় না কত রাত হয়েছে। ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে টিউব পেয়ে ওরা বর্তে গেল। সেখানে চমৎকার গরম। কেবল হাওয়া তেমন তাজা নয়।

"চক্রবর্তী, তুমিও শেষকালে ডিটেকটিভ বনলে!" বলল দে সরকার।

"কিসে তেমন মনে হয়?" সুধী বিস্মিত হল।

"নইলে কেন রোজ সন্ধ্যাবেলা আসতে চাও?"

"এত কাছে থেকেও যদি রোজ না আসি তবে কি সেটা বিসদৃশ হয় না! যারা রোজ আসে তারা কি এত কাছে থাকে?"

দে সরকার এ কথা গায়ে পেতে নিল। বিরক্ত স্বরে বলল, "না, আমি রোজ রোজ আসিনে। কোন কোন দিন আসি তা তোমাকে জানিয়ে রাখতে পারি, তা হলে তোমার শ্রম সংক্ষেপ হয়।"

"তা সত্ত্বেও আমি রোজ সন্ধ্যাবেলা আসব। না এসে আমার উপায় নাই যে! খাব কোথায়?" সুধী হাসল।

"ওহ্। তোমার সেই চিনি আতপ ও গব্য ঘৃত। আছে এখনো বাকী?"

"হাঁ। এইবার সম্যক সদ্ব্যবহার হবে। যদি উজ্জয়িনী নারাজ না হয়।"

"কিন্তু", দে সরকার চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, "এটা ফেয়ার প্লে নয়। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানে থাকলেই ভালো করতে। আমরা তোমাকে শ্রদ্ধা করি, চক্রবর্তী।"

সুধী চলতে চলতে বলল, "আমি কোনখানে থাকব তার উপর নির্ভর করবে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা?"

"কই, আগে তো শুনিনি যে ওখানে তোমার খাবার অসুবিধে হচ্ছে। আমি যে তোমার মাদামকে কয়েক রকম রান্না শিখিয়েছি তা কি সে বেবাক ভুলেছে?"

"প্রিয়জনের হাতে খেয়ে যেমন তৃপ্তি," সুধী মোড় ঘুরে বলল, "তেমন কি পরের হাতে খেয়ে হয়? তুমিই বল না।"

দে সরকার সুধীকে নেমন্তন্ন করে নিজে রেঁধে খাইয়েছে। তৃপ্তির প্রশ্ন উঠলে প্রিয়-জনের তুলনা মেলে না। তা বলে শুধু এই জন্যে সুধী তার এত সুখের বাসা ছেড়েছে দে সরকারের মতো ঘুঘু বিশ্বাস করবে এ কথা!

"না, চক্রবর্তী।...কিন্তু যাক ও প্রসঙ্গ। তোমার পড়া কেমন চলছে?"

"খুব জোরে চলছে। দশ বছরের পড়া এক সঙ্গে পড়ে নিচ্ছি। দেশে ফিরে একে তো বইপত্র পাব না, পেলেও অবসর পাব না।"

"কী স্থির করলে শেষ পর্যন্ত? চাষ করবে না ঘাস কাটবে?"

"দাঁড়াও।" সুধীর কাছে ল্যাচ কী ছিল। সদর দরজা খুলে একতলায় ঢুকল। তার ঘর দোতলায়। "পছন্দ হয় কিনা আগে বল।"

দে সরকার লক্ষ করল টেবলের উপর মার্সেলের ও দেয়ালের গায়ে বাদল-উজ্জয়িনীর বিয়ের ফোটো। শ্লেষভরে বলল, "কই, আর কাউকে দেখছিনে তো? বোধ হয় বালিশের তলায়।"

দে সরকারের বাক্য চিরদিন অমনি বাঁকা বাঁকা। উপরন্তু সুরার প্রভাব ছিল তার স্বরে। সুধী তার উত্তেজনায় ইন্ধন জোগাল না। "কী খাবে? আপেল না কমলালেবু? আঙুর চাও তো তাও আছে।"

আঙুর আপেল ও কমলালেবু মাঝখানে রেখে দুধারে দুজনে বসল। দে সরকার জিজ্ঞাসা করল, "এই খেয়ে রাত্রে থাকবে?"

"কাল থেকে রেস্টোরাণ্টে খাব, যদি উজ্জয়িনীর অনিচ্ছা দেখি।"

৩

সুধীর নতুন বাসার দুই মালিক—দুই বোন উইনস্লো। দুই জনেরই চুল পেকে চামর

হয়েছে, কিন্তু বিয়ের ফুল ফোটেনি। একজনকে দেখতে পাওয়া যায় না, শোনা যায় সে নাকি পাগল। আরেক জনের সঙ্গে দেখা না হলেই রক্ষা, হলে নিস্তার নেই। অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করতে করতে অনর্গল নিষ্ঠীবন বর্ষণ করে, নিঃশ্বাস নেয় না, নিলে যদি শ্রোতা পরিত্রাণের সুযোগ পায়। তার যে পোশাক তাও ঘ্রাণঘাতক। প্রতি দিন একই, সকাল সন্ধ্যা একই। যেন পোশাক নয়, খোলস।

বুড়ীরা থাকে একতলায়। সেখানে তাদের ভয়ে কেউ ঘর নেয় না। দোতলায় সুধী ব্যতীত আরো জন দুই দুঃসাহসী থাকে। তেতলায় কারা থাকে সুধীর ধারণা নেই। মাটির তলায়ও ঘর আছে, তাতেও মানুষ থাকে, কিন্তু তারা অপরের অগোচর। একটি বাড়ীতে এতগুলি লোক, অথচ এতগুলি স্বতন্ত্র সংসার। একত্রবাস তাদের এক সূত্রে গাঁথতে পারেনি। পাশের ঘরে যে থাকে সেও সুধীর অচেনা, সুধীর কাছে এর মতো অস্বাভাবিক আর কিছু নয়।

"ঘর কেমন লাগল, শুনতে চাও?" সুধাল দে সরকার। উত্তর দিল সে নিজেই, "ঘরণীহীন ঘর যেন তরণীহীন চর।"

সুধী কী ভাবছিল, শুনল কি না শুনল বোঝা গেল না।

"কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।" বলতে লাগল দে সরকার, "কিন্তু তোমার কেন ভরসা নেই? তুমি কেন একা? তোমার তরণী হতে অন্তত জন দুই তরুণী উৎসুক।"

সুধী মৃদু হেসে মৌন রইল। সে হাসি করুণ।

"আমি বলি," দে সরকার থামল না, "তোমার যখন সত্যি কোনো অভাব নেই— না বিত্তের, না বয়সের, না বান্ধবীর—তখন তোমার ব্রাহ্মণ্য যেন প্রতিবন্ধক না হয়। তোমার মতো বৌভাগ্য ক'জনের বা সৌভাগ্য।"

সুধী বলল কাতর স্বরে, "আমার মন ভাল নেই, সখা। ও প্রসঙ্গ থাক।"

"মন ভালো নেই!" লজ্জিত হল দে সরকার। "এতক্ষণ বলতে হয় সে কথা।"

"যাদের সঙ্গে এতকালের সাযুজ্য তাদের থেকে দূরে সরে এসেছি। জ্যাকি কুকুরটাও আমাকে খুঁজছে।" বলতে বলতে সুধী চোখ বুজল। তারপর আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সন্ধ্যাবেলা আমারি ঘরে আগুন পোয়াত পায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে।"

শূন্য মন্দির মোর! শূন্য মন্দির মোর। জ্যাকির অভাবে শূন্য, মার্সেলের অভাবে শূন্য। অথচ এদের একটি তো কুকুর, অন্যটি বালিকাশিশু। কে মেটাবে এদের অভাব, কে কার অভাব মেটাতে পারে। প্রত্যেকেই অতুল, প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। জ্যাকির মতো জ্যাকি আর হয় না, মার্সেলের মতো মার্সেল আর হবে না। একমেবাদ্বিতীয়ম্। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দে সরকারও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ থাকল। "আমি জানি তুমি হৃদয়বান। তুমি ভালবেসেছ, তুমি ভালবাসতে জানো।" আবেগে তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল। "আমার মনে হয় তোমার প্রথম বয়সে তুমি শুক সনক ছিলে না, তুমি প্রেমেও পড়েছ, পাগলামিও করেছ, নিয়তির হাতে সাজা পেয়ে শুক সনক সেজেছ।"

"চুপ। চুপ। চুপ।" সুধী হাসতে হাসতে শাসাল। "রাত হয়েছে। বাসায় যাবে না? ডিনার খাবে না?"

"নাঃ, যথেষ্ট খেয়েছি। কিন্তু অমন করে ফাঁকি দিতে পাবে না, মহর্ষি। ফাঁকি দিয়ে আমার কাহিনীগুলি সমস্ত শুনেছ, নিজের কাহিনী একটিও শোনাওনি।"

"একটিও শোনাবার মতো নয় যে।"

"আছে তা হলে অনেকগুলি!" দুষ্টু হাসি হাসল দে সরকার। "বাল্মীকি একদিনে মহর্ষি হননি।"

"আচ্ছা, আরেক দিন শুনো।" সুধী সহাস্যে বলল, "যদিও যা ভেবেছ তা নয়।"

"কী ভেবেছি তাও তুমি ধ্যানে জেনেছ? অবাক করলে, যোগীবর।" দে সরকার সিগরেট ধরাল। "না, যা জেনেছ তা নয়।"

ধোঁয়ার জন্যে জানালার খানিকটা খুলে সে নিজের জায়গায় ফিরল। "তা নয়, তা নয়। দেহের জন্যে আমি লালায়িত নই। চিরদিন আমার এই অহঙ্কার থাকবে যে কোনো দিন আমি ভিখারী হইনি।"

সুধী এলিয়ে পড়েছিল, তার বেশ ঘুম পাচ্ছিল। মনে পড়ছিল এক জনকে। যাকে মনে পড়ে প্রত্যহ এমনি সময়। কল্যাণ হোক তার, কল্যাণের পথ চিনে নিক নির্মল নয়নে, বেছে নিক নির্ভয় অন্তরে। কল্যাণ হোক তার, যদি ভুল করে তবুও, যদি ভয় পায় তবুও।

"যার জন্যে আমি আকুল," বলছিল দে সরকার, "সে নারী প্রিয়দর্শনা, রঙ্গিনী সে, লীলাকুশলা। সে নারী অপরাজিতা। মানস মুক্ত, প্রকৃতি নির্লিপ্ত, আসক্তি নেই তার অন্নে ব্যঞ্জনে, বসনে ফ্যাশনে। পেলে উপভোগ করে, হারালে হায় হায় করে না। আর শোন, চক্রবর্তী—কি হে ঘুমোলে নাকি?"

"না। বল।"

"বলছিলুম, সেবায় তার রুচি নেই, সেবা তার রুটিন নয়। অথচ সঙ্কটে সে সেবিকার অগ্রগণ্য।"

"তা হয় না। আমার ঘরণীকে দুবেলা রাঁধতে ও বাসন মাজতে হবে, গোবর দিয়ে উঠোন নিকোতে হবে।" দুজনে হেসে উঠল। "আচ্ছা, গোবর না হয়ে ফিনাইল হোক। কিন্তু কাজটা ঘরণীর, দাসীর নয়।"

"তার মানে তুমি ঘরণীর চেয়ে ঘরকে বড় করে দেখছ। আমি হলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম, ঘরণীকে নিয়ে গাছতলায় থাকতুম গাছে উঠে ফল পেড়ে খেতুম। কিন্তু আমার কথা শেষ হয়নি। সেবা তার রুটিন নয়। তা বলে সে অলস নয়। সে শিল্পী, সে স্রষ্টা। সাহিত্যে বা সঙ্গীতে, অভিনয়ে বা নৃত্যে, চিত্রে বা ভাস্কর্যে যত আনন্দ পায় তত আনন্দ দেয়। অথচ যশের জন্যে প্রয়াস নেই। পেলে খুশি হয়, না পেলে নালিশ করে না।"

"তার মানে," সুধী সকৌতুকে বলল, "তোমার ঘরণীর ঘরণী হবে তুমি স্বয়ং।"

"যাও। এবার যা বলব তা নিয়ে হেসো না। মিনতি আমার।" দে সরকার স্বর নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "প্রেমের গভীরতর অনুভূতি তার পক্ষে সম্ভব। স্বভাব যাদের অগভীর তারা তাকে ভালোবাসতেই ভয় পায়, চাইবে কী! চাইবার মতো পৌরুষ যদি থাকে তবে চাওয়ার চেয়ে বেশী দিতে পারে সে অপ্সরা। আত্মসমর্পণ করে কিছুই হাতে না রেখে। অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই তার, ধরে রাখতে ত্বরা নেই, আর ছেড়ে দিতে পরোয়া নেই।"

দে সরকারের বর্ণনায় এমন একটি তন্ময়তা ছিল যা সুধীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল। উজ্জয়িনীর পক্ষে এই আকর্ষণ প্রবলতর হবে, দুর্বার হবে, হবে সর্বনাশা—যদি সুধী না করে প্রতিরোধ।

"আচ্ছা, এখন তবে আসি।" এই বলে ওভারকোট গায়ে চাপাল দে সরকার। "আশা করি ঘুমের ক্ষতি করে গেলুম না। ঘুমোও আর স্বপ্ন দেখ।"

"তুমিও।"

"ধন্যবাদ। আমি প্রায় জেগে কাটাই। এবং যা দেখি তা স্বপ্ন।" একবার বাদল-উজ্জয়িনীর ফোটোর উপর চোখ বুলিয়ে নিল।

সুধী তাকে এগিয়ে দিতে চলল। বিদায়কালে সে সুধীর হাতে হাত রেখে মিষ্টি করে বলল, "কাল থেকে আমাদের শত্রুতা।"

সুধী বিস্মিত হল। "শত্রুতা কেন।"

"ভেবে দেখো।" হাতে চাপ দিয়ে হাসল দে সরকার। "বন্ধু, তুমিই জয়ী হবে শেষ-পর্যন্ত। তোমার দিকে সমাজ, ধর্ম, আইন, লোকমত, সম্পত্তি, নিরাপত্তা। তোমার হাতে বাছা বাছা রং। তবু আমি এক হাত খেলব। খেলেই আমার সান্ত্বনা।" এই বলে ঝাঁকুনি দিল। "গুড নাইট।"

৪

মিউজিয়াম থেকে বেরোবার মুখে অশোকার সঙ্গে দেখা। তারও সেই একই অনুযোগ।

"কেয়ার প্লে নয়। আমার টেলিফোনের জ্বালায় তুমি মুলুক ছেড়ে পালালে। বড় কৃপা করেছ, দেশান্তরী হওনি।"

এর জবাব দুকথায় দেওয়া শক্ত। দিলেও বিশ্বাস্য নয়। এমনি উজ্জয়িনীর উপর অশোকার অনুরাগ নেই। সব শুনলে বিরাগ আসতে পারে।

"তা নয়, খুশি।" সুধী এড়িয়ে গেল। "মনের খুশি" হয়েছে একপক্ষে "মহুয়া," অপর পক্ষে "খুশি।"

"নয়? বাঁচালে। ভেবেছিলুম অপরাধটা আমার।" আশ্বস্ত হল অশোকা। চলতে চলতে সুধাল, "মহুয়া, ঠিক তো? অপরাধটা আমার নয় তো?"

"ঠিক। অপরাধ কারুর নয়।"

দারুণ বৃষ্টি। সুধীর ছাতা ছিল না। অশোকার ছিল। একই ছাতা মাথায় দিয়ে দুজনে চলছিল। ভিজছিল দুজনেই। সুধী বলল, "দুজনের চেয়ে একজনের ভেজা ভালো। সে একজন আমি।"

"বা, তুমি কেন? যেহেতু আমি নারী?"

"অন্তত যেহেতু ছাতা তোমার।"

"তোমার দেখছি আত্মপরভেদটা কিছু প্রখর। বসুধা তোমার কুটুম নয়।" ফেনিল হেসে অশোকা দিল ছাতাটা সুধীর দিকে ঠেলে।

"আচ্ছা, লোকে কী ভাববে সেটা তো বোঝ। ছাতাটা মেয়েলি। ওর ঐ ব্যাকরণের দোষ খণ্ডাবে কিসে?" ছাতা সরলো অশোকার দিকে।

ছাতাটা বন্ধ করল অশোকা। "এবার?" বলে খিল খিল করে হাসল।

টিউব স্টেশন তখনো কিছু দূরে। বাধ্য হয়ে দুজনে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। দোকানটি সুধীর চেনা। ঢুকতেই দুজনের নিরালা জুটে গেল।

"তোমাকে নিয়ে আমি পারব না।" অশোকা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। "চা খাবে না, কফি খাবে না, কোকো—যা চকোলেটের সামিল—তাও তোমার চলে না!"

"কোকোর কথায় মনে পড়ল পুরানো একটা গল্প। শুনবে?"

"নিশ্চয়।"

"কলেজের বন্ধে আমরা দুই বন্ধু—বাদল আর আমি—এক নির্জন পাহাড়ের ডাক বাংলোয় এক মাস ছিলুম। পাহাড়ে যে একজন সাধু থাকতেন তা আমরা প্রথমে জানতুম না, তিনিই আমাদের জানালেন। আধুনিক কালের গ্রাজুয়েট সাধু নয়, সত্তর বছরের জটাধারী। তাঁর আহ্বান পেয়ে আমরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হলুম। বাদল তো সাধু-টাধু মানে না, বোধ হয় সাহেব সাধু হলে মানত, মেম সাধু হলে অবশ্য মানত—"

অশোকা হাসল। "বাদল কি এখনো সেই গোয়েনডোলেন স্ট্যানহোপের আশ্রয়ে আছে?"

"হাঁ। তবে কয়েক দিন থেকে খবর পাইনি।"

"তারপর?"

"তারপর তাকে ধরে নিয়ে এক সঙ্গে হাজির হলুম। সাধু বললেন, বেটা বৈঠো। আমরা অনুমান করলুম এর পরে আসছে সাধনমার্গের সঙ্কেত, পরকালের পাথেয়। বাদল তো তর্কের জন্যে জিবে শান দিয়েছিল। কিন্তু গোড়াতেই প্রশ্ন উঠল, আমাদের সঙ্গে চা আছে?"

"ওমা!" অশোকা অবাক হয়ে গালে হাত রাখল।

"চা আমরা দুজনেই খাইনে। বাদলের সঙ্গে কোকো ছিল, ওর অনিদ্রার ওষুধ। কোকোর নাম শুনে সাধুজী বাদলকে দুই বাহু তুলে আশীর্বাদ করলেন। আর সেই নাস্তিকের প্রতি যতটা ঝুঁকলেন এই আস্তিকের প্রতি তার শতাংশ নয়। বাদল তাঁকে কোকো বানিয়ে খাওয়াল, তাঁর আগ্রহে টিনের অর্ধেক উপহার দিল।"

"তাবপর?"

"তারপর আমার কথাটি ফুরোল। আধ টিন কোকোর বদলে তিনি আমাদের আধ মণ ফলমূল পাঠিয়েছিলেন। আর বাকি অর্ধেকের জন্যে আর্জি পেশ করে বাদলকে বিব্রত করেছিলেন।"

"বাদল!" অশোকা বলল তাচ্ছিল্যের স্বরে। "অমন পাগল কি দুটি আছে! হাঁ, আছে বৈকি। তার স্ত্রী উজ্জয়িনী।"

উজ্জয়িনীর নাম উঠলে সেই থেকে আরো কী উঠবে, সুধী তাই সে প্রসঙ্গ পরিহার করল। "দেখলে তো গোঁড়া হিন্দুরও চা কোকো চলে। আমার চলে না, এর কারণ আর যাই হোক গোঁড়ামি নয়, তা তো মানলে?"

"মানলুম, কিন্তু কারণটা আসলে কী তা তো জানলুম না।"

"এমন কোনো অভ্যাস আয়ত্ত করতে চাইনে যা আমাকে গ্রামে বাস করতে দেবে না, যা হয়তো আমার ঘর দিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকবে।"

"ওহ্! এই কথা! তুমি তা হলে গ্রামে গিয়ে বসবেই? নিশ্চিত।"

"ধ্রুব।"

"বাদলের চাইতেও তুমি পাগল।" অশোকা দুই গালে দুই হাত চেপে টেবলে ভর দিল। "আমার বিশ্বাস আমাকে তুমি পরীক্ষা করতে চাও বলেই গ্রামের ভয় দেখাও।"

"ভয়!" সুধী মৃদু হাসল। "ভয়ের কী আছে গ্রামে! গ্রামে যাওনি বলেই গ্রামের নামে ভয় পাও।"

বৃষ্টি করেছিল। অশোকা ব্যাগ খুলছে দেখে সুধী বলল, "আমি দিচ্ছি, আমারি দেনা।"

"বা। তোমার কেন? আমার অর্ডার। বিলও আমার।"

বচসা না বাধিয়ে চুপি চুপি বিল চুকিয়ে দিল সুধী। অশোকা একবার প্রতিবাদ করে পরক্ষণে হাসির ফুলঝুরি ঝরাল।

"মহুয়া," বাইরে এসে অশোকা আবার শুধাল, "মহুয়া, সত্যি বলছ আমার দোষে দূরে যাওনি?"

"সত্যি।"

"তা হলে বল কী ব্যবস্থা করেছ? তোমার সঙ্গে কথা কইবার কী উপায়! মিউ-জিয়ামে আসতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা কি সুন্দর দেখায়?"

বাস্তবিক কোনো সুচিন্তিত উপায় ছিল না। ইচ্ছা করলে সুধী এমন কোনো বাসা নিতে পারত যেখানে টেলিফোন থাকত। কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে ডাকলে সাড়া না পেয়ে অশোকা আরো ক্ষেপত, তার চেয়ে টেলিফোন না থাকা নিরাপদ।

অনেক দিন থেকে সুধীর মনে একটা কথা ঘুরছিল, অশোকার মনে আঘাত লাগতে পারে তাই বলেনি। "খুশি," সুধীর স্বরে দ্বিধা, "না, থাক।"

"কী বলতে যাচ্ছিলে বল।"

"ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে?"

"কী মুশকিল। এত ভণিতা কেন?"

"খুশি," সুধী দ্বিধা কাটিয়ে বলল, "মা'কে জানালে হয় না?"

অশোকা যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল। "কোন মুখে জানাব? কার ভরসায় জানাব? মা যখন জানতে চাইবেন, ছেলেটি কী করে, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার তো অসাধ্য।"

"আচ্ছা, সে উত্তর আমিই দেব?"

"তুমি যা দেবে তা আমি জানি।" অনুকরণের ভঙ্গীতে অশোকা আবৃত্তি করল, "আমি ভারতবর্ষের সনাতন মার্গে চরণ রেখে জীবনতীর্থের যাত্রী। আমি জীবনশিল্পের শিক্ষানবীশ। কেমন করে বাঁচতে হয় বিদেশের সঙ্গে তুলনা করে শিখছি, দেশে ফিরে গ্রাম্য কেন্দ্রে শেখাব।"

"প্লাটফর্মে পায়চারি করছিল দুজনে। সুধী বলল, "এই উত্তর দিও।"

"লজ্জা করবে আমার। যদি জানতুম যে জোড়াসাঁকোয় বাড়ী আছে, পতিসরে জমিদারী আছে, তা হলে মা'কে বোঝাতে চেষ্টা করতুম এ ছেলে রবি ঠাকুর হবে, অন্তত সেই মার্গে চরণ রেখে সেই তীর্থের যাত্রী হবে। কিন্তু—" অশোকার ট্রেন এসেছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সুধীর দিকে ফিরে দেখল অপমানে বিবর্ণ তার মুখ।

সুধীর প্রস্তাবে উজ্জয়িনীর স্ফুতি কত। "তুমি খাবে, আমি রাঁধব না? বল তো আজ থেকে কোমরে এপ্রন বাঁধব।"

তারপরে সে এমন হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দিল যে তার উৎসাহের আগুনে চাল ডাল আলু কপি অর্ধেক সিদ্ধ। ইলেকট্রিক আগুন বেচারা বেশী কী করবে? তবে, হাঁ, রাঁধুনীর আঁচলের অভিমুখে ধাওয়া করেছিল বটে, ধরতে পারেনি, আঙুলে ফোস্কা পড়িয়ে ছেড়েছে।

রাত্রে সুজাতা গুপ্ত বাইরে খান, প্রায়ই নেমন্তন্ন থাকে। তাঁর ফিরতে এগারোটা বাজে। উজ্জয়িনী অনেকটা স্বাধীন। কোনো দিন থিয়েটারে যায়, কোনো দিন সিনেমায়। নাচের আসরেও যায়নি তা নয়। ক্রাইজ্‌লারের বেহালা ও পাড্‌রিউস্কির পিআনো শুনতে যারা রয়াল আলবার্ট হলে ভিড় করেছিল তাদের মধ্যে সেও ছিল। কোনো দিন বুলুদা কোনো দিন দে সরকার তার সাথী হয়, কোনো দিন সে একা চলে যায়, কাউকে নেয় না। ইতিমধ্যে তার দুটি একটি ইংরাজ বান্ধবী মিলেছে, তাদের সঙ্গে সে দোকান বাজার ঘুরে ভালো মন্দ অনেক জিনিস কিনেছে ও আরো অনেক জিনিসের দর জেনেছে। ঘরকন্নায় তার তৎপরতা লক্ষ করে তার মা তার হাতে সংসার সঁপে দিয়েছেন।

বিজ্ঞান পড়ার অনুমতি না পেয়ে সে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তারপরে স্কুল অব ইকনমিক্সের বাইরের ছাত্রী হিসাবে অর্থনীতি ও সমাজনীতির লেকচার শুনছে। বিষয় যাই হোক বিদ্যা তো বটে। বিদ্যার জন্যে সে এক প্রকার বুভুক্ষু বোধ করছিল। বই হাতে পেলে গ্রাস করতে অধীর হয়, মন দিয়ে নোট লিখে নেয়, অন্যের কাছ থেকে নোট চেয়ে নিয়ে মেলায়। বুঝতে না পারলে দে সরকারকে সাধে। বলা বাহুল্য দে সরকার যে ভাষ্য দেয় তা সুধীর মতো সজ্জনের শ্রবণে অভাষ্য। সুধীর মতে বৈপ্লবিক।

বই পড়তে পড়তে সে ভাবে, আহা, জ্ঞানের মতো আনন্দ আর নেই! বেহালা শুনতে শুনতে তার মনে হয়, মরি মরি! কী মুক্তি! সাঁতার কাটতে কাটতে তার বলতে সাধ যায়, দেহ আমার এমনি লঘুভার এমনি নিরাবরণ যদি সব সময় হত! হাঁটতে হাঁটতে তার এই চিন্তা আসে, হাঁটা নয় তো উড়ে চলা, মাটির উপর পা ছুঁইয়ে হাওয়ার উপর গা ভাসানো।

এমনি কত রকম আবিষ্কার তাকে মাতিয়ে রেখেছিল। মানুষের প্রতি নজর দেবার সময় পায় কখন! কারা তার ওখানে কী মতলবে হাজিরা দেয়, কার কেমন চরিত্র, কেউ তার প্রেমে পড়েছে কিনা, এ সব তার মনে উদয় হয় না। সবাইকে সে বিশ্বাস করে, আপ্যায়ন করে, কিন্তু ফরমাস খাটে কেবল প্রিয়জনের। সুধী তাদের পয়লা নম্বর, বাদলকে বাদ দিলে।

"নাও, কোথায় তুমি, সুধীদা ? ওঠ। বুলুদা, তুমিও। মিস্টার দে সরকার, আপনিও তো দিশীর পক্ষপাতী।" উজ্জয়িনী অতিথিদের ডাকতে এল। "ইলাদি, গা তোল।"

"দিশী রান্নার পক্ষপাতী, তা ঠিক।" দে সরকার মন্তব্য করল। "কিন্তু দিশী ফোস্কার নয়।"

ইলা মুখুজ্যে তখন সুধীর সঙ্গে আলাপ করছেন। তাঁর আলাপের রীতি হচ্ছে পরিচয় নেওয়া ও দেওয়া। "আপনারা তো মেহেরপুরের মেজ তরফ। না ?"

"আজ্ঞে না। তেমন কিছু নই।"

"আশ্চয্যি। আমার ধারণা ছিল আমি আপনার মামীশাশুড়ীর কাছে মেহেরপুরের গল্প শুনেছি।"

"আমার বিয়েই হয়নি।"

"ওমা। তবে তো আমি মস্ত ভুল করেছি। আচ্ছা, চামেলী পালিতকে নিশ্চয় চেনেন। সেই যে মণ্টু পালিতের বোন।" সুধী চেনে না শুনে তিনি বিশ্বাস করলেন না। "চেনেন, তবে তার আরেক নাম আছে, পামেলা, সেই নামে চেনেন।" সুধীর সাহস হল না অস্বীকার করতে।

"যাক, আপনার মামীশাশুড়ী অর্থাৎ মিসেস চ্যাটার্জি—না, আপনি যখন বিয়েই করেননি, তখন তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক ? তবে সার সত্যেন মুখার্জির নাম শুনেছেন নিশ্চয়। সার সত্যেন মুখার্জির মেয়ে হলেন আপনার মিসেস চ্যাটার্জি, আর সার সত্যেনের ভায়রা ভাইয়ের মেয়ে হলুম আমি।" তাঁর মনের ভাবটা এই—কেমন, এখন চিনলেন ?

উজ্জয়িনী কোনোটা পুড়িয়েছে, কোনোটাতে নুন বেশী দিয়েছে, কোনোটাতে নুনের বালাই নেই। দে সরকার দিশী মুখে দিয়ে বিলিতীর দ্বারা মুখ শুদ্ধি করল। বুলু দিশীর দিকে ঘেঁষল না। ইলা মুখুজ্যে এক চামচ মুখে ছুঁইয়ে তারিফ করলেন, "বেশ হয়েছে।" কিন্তু অলক্ষে চামচটি নামিয়ে উপুড় করলেন।

"কী ভাই সুধীদা, কেমন লাগল ?"

"হুঁ।" সুধী এমন একটা শব্দ করল যার দুরকম অর্থ হয়। অথবা কোনো রকম অর্থ হয় না।

উজ্জয়িনী অবশ্য রেঁধেই খালাস। নিজের রান্নায় তার নিজের অরুচি, ময়রার যেমন মিষ্টান্নে। মিসেস মেলিন নামে তার এক আইরিশ পাচিকা ছিল, সকলের জন্যে সেই রেঁধেছে, শুধু সুধীর জন্যে উজ্জয়িনী। ফোস্কার জ্বালায় বেচারি তখনো যন্ত্রণা পাচ্ছে, তবু তার স্ফূর্তি কম নয়। সে আজ নিজে রেঁধেছে, আর তা খেয়ে সুধীর মতো গুণীজন মুগ্ধ হয়ে বলেছে, "হুঁ।"

"চামেলী পালিতের কথা বলছিলুম না আপনাকে ?" ইলাদি সুধীকে পাকড়ালেন।

"চামেলী আপনার ধ্রুপদের যা সুখ্যাতি করছিল তা ধ্রুপদের চাইতেও মধুর। শুনব একদিন আপনার ধ্রুপদ।"

"ধ্রুপদ!" সুধী বিস্ময়ে বিমূঢ়।

"ধ্রুপদ কি খেয়াল যেটা আপনার ভালো আসে।"

"আপনি কার নাম শুনেছেন? আমি তো গান জানিনে।"

বুলু কণ্ঠক্ষেপ করল। "ইলাদি, ওঁকে ছেড়ে দাও। যারা গান ভালোবাসে না তারা খুন করতেও পারে।" এমন চিবিয়ে চিবিয়ে চাল দিতে বুলুর জুড়ি নেই।

কথাটা উজ্জয়িনীর কানে গেল। "আমার সুধীদা খুন করতে যাবে কোন দুঃখে? তোমরা কেউ শুনেছ তার বাঁশি?"

"বাঁশি!" ইলাদি যেন কূল পেলেন। "তবে বাঁশিই হবে। চামেলী বোধ হয় বাঁশির কথাই বলছিল। বাঁশি কিন্তু আজকেই শোনাতে হবে। বাঁশি কি সঙ্গে আছে, মিস্টার চক্রবর্তী?"

"সর্বনাশ!" বুলু টিপ্পনী কাটল। "বাঁশি শুনলে গোপিনীরা কেউ ঘরে টিকবে না। লজ্জাসরম ভুলে পথে বেরিয়ে পড়বে, কূলে কালি দিয়ে পুলিশ ডেকে আনবে।"

ইলা মুখুজ্যে সুধীর বাঁশি শুনতে ব্যাকুল হননি, যে জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন তা একজন অবিবাহিত যুবকের মনোযোগ। দে সরকার সে ভার নিল।

"মিস মুখার্জির, শুনেছি, গানের সুনাম আছে। কই, তার প্রমাণ পাওয়া গেল না।"

"যান। কে বলেছে, আমার গানের সুনাম আছে? রিনা বোস? ও মা! কেন যে ওরা এত রটায়। গানটান আমি ভুলে গেছি।"

"আপনি ভুললে কী হবে, মিস্ মুখার্জি। দেশের লোক তা ভোলোন। সকলে শুনল, শুধু আমরাই বঞ্চিত হব!"

ফল ফলতে সময় লাগল না। ইলাদি গান শোনালেন। অবশ্য প্রতিবেশীর ভয়ে চাপা গলায় ও বন্ধ ঘরে। তা শুনে উজ্জয়িনী সুধাল, "আমার গান শেখার কী হলো, বুলুদা?"

বুলু নিজেও একজন গাইয়ে। তবে শেখায় কখন! আর উজ্জয়িনীরও একো দিন একো রকম শখ। যে যা করে উজ্জয়িনী বলে সেও তাই করবে। বেহালা বাজাবে, পিআনো বাজাবে, ঘোড়ায় চড়বে, বাচ খেলবে, তার শিক্ষাভিলাষের সীমা নেই।

"গান শিখবে! তা কি তুমি আমাকে দ্বিতীয় বার বলেছ?"

"বেশ, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হল। কিন্তু প্রথম বারই যথেষ্ট। এবার যদি তুমি ভুলে যাও তবে জানব তুমি কোনো কাজের নও।" বুলু পণ করল কাল থেকে গান শেখাবে।

এদিকে গান, ওদিকে রান্না। সুধীকে বলল উজ্জয়িনী, "কাল আসছ তো? ভুলো

না যেন। কাল তোমার জন্যে ঘি দিয়ে পাঁউরুটি ভাজব আর আতপ চালের পুডিং বানাব। বুঝলে?"

সুধী ত্রস্ত স্বরে বলল, "হুঁ"।"

দশা দেখে টিপে টিপে হাসছিল দে সরকার।

৬

রবিবারটা মার্সেলের। সুধী কখন আসবে তা সে জানে, গেটে খট করে আওয়াজ হলেই বাড়ীর দরজা খুলে যায়। প্রথমে জ্যাকি লাফ দিয়ে নামে, মার্সেল নামতে চাইলে বৃষ্টির মধ্যে নামতে দেয় না সুজেৎ। সুধীর হাতে মার্সেলের জন্যে পার্সেল, সেটা হয়তো সুজেৎই ছিনিয়ে নেয় ও খোলে। মার্সেল ঠিক করতে পারে না কাকে ছেড়ে কার দিকে ঝুঁকবে—দাদার দিকে না দিদির দিকে। পার্সেল খোলা হলে সে পুতুলটা নিয়ে দাদাকেই জড়িয়ে ধরে। সুজেতের হাতছানি গ্রাহ্য করে না।

দুজনায় অনেক কথাবার্তা হয়, অজস্র কথাবার্তা। আরো একজন শ্রোতা থাকে, সে মাঝে মাঝে গুমরে ওঠে ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। সুধী তার পায়ে ও গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, "আচ্ছা, আমি সহায়কে বলব তোকে আদর করতে।" সহায় সুধীর বিহারী বন্ধু।

"দাদা," মার্সেল বলে, "জানো? তোমাকে সেদিন টেলিফোনে কে ডাকছিল?"

"কে ডাকছিল রে?"

মার্সেল নাম করতে পারে না। সুজেৎ ওঘর থেকে বলে ওঠে, "কী, মার্সেল, তুই মিস্টার সেনকে ভুলে গেছিস?"

বাদল কবে এ বাড়ীতে ছিল, মার্সেলের অত মনে নেই। সুধী বলল, "কে? বাদল ডাকছিল?"

সুজেৎ অন্যমনস্কতার ভান করে বলে, "হুঁ"। তিনি আপনার জন্যে একটা মেসেজ দিয়েছেন, আমি লিখে রেখেছি।"

বাদল বলেছিল ও সুজেৎ লিখেছিল—

"উদ্দেশ্য মহৎ হলে কি উপায়ের সাত খুন মাফ? কেউ যদি বলে কোনো উপায়ই তো বিশুদ্ধ মহৎ নয়, তবে কি নিরুপায়ের চেয়ে মন্দ উপায় ভালো, না মন্দ উপায়ের চেয়ে নিরুপায় ভালো? আচ্ছা, উদ্দেশ্য মহৎ কিনা তারই বা প্রমাণ কী? কেউ যদি বলে মহৎ নয়, তবে মহত্বের কি এমন কোনো সংজ্ঞা আছে যা স্বতঃসিদ্ধ?"

সুজেৎ তার লিখিত বার্তার এক অক্ষর বোঝেনি। তাই ভুল করেছে কয়েক জায়গায়। তবু মোটের উপর মানে হয়। সুধী কাগজখানা পকেটে রাখল ও সুজেৎকে ধন্যবাদ দিল।

খুশি হল এই ভেবে যে বাদল এখনো ঠিক বাদল আছে, তার মনে এখনো জিজ্ঞাসা আছে। জিজ্ঞাসার মীমাংসা আশ্রমে মিলছে না, মিলেলেও মনঃপূত হচ্ছে না, এও সুলক্ষণ। আশ্রম তো জগৎ নয়। জীবনের জিজ্ঞাসা চায় জগতের পরিসর। যেখানকার সমস্যা সেইখানেই তার সমাধান। আশ্রম তো মনগড়া জগৎ, সেখানকার সমাধানও মনগড়া।

সহায়কে পেয়ে মাদাম সুধীর অভাব ভুলেছে। ছেলেটি সুবোধ। মাদামকে মায়ের মতো মানে। সকলের সঙ্গে তার খুব ভাব, কেবল জ্যাকির সঙ্গে স্বত্বের মামলা। কুকুরের মতো একটা অপরিষ্কার জানোয়ার তার ঘরে ঢুকবে, এটা তার সংস্কারবিরুদ্ধ, চক্রবর্তীজী হিন্দু হয়েও কী করে এই অনাচার প্রশ্রয় দিতেন, তা অনুধাবন করা কঠিন। অথচ জ্যাকি কী করে বুঝবে যে মালিকের বদল হলে কানুনের বদল হয়, যে ঘরে তার অবাধ প্রবেশ সেই ঘরে তার অনধিকার।

"এ কুত্তা বিলকুল বেইখতিয়ার হৈ।" সহায় নালিশ করে। তা শুনে জ্যাকি জবাব দেয়, ভেউউউ—

"ইসকো হরবখত বাঁধকে রখনা।"

জ্যাকি সুর করে জবাব দেয়,—উউউ।

তাদের আপোসের চেষ্টায় সুধীর বেলা যায়। ম'সিয়ে ও মাদাম সুধীর নতুন বাসার বিবরণ শোনে। সহায়ের সঙ্গে দেশের রাজনীতি আলোচনা হয়। লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ইংরেজের উপর সে খাপ্পা। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে তার রাগ পড়বে না, কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হলে তার মেজাজ শরীফ হবে। উপায়ের প্রশ্ন উঠলে সহায় বলে, "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র। দেশ যখন ওর জন্যে তৈরি হবে তখন বিনা অস্ত্রে স্বাধীন হবে।"

"আমি জানিনে," সুধী বলে, "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বলতে তোমরা কী বোঝ। যদি নিছক আইন অমান্য হয় তবে ওর দ্বারা কোনো দেশের গবর্নমেণ্ট অচল হতে পারে না। তবে ওর একটা নৈতিক সুফল আছে, গবর্নমেণ্টের মনে অনুতাপ জন্মাতে পারে৷ তার থেকে আসতে পারে শাসনসংস্কার। কিন্তু শাসন অচল হবে যদি আশা কর তবে সে আশা অমূলক।"

সহায় বলে, "তাও হবে, চক্রবর্তীজী। আইন অমান্যের সঙ্গে থাকবে বাণিজ্যবর্জন। বণিক জাতির পক্ষে তা বজ্রাঘাত।"

"আমাদের দেশীয় বণিকেরা কেন তা সহ্য করবে, সহায়? ওরাও কি কম লাভ করছে বিদেশী বণিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে?"

"ওরা সংস্রব ছাড়বে বিদেশী বণিকের।"

"এক নম্বর সন্দেহ।" সুধী হাসে।

"তারপর," সহায় বলে, "বিদেশীরও তো সামাজিক প্রয়োজন আছে। সামাজিক অসহযোগ চালালে তুমি আমি যেমন এ দেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হব ওরাও তেমনি আমাদের দেশ থেকে।"

"ওর পরীক্ষা এক দফা হয়েছে। ফলাফল তুমিও জানো, আমিও জানি।"

সহায় স্বীকার করে যে ফলাফল আশানুরূপ হয়নি।

"একটা কথা তোমরা ভুলে যাও," সুধী বলে, "স্বদেশী হোক বিদেশী হোক গবর্নমেণ্ট হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান, এর আয় আছে ব্যয় আছে। খাজনা থেকে, ট্যাক্স থেকে, আমদানি শুল্ক থেকে এর আয় কমলে পরে অচল হওয়ার কথা উঠত। কিন্তু সেইখানে আমার দু নম্বর সন্দেহ।"

সহায়েরও সন্দেহ ছিল। তবে সকলের মতো সেও খাজনাবন্ধের জল্পনা করে। সুধী বলে, "যারা বড় লোক তারা আয়কর দিয়ে সম্পত্তি রক্ষা করবে, সম্পত্তির গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেবে না। যারা নেহাৎ গরিব তারা খাজনা বন্ধ করতে গিয়ে ভিটেমাটি খোয়াবে।"

"খোয়াবে কেন? কেউ পত্তন নেবে না। বেদখল করবে না।"

"তা হলে ইংরাজকে তাড়াতে যে বিদ্যায় হাতে খড়ি সেই বিদ্যা জমিদারের বেলায় প্রয়োগ করবে। কেউ পত্তন নেবে না, বেদখল করবে না।"

সহায় সুধীর মতো তালুকদার শ্রেণীর লোক। তাকে বেশী বলতে হয় না, ইঙ্গিত যথেষ্ট। সে আতঙ্কের সহিত বলে, "না, না, ওটা অহিংসার অপপ্রয়োগ। অমন করলে অধর্ম হবে। আমরা হচ্ছি ওদের নৈসর্গিক ন্যাসী। আমাদের লক্ষ্য রামরাজ্য।"

"সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রামরাজ্যবাদের লঙ্কাকাণ্ড মিটলে কী ঘটবে জানো?" সুধী হাসতে হাসতে বলে, "তখন বাধবে রামরাজ্যবাদের সঙ্গে হনুমদ্‌রাজ্যবাদের উত্তরাকাণ্ড। মনে করেছ ইংরাজের সৃষ্ট জমিদার ইংরাজের পরে এক মুহূর্ত টিকবে!"

সহায়ের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তারও তলে তলে ক্ষীণ আশা ইংরাজরা আপোস করবে, খাজনাবন্ধের আন্দোলন দরকার হবে না। ইংরেজরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স উপহার দেবে। অহিংসামন্ত্র কি সোজা মন্ত্র?

সুজেৎ সুধীর জন্যে গরম গরম স্কোন আনে, তার সঙ্গে মাখন মাখানো ব্রাউন ব্রেড, মল্ট মেশানো দুধ। আর সহায়ের জন্যে সাধারণ ব্যবস্থা। সুজেতের ব্যবহার সুধীর প্রতি সহজ নয়। সুধী বোঝে, কিন্তু মানতে চায় না। ওসব কিশোর বয়সের বীরভজন। সহজ ভাবে গ্রহণ করলে বিপদ কেটে যায়। সুধীর ব্যবহার সম্পূর্ণ সহজ।

মার্সেলকে সুধী পাশে বসিয়ে খাওয়ায়, জ্যাকিকেও নিরাশ করে না। যদিও কুকুরকে সঙ্গে খাওয়ানো আপত্তিকর। সুজেৎকে বলে, "এস, সুজেৎ, তুমিও বস।"

৭

স্থির ছিল ইউরোপে দু'বছর কাটিয়ে সুধী আর কালক্ষেপ করবে না। সোজা গিয়ে গ্রামে বসবে ও বিষয়সম্পত্তি বুঝে নিয়ে সংসারপ্রবেশ করবে। প্রথম কাজ জীবনের জন্যে মনের বনিয়াদ গভীর করা, ভিতরের ভিত্তি গাঁথা। দ্বিতীয় কাজ জীবনবরণ।

কত লোক সতের আঠার বছর বয়সে জীবনক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে, তাদের শিক্ষা হাতে ক-সমে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় এবং বয়স ধ্বংস করে ফল কী, আয়ু যখন সুপরিমিত। আর বয়স কি যে সে বয়স! যৌবনের আদিপর্ব, সকলরূপে অমূল্য। সুধীরও কল্পনা ছিল না কলেজে যাবার। বাদলের বন্ধুতা তাকে সংসারপথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কলেজের রথে বসাল! পরে সুধীও ভেবে দেখেছে অপরিণত মন নিয়ে সংসারযাত্রা আর যার পক্ষে যাই হোক তার পক্ষে ঠিক হত না। আধুনিক জীবন অকল্পনীয় জটিল। জট খুলতে কলেজের চার বছর কাটল—যৌবনের চারটি যুগ। কথা ছিল বি-এ'র পরে কলেজ ছাড়বে, কাজে নামবে। তারপরে বাদলেরই আগ্রহে ইউরোপ প্রবাস নির্ধারিত হল। মেয়াদ দুবছর। পশ্চিম থেকে না দেখলে দেশকে পুরোপুরি চেনা যায় না এবং আধুনিক জীবনের গ্রন্থি যেখানে জটিলতম গ্রন্থিমোচনের গ্রন্থপঠন সেইখানেই প্রকৃষ্ট। ইউরোপে এসে সুধী বাদলেরই খাতিরে ইংলণ্ডে বাস করল, বাদলেরই টানে লণ্ডনে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত পাঠাগারে দেশবিদেশের অসংখ্য পাঠকের মধ্যে এই ভারতীয় খনিক দিনের পর দিন জ্ঞানের খনিজ আহরণ করল।

মাঝখানে কয়েক মাস দেশে ফিরে ও দেশময় ঘুরে সে উজ্জয়িনীর সন্ধান পেল। সেই ঘোরাঘুরি থেকে আর যা পেল তা দেশের মতির সন্ধান। এর মানে এমন নয় যে দেশের মতি দেশে থাকতে তার অজানা ছিল অথবা এমন নয় যে তার প্রবাসকালে দেশের মতি সহসা পরিবর্তিত হল। প্রবাসে মানুষের দেশবোধ তীব্র ও দেশদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। সুধীরও তাই হয়েছিল। দেশ তার চোখে নতুন ঠেকল, দেশের মতিও সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল। তার মনের অজ্ঞাতসারে তার নিজেরই অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল, পরিবর্তিত দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পরিবর্তনের দৃশ্য দেখা যায়। সুধীর দর্শনীয় দেশের মতি। সে দেখল দেশ যেখানে ছিল সেইখানে থাকলেও দেশের মন যেখানে ছিল সেইখানে নেই। অন্তত তার তাই মালুম হল।

সংঘর্ষের প্রসঙ্গ সকলের মুখে। আইন অমান্য ব্যতীত গতি নেই, এ যেমন বড় এক দলের কথা তেমনি ছোট্ট এক দলের বিশ্বাস, বিনা অস্ত্রে স্বরাজ নৈব নৈব চ। আরো

এক দল তৃতীয়পন্থী। তারা বলে, শ্রমিক ও কৃষক অংশ না নিলে নিরস্ত্র বা সশস্ত্র কোনো সংগ্রাম সফল হবে না। শ্রমিক করবে ধর্মঘট ও কৃষক করবে খাজনাবন্ধ। তা হলেই রাজশক্তি অচল হবে ও জনশক্তি শাসনযন্ত্র হাত করবে।

কাজেই আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খবর বেশ একটু দোলা দিয়েছে। আদার কারবার বেশী দিন চলবে কি না সন্দেহ। সুধীর খেয়াল, সে নিজের হাতে লাঙল ঠেলবে, বীজ বুনবে, আগাছা বাছবে, ফসল কাটবে। নির্ভরযোগ্য, স্নেহবশ জনকয়েক চাকর—না, চাকর নয়, সাথী—যদি মেলে তবে চাষ করেও প্রচুর অবসর থাকবে, সেই অবসরে গ্রামের কাজ হবে। গ্রাম্য সমাজের পুনর্গঠন না হলে গ্রামের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। অথচ সামাজিক পুনর্গঠন কী করে হবে যদি ভদ্র এবং ইতরের সম্পর্ক হয় শোষক এবং শোষিতের সম্পর্ক। সুধী তাই নিজের শরীর দিয়ে করতে চায় সেতুবন্ধন, ইতরভদ্রের মধ্যে কর্মের ঐক্যপ্রতিষ্ঠা।

কিন্তু মামার কাছে শুনল একালে মনের মতো চাকর মেলে না, যারা চাকরি করে তারা চাকরি ছাড়া আর কিছু করবে না, তাদের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্পর্ক। মামা বলেন, বর্গা দাও, পত্তন কর, লোকসান বাঁচবে। তাতে সুধীর অসম্মতি। এমনি যথেষ্ট রায়ত ও বর্গাদার আছে, অন্তত কিছু জমি নিজের লাঙলে চাষ করা দরকার। তা না হয় করা গেল। কিন্তু উপযুক্ত সহায়ক না পেলে একা কতটুকু করা যাবে। তাও চলবে না যদি দেশের অবস্থা অনুকূল না হয়। সাপকে মন্তর পড়ে গর্ত থেকে বার করা যত সোজা গর্তে ঢোকানো তত নয়। একবার খাজনা বন্ধের স্বাদ পেলে আবার চাইবে সেই স্বাদ। আইন দিয়ে ঠেকানো যাবে না, আইন অমান্য কাকে বলে তা সে শিখেছে। অহিংসা দিয়ে ঠকানো যাবে না, অহিংসার সঙ্গে যদি স্বার্থ মিশ্রিত থাকে। ভারতের বণিকরা কারো চেয়ে কম স্বার্থপর নয়, মহাজনরা নয় কম প্রবঞ্চক। ভারতের জমিদাররা কারো চেয়ে কম আত্মপরায়ণ নয়, গুরু পুরোহিতরা নয় কম উদরপরায়ণ। রুশবিপ্লবের সমস্ত উপাদান ভারতে রয়েছে। টলস্টয়পন্থা যাকে নিবৃত্ত করতে পারল না গান্ধীপন্থা তাকে প্রতিহত করবে ?

আর সুধীর সংকল্পিত পন্থাও কার্যকর হবে কি ? ইতরভদ্রের পার্থক্য কি ঘুচবে ? এই নিয়ে সুধীর চিন্তার অবধি ছিল না। নিজের জীবনের ধারা কেমনতর হবে, সেও প্রশ্ন। আবার এও প্রশ্ন, ভারতের শাপ মোচনের শর্ত কেমনতর হবে। প্রশ্নের উত্তর কোনো কেতাবে লেখা নেই, তবু বই পড়েই সুধীর দিন কাটত। অতীতে কত মনীষীর জীবনে সদৃশ প্রশ্ন উঠেছে। কে কী ভাবে উত্তর দিয়েছেন জানলে নিজের উত্তরদান সুসাধ্য হতে পারে। সব প্রশ্নের উপরের প্রশ্ন, কেমন ভাবে বাঁচব। জীবন নিয়ে কী করব। জীবনে কী হব। তর্কে এর মীমাংসা নেই, দৃষ্টান্তে হয়তো আছে। সুধী দৃষ্টান্ত অধ্যয়ন করে।

তার নিজের ভিতরে কোনো রকম দ্বন্দ্ব ছিল না। কিন্তু তার দেশের ভিতরে দ্বন্দ্বের উপাদান প্রচুর। ভারতের এই সব আভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ মীমাংসার মধ্যে বিরতি না পেলে বিবাদে বিসংবাদে সমস্তা খুঁজবে। কোনো একটি মন্ত্রের দ্বারা, তন্ত্রের দ্বারা মীমাংসা হতে পারে না। দৃষ্টান্তের জন্যে সুধী ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস পড়ে। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ঘাঁটে। সুযোগ পেলে ভাবুকদের সঙ্গে কথা কয়। ক্রমেই তার প্রত্যয় হচ্ছিল যে ভারতের সমস্যা সৃষ্টিছাড়া নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় ও সংশ্লিষ্ট। সুধীর পটভূমিকা যেমন ভারত, ভারতের পটভূমিকা তেমনি পৃথিবী। বৃহত্তর মীমাংসার সূত্র আয়ত্ত না হলে চরকার সূত্র দিয়ে অন্তর্বিরোধের অবসান হবে না।

আণ্ট এলেনরের নির্বন্ধে লীগ অফ নেশনস ইউনিয়ন, নো মোর ওয়ার মুভমেণ্ট ইত্যাদি মণ্ডলীর সঙ্গে ও সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ডস, য়্যানথ্রোপোসোফিস্ট ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুধীর পরিচয় ঘটেছিল। তার ইংরাজ আলাপীদেরও সেই একই জিজ্ঞাসা। ব্যক্তি কেমন ভাবে বাঁচবে, দেশ কেমন ভাবে বাঁচবে, মানব কেমন ভাবে বাঁচবে। জীবন তো কত রকমেই যাপন করা যায়, কিন্তু যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত ও সুতন্ত্র ধারা কোনটি। তার মধ্যে জীবিকার কথাও আসে, কিন্তু আরো গভীর কথা—শান্তি ও ন্যায়, প্রজ্ঞা ও সামঞ্জস্য, আত্মপ্রকাশ ও পরমাত্মসংযোগ। পৃথিবীতে অনর্থের তাণ্ডব চলেছে, ধর্মের মধ্যে ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু এই অনর্থ যে কবে ও কিসে দূর হবে তার বিশ্বাসযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী মিলছে না। দু হাজার বছর আগে খ্রীস্ট আশা দিয়েছিলেন, ভগবানের রাজ্য আসন্ন। দু হাজার বছর কেটেছে, আশার অবশিষ্ট নেই, অথচ প্রত্যহ প্রার্থনা জানাতে হয়, তোমার রাজ্য আসুক। টলস্টয়ের ভাষ্য, ভগবানের রাজ্য প্রত্যেকের অন্তরে। তাই যদি হয় তবে আসন্ন বলবার প্রয়োজন কী ছিল, আসুক বলবার আবশ্যক কী আছে?

"ভারতবর্ষ কী বলেন?" সুধীকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়।

"ভারতবর্ষের যা বলবার তা আজকের নয়, তা খ্রীস্টপূর্বের।" উত্তর দেয় সুধী। "খ্রীস্টের মুখে সেরূপ বাণী ব্যক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি ইউরোপের জিজ্ঞাসা থাকে তবে ভারতেরও জিজ্ঞাসা আছে। জিজ্ঞাসাটা দেশের নয়, যুগের। যদিও চিরন্তন তবু অধুনাতন। মীমাংসাও তেমনি চিরন্তন তথা অধুনাতন হবে।"

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রভেদ নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে সুধী তাদের দেখতে পারে না ও প্রভেদের কথা যারা তোলে সুধীর কাছে তারা প্রশ্রয় পায় না। আছে নিশ্চয় প্রভেদ, কিন্তু তার চেয়ে সত্য, আজকের দিনের অভিন্ন জিজ্ঞাসা, অভিন্ন উদ্বেগ। ইউরোপের আত্মার দীপ এখনো অম্লান, যদিও তার চারদিকে বস্তুবাহুল্যের ধূম। আর ভারত কি নাগরিকতা থেকে মুক্ত?

উজ্জয়িনীদের ওখানে কয়েকবার উপস্থিত হয়ে সুধী লক্ষ করল প্রথম প্রথম ওরা সংযত ব্যবহার করত, চক্ষুলজ্জার পরিচয় দিত। ক্রমে কিন্তু ওদের সাবেক অভ্যাস ফিরল, ওরা কেয়ার করল না। তখন দেখা গেল কেউ তাস পিটছে, কেউ তান ধরেছে, কেউ রেডিওর তালে তালে নাচের চাল শিখছে, কেউ চুরুট ফুঁকছে, কেউ হুইস্কি টানছে, কেউ মারছে ও মার খাচ্ছে।

মোনা ঘোষকে দেখলে ভালোমানুষেরও হাত নিসপিস করে। তার মধ্যে যেন এক-প্রকার চুম্বক রয়েছে, যার কাছে যায় তার হাত থেকে চড়টা কানমলাটা গাল বাড়িয়ে কান বাড়িয়ে নেয়। মিটমিটে শয়তান, এমন এক একটা ফোড়ন কাটে যা চড়ের প্রতি গালের আমন্ত্রণ। যদি কিছু নাও বলে তবু তার চাউনির মধ্যে এমন কিছু আছে যা চাঁটির ভিখারী।

"এই মোনা, অমন করে কী ভাবছিস ? নিশ্চয় খারাপ কিছু। এদিকে আয়।"

মোনা গালে অনেক খেয়েছে, চুল এগিয়ে দেয়। ব্রজেন তার চুল ধরে করাতের মতো একবার টানে ও একবার ঠেলে। তারপরে হঠাৎ ছেড়ে দেয়। মোনা হুড়মুড় করে পড়ে ও হি হি করে হাসে। তখন তার জন্যে দরকার হয় ফার্স্ট এড। মীরা ছুটে যায় ব্র্যাণ্ডি আনতে। বেচারা মোনা।

দুনিয়ার যত রকম মার আছে মোনা সব রকম খেয়েছে। তার খাদ্যের তালিকা সুকুমার রায়ের "খাই খাই"-কেও ছাড়িয়ে যায়। সকলেই তাকে খাওয়ায়, যারা তাকে ভালো করে চেনে না তারাও। সুধীর কার্পণ্য তাকে হতাশ করেছে। তবে তার নিজের দিক থেকে ত্রুটি নেই। তার দেহের অটোগ্রাফের খাতায় সুধীর চিহ্ন থাকবে না, এ যে ঘোর অঘটন।

এক দিন সে ইচ্ছা করেই সুধীর পায়ে পা বাধিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। "আহা, মারলেন আমাকে ? তা মারুন।" মোনা কোকিয়ে উঠল।

উজ্জয়িনীর কাছে বার্তা গেল মোনা ঘোষ জখম হয়েছে, মিস্টার চক্রবর্তীর লাথি খেয়ে জখম। ফার্স্ট এড দিতে হবে।

আমার সুধীদা লাথি মারে। এ কি কখনো সম্ভব ! উজ্জয়িনী তো শুনে থ।

সুধীও অকারণে অপদস্থ হয়েছিল। প্রতিবাদ করতেও প্রবৃত্তি হয় না। একে তো ওরা সুযোগ পেলেই তামাশা করে। এটা কিন্তু নিছক তামাশা নয়, বদনামও বটে। বদনাম বাড়ে যখন ঘটক বলে, "সাবাস, মিস্টার চক্রবর্তী, অমন একখানা লাথি মারতে অনেক দিন থেকে প্রাকটিস করছি, কোনোটাই জুৎসই হয় না। আপনার পাদপদ্মে প্রণাম।"

"উঁহু। হল না, হল না।" মোনা এত ক্ষণে জমিয়ে বসেছিল। "বলতে হয়, ঠ্যাংপদ্মে দণ্ডবৎ।"

এদের কথাবার্তা সুধীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। কথায় কথায় একটা আরেকটাকে মামা বলছে। তাতেও সন্তোষ নেই, বলছে ছেলের মামা। তাও সহ্য হয়। কিন্তু থেকে থেকে একজন আরেকজনের কটি জড়িয়ে ধরে। ব্যাপার কী! কিছু নয়, নাচ। অন্যান্য ললিতকলার মতো নৃত্যকলায় সুধীর অনুরাগ ছিল, কিন্তু তার বিতৃষ্ণা ছিল সামাজিক উদ্দামতায়। অথচ তার স্নেহের পুত্তলী উজ্জয়িনীও ওতে সম্মতি দেয়, কেউ তার কটি জড়িয়ে ধরলে সে কাঁধে হাত রাখে ও হাঁসের মতো ভেসে যায়। সব চেয়ে তাকে মানায় বুলুর সঙ্গে। বুলু যেমন সুপুরুষ তেমনি সুনিপুণ নর্তক। গাইতে পারে ভালো। যেমন বাংলা তেমনি ইংরেজী। পিআনোয় সে দেশী বিলাতী দুরকম ঝঙ্কার তোলে। আর আবৃত্তি যা করে তা উত্তম অভিনেতার যোগ্য। কিন্তু এত গুণ থেকেও তার জীবনে লক্ষ্য নেই, কোনোমতে সময় কাটিয়ে পাস করে চাকরি জুটিয়ে বিয়ে করে আস্তে আস্তে নিবে যাবে।

দে সরকারও অদম্য। তারও চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে। তাসে তার জয়জয়কার। যে মেয়ে তার পার্টনার হয় সে বিনা যত্নে জয়ভাগী হয়। তাই তার পার্টনার হতে সবাই ব্যগ্র। সময় পেলেই উজ্জয়িনী এই সম্মান পায়। জয়লাভের পর ওরা নাচ দিয়ে সেলিব্রেট করে। দে সরকারের রুচি ভালো, সে ওয়াল্টস ছাড়া অন্য কোনো নাচ পছন্দ করে না, আর উজ্জয়িনীর যদিও তেমন কোনো পছন্দ নেই তবু সে যেন এই নাচটির জন্যে প্রতীক্ষা করে। দে সরকার বুলুর মতো গন্ধর্ব নয়, কিন্তু জাদুকর।

সুধী দেখল উজ্জয়িনীর ওখানে সন্ধ্যাবেলাটা মাটি করে ফল নেই। উজ্জয়িনীকে উপদেশ দিলে সে শুনবে না, রাগ করবে। উপদেশ দিতে সুধীরও ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে গায়ের জোরে সব ক'টাকে ভাগাতে। সুধীর তুল্য বলিষ্ঠ ওদের একজনও নয়। তার লাথি খেলে মোনাকে সে দিন উঠতে হত না। বুলু তো ফুলের চেয়ে হাল্কা। দে সরকার এক দিন সুধীর সঙ্গে পাঞ্জা কষে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে। কিন্তু ওদের এক এক জনকে এক একটি ধনঞ্জয় বানালেও উজ্জয়িনীর মন থেকে ওরা মুছবে না। মাঝখান থেকে সুধীর প্রতি উজ্জয়িনী বিরূপ হবে।

সন্ধ্যাবেলা যাওয়া বন্ধ করে সুধী অন্য উপায় ধরল। এখন থেকে তার প্রণালী হল উজ্জয়িনীকে আকর্ষণ করা। "উজ্জয়িনী," সে চিঠি লিখল, "সামনের বুধবার আমি রিজার্ড দম্পতীর সঙ্গে চা খাচ্ছি। তুমি আসবে? চেয়ারিং ক্রসে পৌনে পাঁচটায় প্রত্যাশা করব।"

কেউ নিমন্ত্রণ করলে উজ্জয়িনী 'না' বলে না। সে এত জিনিস দেখতে ও শিখতে

চায় যে কে জানে কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করবে। ব্লিজার্ড দম্পতী হয়তো গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্তি দেখেছেন কিংবা তাঁদের বাড়ীতে রকমারি পাখী আছে কিংবা তাঁদের আছে কাঁচের কারখানা, কী করে কাঁচ তৈরি হয় খবর নিতে হবে। সাড়ে চারটের সময় চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে উজ্জয়িনী সুধীর জন্যে ছটফট করে।

ব্লিজার্ডরা তাকে গ্রীসের কীর্তির নিশানা কিংবা কাঁচের কারখানার হদিস দিতে পারলেন না। আর পাখীও তাঁদের সবে ধন নীলমণি একটি কেনারী। উজ্জয়িনী তৎক্ষণাৎ সংকল্প করল সেও কেনারী পুষবে। কেনারী কী খায় ও খায় না তার খাদ্যাখাদ্যঘটিত সঠীক বৃত্তান্ত উজ্জয়িনীর নোটখাতায় টোকা হল।

"তখন তোমরা শিশু বললেও চলে," মিস্টার ব্লিজার্ড বললেন সুধীকে, "বছর দুই তোমাদের দেশে ছিলুম, পশ্চিম ভারতে। ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আশা করি।"

মিসেস ব্লিজার্ড জানালেন ভারতবর্ষে যেতে তাঁরও বাসনা, কিন্তু কবে পূর্ণ হবে কে জানে।

"আমরা আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি," উজ্জয়িনী বলল, "আসছে বছর আসবেন আমাদের দেশে। না এলে কিন্তু ভারী হতাশ হব, মিসেস ব্লিজার্ড।"

ব্লিজার্ডদের পুত্রবধূ ফরাসী মেয়ে, মুখশ্রীতে অনির্দ্দেশ্য ফরাসীয়ানা। কিন্তু ইংলণ্ডেই লালিত, তাই ভাষায় টান নেই। উজ্জয়িনী ঠিক ধরল। বলল, "আপনি তো ফরাসী।"

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, "কেউ তো কখনো টের পায় না, আপনি কী করে বুঝলেন।"

"হ্যাঁ, চক্রবর্তী।" বলছিলেন মিস্টার ব্লিজার্ড। "সেদিন তোমার সঙ্গে যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দেখ, ইউরোপেও একদা ধর্মে ও পলিটিক্সে এ হেন দুস্তর ব্যবধান ছিল না, যিনি ছিলেন সেণ্ট তিনিই ছিলেন নেতা। কিন্তু এত কালের অভিজ্ঞতায় আমরা এই শিখেছি যে সেণ্ট যদি পলিটিক্সে হাত দেন তবে পলিটিক্সের যাই হোক সেণ্টলিনেসের উপর থেকে শ্রদ্ধা চলে যায়, পলিটিক্স জিনিসটা এমন নোংরা। গান্ধীর বেলায়, ভারতের বেলায় কি এর ব্যতিক্রম হতে পারে? হলে অবশ্য আমার মন থেকে একটা বোঝা নেমে যায়, কিন্তু ভরসা হয় না, চক্রবর্তী। যেশুইটদের মতো ত্যাগী কে? তবু—"

তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থানকালের ফোটো হাজির হল। ওদিকে উজ্জয়িনী চেষ্টা করছিল ফরাসী উচ্চারণ করতে।

৯

গত মহাযুদ্ধের সময় বিবেকের অনুশাসনে যাঁরা যুদ্ধ করতে ও যুদ্ধে সাহায্য করতে অস্বীকার করে সামাজিক নির্যাতন ও কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন মিস্টার ব্লিজার্ড তাঁদের অন্যতম। ঠিক সেই সময় কিনা যুদ্ধের জন্যে সিপাহী সংগ্রহ করতে যাচ্ছিলেন গান্ধী। সেই সূত্রে গান্ধীর প্রতি মিস্টার ব্লিজার্ডের একটা সংশয়ের ভাব ছিল। একজন খাঁটি অহিংসাবাদী যদি বিশ্বব্যাপী হত্যাকাণ্ডের জন্য হত্যাকারী সংগ্রহ করতে পারেন তবে তাঁর অহিংসাবাদ সেণ্টলিনেসের পরিচায়ক নয়। সেণ্ট যদি সুযোগ বুঝে পলিটিসিয়ানের মতো চাল চালেন তবে তাঁর সেণ্টলিনেসও তো একটা চাল হতে পারে।

"ভারতের জন্যে তিনি যা উচিত মনে করেন তা করুন, আমার পক্ষে তাঁকে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা," বললেন মিস্টার ব্লিজার্ড। "পলিটিসিয়ানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেণ্ট তো কেবল এক দেশের নন, সব দেশ তাঁর দেশ। কেন তবে তিনি জার্মানকে মারতে ভারতীয় পাঠাতেন? জার্মান দোষী বলে? এমন তো হতে পারে যে জার্মানের চেয়ে ইংরেজের দোষ কম নয়, এক হাতে তালি বাজে না। আধুনিক যুদ্ধ অতি কুটিল ব্যাপার। যারা ওতে যোগ দেয় তারা না বুঝে যোগ দেয়, ভোগে ও ভোগায়। যে বোঝে তার কর্তব্য যোগ না দেওয়া।"

"আমি যত দূর জানি," সুধী বলল, "তাঁর ধারণা ছিল ইংরেজের বিপদে ইংরেজকে সাহায্য করা ভারতের দিক থেকে বন্ধুকৃত্য। ইংরেজের হৃদয় সাড়া দেবে, এই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস।"

"যারা চাল চালে তারাও তো সাড়ার আশায় চালে। তাদের মতো আমরাও কেন সাড়ার কথা ভাবব? যা ন্যায় তাই করে কেন ক্ষান্ত হব না? তাই করে যে মঙ্গল সেই তো সর্বজনীন মঙ্গল। আমরা যখন যুদ্ধে অসহযোগ করেছিলুম আমরা তো এক মুহূর্তের জন্যে ভাবিনি যে দেশের হৃদয় গলবে, শত্রুর হৃদয় টলবে, হত্যার তাণ্ডব থামবে। এমনও হতে পারত যে ইংলণ্ড হেরে যেত, যত নষ্টের গোড়া বলে লোকে আমাদের লিঞ্চ করত। ফল কী হবে তা আমরা হিসাব কিংবা আন্দাজ করিনি, কাজটা করতেই হবে তাই আমরা করেছি।"

সুধী বলল, "ফলাফলের জন্যে গান্ধীজীর উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তিনি পলিটিসিয়ান নন, তিনি সেণ্ট। তাঁর চাল অন্যশ্রেণীর চাল। তাঁর অহিংসাও বিশুদ্ধ অহিংসা। কিন্তু অহিংসার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে এই যে ন্যায়ের উপর তেমন জোর পড়ছে না। আচারটা মুখ্য হয়ে বিচারকে আড়াল করছে।"

শাশুড়ী ও বৌমা—দুই মিসেস ব্লিজার্ড— উজ্জয়িনীকে নিয়ে ব্যাপৃত। এর মধ্যে পর্দা ও সতীদাহ হয়ে গেছে, বাল্যবিবাহ চলছে। এর পরে আসবে সাপ। উজ্জয়িনী বার বার

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মুখস্থ করে রেখেছে। তার চটপটে জবাব শুনে তাঁরা বোধ হয় ভাবছেন মেয়েটি খুব সপ্রতিভ। আধুনিক ভারতীয় মেয়েরা বোধ হয় এমনি সজীব।

"এটি বুঝি আপনার খুকু। কী নাম এর? সোনিয়া। বা বেশ নাম তো! রাশিয়ান নাম বলে মনে হয়।"

"ঠিক ধরেছেন। রাশিয়ান নামই বটে। কয়েক বছর আগে ঐ নামের একখানা বই খুব চলতি হয়।"

"শুনেছি, কিন্তু পড়িনি। আপনার কাছে থাকলে অবিশ্যি লুট করব। সোনিয়া, সোনা, আয়। আমার কাছে আয়। আমি এর নাম রাখলুম সোনা, কেমন লাগে শুনতে? সোনা, আমার সঙ্গে যাবি?"

সোনিয়াকে টেপাটিপি করে অস্থির করে তুলল উজ্জয়িনী। তার মাকে বলল, "দেখুন, আপনার রাশিয়ান বই লুট করে কী হবে, আপনার এই রাশিয়ান ডলটিকে লুট করি।"

মিস্টার ব্রিজার্ডের ছেলে জন আপিস থেকে দেরিতে ফিরে নিজের বাড়ীতে স্ত্রীকে ও মেয়েকে না পেয়ে এ বাড়ীতে এলেন। সুধীদের সঙ্গে পরিচয়াদি হলে জন বললেন, "আশা করি ইংলণ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ হননি। কিন্তু সাধারণ ইংরাজের অসহায়তা আপনাদের চেয়ে কম নয়, এদেশের শাসক শ্রেণী আপনাদেরও শাসক আমাদেরও শাসক। আপনারা ভাগ্যবান, আপনারা বিদ্রোহ করতে পারেন, আমাদের সে স্বাধীনতাও নেই। আজ রাশিয়ার জুজু, কাল জার্মানীর জুজু এই রকম জুজুর পর জুজু আমাদের ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির ইচ্ছামতো আমাদের ঘুম পাড়ায়।"

ব্রিজার্ড পলিটিক্সে আস্থাহীন, কোনো পার্টিকে ভোট দেন না। জন কিন্তু লেবার পার্টির সদস্য। তবে তাঁরও ভরসা হয় না যে লেবার ক্ষমতা হাতে পেলে নির্ভয়ে প্রয়োগ করবে। শাসক শ্রেণীকে শাসন করার মতো সাহসের অভাব।

"তা হলে," মিস্টার ব্রিজার্ড বললেন, "গান্ধী সম্বন্ধে আপনার নিজেরই সংশয় আছে?"

"গান্ধীজী সম্বন্ধে নয়," সুধী সংশোধন করল, "গান্ধীজীর অহিংসাবাদ সম্বন্ধে। ওর মূল্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু ও জিনিস স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ওর সম্পূর্ণতা ন্যায়সাপেক্ষ।"

জন কণ্ঠক্ষেপ করলেন, "কখনো কখনো আমার এই সন্দেহ হয় যে ভারতবর্ষও ইটালীর মতো প্রথমে আদর্শবাদের সাহায্যে স্বাধীন হয়ে পরে স্বার্থবাদের ঠেলায় ফ্যাসিস্ট হবে। তাই যদি হয় তবে সাধারণ লোকের অসহায়তায় কী প্রতিকার? বিদ্রোহ করলে তো সেটা হবে দেশদ্রোহ।"

"অহিংস বিদ্রোহ !" সংশোধন করলেন বুড়ো ব্লিজার্ড ।

"সেই তো আমার শঙ্কা । অহিংসা যদি একটা আচারে পরিণত হয় তবে নির্বিচারে প্রযুক্ত হবে, যত্র তত্র, যার তার দ্বারা । ন্যায়-বুদ্ধির বিকল্প নয়, বাহন ওটা । কিন্তু হয়তো এক দিন বিকল্পে দাঁড়াবে । এবং এক অন্যায়ের স্থলে অপর অন্যায়কে স্থাপন করবে ।" এই বলে সুধী উজ্জয়িনীকে নয়নসঙ্কেত করল । এবার উঠতে হবে, দূর তো কম নয় । স্টৈথাম থেকে হলাণ্ড পার্ক ।

উজ্জয়িনী ততক্ষণে পশুক্লেশ নিবারণ করছে । সোনিয়াকে ছাড়তে ইচ্ছা নেই, এমন মিষ্টি মেয়ে, যেমন মোটাসোটা তেমনি ধবধবে । তা ছাড়া যতই ফারকোট চাপাও বাইরে বেরোলে গা হিম হয়ে যায়, হাত জালা করে । হাতের তবু দস্তানা আছে, নাকের তাও নেই । আহা বেচারা নাক ।

"চললুম, মিসেস ব্লিজার্ড," নাকের মায়া পরিত্যাগ করল উজ্জয়িনী । "চললুম, ভাই ক্রিষ্টিন ।" ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে সবাইকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে বলল, "ভুজ এৎ শারমাঁৎ ।" আপনি হচ্ছেন মোহিনী ।

"সোনিয়াও চলল আমার সঙ্গে । কী বলিস, সোনিয়া ? না ? আমাকে ভালোবাসিস না ?"

সোনিয়া তার মায়ের কাপড়ে মুখ লুকিয়ে আড় চোখে তাকিয়ে দুষ্টু দুষ্টু মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল । উজ্জয়িনী তাকে কেড়ে নিয়ে তার গালে ও কপালে কয়েকবার চুমু খেল । তারপরে তাকে একবার বুকে রেখে এমন চাপ দিল যে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল । তারপরে তাকে তার মার কাছে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, আরেক দিন । আপনারা আসছেন তো আমার ওখানে ? আপনি, মিস্টার ব্লিজার্ড ?"

বুড়ো বললেন, "তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না । তোমরা মেয়েরা দেশে ফিরে শুধু কি ঘরের কাজ করবে, সামাজিকতায় তলিয়ে যাবে, না দেশকে উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে, পলিটিক্সের ঘূর্ণি থেকে বাঁচাবে ?"

"দেখবেন," উজ্জয়িনী তাঁর হাত নাড়তে নাড়তে বলল, "দেখবেন, মিস্টার ব্লিজার্ড । ভারতের মেয়েরা কারো তোয়াক্কা রাখে না । না ইংরেজের, না গান্ধীর, না যীশুর, না মনুর । সব আদর্শই পুরুষের পোশাক, পুরুষের মাপে তৈরি । ওর উপর আমাদের লোভ নেই, বরং লোভ আছে ওকে কাঁচি দিয়ে কেটে কুটি কুটি করে দেশলাই দিয়ে জালাতে ।"

শত্রুতা

১

ডলির ফেয়ারওয়েল লাঞ্চনে বাদল বলেছিল উজ্জয়িনীকে, "আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।" বলেছিল, "এখন তো আছেন এদেশে কিছুকাল। একদিন মোকাবিলা হবে।"

তখন থেকে উজ্জয়িনীর চিত্তে রয়েছে কৌতূহল, কখনো স্মরণে কখনো বিস্মরণে। শুনতে সাধ যায়, কী কথা? ভাবতে সাধ যায়, কী কথা থাকতে পারে? আশা করতে লজ্জা লাগে, সেই কথা নয় তো?

দেখা আর হয় না, শোনাও তাই হয় না। বাদল না আসায় উজ্জয়িনী গেল তার আশ্রমে। সেখানে দেখা যদি বা হল, শোনা হয়ে উঠল না। এত লোকের ভিড়ে বাদলই বা বলে কী করে, উজ্জয়িনীই বা বলায় কী করে। আশ্রম যে নিভৃত নয়, লোকালয়ের চেয়ে জনাকীর্ণ, তা কি উজ্জয়িনী জানত!

বাদলের কথাটা এই ভাবে দিগ্বলয়ের মতো দূরত্ব রক্ষা করল, নিকটে গেলেও নিকট হল না। এদিকে উজ্জয়িনীরও একটু কথা ছিল, এত গোপন যে বাদলই একমাত্র শ্রোতা, বাদলও নয় যদি ইচ্ছুক না হয়। প্রত্যাশা ছিল মোকাবিলাটা একতরফা হবে না, বাদল তার কথা বললে উজ্জয়িনী বলবে তার কথা। বাদলের কাছে যা শুনবে ও বাদলকে যা শোনাবে মনে মনে তার মহড়া দিতে দিতে উজ্জয়িনীর মনে ক্লান্তি এল। যতই দিন যেতে লাগল ততই তার ধারণা হতে লাগল বাদল যা বলবে তা এমন কিছু নয়, তা সে এতদিনে বুঝতে পেরেছে। বাদল বলবে, তাদের সম্পর্ক স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক নয়, তারা বন্ধু। তারা পরস্পরের কাছে বদ্ধ নয়, তারা মুক্ত। তারা অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে পারে, তারা অবাধ। তাই যদি বাদল বলে তবে উজ্জয়িনী তার গোপন কথা কেন প্রকাশ করবে? শুধু বললে চলবে, আমারও একটা কথা ছিল। এমন কিছু নয়। চিঠির জন্য বহু যুগ অপেক্ষা করে অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়েছিলুম, সে অভিমান আজ নেই, এখন আমি প্রার্থনা করি আপনি সিদ্ধার্থ হোন।

কথাটা কিন্তু বাইরে আসার রাস্তা না পেয়ে ভিতরের দিকে সিঁধ কাটল। একবার যদি সে বাদলের কাছে—যে কোনো মানুষের কাছে—মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারত, আমি কেবল বাড়িই ছাড়িনি, স্বামীকেও ছেড়েছিলুম, তা হলে তার পাপবোধ সেই মুহূর্তেই শব্দের সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে যেত। তারপর যার যেমন মন সে তেমন মনে নিত। বাদল হলে হেসে উড়িয়ে দিত, সুধী হলে মৌন থেকে শুভানুধ্যায়ী হত, সুজাতা দেবী হলে নিজে কী ভাবতেন তা বাদ দিয়ে লোকে কী ভাববে তাই বিবেচনা করে বিষম শক পেতেন।

কিন্তু একবারও উচ্চারিত না হয়ে কথাটা ক্রমে চেতনা থেকে অবচেতনায় নামল। পাপবোধের ক্রিয়া চলল মনের অগোচরে। উজ্জয়িনী বেশ থাকে, হঠাৎ পাগলামি আরম্ভ করে, তার সেই পাগলামির দৃশ্যমান হেতু পাওয়া যায় না। তার সেই পাগলামির কখন কিংবা কেন নেই, কোথায় কিংবা কিসে নেই। কিন্তু এও ঠিক যে হঠাৎ হলেও ঘন ঘন নয়। বেশীর ভাগ সময় সে নানা ব্যাপারে ব্যস্ত ও নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত। সামাজিক উন্মাদনায় ও আবিষ্কারের উত্তেজনায় সে রাত্রিদিন ধাবমান। পাগলামিরও ফুরসৎ দরকার, তাও তার নেই।

বিলেতের আবহাওয়ায় সে খুব হাল্কা বোধ করছে, একটু রোগা হয়েছে। তার জীবনে একটা মস্ত আফসোস, সে ক্ষীণ নয়। এত দিনে বোধ হয় আফশোষ ঘুচল। এখন যদি তাকে কেউ স্লিম না বলে তবে সে দস্তুরমতো ডুয়েল লড়বে। কালো বলে বলুক, আপত্তি নেই। কিন্তু মোটা বললে শুধু আপত্তি নয়, বিপত্তি। উজ্জয়িনী ইংরেজ মেয়েদের মতো ব্যাগে আয়না নিয়ে বেরোয়, পথেঘাটে তাদেরই মতো চুরি করে মুখ দেখে। স্টেশনে কি দোকানে কোথাও একখানা বড় মাপের আয়না দেখলে এক সেকেণ্ড দাঁড়ায়। না, গড়ন ঠিকই আছে, বাড়তির দিকে নয়, কমতির দিকে। গড়নের জন্যে তার যত ভাবনা বর্ণের জন্য তত নয়। হাজার পাউডার মাখলেও তাকে মেম বলে কেউ ভুল করবে না, অথচ তন্বী যদি সে হয় তবে তার চিরকালের ক্ষোভ দূর হবে।

কেশ তার হ্রস্ব ছিল গৃহত্যাগের সময় থেকেই, বিলেতে এসে শাড়ীও সংক্ষেপ হয়েছে। নইলে লাফ দিয়ে বাসে ওঠা সম্ভব নয়, দুরন্তপনার অন্ত থাকে। শাড়ী জিনিসটাই তার পক্ষে এক অসহনীয় সীমা। ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে সে শাড়ীর মায়া কাটিয়েছে। সামনে যখন বরফের মরসুম পড়বে তখন সে স্কেট করতে চলবে, তখনো শাড়ী বাতিল। নাচের জন্যে সে ফ্রক পরবে কি না এও তার এক অমীমাংসিত সমস্যা।

এমন যে উজ্জয়িনী এর কাছে হৃদয়বৃত্তির ঠাঁই নেই। অতীতে সে হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত করেছে, তারই প্রতিক্রিয়াবশত হোক, অথবা বৈদেশিক জীবনধারার ফেনিল উচ্ছলতা-বশত হোক, সে হৃদয়চালনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। গভীরভাবে গভীর কথা ভাবতে পারে না, কেউ ভাবছে দেখলে রঙ্গ করে। সুধী যে অশোকার প্রতি আকৃষ্ট এর দরুন সে উজ্জয়িনীর পরিহাসের পাত্র। কেউ কদাচ প্রেম শব্দ উল্লেখ করলে সে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। বাস্তবিক সে বুঝতে পারে না দুনিয়ায় করবার মতো এত কাজ থাকতে কেন কেউ মন দেওয়া নেওয়া করে। নিজের কীর্তিকলাপ স্মরণ হলে তার যেমন লজ্জা লাগে তেমনি রাগ ধরে। ছেলেমানুষীর চরম করেছে, আর ওসব নয়। এখন তো সে কল্পনা করতে পারে না যে তার হৃদয়ে প্রকৃত একটা ক্ষুধা ছিল, দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন ক্ষুধা; যা তার কাছে অল্প আগেও সত্য ছিল তাই আজ মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। অকালে

বিয়ে হওয়ায় ঐ উপসর্গ জুটেছিল, ওটা মিথ্যা ক্ষুধা।

বাদলের প্রতি উজ্জয়িনীর মনোভাব ক্রমে সহজ হয়ে এল। বাদল তার স্বামী, তা তো নিশ্চয়। বাদলের প্রতি তার কর্তব্য অশেষ, তাও স্বতঃসিদ্ধ। ঠিক যেন তার বাবার প্রতি তার মায়ের কর্তব্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যা কর্তব্য অবশ্য সে তা করবে। তার দিক থেকে অস্বীকৃতি নেই, অনিচ্ছা নেই, নেই আগ্রহের অভাব। কিন্তু প্রেম? কই, প্রেম তো সে আর অনুভব করছে না, যা অনুভব করত তাও প্রেম কি না সন্দেহ। এখন তার হাসি পায় তার ইতিহাস মনে পড়লে। এমন হাসি পায় যে নিজের কাছে নিজের মুখ দেখাতে লজ্জা করে। রাগ হয় নিজের উপর, কেন সে তার বয়সের ইংরেজ মেয়েদের মতো খেলায় ধুলায় মাতামাতি না করে পড়ায় শুনায় মনোযোগ না দিয়ে দশ জনের সঙ্গে না মিশে দশ রকম জিনিস না দেখে হৃদয়ের আবেগে অন্ধ হয়ে বয়সের প্রতি অন্যায় করেছিল।

তার ইংরেজ বান্ধবীদের দিকে চাইলে তার নিজের উপর অবজ্ঞা জন্মায়। কেমন স্বাস্থ্যবান, সতেজ তারা। কেমন আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী। তুচ্ছ মান অভিমানে তাদের জীবন বিরস নয়। পুরুষের খুশির উপর তাদের সুখদুঃখ নির্ভর করে না। পুরুষ তাদের জীবনে থাকলেও পারে, না থাকলেও পারে, থাকা না থাকা পুরুষের ইচ্ছাসাপেক্ষ, তাই নিয়ে তারা সাধেও না, কাঁদেও না। একাকী পুরুষের মতো একাকিনী নারীও তার আপন জীবনের কর্ণধার, তার কান ধরবার জন্যে স্বামীর দরকার হয় না। ধন্য মেয়ে। পুরুষের মতো একটা অত্যাচারী উদ্ধত জাতিকে তারা সার্কাসের সিংহের মতো হাস্যাস্পদ করেছে। বাছাধনদের তর্জন নেই, গর্জন নেই, আছে বড় জোর একটু খিটখিটেমি। আহা, ইংলণ্ডে স্বামীদের দেখলে দয়া হয়, গোপালের চেয়ে সুবোধ, যা পায় তাই খায় ও তার জন্যে ধন্যবাদ দেয়। বেণীকে গোপাল বানানো কি সামান্য শক্তির পরিচায়ক! আজকাল জন্তুকে জব্দ করার জন্য সরকারী চিড়িয়াখানায় নারী নিযুক্ত করা হয়। সেই তো নারীর ঈশ্বরদত্ত ব্রত। পুরুষের হাত থেকে সমাজের শাসনভার ছিনিয়ে নিতে হবে—তার পকেট থেকে সিন্দুকের চাবী চেয়ে নিয়ে তার সংসারে গিন্নীপনা করতেই জন্ম নয়। শোষণ এবং সেবা ছেড়ে শাসন এবং প্রজারঞ্জন, এই হবে নারীধর্ম।

২

কার কাছে উজ্জয়িনী এসব শিক্ষা পায়, দেবতারাও জানেন না। হয়তো তার স্বভাবের মধ্যে এর প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। হয়তো তার গোপনীয় অভিজ্ঞতার মৃদু স্বরকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে এই উচ্চ স্বর তার নিজেরও উদ্‌ভাবন। একটি আঠার উনিশ বছর বয়সের

তরুণীর মন কোন নিয়মে চলে, কে তা বলবে ? হয়তো কোনো নিয়মে চলে না, চলে বেনিয়মে।

সুধী দোষ দেয় দে সরকারকে, কিন্তু সে বেচারাও উজ্জয়িনীর ঝঙ্কার শুনে রুদ্ধশ্বাস। নারী পুরুষের সমান হোক, উজ্জয়িনীর এত অল্পে সন্তোষ নেই, অধমের সমান হতে গেলে উত্তমের অপমান। সে চায় শাসন করতে, সে চায় প্রাধান্য। আদৌ স্বীকার করে না যে পুরুষজাতটা নারীজাতির সমকক্ষ। দে সরকারের মতো পুরুষকে সমকক্ষ বলে গ্রাহ্যই করে না, বুলুদার মতো পুরুষকে পুরুষ বলে গণ্যই করে না, ঘোনা ঘোষেরা তো কুকুরবেড়ালের সামিল। সুধীকে মানে বটে। বাদলকেও মানতে হয়, ও যে স্বামী।

তাব এই স্বামীবিষয়ক সংস্কার দে সরকারের দুচক্ষের বিষ। হিন্দুর মেয়ে ব্রাহ্ম সমাজে বাড়লেও, হিন্দুস্থানের মেয়ে ইউরোপ মাড়ালেও স্বামী তার কাছে মানুষ নয়, স্বামী একটি প্রতিমা। দে সরকার বাদলকে ভালোবাসে, কিন্তু যে বাদল উজ্জয়িনীর প্রতিমা সে বাদলকে দেখতে পারে না। প্রতিমাভঙ্গের জন্যে দে সরকার নিষ্ঠুররূপে প্রস্তুত হয়েছিল, তার ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে প্রতিমাভঙ্গ করবেই! প্রতিমা একবার ভাঙলে বাদলের সঙ্গে দে সরকার সমান পর্যায়ে দাঁড়ায়, দুজনেই মানুষ, দুজনেই পুরুষ, দুজনের সমান সুযোগ। হৃদয় যার দিকে যেতে চায় সেই নায়ক। বাদল নায়ক হলে দে সরকার অভিনন্দন জানাবে, কিন্তু তার আগে উজ্জয়িনী সংস্কারমুক্ত হোক।

দে সরকারের প্রতিমাবিদ্বেষ আজকের নয়। একদা একজনকে সে ভালোবাসত, ভালোবাসাও পেয়েছিল। আইনের বাধা ছিল না তিনি বিধবা। কিন্তু সংস্কারের বাধা অভ্রভেদী। যদি তিনি লোকনিন্দার দোহাই দিতেন, সমাজভয়ের উল্লেখ করতেন দে সরকার আশ্চর্য হত না, আশা রাখত। পরলোকে বসে তাঁর সনাতন স্বামী তাঁকে নজরবন্দী করেছেন, পরজন্মও স্বামীর কাছে বন্ধক। স্বর্গে মর্তে পাতালে শত শত অনাগত জন্মে সেই স্বামীটিই তাঁর একমাত্র স্বত্বাধিকারী। তাঁর দেহে মনে আত্মায় সেই আদি ও অদ্বিতীয় ভর্তার সর্বস্বত্বসংরক্ষিত। দে সরকার তপস্যা করলে দুচার জন্মে স্বয়ং ভগবানকে পেতে পারে, কিন্তু কোটি জন্মেও প্রিয়জনকে পাবে না, কেননা তিনি একটি প্রতিমার দেবোত্তর সম্পত্তি।

দে সরকার দেশান্তরী হল। ভুলল তাঁকে, ভুলল তাঁর জন্মজন্মান্তরের সধবতাকে। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র প্রেম তাকে নিবিষ্ট রাখল। আবার যে তার জীবনে সেই পুরাতন প্রেম নতুন আকারে ফিরবে ও সেই পুরাতন সংস্কার পুনরায় বাদ সাধবে তা কি সে জানত ? প্রভেদ এই যে একজনের স্বামী এপার থেকে ওপারে গিয়ে সেইখান থেকে নিত্য পূজা পাচ্ছেন, অপর জনের স্বামী এপারেই আছেন ও পূজার জন্যে একটুও উৎসুক নন। তবু পূজা পাচ্ছেন ঠিক।

দে সরকার পদ্ম'র প্রতি মমতাবশত তার প্রতিমার গায়ে হাত তোলেনি। তখন তার মন ছিল নরম, তাই প্রিয়জনের মনে আঘাত লাগবার ভয়ে নিজেই কাতর হয়েছিল। পৌরুষের অভাব ছিল তার স্বভাবে। তার প্রেম ছিল ভাববিলাসের অঙ্গ। প্রতিমার কাছে পরাস্ত হয়ে অসহায়ের মতো কেঁদেছিল, অথচ প্রতিমার মতো অসহায় কী আছে! ইচ্ছার প্রবল সংঘাতে কত প্রতিমাই ভগ্ন হয়, এই বা কিসের প্রতিমা! দে সরকার ইচ্ছা করলেই পদ্মকে পেত, কিন্তু তখনকার দিনে তার ইচ্ছার পিছনে শক্তি ছিল না, সেই থেকে তার পরাজয়। পরাজয় থেকে প্রকৃতিগত বক্রতা। বক্রতা থেকে বক্রোক্তি। সংস্কারের সম্মোহনে পদ্ম তো অসুখী হলই, সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম না করে দে সরকারেরও গ্লানি থাকল।

একই ভুল কেউ দ্বিতীয় বার করে না। দে সরকার স্থির করল এবার সে নির্মমভাবে যুঝবে। পরাস্ত যদি হয় তবে স্বেচ্ছায় হবে না। বাদল অবশ্য তার বন্ধু, কিন্তু বাদলের উপর যে প্রতিমা আরোপ করা হয়েছে সে প্রতিমা তার শত্রু। শুধু তার নয়, বাদলেরও। কেননা বাদলের বাদলত্ব তদ্দ্বারা আড়াল হয়েছে, আসল বাদলকে উজ্জয়িনী দেখতে পাচ্ছে না। বাদলের প্রতি তার বন্ধুকৃত্য হবে স্বামিত্বের আবরণ ছেদন করা। উজ্জয়িনীর প্রতিও এ তার সৌজন্য। উজ্জয়িনী সতী হবে কী করে যদি সত্যদর্শিনী না হয়? তেমন সতীত্বের মূল্য কী যা সত্যের নিকষে যাচাই হয়নি?

দে সরকারের সাধনা হল উজ্জয়িনীর স্বামীসম্পর্কীয় আইডিয়াকে আঘাত করা। প্রত্যক্ষ আঘাত হয়তো মনের বৃন্তে বাজবে। পরোক্ষ আঘাত শ্রেয়। মনের উপর চাপ দিলে হয়তো মনেও ছাপ পড়বে, মন নিষ্কণ্টক হলেও অপ্রসন্ন হবে। তার চেয়ে ভালো মনের ভিতর থেকে এক এক করে ধারণা সরানো—যেসব ধারণা নগণ্য এবং অলক্ষ্য, অথচ যাদের উপর স্বামিত্বের স্থিতি। কখনো তাস খেলার ছলে কখনো বই পড়ার ছলে সর্বদা কোনো না কোনো ছলে শিথিল করতে হবে এক একটি অসতর্ক ধারণা, এক একটি পাথর। অবশেষে এক দিন মন্দির টলবে, প্রতিমা টুটবে, আরতির বিরতি হবে।

দে সরকারের প্রতিমাভঙ্গ এমন কৌশলে চলল যে উজ্জয়িনী নিজে ঘুণাক্ষরেও জানল না কী তার মনের মধ্যে চলেছে। দে সরকারের তুচ্ছ মন্তব্যেও এমন আবেদন থাকত যা উজ্জয়িনীর হৃদয়ে হানা দিত। দে সরকার খুব বেশী আসত না, এলেও খুব বেশী মিশত না। তাকে ডাকাডাকি করত উজ্জয়িনীই, তবে ডাকাডাকি যাতে করতে হয় তার কল টিপত সে স্বয়ং। কথাবার্তায় সে বেফাঁস কিছু বলত না, ভালোবাসার কথা বলত না ভুলেও। তবে তার স্বর মাঝে মাঝে প্রগাঢ় হত ও সজল হত তার চাউনি। ফল কী হবে ভেবে কূল পেত না সে। হঠাৎ কয়েক দিন অদৃশ্য হয়ে যেত, নিরাশায় ও শোচনায়। তারপরে দ্বিগুণ চেষ্টা করত সংস্কার সাফ করতে।

দে সরকার উজ্জয়িনীকে অতীত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না, ধরে নেয় যে তার অতীত নেই। যেন সে উর্বশীর মতো যৌবনে গঠিতা। কিন্তু অতীত নেই বলতে তো অতীতের ব্যথা উবে যায় না। ব্যথাও থাকে, ব্যথার জন্যে সমব্যথারও আবশ্যক থাকে। সহানুভূতির জন্যে উজ্জয়িনীর অন্তর আকুল। সুধী প্রভৃতি কেউ তার অনুভূতির সন্ধান রাখে না, তাই কারো সহানুভূতি যথাস্থানে পৌঁছোয় না। ওরা ভাবে তার বেদনা পতিপরিত্যক্তার বেদনা। ভাবতে পারে না যে সে হয়তো অন্য কারো প্রেমে পতিপরিত্যাগিনী হয়েছিল, ফিরেছে প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতায়, কিংবা নিজেরই ভবিষ্যৎ ভয়ে। দ্বিতীয়টারই সম্ভবপরতা বেশী। যে মেয়ে প্রেমের জন্যে সব দিতে যায়, কিন্তু সংস্কারে বাধলে সব ফিরিয়ে নেয় দে সরকার তেমন মেয়েকে মর্মে মর্মে চেনে। আবার প্রথম টাইপও তার অচেনা নয়। উজ্জয়িনীর নিরুদ্দেশযাত্রার রহস্য সে জানতে চায় না, কিন্তু বুঝতে প্রয়াস পায়। দে সরকারের আধারে নিক্ষেপ করা ঢিল এক এক বার সত্যকে স্পর্শ করে। উজ্জয়িনী অসহ ব্যথায় পাণ্ডুর হয়। তার থেকে দে সরকার অনুমান করে সত্যের স্বরূপ। সহানুভূতির সঙ্গে নীরব হয়।

উজ্জয়িনীর সেই গোপন কথাটা সে দে সরকারকে বলেনি ও বলবে না। তবু কেমন করে তার মনে হয় যেন এই মানুষটি তা জানে। জানে অথচ নিন্দা করে না। এই সূত্রে তাদের দুজনের মধ্যে একরকম মিতালির মতো দাঁড়ায়। পাতানো মিতালি আরো পাকা। কোনোরূপ বোঝাপড়া নেই, তাই এ মিতালি আরো নির্ভুল। অনেক সময় ইশারায় কথা হয়, চোখে চোখে। অনেক সময় তারও দরকার হয় না।

৩

সুজাতা দেবী চেয়েছিলেন জীবনকে দর্শন করতে। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হচ্ছে। এর মধ্যে রামমোহন রায়ের সমাধি দেখেছেন, লর্ড মেয়রের শোভাযাত্রায় তিনিও ছিলেন দেখনদার, কুকুরদৌড়ে বাংলার প্রতিনিধি থাকেন তিনি ও বিভূতি, ছাগপ্রদর্শনী হোক মেষপ্রদর্শনী হোক যেখানে যত রকম প্রদর্শনী লর্ড ও লেডীদের দ্বারা উদ্বোধন করা হয় সর্বত্র উপস্থিত হন তিনি ও তাঁর আপনার জন, চ্যারিটি বাজারে ও চ্যারিটি শো'তে তাঁর পদার্পণ অবধারিত। বেস্ট পিপল যেখানে যাবেন তিনিও যাবেন সেইখানে, বেস্ট পিপল যা করবেন তিনিও করবেন সেই কাজ, বেস্ট পিপল যদি হাঁচে তাঁরও হাঁচি পাবে, যদি হাঁচি চাপে তিনিও হাঁচি চাপবেন।

কোথাও গেলে তিনি কন্যাকে সঙ্গে নেন না। বরং সযত্নে পরিহার করেন। ও যদি দেখতে তাঁর মতো ফরসা হত তবে হয়তো নিতেন, কিন্তু ও যখন তা নয় তখন ওকে নেবার প্রশ্ন ওঠে না। ময়লা কাপড় পরে সভায় যাওয়া যেমন লজ্জার কথা ময়লা রঙের

মেয়েকে নিয়ে বিলেতের মাটিতে চলা তেমনি লজ্জাকর। ওরা ভাববে এটি বুঝি তাঁরই মেয়ে! ছি ছি! অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করে কার কী লাভ। তার চেয়ে ও মেয়ে ওরই মতো কালো মানুষের সঙ্গে বেড়াক।

সুরূপা বলে সুজাতা দেবীর প্রসিদ্ধি চিরকাল। কিন্তু সুরূপা হলে কী হয়, বয়স হয়েছে। দেশে যখন ছিলেন তখন বয়সের ভারে তাঁকে ভারিক্কি বোধ হত। লোকেও পছন্দ করত বয়সোচিত ভারিত্ব। কিন্তু বিলেতের লোক অমন বেরসিক নয়। ত্রিশ বছরের যুবতীদেরও বলা হয় গার্ল। তাই যদি চলে তবে মিসেস গুপ্তর এমন কী বয়স হয়েছে যে বয়সের ভারে মুখখানা ভার হবে। বিলেতের হাওয়ার গুণে মরা গাঙেও জোয়ার আসে, বুড়ো হাড়েও ফুর্তি লাগে। তা ছাড়া এটাও নিরেট সত্য যে বৈধব্য এক প্রকার মুক্তি আনে, শোকসত্ত্বেও। মুক্তির সহচর হয় কৃশতা। দেখে চেনা কঠিন হয় যে ইনিই তিনি, সেই পদাধিকারপ্রমত্তা মন্দোদরীসঙ্কাশা। বাস্তবিক মিসেস গুপ্তকে দেখলে সহজে বিশ্বাস হয় না যে তাঁর বয়স ত্রিশের ওপিঠে। মেয়েকে সঙ্গে না নেবার এটাও একটা কারণ, নিলে হয়তো বিশ্বাস হবে।

মেয়ের প্রতি মায়ের মনোভাব যদি এই হয় তবে মায়ের প্রতি মেয়ের মনোভাবও কম যায় না। মা যে দিন দিন তরুণ হচ্ছেন, তরুণ এবং লঘুভার, হালকা এবং ঝরঝরে, এর জন্যে মেয়ে ঠিক পুলকিত নয়। এই নিয়ে মেয়ের মনে একটুখানি হিংসা যে নেই তা হয়তো হলপ করে বলা মুশকিল। হুঁ, তরুণ হবার আর সময় পেলেন না, বৈধব্যের অপেক্ষায় ছিলেন। বাবাকে খুব ভালোবাসতেন বৈকি, বাবা যেতে না যেতে কেমন গোলাপ ফুলটি হয়েছেন, আর কিছুদিন পরে সকলে বলবে, মেরি উইডো। ছি ছি! কী লজ্জা! কী কেলেঙ্কারি!

ক্লিনিক করবেন কথা ছিল। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, হচ্ছে, হবে। ক্লিনিক তো রাতারাতি হবার নয়। তার জন্যে দশ জনের পরামর্শ নিতে হয়। ডিউক ডাচেসদের বাণী সঞ্চয় করতে হবে, তার পর বড় লাটের, গবর্নরের, প্রধান সেনাপতির, সার্জন জেনারলের, শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথের। একটা স্কীম তৈরী করতে হবে, একটা বোর্ড গঠন করতে হবে, আরো অনেক করণীয় রয়েছে, ক্লিনিক তো মুখের কথা নয়। হচ্ছে, হবে।

তা শুনে দে সরকার ছড়া কাটে—

হচ্ছে হবে হচ্ছে হবে হচ্ছে হচ্ছে হবে হবে।
হবে কাল হবে কাল পরশু তরশু হবে হবে॥

এই তারকব্রহ্ম নাম কেবল গুপ্তজায়ার নয় নিখিল বিশ্বের দীর্ঘসূত্রীর অষ্টপ্রহরী সংকীর্তন। কুঁড়েস্থানের এই জাতীয়সঙ্গীত দুই কলিতেই খতম।

"শুনেছিস?" সুজাতা দেবী আর্তস্বরে সুধালেন। "রাজার অসুখ করেছে।"

"তাই নাকি ?" উজ্জয়িনীর ভারি তো ভাবনা।

"ডসন আর হিউএট পরীক্ষা করে বলেছেন সর্দি আর জর। কী ভয়ঙ্কর কথা! রাণীর জন্যে আমার মনটা খালি কাঁদছে।"

"সর্দি আর জর," উজ্জয়িনী বলল, "কার না হয় ? আমার সেদিন হয়েছিল। কই, তোমাকে তো কাঁদতে দেখিনি ?"

"যাঃ। কার সঙ্গে কার তুলনা। সসাগরা পৃথিবীর—না, না, সাম্রাজ্যের—অধীশ্বর! আর কোথাকার কে একজন বেবী গুপ্ত—না, না, সেন।"

উজ্জয়িনী রাগ করবে না ? রেগে বলল, "সামান্য সর্দির জীবাণুর আস্পর্ধা দেখ! খোদ সম্রাটকে ভোগায়! তা ওকে ফাঁসিতে লটকানো যায় না ? ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ালে কি লঘু দণ্ড হবে ? আচ্ছা সর্দি হলে কি আমার কষ্ট কম আর সম্রাটের কষ্ট বেশীরকম বেশী ?"

তার মা চিন্তান্বিত হয়ে একে ফোন করেন, ওর সঙ্গে দেখা করেন। যেন সম্রাটের নয়, তাঁর কোলের ছেলের, সর্দি নয়, সন্নিপাত হয়েছে। এই সূত্রে পাশের বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে বেদনা বিনিময় হল। বাকিংহাম প্যালেসের বুলেটিনের জন্যে উনি দিবা-রাত্র ছটফট করতে থাকলেন।

তা সম্রাটের সর্দি সম্রাটের যোগ্য হয়ে উঠল। শোনা গেল, প্লিউরিসি। লণ্ডনের পথে ঘাটে অন্য কথা নেই, এখানে দুজন ওখানে চারজন সেখানে সাতজন ফিসফিস করে ওই কথা বলাবলি করছে। প্রিন্স অফ ওয়েলস আফ্রিকায় ছিলেন, রওনা হয়েছেন, তাতে জনরবটা জবর হয়েছে। দু একজন জোগাড়ে লোক এরই মধ্যে শোকের সাজ বানাতে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ করোনেশনের তারিখ ফেলেছেন চুপি চুপি। ওদিকে নাকি কাশীর বামুনরা যজ্ঞ করছে।

"হায় হায় হা-য়!" সুজাতা দেবী জোর দিয়ে সোর তুললেন। "এত দুঃখ মানুষের কপালে ছিল। এই সেদিন স্বামী গেলেন, এখন রাজার কিছু একটা না হলে বাঁচি।"

"কিছু হবে না, মা। কেন মিছিমিছি কাঁদছ ?"

"ওঃ, কী হৃদয়হীনের মতো কথা! কিচ্ছু হবে না, মা! ডসন আর হিউএট অভিজ্ঞ ডাক্তার, ডাক্তারে কখনো বাড়িয়ে বলে শুনেছিস ? তবে শোন, তাঁরাও বলেছেন অবস্থা সিয়েরিয়াস।"

"হলই বা সিয়েরিয়াস। তা বলে তোমরা সবচেয়ে খারাপটা ভাবছ কেন, বল তো ? তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছাটা কী, শুনি ? প্রিন্স অব ওয়েলস রাজা হলে বেশ হয়, না ?"

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোল। মিসেস গুপ্ত অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হলেন। "অসম্ভব মেয়ে! তোর মনে এত ময়লা। রাণীর দুঃখে আমরা সবাই ম্রিয়মাণ, কাশীর

পণ্ডিতরা পর্যন্ত হোম করছে। তুই কিনা স্বচ্ছন্দে ওকথা উচ্চারণ করলি ! আমরা তো স্বপ্নেও ভাবিনি।"

ভণ্ডামির নমুনা এই প্রথম নয়। তবু উজ্জয়িনী হাড়ে হাড়ে চটল। শুধু মায়ের উপর নয়, ইংরেজদের উপরেও। বাবাঃ। মনে এক, মুখে আর। এমন জাত আর দেখিনি। কাশীর পণ্ডিতদের বিষয় আলাদা। ওই হল ওদের ব্যবসা, বৈদিক যুগ থেকে ওরা ওই করে চালিয়ে আসছে। বোধ হয় মোগল বাদশার জন্যেও এক দিন হোম করেছে।

যা হোক সকলের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে রাজা সে যাত্রা বাঁচলেন। তখন মিসেস গুপ্তর হাসি দেখে কে ! "কেমন, আমি বলিনি ? আমাদের পঞ্চাশ কোটি কণ্ঠের অবিরাম প্রার্থনা কি ভগবান না শুনে পারেন ? এখনো চন্দ্র সূর্য ওঠে, এখনো শীতের পর বসন্ত আসে। আহা, এতগুলি লোক প্রার্থনা করলে আমার স্বামীও কি বাঁচতেন না ?"

উজ্জয়িনী পিতার উল্লেখে অন্যমনা হল। তারপর বলল, "আমার বাবার তো এত-গুলি প্রজা ছিল না, আর ভগবান তো কেবল সংখ্যাই বোঝেন। আদমসুমারির রিপোর্ট-খানা ভগবানের চব্বিশ ঘণ্টা পাঠ্য। কখনো পঞ্চাশ কোটি ব্রিটিশ প্রজা তাঁকে ডাকছে, কখনো তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী, কখনো সাত কোটি মুসলমান। এই সব দেখে শুনে আমি প্রার্থনা ছেড়ে দিয়েছি, মা। আমার একলার প্রার্থনা কেন তিনি শুনবেন আর কখন তিনি শুনবেন !" এই বলে সে আবার আনমনা হল।

"ভগবান আছেন বৈকি।" উজ্জয়িনী বলে। "তবে আমি প্রার্থনা করিনে, উপাসনা করিনে।"

৪

মা ও মেয়ে কেউ কারো মুখ দেখতে চান না। কিন্তু তা নিয়ে উচ্চবাচ্যও করেন না। যার যার নিজের সেট নিয়ে থাকেন, সেই আয়নায় নিজের মুখ দেখেন। তাতে দু'পক্ষের সুবিধে।

থেকে থেকে বাদলকে তার মনে পড়ে যায়। মনে পড়লেই সে অন্যমনস্ক হয়। তখন যদি দে সরকার থাকে তবে ঠিক বুঝতে পারে অন্যমনস্ক মানে বাদলমনস্ক। তখন তার তূণ থেকে একটি শব্দভেদী বাণ ছাড়ে। উজ্জয়িনী চমকে ওঠে।

"খুব নাম করেছে বাদল।"

"কে নাম করেছে ? কে ?"

"বাদল, আমাদেরই বাদল।" দে সরকার জোর দিয়ে বলে। "আমরা অবশ্য আগে থেকে জানতুম যে ওর প্রতিভা আছে, নাম করা অনিবার্য। কিন্তু এমন ভাবে নাম করা একটু অপ্রত্যাশিত নয় কি ?"

উজ্জয়িনী কৌতূহলী হয়েছে লক্ষ করে দে সরকার বলল, "আপনি শুনেছেন নিশ্চয়। মিসেস বেসান্টের কৃষ্ণমূর্তির মতো মিস স্ট্যানহোপের বাদল এখন ভাবী যুগের নক্ষত্র, যা দেখে নাবিকরা দিক নির্ণয় করবে। কেউ বলছে ওর নয়নে দিব্য জ্যোতি, কেউ বলেছে ওর শিয়রে দিব্য অরা (aura)। মিস স্ট্যানহোপ ওর ফোটো তুলতে দিচ্ছেন না, তাই লোকের ঔৎসুক্য আরো নিবিড় হয়েছে। অনেকেই যাচ্ছেন চাক্ষুষ করতে।"

"ওমা, তাই নাকি?" উজ্জয়িনী সগর্বে ভ্রূবিস্তার করল। তার গর্বে আঘাত লাগল দে সরকার যেই বলল, "হাঁ, অনেকেই যাচ্ছেন, তবে মিস স্ট্যানহোপ অনুমতি না দিলে কেউ তার দর্শন লাভ করতে পারেন না। আমিও যেতুম, কিন্তু মিস স্ট্যানহোপ শুনেছি বাদলের পরিচিতদের অনুমতি দিতে কার্পণ্য করেন। মানব মাত্রেই যার আপন তার আবার আপন জন কে?"

"আপন জনের কি এতটুকু অধিকার নেই যতটুকু মানবমাত্রের?"

"আমি কী করে বলব?" দে সরকার ধাঁধাগ্রস্তের মতো চুপ করে থাকল। বলল, "এমনো হতে পারে মিস স্ট্যানহোপের ধারণা আপন জনকে সাধারণ অধিকার দিলে সাধারণে ভাববে ওটা পক্ষপাতিত্ব। সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগ করে কেন? গৃহের লোকের কি সাধারণ অধিকার নেই? গৃহিণী কি পরের চেয়েও পর?"

আশ্রমে গেলে মিস স্ট্যানহোপ তাকে ঢুকতে দেবেন না, বাদলকে খবর দিলে খবরটা তার কানে পৌঁছোবে না, এতে উজ্জয়িনী মর্মাহত হল।

সুযোগ বুঝে দে সরকার টিপল, "চিরকাল এই চলে আসছে, দোষ দেবেন কাকে? পুরুষ সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তার পরে স্ত্রীজাতিকে যে অধিকার দেয় স্ত্রীকে তা দেয় না। তাদের কেউ তার মা, কেউ তার বোন, কেউ বা তার মেয়ে বলে আসন পায়, কিন্তু স্ত্রী বেচারি আমলই পায় না। অন্তত তাকে একবার বোন বলে ডাকলেও তো পারত।"

উজ্জয়িনী শিউরে উঠল।

"সংস্কারমুক্ত হওয়া পুরুষের পক্ষে কিছু নয়। ইচ্ছা করলেই সে কারো স্বামী নয়, সে সকলের স্বামীজী। কী রকম অহঙ্কার, দেখেছেন? সকলের স্বামীজী!" দে সরকার আরো জোরে টিপল।

সেদিনকার মতো সেই যথেষ্ট। বাকীটুকু উজ্জয়িনীই ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে পূরণ করে নেয়। পুরুষ ইচ্ছা করলেই সংস্কারমুক্ত হয় সম্পর্ক কাটায়, জন্মজন্মান্তর তার বেলা কিছু নয়। নারী কিন্তু ভেবে মরে এই তার পূর্ব জন্মের স্বামী, এর সঙ্গে তার সম্পর্ক সনাতন। ছায়াকে ছেড়ে আলো থাকতে পারে কখনো? কেউ দেখেছে ছায়াহীন আলো? তা যদি সম্ভব হয়, যদি ছায়াকে বাদ দিয়ে আলো থাকে, তবে সেই মুহূর্তেই ছায়াও তো আলোছাড়া হয়। সম্পর্ক কাটলে দুদিকেই কাটে।

"যাক, মিস স্ট্যানহোপের চরণে একবার আবেদন করব, যে আবেদন ধর্মত আরেকজনের কাছে করবার কথা। বলেন তো আপনার পক্ষেও আবেদন করতে পারি।" দে সরকার উঠল।

"না, না, আমার পক্ষে নয়।" উজ্জয়িনী রঙিন হল। দে সরকার কী মনে করবে ভেবে বলল, "আমি আপাতত তাঁকে বিরক্ত করতে চাইনে। তাঁর সাধনার মূল্য আমার সাক্ষাতের চেয়ে বেশী।"

"ঠিক বলেছেন।" দে সরকার জানে সায় দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সেই সঙ্গে যোগ করতে ভুলল না, "পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ তো এক দরের নয়। সাধু সন্ন্যাসীরাও বেশ বোঝেন যে আপন স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এ দুয়ের মধ্যে অশেষ পার্থক্য।"

কয়েক দিন দে সরকার এলই না। যদি বা এল ও প্রসঙ্গ তুলল না। ইতিমধ্যে উজ্জয়িনী অনেকবার অন্যমনস্ক হয়েছে। কিন্তু বাদল সম্বন্ধে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। সুধীদাকেও না। বিভূতি এক দিন কথায় কথায় বলছিল, "বাদলটার ব্যবসাবুদ্ধি থাকলে এই হুজুগে বড় লোক হতে পারত। আমি যদি তার ম্যানেজার হতুম তাকে নিয়ে আটলান্টিকের ওপারে যেতুম, দর্শনী আদায় করলে দশ বিশ হাজার ডলার উঠত।" বাদলের যে এত আদর তার দরুন উজ্জয়িনীর গর্বের সীমা ছিল না। তার বাবা মানুষ চিনতেন, যার হাতে তাকে দিয়েছেন সে মানুষের মতো মানুষ, অতিমানুষ। তেমন মানুষ একটু পাগলাটে হয়ই তো। তাদের নিয়ে কে কবে সুখী হয়েছে! উজ্জয়িনী সুখের কাঙাল নয়। এই তার মস্ত সুখ যে তার স্বামী মহাপুরুষ।

তার স্বামী? উজ্জয়িনীর মনে ধোঁকা লাগে। যাদের স্বামী আছে তাদের কাছে স্বামী কথাটার যে অর্থ বাদল কি সেই অর্থে তার স্বামী? তাদের স্বামীরা কি কেবল আনুষ্ঠানিক স্বামী? আইনের স্বামী? লোকচক্ষে স্বামী? তাই যদি হয় তবে বাদলও তার স্বামী বৈকি। আর তাই যদি না হয়, তবে? ভাবতে লজ্জা করে, ভাবনার উপর উজ্জয়িনী অবগুণ্ঠন টেনে দেয়। ভেবে কাজ কী! স্বামী হচ্ছে স্বামী, এই হচ্ছে চরম উত্তর।

হঠাৎ একদিন দে সরকার বলল, "ভালো কথা, আপনাকে জানিয়েছি কি? স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।"

উজ্জয়িনী নির্লিপ্তভাবে বলল, "তাই নাকি?"

"ভালো আছে। যতটা শুনেছিলুম ততটা কড়াকড়ি নেই। মিস স্ট্যানহোপ একবার চোখ বুজে স্থিরভাবে হাসলেন, তারপর চোখ বুলিয়ে আমার মনের অন্ধিসন্ধি দেখলেন। বললেন, আপনি বাদলের বন্ধু বটে। আশ্রমেরও। অনুমতি পেয়ে গেলুম উপরের

ছোট হল ঘরে। বাদল তখন বর্ণনা করছিল তার আধুনিকতম Vision—সে নাকি আজকাল উইলিয়াম ব্লেকের মতো Vision দেখে।"

এই বলে দে সরকার একটা Vision এর নমুনা শোনাল। উজ্জয়িনী আবিষ্ট হয়ে শুনল।

"আশ্চর্য। কে জানত বাদল শেষকালে মিষ্টিক হয়ে দাঁড়াবে। ওর মতো নাস্তিক, ওর মতো বস্তুবাদী কিনা ঘোষণা করে, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক দৃষ্টির অতীত জগৎ রয়েছে, মানচিত্রে তার সীমানা নেই। তা বলে সে কম বাস্তব নয়। তবে সেই যে বাস্তব আর এই যে মায়া এমন সিদ্ধান্ত যেন কেউ না করেন।"

উজ্জয়িনী সুধাল, "আরো কেউ ছিলেন নাকি?"

"ছিলেন না?" দে সরকার যেন এই প্রশ্নের প্রতীক্ষা করছিল। "বিশ পচিশ জন তো নিশ্চয়ই। বেশ অবস্থাপন্ন বলে মালুম হয়। মেয়েরাই বেশীর ভাগ, বেশ ফ্যাশনেবল গোছের।"

উজ্জয়িনী চমৎকৃত হল। কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "স্বামীজী আর কিছু বলছিলেন?"

"হাঁ, বলছিলেন আপনার কথা। আপনি তাঁকে যদি কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করেন তো অনায়াসে চিঠি লিখতে পারেন। এক রাশ চিঠি আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, দেখছ তো মানুষের কত রকম কত প্রশ্ন? অথচ আমরা ধরে নিই যে মানুষের সেরা প্রশ্ন দুঃখ মোচনের প্রশ্ন। দারিদ্র্য মোচনের প্রশ্ন। মানুষ যে ডিভাইন স্বভাবত দুঃখদারিদ্র্য-হীন, তাই আমরা ভুলে বসে আছি।"

৫

অথচ তামাশা দেখুন, উজ্জয়িনীকেই সকলে সুধায়, "তোমার স্বামীর খবর কী?"

তার স্বামীর খবর!

আণ্ট এলেনর তাকে মাঝে মাঝে চা খেতে বলেন। তিনিও জানতে চান, "বাদলের খবর পেয়েছ? কেমন আছে সে?"

উত্তরে উজ্জয়িনী বলতে উদ্যত হয়, আমি তো মিস স্ট্যানহোপ নই, কী করে জানব? আর মিস স্ট্যানহোপ তো আপনার বন্ধু। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে, "আছেন ভালো। কী যেন দেখছেন আজকাল। কী বলে ওকে? কে যেন ওসব দেখতেন?"

নমুনা দেয়। অজগরের মতো তেড়ে আসছে আগুনের স্রোত। প্রাণীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। কারো পথ জলে, কারো স্থলে, কারো অন্তরীক্ষে। দেখতে দেখতে আগুন আগুয়ান হয়, পলাতকদের নাগালে পৌঁছোয়। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আগুনের প্লাবন,

প্রাণীরা আর পথ পায় না, আগুনই তাদের পথ। তখন তারা ভয় কাটিয়ে ওঠে, তাদের অগ্নিশুদ্ধি হয়, তারা নব কলেবর পরিগ্রহ করে। তাদের সেই উজ্জ্বল রূপ তাদের আত্মার স্বরূপ। আর তাদের মৃত্যু নেই। তারা চিরপ্রাণ। তারা স্বর্গীয়। নেই তাদের দুঃখ দারিদ্র্য, নেই তাদের প্রিয়বিয়োগ, তারা পূর্ণ।

"বাদল তা হলে মিষ্টিক হয়েছে।" মন্তব্য করেন আণ্ট এলেনর। "কার মধ্যে কী যে থাকে কেউ বলতে পারে না। নইলে সেই তার্কিক বাদল!" হাসতে হাসতে বিবৃত করেন বাদলের সেই বিবর্তনের সূত্র। সেই যেবার সে নাচতে গিয়ে কোমর ভেঙে বিছানায় পড়েছিল।

"তারপর, তুমি কী হচ্ছ, উজ্জয়িনী? তোমাকে এখন থেকে সংক্ষেপে জিনী বলে ডাকব, আপত্তি আছে?"

আপত্তি ছিল না, তবে হাসির কারণ ছিল।

"মিস্টিক হবে না তো?" তিনি পরিহাস করেন। "মিস্টিকের স্ত্রী যদি মিস্টিক হয় তবে কে কাকে দেখবে? তুমি হবে ওর রক্ষক। ওকে বাস্তবের উৎপাত থেকে রক্ষা করবে তুমি। কেমন?"

তাঁর স্বর পরিহাসের পর্দা থেকে গাম্ভীর্যের পর্দায় ওঠে।

কিন্তু উজ্জয়িনীর ও কাজ মনঃপূত হয় না। মিস স্ট্যানহোপ থাকতে কেই বা খোঁজে তার আশ্রয়। মিস স্ট্যানহোপ এমন সন্তর্পণে রক্ষা করেছেন যে অপর কোনো রক্ষককে দেখলে ভক্ষকের মতো তাড়া করবেন হয়তো। না, বাপু, রক্ষক হয়ে কাজ নেই। তার অন্য কাজ আছে।

ইংরেজ মেয়েদের দেখে তার চোখ ফুটেছিল। যেখানে যায় সেখানে লক্ষ করে কর্মী বা কর্মচারী বলতে মেয়েদেরও বোঝায়। ডাকঘরে, দোকানে, কলেজের আপিসে, কলেজের বক্তৃতা মঞ্চে, রেস্টোরাণ্টে, মিউজিয়ামে, থিয়েটারে—সর্বত্র মেয়েরা অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত, দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত। একজন মেয়ের বেহালা শুনতে শত শত নারীনর সমবেত হন, একজন মেয়ের সার্মন শুনতে আরো ভিড় হয়। মেয়েদের নিজেদের কনসার্ট আছে, নিজেদের মালিকী দোকান আছে, নিজেদের সেবাসমিতি আছে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনেত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও নার্স তো হাজার হাজার। মেয়ে দর্জি, মেয়ে মুদি, ফলওয়ালী, ফুলওয়ালী, রুটিওয়ালী ও কেকওয়ালী, এটা ওটা খুচরো জিনিসের পসরাওয়ালী লাখে লাখে। দেশটা পুরুষের একার নয় আর পুরুষও তো মাইনরিটি। বোধ হয় পুরুষ বেচারাদের পাহারা দিতে বিকট কালো পোশাকপরা মেয়ে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে।

উজ্জয়িনী কি জনকয়েক সঙ্গিনীর সাহায্যে চায়ের দোকান খুলতে পারে না? বইয়ের

দোকান, সিগরেটের দোকান, মণিহারির দোকান চালাতে পারে না? অলঙ্কারের দোকান, প্রসাধনের দোকান? আচ্ছা, কনসার্টে বেহালা কিংবা চেলো বাজাতে পারে না? হাসপাতালে নার্স হতে তার প্রবৃত্তি নেই, তা বলে কি অন্য বৃত্তি নেই?

"না, আন্টি।" মাথা নাড়ে উজ্জয়িনী, ওরফে জিনী। আমরাও এখন থেকে তাকে জিনী বলতে পারি। পাঠকের আপত্তি আছে?

''না, আন্টি। আমার নিজের একটা প্রতিষ্ঠা চাই, career চাই। নার্স হব না, স্থির করেছি। কিন্তু কী যে হব তা স্থির করিনি। তাই আমাকে স্থির করতে হবে। মিস্টিকের রক্ষক," হেসে বলে, "স্বয়ং ভগবান। যদি আর কেউ সে ভার না নেন।"

আণ্ট এলেনর চিন্তিত হন। আধুনিক মেয়ের পক্ষে জীবিকার সন্ধান অনাসৃষ্টি নয়, বিবাহিতা হলেও প্রত্যেক মেয়ে চায় প্রয়োজনের সময় আত্মনির্ভর হতে। কিন্তু ভারতের মেয়ের পক্ষে পরিসর কতটুকু তার স্বদেশে। ভারতের সংবাদ ভালো না জানলেও যেটুকু জানেন সেটুকু তো আশাপ্রদ নয়।

"কিন্তু তুমি তো দেশে ফিরে খুব বেশী সুযোগ পাবে না, জিনী। নার্স না হলে মেয়ে ডাক্তার, তা না হলে মেয়ে মাস্টার, এ ছাড়া আর কিছু কি হবার জো আছে ও দেশে?"

কথাটা সত্যি। কিন্তু উল্টো বোঝে জিনী। আণ্ট এলেনরও ইংরেজ, ইংরেজমাত্রেই ভারতবিদ্বেষী, তাঁর ভারতবিদ্বেষ এত দিনে একটা উপলক্ষ পেয়েছে। ভারতের দোষ অনেক, তা বলে বিদেশীর মুখে ও কথা শুনতে কার ভালো লাগে? আমার দেশের নিন্দা করতে হয় আমি করব। তুমি কে যে তুমি আমার মুখের উপর আমার দেশের দোষ ধরবে?

"জানিনে আপনার বার্তাবহটি কে!" উষ্ণ হয়ে উত্তর করে জিনী, "কিন্তু ভারতের মেয়েরা কারো চেয়ে কোনো বিষয়ে খাটো নয়, আণ্ট এলেনর। তারা পরিসর না পেলে প্রস্তুত করে নেবে, তারা পরিসর নেই বলে চুপ করে বসে থাকবে না। আমি যদি মনের মতো কাজ শিখতে পারি তবে মনের মতো কাজ জুটিয়ে নিতে পারব। নতুবা যাতে কাজ জোটে তার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করব।"

"আন্দোলনের কথায় মনে পড়ল আমার সাফ্রেজেট আন্দোলন। তোমরা ভারতের মেয়েরা আন্দোলন কর না কেন? আন্দোলনেই পরিসর প্রসারিত হয়। এদেশে যতগুলি দরজা খোলা দেখছ প্রত্যেকটি আমরা জোর করে খুলেছি।"

আণ্ট এলেনর এক কালে প্রচণ্ড সাফ্রেজেট ছিলেন, এখনো প্রচণ্ড আছেন, তবে সাফ্রেজেট না, শান্তিবাদী। জগতে শান্তিস্থাপন না হওয়াতক তাঁর শান্তি নেই, জগতেরও শান্তি নেই। তাঁরা নো মোর ওয়ার মুভমেণ্ট নামে একটা নূতন আন্দোলনে নেমেছেন— তিনি ও তাঁর মতো সাফ্রেজেট যুগের সৈন্যগণ।

"করব আন্দোলন।" জিনী উৎফুল্ল হয়। "তবে শুধু হাতে ও খালি মগজে নয়। হাতে কাজ থাকা চাই, যে-কোনো একটা বৃত্তি। মগজে বিদ্যা থাকাও দরকার, যে-কোনো একটা বিদ্যা। আমার আজকাল পড়াশুনো করতে এত ভালো লাগে, আন্টি, যে কী বলব? ইচ্ছা করে ওতেই ডুবে থাকতে। সেই সঙ্গে কোনো রকম বৃত্তি শিখতে পেলে আরো বল পেতুম।"

আণ্ট এলেনর উৎসাহ দেন। "অসংখ্য কাজ করবার রয়েছে মেয়েদের। যেমন এদেশে, তেমনি ওদেশে। তবে ওদেশে আরো বেশী। তোমরা মেয়েরা মনোযোগী না হলে তোমাদের দেশের বাল্যবিবাহ, শিশুমৃত্যু, প্রভৃতির দুর্দশা ঘুচবে না।"

কথাগুলি বেশ, কিন্তু বাল্যবিবাহের উল্লেখে উজ্জয়িনী সন্দিগ্ধভাবে তাকায়। যেন তাকেই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। যেন তারই প্রতি অনুকম্পা দেখানোর ছল ওটা। বাল্য-বিবাহিতা বলে সে অনুকম্পার পাত্রী হবে না কারো। তবে বাল্যবিবাহ যে ভুল তা সে মর্মে মর্মে অনুভব করে, করে বলেই বিদ্রোহী হয়। অনুকম্পা যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। যার ক্ষত আছে তাকে জ্বালাতন করে তোলে।

"আচ্ছা, তোমাকে দেখাব কয়েক রকম কাজ। নার্স তুমি হবে না, কিন্তু সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে অমত নেই তো? চল তা হলে এক দিন অন্ধ শিল্পাগারে।" প্রস্তাব করেন আণ্ট এলেনর। জিনী আশ্বস্ত হয়। না, অনুকম্পা নয়।

৬

ক্লাসে সহপাঠিনী ব্যতীত সহপাঠীও থাকে। তাদের মধ্যে যারা ইংরেজ তারা তেমন মিশুক নয়, একটু লাজুক। যারা জার্মান কি পোল কি রুমেনিয়ান তারা কিন্তু যেচে আলাপ করে ও বিবাহিতা জানলে আরো উদযোগী হয়। দে সরকার তাই সদুপদেশ দিয়েছে সিঁদুর না পরতে। এত বড় একটা সংস্কার এত সহজে কাটানো কঠিন, উজ্জয়িনী নামমাত্র ছুঁইয়ে রাখে সিঁথির এক কোণে।

তাতেও উদযোগীদের উদ্যম কমে না। নাচের নিমন্ত্রণ রাশি রাশি। তা শুনে দে সরকার বলে, খবরদার। ইংরেজের আমন্ত্রণ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কন্টিনেণ্টালদের আমন্ত্রণ কণ্টকময়।

সে ভেঙে বলে না কেন কণ্টকময়। কিন্তু তার কথা শুনে উজ্জয়িনীর গায়ে কাঁটা দেয়। বৃন্দাবনের ঘটনার পর থেকে সে একটু ভয়ে ভয়ে চলে। অপরিচিতের সঙ্গে মেলামেশা করলেও একা একা চলাফেরা করে না। ইংরেজের আমন্ত্রণ নির্ভরযোগ্য হলেও সে একটা না একটা অজুহাতে রেহাই পায়। আর ইংরেজরাও পীড়াপীড়ি করতে কুণ্ঠিত। তারা একদিন সাড়া না পেলে বলে, আচ্ছা, আরেকদিন।

কিন্তু কন্টিনেন্টালদের সাড়া না দিলে তারা ছাড়া দেয় না, যতক্ষণ না মিথ্যার উপর মিথ্যা জমে স্তূপাকার হয়। 'জানিনে' বললে ওরা চায় শেখাতে। 'সময়াভাব' বললে ওরা বিশ্বাস করে না, এনগেজমেণ্ট ডায়েরির মেলাতে চায়। 'ধর্মে নিষেধ আছে' বললে ওরা হেসে খুন হয়। শেষকালে বলতে হয়, "মা আসতে দেয় না।"

দে সরকার যা বলে তা ফলে। বিস্মিত হয়ে উজ্জয়িনী জানতে চায়, "কেন এমন হয় ? বিবাহিতা মেয়ের উপর কেন ওদের পক্ষপাত ?"

দে সরকার দুষ্টু হাসে। "আছে কথা।"

উজ্জয়িনী যখন কৌতূহলে অধীর হয় তখন আস্তে আস্তে মন খোলে দে সরকার। "ফরাসী দেশে কুমারী মেয়েদের চোখে চোখে রাখা হয়, চোখের আড়ালে মিশতে দেওয়া হয় না। তাদের স্বামীনির্বাচনের ভার গুরুজনের উপর। কিন্তু যেই একবার বিয়ে হয়ে যায় অমনি সেই মেয়ে স্বাধীন। সে তার নিজের সংসারের মালিক। তার শাশুড়ী তাকে আটকে রাখতে পারে না, তার স্বামীরও সময় নেই। তারপর সে চোখের আড়ালে কার সঙ্গে মেশে না মেশে তা সম্পূর্ণ তার নিজের ব্যাপার।"

"কিন্তু তাতে কী আসে যায় ?"

"এই আসে যায় যে যারা তার দিকে ভয়ে তাকাতে পেত না তারা নির্ভয়ে তাকায়। তারা নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে ও প্রশ্রয় পেলেই অগ্রসর হয়। স্বামীর সঙ্গে প্রেমহীন মামুলি সম্পর্ক, তাই একটু রোমান্স জুটলে মেয়েরা এসেন্সের মতো মাখে। স্বামীরও বিশেষ আপত্তি নেই, কেননা তাঁরও ইতিমধ্যে কয়েকবার অন্যত্র মাখা হয়েছে।"

জিনী শুনছে কি না শুনছে বোঝা যায় না, শুধু তার মুখভাব কঠোর মনে হয়। দে সরকার প্রসঙ্গটাকে তাড়াতাড়ি একটা বৈজ্ঞানিক পোশাক পরায়।

"সব জিনিস একটু তলিয়ে দেখতে হয়। নইলে জিনিসটা যে আসলে কী আর এল কোনখান থেকে তাই অজানা থাকে। অজানার উপর রাগ করা সোজা, তা তো সকলেই করে।" এই বলে দে সরকার তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

"বিবাহ বলে এই যে প্রথাটা আজ চিরন্তনতা দাবী করছে প্রকৃতপক্ষে এর উৎপত্তি খুব বেশী দিনের নয়। মানুষ যদি কয়েক লাখ বছরের হয় বিবাহ তবে কয়েক হাজার বছরের। তা হলেই মানতে হয় বিনা বিবাহে মানুষ বহুকাল জন্মিয়েছে ও তেমন জন্মানো পাপ নয়। অথচ এখন আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার অন্যরূপ। বিবাহ দিয়ে শোধন করে না নিলে মিলন হয় অশুদ্ধ। কেন এমন হল ? কবে এমন হল ? কার আদেশে হল ? বিধাতার বা প্রকৃতির না সমাজের না শাস্ত্রের ?"

জিনী ভীত হয়ে অন্যমনস্কতার ভান করে।

"বিবাহের ইতিহাস অতি চিত্তাকর্ষক। কত রকম পরীক্ষা যে হয়েছে ও হচ্ছে তার

ইয়ত্তা নেই। কোনো এক দেশের সঙ্গে অন্য কোনো দেশের মেলে না, কোনো এক জাতির সঙ্গে অন্য কোনো জাতির মেলে না। বৈচিত্র্যের পরিসীমা নেই। অথচ এক জায়গায় মিল আছে। সমাজের দশজনে জানে যে অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়ে হয়েছে। এই স্বীকৃতি হচ্ছে বিবাহের গোড়ার কথা। দশজনে না মানলে কোনো বিবাহ সিদ্ধ নয়। কোনো কোনো দেশে দশজনকে মানাতে বেশী কিছু করতে হয় না। তিন দিন একত্র থাকলেই চলে। আবার কোনো কোনো দেশে বিস্তর ধুমধাম করতে হয়। উৎসব অনুষ্ঠান পুরোহিত সাক্ষী বরযাত্রী কন্যাযাত্রী ভোজন দক্ষিণা যৌতুক পণ—তুমুল কাণ্ড। মায় বাসরঘর ও কর্ণমর্দন।"

জিনী ফিক করে হাসে। তারপর কী মনে করে কাতর হয়।

"স্বীকৃতিই শাঁস, বাকী সব খোসা।" দে সরকার বলতে থাকে। "কিন্তু আরো কথা আছে। স্বীকৃতিই যদি সমস্ত হতো তবে একজন মেয়ে তিন জন পুরুষকে বিয়ে করলেও তা স্বীকৃত হতো। হয়ও কোনো কোনো দেশে, যেমন তিব্বতে।"

জিনী চমকে ওঠে।

"একজন পুরুষের ষোল হাজার স্ত্রী তো পুরাণেই আছে, তিন চারটি তো আমাদের চোখে দেখা।" মুচকি হাসে দে সরকার। জিনী নাসিকাকুঞ্চন করে।

"তা হলে স্বীকৃতিই সমস্ত নয়। আরো কথা আছে। সেটা হচ্ছে পারিবারিক গড়ন। আমাদের যুগে সভ্য মানুষের মধ্যে পারিবারিক গড়ন বদলাতে বদলাতে ক্রমে একটি পুরুষের একটি স্ত্রীতে পৌঁছেছে। আশা করি একের নিচে নামবে না। কী বলেন?" এই বলে সে একটু রহস্য করে। জিনী খিল খিল করে হেসে ওঠে। "কী জানি!"

"কিন্তু সত্যি, ভাববার কথা।" দে সরকার গম্ভীর হয়। "ক্রমে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটাই সংক্ষিপ্ত হতে হতে বিলুপ্ত হতে চলেছে। কয়েক হাজার কেন কয়েক শো বছর পরে তার চিহ্ন পাবেন না। যদি ততদিন বাঁচেন। কত পুরুষ ইচ্ছে করেই চির-কুমার থাকছে, কত মেয়ের ইচ্ছে থাকলেও বিয়ে হচ্ছে না। এসব কিসের লক্ষণ?"

জিনী চোখ তুলে তাকায় ও ভাবে।

"সোজা উত্তর। পারিবারিক গড়ন ক্রমে পরিবারকেই অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছে। এই ধরুন কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু তারা এই দেশেই থাকছে, তাদের স্বামীরা রয়েছে বিদেশে। মাঝে মাঝে দেখা হয়, কিন্তু একত্র জীবন কাটানো সম্ভব হয় না। সন্তান হতে না হতেই ইস্কুল চলল। মা বাপ তাকে ইস্কুলে দিয়ে খালাস। কেমন? এই কি পরিবারের অবস্থা নয়?"

জিনী অত না জানলেও সায় দেয়।

"মেয়েরা আজকাল বৃত্তি চায়। তা আপনিও চান। তার মানে যেখানে বৃত্তিগত

সুবিধা সেইখানে স্ত্রীর স্থিতি। স্বামী হয়তো বৃত্তির জন্যে পাঁচশো মাইল দূরে। এদের মেলার উপায় নেই। তাই এরা একটা পরিবারই নয়! তা হলে," দে সরকার খেই হাতে নেয়, "তা হলে একজন পুরুষের একজন স্ত্রী নামমাত্র। কেউ কারো স্বামী-স্ত্রী নয়, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে নয়। কুমারকুমারীর মতো একাকী জীবন। কেউ এরোপ্লেনের পাইলট হয়ে পৃথিবী পারাপার করে, কেউ ডিপার্টমেন্ট স্টোরে খেলনা বিক্রী করে।"

"আমি এবার উঠি।" জিনী বলে।

"বা! আমি তো অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি।" দে সরকার অপ্রতিভ হয়। পাছে কেউ তাকে একটা 'বোর' বলে সেই ভয়ে সে হিসাব করে কথা বলে।

"না, খুব শিক্ষা হল আমার। অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার দে সরকার। উঠতুম না যদি একটা এনগেজমেন্ট না থাকত।"

দে সরকার বোঝে তারই আগে ওঠা উচিত ছিল। মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে, হাজার বলবার থাকলে হাজার বলতে নেই, বলতে হয় শ্রোতার যতটা সয়।

৭

উজ্জয়িনীর সঙ্গে দে সরকারের সম্পর্ক এতদূর গড়িয়েছে এমন সময় সুধীর বাসাবদল।

সুধী জানত যে দুটি উপলক্ষ্যে দে সরকারের অবারিত গতিবিধি ও অসামান্য প্রভাব। সে দুটির একটি হচ্ছে বাদলের সঙ্গে তার তথাকথিত বন্ধুতা। সুধীর বাসাবদলের পর উজ্জয়িনীকে একথা বোঝানো শক্ত হবে যে বাদলের খোঁজখবর সুধীর চেয়ে বেশী রাখে দে সরকার। তবে সুধী জানত না এক হিসাবে ও কথা ঠিক। দে সরকার ওখানে কয়েক-বার গেছে, সুধী গেছে একটিবার। দে সরকারের যাওয়া অবশ্য নিষ্কাম নয়। বাদলের কাছ থেকে একখানা ফতোয়া আদায় করা বোধ হয় তার উদ্দেশ্য। যা পড়ে উজ্জয়িনী বিশ্বাস করবে যে বিবাহ কথাটার কোনো মানে হয় না। বিশেষত যেখানে পরিবার রচনার অভিপ্রায় নেই।

দ্বিতীয় উপলক্ষ্য পড়াশুনাসংক্রান্ত পরামর্শ। এ ক্ষেত্রেও সুধীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষ্ফল। এতদিন সুধী সুদূর ছিল বলে দে সরকার একচেটে অধিকার আয়ত্ত করেছে। তার সে অধিকার এবার সার্বভৌমতা হারিয়ে ইকনমিকসের এলাকায় ঠেকবে। সেই এলাকার বাইরে অন্য যে সব এলাকা রয়েছে সুধী তাদের সঙ্গে অপরিচিত নয়। আর ইকনমিকসও সুধী পড়তে শুরু করেছে। ভারতের সমস্যার পক্ষে ও বিদ্যা একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে দুটি কারণে দে সরকার মূল্যবান ছিল সে দুটি কারণ সুধীর বাসাবদলের পর

সুধীর অনুকূলে গেল। এর পরে দে সরকার তাস খেলতে পারে, আড্ডা দিতে পারে, ফাইফরমাস খাটতে পারে, কিন্তু এখন থেকে তার আসন মোনা ঘোষের পংক্তিতে। সে পাঁচজন অভ্যাগতের একজন। সে একটি বিশেষ জন নয়।

কয়েক সন্ধ্যা উজ্জয়িনীর ওখানে যাবার পর ও কয়েকবার তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবার পর সুধী ভেবেছিল তার উপর দে সরকারের প্রভাব পড়বার হেতু নেই। প্রকৃতপক্ষে তাদের দুজনের কথাবার্তা এত কম যে সুধী থাকলে তার মধ্যে বৈপ্লবিক কিছু পায় না। তা সত্ত্বেও সুধী তার ইনটুইশন দিয়ে অবগত হয় একের মনের সঙ্গে অপরের মনের সম্পর্ক বৈপ্লবিক। লোকটা কি জাদু জানে? মুখে একটাও কথা নেই। অথচ চোখে চোখে টরে টক্কা টরে টক্কা। তবে কি উজ্জয়িনী প্রেমে পড়েছে? কই, তাও তো নয়। সুধীর ইনটুইশন তেমন কিছু আবিষ্কার করেনি।

বাদলের বন্ধু হিসাবে নয়, উজ্জয়িনীর সচিব হিসাবে নয়, কী জানি কোন গুণে দে সরকার পরম মূল্যবান হয়ে রইল, তার সমাদর একটুকুও কমদর হল না। সে টেলিগ্রাফ করলেই উজ্জয়িনী আসন ছেড়ে ওঠে, পানীয় নিয়ে আসে। সে যখন যায় তখন টরে টক্কা করলেই বুঝতে হয়, কাল দেখা হবে না। সুধীর বাসাবদলের ফলে বৈপ্লবিক উক্তি বাধা পেল, কিন্তু অনুক্তি যে উক্তির বাড়া।

দে সরকার বাসাবদলের বার্তা পেয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল, এ খেলা খাটবে না। সুধী তাকে বিদায় না করলেও বেচাল করবে, তার চেয়ে বিদায় ভালো। তা সত্ত্বেও দে সরকার খেলা ছাড়ল না। সুধীকে বলল, এক হাত খেলবে। জানে হারবে, তবু যত বিলম্বে হারে তথা লাভ।' বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে খেলবে ও দস্তুর মতো ভাবাবে। হারবে শেষপর্যন্ত, তবু ঘটা করে হারবে।

দুখানা রং যদিও সুধীর হাতে গেল, একখানা রইল দে সরকারের হাতে। এখানা সে একদম লুকিয়ে রেখেছিল, এমন চাপা দিয়েছিল যে সুধীর ইনটুইশনও গন্ধ পায়নি। হা হা! দে সরকার মনে মনে হাসে। হোরেশিও, স্বর্গে মর্তে এত রহস্য আছে যার স্বপ্ন দেখেনি তোমার দর্শনশাস্ত্র।

উজ্জয়িনীর এমন কোনো সখী ছিল না যার কানে কানে তার সেই গোপন কথাটি বলে প্রাণে সোয়াস্তি পেত। তার সঙ্গিনীর অভাব ছিল না, বান্ধবীও ছিল। কিন্তু তাদের কারো কাছে অন্তরের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা যায় না, তারা বিশ্বাসিভাগী নয়। তাদের সঙ্গে খেলাধুলো গল্পগুজব পড়াশুনো চলে, চলে না বিনা বচনে আলাপ। তাদের কেউ কেউ তাকে তাদের প্রেমের উপাখ্যান শুনিয়েছে, কিন্তু সেসব উপাখ্যানে রসের উপাদান নেই, সরমের উপাদান নেই। যেমন কনভেনশনাল প্রেম তেমনি কনভেনশনাল পরিণতি। ওরা যতটা গম্ভীরভাবে শোনায় উজ্জয়িনী ততটা গম্ভীরভাবে শোনে না।

তার সখীর অভাব পূরণ করা পুরুষের অসাধ্য। তবু পুরুষও তো মানুষ। এমন একজন মানুষ আছে যে তার গোপন কথাটি আপনি জেনে নিয়েছে, জানাবার লজ্জা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, জেনে উচ্চবাচ্য করেনি, চেপে গেছে—সখী না হলেও সখীর মতো নয় কি? যে মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে সে মানুষ অমূল্য। আর শুধু কি বিশ্বাস-ভাগী? দরদী, ব্যথার ব্যথী। অন্য দশজনের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, সে সামাজিকতার ঊর্ধ্বে। সে সুধীর মতো স্বতন্ত্র পর্যায়ভুক্ত। যদিও সমকক্ষ নয় সুধীর।

দে সরকার অবশ্য জানত না উজ্জয়িনীর সেই গোপন কথাটি কী কথা। অথচ উজ্জয়িনীর ধারণা ছিল দে সরকার জানে। আর উজ্জয়িনীর যে অমন ধারণা আছে তা দে সরকার জানত। তার সেই জ্ঞানই তার হাতের রং। ঐ রংয়ের জোরে তার সুধীর সঙ্গে খেলবার স্পর্ধা। একদিন হয়তো সে সত্যিই সমস্ত শুনবে। তখন তার প্রতিপত্তি হবে অসীম। সুধী তাকে খেলায় হারাতে বেগ পাবে তখন। আর ইতিমধ্যে সে সুধীকে নাকাল করবে।

"চক্রবর্তী," দে সরকার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "শুনেছ?"

"কী খবর?"

"জান না?" সে খানিক ঔৎসুক্য জাগিয়ে বলল, "বাদল আশ্রম ত্যাগ করেছে।"

"তাই নাকি?" প্রশ্ন করল উজ্জয়িনী। তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও হর্ষ। "সত্যি?"

"আশ্রমে নেই তা সত্যি। কিন্তু কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারছে না।"

আবার নিরুদ্দেশ। সুধী চিন্তিত হল। বাদলের সঙ্গে নিকটে সাক্ষাৎ হবে, অনেক কথাবার্তা আছে, এই আশায় ছেদ পড়ল।

"মিস স্ট্যানহোপ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন," দে সরকার বলল, "চক্রবর্তী জানেন কি না।"

সুধী ম্লান হেসে বলল, "না, চক্রবর্তী কী করে জানবেন?"

উজ্জয়িনী বলল, "তা হলে তাঁর খোঁজ পাবার কী উপায়, সুধীদা?"

দে সরকার রঙ্গ করল, "ধ্যান।"

কিন্তু তার রসিকতায় কেউ হাসল না। সে নিজেও না।

"কোনো চিঠিপত্র রেখে যায়নি?" জানতে চাইল সুধী।

"রাশি রাশি। কিন্তু ওসব তাকে লেখা চিঠি। তার লেখা নয়।"

"তা হলে—" শেষ করতে পারল না উজ্জয়িনী।

"না, পুলিশে এত্তেলা দেবার প্রশ্ন ওঠে না। বাদল কারুর কোনো ক্ষতি করেনি। আশ্রমের জিনিস আশ্রমেই রেখে গেছে, আর তার নিজের বলতে বিশেষ কিছু ছিলও না।"

বাদল নিজে সংবাদ না দিলে যে তার সংবাদ পাবার আশা নেই তা বুঝতে পেরে-ছিল সুধী। আগে একবার নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিল আপনার অস্তিত্ব। উজ্জয়িনী ওসব শোনেনি। বলল, "এ তো ভীষণ ভাবনার কথা। একজন গেল কোথায় কেউ বলতে পারছে না। সঙ্গে জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। সুধীদা, তোমার কী মনে হয়। গুণ্ডা কি গ্যাংস্টার গায়েব করেনি তো?"

তার কাঁদো কাঁদো ভাব দেখে দে সরকার গম্ভীর মুখে বলল "না। তেমন ঘটনা এ দেশে ঘটে না। অন্তত ঘটলে কাগজে বেরোত। এর মধ্যে একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে, ভালো ডিটেকটিভের উপর ভার দিলে সেই ক্লু থেকে সব প্রকাশ পাবে। চক্রবর্তী, তুমিও তো ঝানু ডিটেকটিভ, তুমিই কেন এ ভার নাও না?"

সুধী ও উজ্জয়িনী দুজনেই উৎকণ্ঠিত, দুজনেই জিজ্ঞাসু। দে সরকার রহস্যময় স্বরে বলল, "আরেকজনকেও আশ্রমে দেখলুম না, শুনলুম তিনিও চলে গেছেন। মনে আছে? সেই চশমাচোখো মেয়েটি? কী যেন তাঁর নাম—মার্গারেট না মার্জরী?"

উজ্জয়িনীর মুখে যেন কে কালি মাখিয়ে দিল। সুধীও স্তম্ভিত।

গ্রন্থিচ্ছেদন

১

আশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে বাদল যেন তার ব্যক্তিসত্তা ফিরে পেয়েছিল। প্রথম কয়দিন সেই উল্লাসে কাটল। উল্লাসের ক্লোরোফর্ম তাকে বুঝতে দেয়নি যে তার মনের ভিতরে কী একটা অস্ত্রোপচার ঘটেছে, কয়েকটি গ্রন্থি একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

আত্মীয়স্বজনের মমতা কাটিয়ে বিদেশে গিয়ে বসতি করা বরং সহজ, কিন্তু মন তার চারদিকে যেসব ডালপালা মেলেছে, যে মাটিতে শিকড় গেড়েছে, যে আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়েছে সেই সকলের সংস্রব ছেদ করে মনটাকে উচ্ছেদ করা অপার বেদনাময়। যেসব বিশ্বাস, যেসব চিন্তা, যেসব উপলব্ধি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো আপন তাদের বর্জন করা অঙ্গচ্ছেদের দোসর। এক আইডিওলজি থেকে অপর আইডিওলজিতে প্রয়াণ মনের পক্ষে যেন অস্ত্রোপচার। দুচার দিন তার সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকা যায়, কিন্তু ক্রমেই ব্যথাবোধ অঙ্কুরিত হয়, সমস্ত চেতনা ছেয়ে যায় তার শাখাপ্রশাখায়।

স্টেলার ওখানে দিন দুই কাটতে না কাটতে বাদল মুষড়ে পড়ল।

"বাদল।"

"কী, স্টেলা?"

"তোমার কি ভালো লাগছে না এখানে?"

"খুব ভালো লাগছে। তার জন্যে তোমাকে রাশি রাশি ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি কী

করে বুঝবে, স্টেলা, আমার যেন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"ও কী, বাদল। ও কী!" বাদলের মুখে ও কী উক্তি। যে বাদল কত লোককে আলো দিয়েছে, বল দিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে বাঁচতে, সেই কিনা মরণকামী।

"সেদিন আমি ভারি হালকা বোধ করছিলুম, স্টেলা। আজ মালুম হচ্ছে একখানা পা কাটা গেলে যেমন হালকা ঠেকে এও যেন তেমনি। জানি আমাকে সামলে উঠতে হবে। তবু কী কষ্ট! সত্যি সত্যি পা কেটে নিলেও বোধ হয় এত কষ্ট হত না।"

লীথ হিলে স্টেলাদের কটেজ। সেখানে থেকে 'সারে' জেলার উপত্যকা ছবির মতো দেখতে। স্টেলার মা চিররুগণা, দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকেন, তাঁর সাড়াশব্দ শোনা যায় না। বাপ চটপটে ছটফটে জলি ভদ্রলোক, দেখলে মনে হয় না যে বাহাত্তুরে কি ছিয়াত্তুরে, বরং বলা যেতে পারে পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত। কিন্তু পরিচয় বাসি হলে টের পাওয়া যায় তিনি একজন নিরীহ পাগল। এই জঙ্গমটি আর ওই স্থাবরটি স্টেলার জীবনযৌবন নিঃশেষ করেছেন, সে বেচারি একদিনও ছুটি পায়নি। মেয়ের বয়স হল প্রায় চল্লিশ। যার সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল সে যুদ্ধে প্রাণ হারায়। তখন থেকে স্টেলার গৃহকাজ ছাড়া অন্য কাজ নেই, সেবা ব্যতীত অন্য ব্যসন নেই। কী করে যে সময় কেটে যায়, বয়স চুরি যায়, সে জানতে পায়ও না, চায়ও না। জীবনের কাছে তার নতুন কোনো প্রত্যাশা নেই, সে বেশ নির্ভাবনায় আছে।

অনেকটা প্রাচ্যদেশীয় চেহারা। কালো কালো চুল, সেকেলে ছাদের খোঁপা। পোশাকও তেমনি সেকেলে ও মামুলি। গোড়ালি অবধি ঝুল। আসল ব্যাপার স্টেলা তার সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের পর আর বাড়েনি, যুদ্ধের খবর পেয়ে তার বয়স যেন থেমে গেছে, তার রীতি ও রুচি তৎকালীন। সাতাশ আটাশ বছর বয়সের তরুণী বলেই তাকে ভুল হয়। বাদলের ঠিক সমবয়সী না হলেও নেহাৎ অসমবয়সী নয় দৃশ্যত:

তার জীবন যে ব্যর্থ নয়, অর্থহীন নয়, বাদলের কাছে এই আশ্বাস না পেয়ে বাদলকে তার দেখবার সাধ হয়েছিল। বাদলের খ্যাতি কোনো এক অজ্ঞাত সূত্রে লীথ হিলের এই কটেজেও পৌঁছেছিল। সাধু সুন্দর সিংহের পর হিন্দু ক্রিশ্চান মিস্টিক যদি কেউ থাকে তবে সে সাধু বাদল সেন। অথচ সেই বাদল কিনা বলে তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। ও যে সাধারণ মানুষের মতো কথা। স্টেলা বিস্মিত হয়ে ভাবে নিশ্চয় এর অন্য তাৎপর্য আছে। যীশুও তো বলেছিলেন, পিতঃ, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ। স্টেলা বাদলকে নড়তে দেয় না, বাদলেরও নড়বারও সামর্থ্য নেই। সে বসবার ঘরে অর্ধশয়ান হয়ে কয়লার আগুন পোহায়, সকাল থেকে সন্ধ্যা। সেইখানেই তার খাবার দিয়ে যায় স্টেলা। তখন বাদল বলে, "স্টেলা, তুমি আমার গুড সামারিটান।"

খেতে যে বাদলের হাত ওঠে তা নয়, তবু একটু উৎসাহের সঙ্গে খায়। "শুনবে, স্টেলা? কত কাল আমি পেট ভরে খাইনি। অসংখ্য লোক বেকার ও বুভুক্ষু। তারা অভুক্ত থাকতে আমি খেতুম কোন অধিকারে? তারপর কম্বল গায়ে দিইনি, কোনো মতে ওভারকোট চাপিয়ে রাত কাটিয়েছি। বাস-এর পেনি বাঁচাতে মাইলের পর মাইল হেঁটে পায়ে ব্যথা ধরিয়েছি। আর দেখ তোমার এখানে কেমন আরাম করে আগুন পোহাচ্ছি ও কয়লা পোড়াচ্ছি। অথচ কয়লাকে আমি সোনারূপোর চেয়ে মূল্যবান মনে করে অন্যের জন্যে তুলে রেখেছি, যখন দশ জন জুটেছে তখনি আগুন জ্বালিয়েছি। আমার একার জন্যে এতটা আগুনের বাজে খরচ আজও আমার প্রাণে সইত না, স্টেলা, যদি না ইতিমধ্যে আমি চ্যারিটির উপর আস্থা হারাতুম।"

"বুঝলে না?" আবার বলে বাদল। "তুমি আমি যদি কয়লা বাঁচাই তা হলে তোমার আমার বিবেক এই ভেবে নিরস্ত হয় যে আমরা তো আমাদের যথাসাধ্য করেছি আমরা তো যেটুকু না করলে নয় তার অধিক খরচ করিনি, আমরা তো গরীবের চেয়েও গরীবভাবে চলছি। কিন্তু তাতে ফল কী হল? আমাদের দাক্ষিণ্যে জন দুই চার দীন দুঃখীর সাময়িক দুর্গতি ঘুচল। এই তো? অথচ ওদিকে দেখ কয়লার চাহিদা কম বলে খনি বন্ধ হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ধর, আমরা যদি বেপরোয়া হয়ে খরচ করতুম তা হলে কি চাহিদার বাড়তি ও বেকারের কমতি হত না?"

স্টেলা কোনো দিন ভেবেচিন্তে কয়লা বাঁচায়নি, জোর করে আধপেটা খায়নি, তাই বাদলের কাণ্ড শুনে তার তাক লাগে। বাদলের প্রশ্ন শুনেও তার ধাঁধা লাগে।

"চ্যারিটির উপর আমি আস্থা হারিয়েছি, স্টেলা। তাই আজ খুশি হয়ে কত খাচ্ছি দেখছ তো।" যাই বলুক বাদল, খুশি হয়ে নয়।

"তুমি আরো খেলে আমি আরও খুশি হব, বাদল।"

"আমিও আরো খুশি হতুম এই বিশ্বাসে যে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে ও চাষীর ঘরে টাকা পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমার সন্দেহ মিটছে না। চাষীর পাওনা মাঝখান থেকে দালালের পকেটে ঢুকছে, সেখান থেকে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের আমানত হয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে কোম্পানীর শেয়ারে, কোম্পানী তা দিয়ে কুলী খাটিয়ে নিচ্ছে, খাটুনির অনুপাতে মজুরি দিচ্ছে কম। লাভ ছাড়া আর কোনো কথাই ভাবছে না ওরা কেউ। কোটি কোটি টাকার কারবার, কোটি কোটি মানুষ লিপ্ত, কিন্তু একটি মাত্র প্রেরণা—লাভ করতেই হবে। যাতে দুপয়সা বেশী আসে—তা সে গোলাবারুদের ব্যবসা হোক বা ক্রীতদাসের ব্যবসা হোক—তারই পানে শকুনির দৃষ্টি। ওদের দোষ কী? তুমি আমি যখন ব্যাঙ্কে টাকা জমাই তখন যে ব্যাঙ্কে বেশী সুদ পাব সেই ব্যাঙ্কে জমাই। ওরাও খাটায় সেই কোম্পানীতে যে কোম্পানী বেশী ডিভিডেণ্ড দেয়। আর দেবে কোথেকে কোম্পানী যদি

শ্রমিকের পাওনা থেকে না কাটে ? ও গাধাগুলো এত অসহায় যে যাই পায় তাই পাবার জন্যে ভিড় বাধায়, ওদেরও অন্য গতি নেই। বেকার হবে যে। ওদের অভাবের সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর লাভ, ব্যাঙ্কের লাভ, তোমার লাভ, আমার লাভ। আর এই লাভের ব্যবসা বজায় রেখে তোমার দান, আমার দক্ষিণা। না, স্টেলা, তোমাকে লক্ষ্য করে বলছিনে। বলছি এই যে দোহন অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের কিনা দুধ খেতে দ্বিধা। পুডিং খেতে বিবেকের বাধা। ভোগে অপ্রবৃত্তি। ত্যাগে উন্মাদনা। দাও, পুডিংটুকু দাও, শেষ করি। আর ত্যাগ নয়, ওসব বিবেকের সঙ্গে লুকোচুরি, ভণ্ডামি, জোচ্চুরি। আমি নির্বিবেক ভোগ করব, একশোবার ভোগ করব, যতদিন দোহন চলবে ততদিন দোহনের যা ন্যায়শাস্ত্রসম্মত পরিণাম তাও চলবে, দোহনের পরিণাম ভোগ। কিন্তু", বাদল যেন কতকটা আপন মনে জেরা করে, "দোহনই বা চলবে কেন ? কেন চলবে ? কেন চলবে, স্টেলা ?"

স্টেলা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। আনতে গেছে কফি। বাদল অবসাদে এলিয়ে পড়ে।

২

প্রহসন মন্দ নয়। দোহনের সময় বাছুরকে বঞ্চিত করে ভোজনের সময় সে বেচারার জন্যে অশ্রুমোচন।

যার দুধ তাকে রাখতে দিলে তো মামলা মেটে। দুধ বাছুরের জন্যে অভিপ্রেত, তোমার আমার জন্যে নয়। আমরা কেনই বা দোহন করি, কেনই বা দান করি।

ন্যায়ের উপর যদি সমাজের প্রতিষ্ঠা হত তবে যে যার শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক পেত, ডিভিডেণ্ড বলে কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না। যদি থাকত তবে তা সকলের জন্যে ব্যয়িত হত, সকলে তার অবিভক্ত অংশ ভোগ করত।

খেটে রোজগার করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, ধনীরও। কিন্তু যারা নিজেরা খাটে না তাদের টাকা খাটে বলেই তারা সিংহের ভাগ পাবে এ যে অতি বড় অন্যায়। এর চেয়ে বড় অন্যায় আজকের জগতে নেই। অন্য সব অন্যায় এরই আনুষঙ্গিক। ছোট ছোট অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করে ফল কী, যদি রক্তবীজ স্বয়ং বাঁচে ও বীজ ছড়ায়। রক্তবীজের ধ্বংস না হলে অন্যায়ের বিরতি হবে না। টাকার খাটুনি বন্ধ করে মানুষের খাটুনির মূল্য বাড়াতে হবে।

বাছুরের মুখে বাঁট দাও, বাছুর পেট ভরে পান করুক। তুমিও ওর সঙ্গে মিশে যাও, খাটো আর খাও। আগে শ্রমিক হও, পরে যদি শখ হয় তবে দেবতা হতে পার। পরের লভ্য দুগ্ধ তোমার ভাণ্ডে দোহন করে তুমি হয়তো ডিভাইন হবে, তাতে পরের কী ! তোমাকে দর্শন করে কি তার সাংসারিক অভাব মিটবে ! আর সাংসারিক অভাব

জিনিসটা যদি এতই তুচ্ছ মনে কর তবে তুমিই বা কেন দুধের অভাবে তুষ্ট থাক না ? এমন কেন হয় যে সাধুসন্তের আশ্রম আস্তানা কুলীদের বস্তির তুলনায় সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ? একবার ধর্মের ভেক পরে বেরিয়ে পড়তে পারলে দুধের ইজারাদারদের দৌলতে দুধের অভাব বোধ করতে হয় না। যত অভাব বেচারা মজুরের। বাঁট থেকে তার যা পাওনা তা সে পায় না, ভাঁড় থেকে দয়াল গয়লা যদি ছিঁটেফোঁটা দান করে তবে সেটুকু মুষ্টিভিক্ষায় তার আধ্যাত্মিক পুষ্টিলাভ হয় না।

বাদল উল্টো দিক থেকে ভাবতে চেষ্টা করে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারত যে বাছুর যেটুকু পাচ্ছে সেটুকুও পেত না। প্রচুর ঘাস না খেলে গাই রোগা হয়ে যায়, তার বাঁটে দুধ থাকে না। সেই ঘাস যে জোগায় দুধের উপর তারও দাবী আছে। আর তারই তো প্রধান দাবী। অন্যায়টা কোথায় ?

পুঁজি হচ্ছে এক্ষেত্রে ঘাস। পুঁজি না খাটলে ব্যবসা জমে না। যে দেশে মূলধন নেই সে দেশে ব্যবসার উন্নতি নেই। আমেরিকা ও ইংলণ্ড যা হয়েছে তা মূলধনের সৌজন্যে। ভারত পেছিয়ে রয়েছে কেননা তার মূলধন যথেষ্ট নয়। যা আছে তাও কৃপণ। ফলে তার বেশীর ভাগ লোক চাষ করে, চাষে পুঁজি লাগে যৎসামান্য। আমেরিকার মতো পুঁজি খাটলে ভারতের চেহারা বদলে যেত, কারখানার শ্রমিকদের মজুরি তো বাড়তই, চাষার ফসলের চাহিদা বাড়ায় তারও রোজগার বাড়ত।

মূলধনের আবশ্যক যদি থাকে তবে মুনাফারও বন্দোবস্ত থাকবে। নইলে মূলধন মাটির ভিতর পোঁতা রইবে, বাইরে বেরোবে না। মুনাফার বন্দোবস্ত রাখলে শ্রমিকের ভাগে কম পড়বেই। তা নিয়ে শ্রমিক যদি চেঁচামেচি করে তবে কলকারখানা তুলে দিতে হয়, চরকা কাটাই নিরাপদ। তাতে পরনের কাপড় হয়, পেটের খোরাক হয় না। সবাই চরকা কাটলে কে কার কাছে বেচবে, কে কার কাছে কিনবে ? খালি পেটে খদ্দর জড়িয়ে মাসের মধ্যে একুশ দিন উপোস করবে সবাই। আর বাকী নয় দিন চাষের ফসল খেয়ে প্রাণে বাঁচবে। একবার অনাবৃষ্টি কি অতিবৃষ্টি হলে সবাই্কবে পটল তুলবে।

এ সব তর্ক যে বাদলের মনে এই প্রথম উদয় হল তা নয়। বরং এর বিপরীতটাই এর তুলনায় নতুন। চিরদিন সে লিবারল মতবাদী। দুনিয়ায় লাভলোকসান থাকবে, অবাধ বাণিজ্য থাকবে, প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ থাকবে। যার পুঁজি আছে সে কারবারে খাটাবে, যার গরজ আছে সে গতর খাটাবে, এক জায়গায় মজুরিতে না পোষায় আরেক জায়গায় আরো বেশী মজুরির চেষ্টা করবে, বেকার হলে ডোল পাবে। মুনাফার টাকা নিয়ে কেউ সিন্দুকে তালাবন্ধ করছে না, ওটাকা আবার খাটছে, ওর দ্বারা নতুন কারবার পত্তন হচ্ছে, আরো শ্রমিক কাজ পাচ্ছে। লিবারল মতবাদী বাদল ক্যাপিটালিজমের অনুমোদক। এ কি আজ ? এ তার বাল্যকাল থেকে। স্কুলের ছাত্র ছিল যখন তখনো

সে সাময়িক পত্রিকার পোকা ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় সে বহাল তবিয়তে মডার্ন রিভিউ পড়ত।

কিন্তু ক্যাপিটালিজম যে পন্থা ধরেছে তা ইদানীং বাদলের মনঃপূত নয়। অবাধ বাণিজ্যের নামগন্ধ নেই, দেশে দেশে প্রোটেকশন, টারিফ, শুল্কের প্রাচীর। বাদল যেদিন ইংলণ্ডে পদার্পণ করল সেইদিনই ডোভারে তার মালপত্র আটক হল, অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে রেহাই পেল তা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা তার বুকে বাজল। অবাধ বাণিজ্য তা হলে কথার কথা। ক্যাপিটালিজমের ওতে আর সুবিধা নেই। এখন অন্য বুলি। ক্যাপিটালিস্ট চায় সংরক্ষণ। তাই যদি হয় ক্যাপিটালের দাবী তবে তার ফলে যে পণ্যের বাজারদর বেড়ে যায় ও যারা কেনে তারা প্রকারান্তরে ক্যাপিটালকে নজরানা দেয়। যে বেচারা মেহনৎ করে মজুরি পায় সে যখন বাজারে এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে যায় তখন যত দাম দিলে ঠিক হত তার বেশী দিতে বাধ্য হয়, ওটা একপ্রকার নজরানা। অবাধ বাণিজ্য চললে ওটা দিতে হত না।

বাদলের লিবারল মতবাদ এমনি করে একটার পর একটা ধাক্কা খায়। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাকে লিবারলদের তাঁবুতে টেনে রেখেছিল, নইলে লিবারলদের ক্যাপিটালনির্ভরতা তার বিশ্রী লাগত। ক্যাপিটালিস্টরা একে একে কনসারভেটিভ দলে ভর্তি হয়েছে। যে দু-চারজন এখনো লিবারল দলে রয়েছে তারা রয়েছে কুলত্যাগের লজ্জায়। শ্যামের প্রতি তাদের মনোভাব ক্রমেই কলঙ্কর হয়ে উঠছে।

টোরীদের উপর বাদলের বিরাগ মজ্জাগত অথচ সোস্যিয়ালিস্টদের সে পরিহার করত। কেননা সমাজতন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তিতন্ত্রের স্বতোবিরুদ্ধ। বাদলের নিঃশ্বাসবায়ু তার ইণ্ডিভিজুয়ালিজম। সোসিয়ালিস্ট হলে তার শ্বাসপ্রশ্বাস রহিত হয়। সোস্যিয়ালিজমের পানে তাকালেই তার চোখে পড়ত ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্বীকৃতি। অমনি তার চোখ বাধা পেয়ে ফিরে আসত। গভীরভাবে প্রবেশ করত না, তলিয়ে দেখত না যে সোসিয়ালিজম মুখ্যতঃ ক্যাপিটালিজমের পাল্টা, গৌণতঃ ইণ্ডিভিজুয়ালিজমের। ক্যাপিটালিজমের থেকে ইণ্ডিভিজুয়ালিজম যদি সত্যি কোনোদিন পৃথক হয় তো সোসিয়ালিজমের সঙ্গে তার সম্মুখ সমর বাধবার কথা নয়। কিন্তু ক্যাপিটালিজমের গ্রন্থি ছেদন করতে তার মন প্রস্তুত ছিল না, তাই তেমন প্রশ্ন তার মনে জাগল না। রাজনৈতিক মতবাদ ফেলে সে গেল সোসিয়াল সার্ভিস দিয়ে দুঃখমোচন করতে। সেণ্ট ফ্রান্সিস হল-এ গোয়েনডোলেন স্ট্যানহোপের পরিজনদের একজন হল।

আশ্রমের সাধনায় তার আর কিছু না হোক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গোঁড়ামি কেটেছিল। এখনো সে ব্যক্তিত্ববাদী, কিন্তু এখন আর সে একরোখা নয়। সোসিয়ালিজমের দিকে তাকালে সে এখন ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্বীকৃতি দেখেও দেখে না, যা দেখে তা

ক্যাপিটালিজমের উত্তরমীমাংসা। সোসিয়াল জাসটিস তাকে সোসিয়ালিজমের প্রতি আকর্ষণ করে। সোসিয়াল সার্ভিসে সে সন্তোষ পায় না। মনে হয় ক্যাপিটালিজমকে সহনীয় করবার জন্যেই সোসিয়াল সার্ভিসের উদ্‌ভাবন। ক্যাপিটালিজমের নাস্তিত্বে ওর নাস্তিত্ব, ওর স্বকীয় অস্তিত্ব নেই। ওর দ্বারা যা হবে তা প্রকারান্তরে ক্যাপিটালিজমের দ্বারা। এবং ক্যাপিটালিজমের দ্বারা যা হবার নয় ওর দ্বারাও তা হবে না।

সোসিয়াল সার্ভিস বলে, বাছুরকে তোমার ভাঁড় থেকে যতটুকু পার দাও। সব ধর্ম হতে ত্যাগ ধর্ম সার।

সোসিয়াল জাসটিস বলে, ভাঁড় থেকে দিতে হবে না, বাঁট ছেড়ে দাও। তেমন ত্যাগ যদি করতে না পার তবে এমন ত্যাগ করে কাজ নেই।

বাদল দুই পক্ষের কথা শোনে। ক্রমে তার মনের গতি সোসিয়াল জাসটিসের অভিমুখী হয়। সব ধর্ম হতে ন্যায়ধর্ম সার। সমাজে যদি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় তবে স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষতি ঘটলেও অধিকাংশের পোষাবে।

৩

শুনে স্টেলা বলল, "ভাই, তুমি আমাকে নিরাশ করলে। সংসারে যে সহস্র অন্যায় আছে তা কে না জানে? প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছে। কিন্তু তোমার মতো উর্ধ্বচারী কি কোনো উচ্চতর ন্যায়ের আভাস পায়নি, যা দিয়ে সব অন্যায়ের যাথার্থ্য হয়? তা যদি না হত, বাদল, এজগৎ এত লক্ষ লক্ষ বছর চলত কী করে? না, বাদল, সব অন্যায়ের পিছনে ন্যায়ের হস্ত রয়েছে, এই মুহূর্তে রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে রয়েছে।"

বাদল বলল, "জানি। এখনো অতটা নাস্তিক হইনি। ভগবান হয়তো নেই, কিন্তু মোটের উপর ন্যায় নিশ্চয় রয়েছে। কিন্তু, স্টেলা, আমি চাই শুধু মোটের উপর নয়, খুঁটিনাটিতেও ন্যায়ের পরিস্ফুট চিহ্ন। কেবল উচ্চতর ন্যায়ে আমি তৃপ্ত নই, স্টেলা। নিম্নতর ন্যায় কেন সম্ভব হবে না, পার তুমি আমাকে বলতে? কেন হবে না, কেন হবে না, কেন হবে না?"

ঐকান্তিকতায় বাদলের স্বর কাঁপে।

"পারিনে। কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে কোনো অন্যায়ই চরম নয়। কোথাও না কোথাও তার আপীল আছে, এ পারে না হয় ও পারে। এই দৃশ্যমান জগৎ কি সমগ্র জগৎ?"

"আমি চাই অন্যায় যাতে আদৌ না হয়। আপীলের যাতে আবশ্যক না হয়। অন্যায়ের প্রতিকার হয়তো আছে, আমি চাই প্রতিরোধ। কেন তা সম্ভব নয়?"

"বাদল, এর উত্তর যে দিতে পারত সে তুমি স্বয়ং। এখনো পার। কেন তবে আমাকে পরীক্ষা করছ?"

"না, স্টেলা।" বাদল বলল বিচলিত হয়ে, "আমি নিজেই জিজ্ঞাসু। যাকে তুমি আশ্রমে চিঠি লিখতে সে বাদল আর নেই। আমি দেখলুম সংসারজালা থেকে মুক্তি দিতে রিলিজন হচ্ছে অমোঘ। কিন্তু আমি তো সংসারক্লেশ থেকে মুক্তি চাইনি। আমি চেয়েছি সংসার হোক ক্লেশহীন। আমি তো মর্ত থেকে পরিত্রাণ চাইনি। আমি চেয়েছি মর্ত হোক স্বর্গ। আমি তো ইহলোক থেকে পরলোকে পার হতে চাইনি। আমি চেয়েছি ওপারের সুখকে এপারে আনতে। রিলিজন তা হলে আমার কোন কাজে লাগত?"

"রিলিজন কি কাজে লাগবার জিনিস যে তোমার কাজে লাগত, বাদল? ও হচ্ছে পরম উপভোগ, যেমন প্রিয়জনের প্রীতি।"

"সেই তো আমার বক্তব্য, স্টেলা। রিলিজন কি কোনো কাজে লাগত আমার, কাজ যদি হয় স্বর্গরচন?"

"কিন্তু রিলিজনকে ভিত্তি না করে কি স্বর্গও সম্ভব?"

"ওপারের স্বর্গ হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এপারের স্বর্গ সম্ভব। আমার ভবন ঐহিক, তাই ভিত্তিও ঐহিক। সে ভিত্তি সহযোগিতা। প্রতিযোগিতা যদি যায়, সহযোগিতা যদি আসে, দোহন যদি যায়, বণ্টন যদি আসে, লাভের প্রেরণা যদি যায়, ন্যায়ের প্রেরণা যদি আসে তবে রিলিজন থাকতেও পারে তাদের জন্যে যারা পার্থিব সুখে সুখী নয়, যারা চায় অপার্থিব সুখ। কিন্তু যারা পার্থিব সুখ পেলে বর্তে যায়, যাদের তাও জোটে না, রিলিজন তাদের প্রতি নিষ্ঠুর বঞ্চনা, রিলিজন তাদের অন্নের পরিবর্তে আফিম।"

বলতে বলতে বাদল উত্তেজিত হয়ে উঠল। পায়চারি করতে করতে আবার বলল, "আমার অন্য রিলিজন নেই, আমার রিলিজন সোসিয়াল জাসটিস। না, আমার রিলিজন সোসিয়াল তথা ইণ্ডিভিজুয়াল জাসটিস।"

বলে তার উত্তেজনার উপশম হল। যেন এতদিন যা তার মনে আঁকুপাঁকু করছিল তা ঐ একটি বাক্যে পূর্ণতা পেল।

সোসিয়াল তথা ইণ্ডিভিজুয়াল জাসটিস। মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করে বাদল পরিতৃপ্ত হল। এক এক যুগের এক একটি বীজমন্ত্র থাকে। পূর্ব যুগের ছিল লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রেটার্নিটি। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। বর্তমান যুগের হচ্ছে সোসিয়াল য়্যাণ্ড ইণ্ডিভিজুয়াল জাসটিস। শ্রেণীর প্রতি ও ব্যক্তির প্রতি ন্যায়।

"রিলিজনকে ভিত্তি করার কথা তুলছিলে? বেশ, এই রিলিজন ভিত্তি হোক

আমাদের ঐহিক স্বর্গের। তোমার আপত্তি আছে একে রিলিজন বলে স্বীকার করতে? কেন? এ কি তার চাইতেও নিঃস্বার্থ ও নিরাসক্ত নয়? আমি যে ন্যায় চাই তা ন্যায়ের জন্যে ন্যায়, উপরন্তু তাতেই স্বর্গসুখ।"

"না, বাদল, না।" স্টেলা সায় দিল না। "রিলিজন হচ্ছে প্রেমের মতো এক প্রগাঢ় অনুভূতি। এক পরম অভিজ্ঞতা। তাকে জড়িয়ে থাকতে পারে অনেক তত্ত্ব, অনেক সন্ধান। কিন্তু মূলতঃ সেটা একটা স্পিরিচুয়াল য়্যাডভেঞ্চার। আর তুমি যার কথা বলছ ওকে আমি ছোট করতে চাইনে, কিন্তু ওটা অন্য জিনিস। অন্য দরের নয়, অন্য স্তরের।"

বাদল বলল, "আমি স্পিরিচুয়াল য়্যাডভেঞ্চার ছেড়ে চলে এসেছি, স্টেলা। আর ফিরব না।"

"তাই নাকি?" স্টেলা অবাক হল। "আশ্রম থেকে তুমি বিদায় নিয়েছ?"

"হাঁ, স্টেলা। আমি বিদায় নিয়েছি।"

"দুঃখিত হলুম।"

"দুঃখিত কেন?" বাদল জেরা করল। "অন্য স্তরে যদি সেই দরের জিনিস পাই তবে কি সেটা দুঃখের বিষয়?"

"জানিনে। বোধ হয় এইজন্যে দুঃখ যে তুমি আমাদের সঙ্গে রইলে না, দূরে সরলে।"

"সেই তো আমার নালিশ। তোমাদের সঙ্গে রইলুম না, তার মানে তোমাদের সম্প্রদায়ে রইলুম না। সত্যের চাইতে সম্প্রদায় হয়েছে বড়। সত্য থেকে সরিনি, সম্প্রদায় থেকে সরেছি, কোথায় সুখী হবে, না শুনে দুঃখিত হলে।"

স্টেলা এর উত্তর দিল না। তখন বাদল বলল, "আচ্ছা, তোমাদের আমি জিজ্ঞাসা করি। তোমরা তো চাও স্পিরিচুয়াল য়্যাডভেঞ্চার, আধ্যাত্মিক আত্মপরীক্ষা, অন্তরের অভিমুখীনতা। তবে কেন তোমরা দুঃখমোচনে ব্রতী হও, কেন তোমাদের দৈনন্দিন জীবন হয় বহির্মুখ, কেন সেবা কর? বলতে পার এই অসঙ্গতির অর্থ কী?"

"আমি তো আশ্রম খুলে বসিনি। প্রশ্নটা অপাত্রে পড়ল।"

"গোয়েনকে হাতের কাছে পেলে জিজ্ঞাসা করতুম, কেন এই অদ্ভুত অসঙ্গতি। যারা অন্তর্জগতে বাস করতে চায় তারা বহির্জগতের সেবা করবে কী করে? দুটোর একটা বেছে নিতে পারে না কেন? ভগবানকে ধ্যান করা ও পীড়িতের শুশ্রূষা করা দুই স্তরের ব্যাপার কি না বল।"

স্টেলার জীবনেরও সঙ্কট এটা! রোগীকে সময় মতো নাওয়ানো খাওয়ানো, রোগীর গায়ের তাপ নেওয়া তাপ কমানো তাপ বাড়ানো, ঘর সাফ রাখা, বিছানা পাতা, সাজ বদলানো, এসব অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে ধ্যান করবে ধারণা করবে কখন? বহির্জীবনের অশেষ দাবী চুকিয়ে অন্তর্জীবনে সমাহিত হওয়া প্রতিদিন সম্ভব নয়, দৈবে ঘটে। অথচ

কাজ করতে করতে অভ্যাসও হয়েছে, করবার জন্যে লোকও নেই। মা বাপ যতদিন বাঁচবেন স্টেলাকে ততকাল এই করতে হবে, এ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

"মানুষের সেবাই তো ভগবানের সেবা।" স্টেলা মুখ ফুটে বলল।

"কিন্তু মানুষের ধ্যান তো ভগবানের ধ্যান নয়। যারা সত্যি ভগবানের জন্যে পাগল তারা মানুষের সেবায় লাগে না। লড়াইয়ের ঘোড়া কি চাষের লাঙল টানে?" বাদল বলল তর্কের উল্লাসে। জানল না যে স্টেলার বুকে বাজল।

"তবে হাঁ, একটা অর্থ আছে, কিন্তু সেটা উপাদেয় নয়। যারা ভগবানের জন্যে পাগল তারা বেঁচে থাকবার খোরাক পাবে কার কাছে? যার কাছে পাবে তার শর্ত এই যে তাকে প্রকারান্তরে দাম দিতে হবে। সেবা হচ্ছে সেই প্রকারান্তর।"

স্টেলা আরো আঘাত পেল। লক্ষ না করে বাদল বলে চলল, "তাতে অবশ্য পাগলামিটা মাটি। শেষ পর্যন্ত সেবাটাই খাঁটি। কিন্তু যাই বল, স্পিরিচুয়াল য়্যাডভেঞ্চার এ নয়। স্পিরিচুয়াল যে নয়, তা ঠিক। তবে য়্যাডভেঞ্চার হলেও হতে পারে। তার চেয়ে আমার সোসিয়াল য়্যাণ্ড ইণ্ডিভিজুয়াল জাসটিস অনেক বেশী স্পিরিচুয়াল। আমি চাইনে যে এটা হয় একটা য়্যাডভেঞ্চার। না, আমি চাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা।"

সইতে না পেরে স্টেলা বলল, "বাদল, তুমি কি একটা মনস্টার?"

৪

মনস্টার উপাধি পেয়ে বাদলের মন টিকল না। সহসা মনে পড়ল তারাপদ কুণ্ডুকে। কমরেড কুণ্ডু নিশ্চয় দিন গুনছে কমরেড সেনের জন্যে। অন্যায়, অন্যায় তাকে অপেক্ষা করানো।

বাদলের তল্পিতল্পা সামান্য, কয়েক মিনিটের মধ্যে গুছানো সারা। তা দেখে স্টেলা বলল, "তুমি চললে নাকি!"

"একজনকে কথা দিয়েছিলুম, মনে ছিল না, মিস পার্টরিজ।" বাদল বলল অভিমান-ভরে।

রায়বাহাদুর এম সি সেনের একমাত্র সন্তানকে কেউ কোনোদিন বকেনি, তার বাপও তাকে ডরাতেন। লেখাপড়ায় সে এত ভালো যে তার শিক্ষকরা ক্লাসের বাকী সবাইকে উপদেশ দিতেন, বাদলকে দেখ। সেই বাদলকে কিনা বাইশ বছর বয়সে কে একজন স্টেলা বলে মনস্টার।

অভিমানী বাদল অনুরোধ রাখল না, কৈফিয়ৎ কানে তুলল না। ক্ষমাপ্রার্থনা শুনে সবিস্ময়ে বলল, "না, আমি একেবারেই রাগ করিনি। না, আমি আদৌ মন খারাপ করিনি। হা হা। অতি তুচ্ছ ব্যাপার। নাইস লিটল জোক।"

স্টেলা ব্যথিত হয়ে বলল, "বাদল, শোন। যখন যা তুমি প্রমাণ করতে চাও তা প্রমাণ করবেই। যা অপ্রমাণ করতে চাও তা অপ্রমাণ না করে ছাড়বে না। তর্কে তুমি যে পক্ষ নেবে সে পক্ষের জিৎ। কিন্তু তর্কের জয় ও সত্যের জয় এক নয়। তোমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে তার হয়তো জবাব নেই, তা বলে তা সত্য নাও হতে পারে। বাক্য যতই নিখুঁত হোক না কেন তার সত্যতা নির্ভর করে অন্তরের সম্মতির উপর। তোমার অন্তর সম্মতি দেয় কি? যদি না দেয় তবে তুমি যেন অন্তরকেই বিশ্বাস কর, এই আমার উপদেশ। বোবা অন্তর মিথ্যা বলে না, আর যে বাক্য যত মসৃণ সে বাক্য তত অসার।"

"আর তুমি যে মনস্টার বললে তাই বুঝি সার সত্য!" বাদল তর্কের ছল পেয়ে দপ করে জলে উঠল।

"তার জন্যে ঘাট মানছি, ভাই। তুমি মনস্টার নও, তুমি অতিরিক্ত বুদ্ধিমান। সাবধান, ভাই, বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে বিশ্বাস কোরো না। ওতে মৃত্যু।"

বিদায়ের সময় স্টেলা বাদলের দুই গালে দুটি চুমা খেল।

বলল, "তোমাকে যা ভেবেছিলুম তুমি তা নও, তোমার দিব্যজ্ঞান হয়নি। তাতে কী! তুমি নিতান্তই বালক, সমস্ত জীবন তোমার সামনে পড়ে। আমি প্রতীক্ষা করব, বাদল, উৎকণ্ঠ হয়ে প্রতীক্ষা করব। জগতে জ্যোতিঃপ্রদীপ বেশী নেই, যে দুটি একটি আছে তাদের আমরা আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখলে নিশ্চিন্ত হই, নইলে যদি ঝড়ে নিবে যায়! বাদল, তুমি নিজেকে রক্ষা কোরো, তা হলেই জীবনে আমি সুখী হব।"

অভিভূত হয়ে বাদল বলল, "স্টেলা, তুমি কি জীবনে সুখী হওনি?"

স্টেলা হেসে বলল, "ঐ দেখ। বাক্য শুনে বিশ্বাস করলে। ওটা একটা কথার কথা. সকলে অমন বলে। আমি কিসে সুখী হই, জান?"

"কিসে?"

"আমার মনের যা বিশ্বাস তা যদি না নড়ে।"

"কিন্তু স্টেলা," বাদল আশ্চর্য হল, "বিশ্বাস কি এক ঠাঁই স্থির থাকতে পারে! এমন কে আছে যার বিশ্বাস তার নিঃশ্বাসের মতো চলাচল করেনি, কাঁপেনি, হাঁপায়নি?"

"তা হলে দুঃখই মানুষের সাধারণ ভাগ্য। তোমার সোসিয়াল জাসটিস এর কিনারা পাবে না।"

"না, আমার সোসিয়াল জাসটিস এর কিনারা চায় না। আমার পরিকল্পিত স্বর্গেও মানুষ সন্দেহ করবে, পরীক্ষা করবে, প্রমাণ খুঁজবে, সন্তুষ্ট হলে বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস নিয়ে কেউ ভূমিষ্ঠ হবে না, পূর্বপুরুষের কাছে কেউ বিশ্বাসের উত্তরাধিকার পাবে না, গুরুমশায়ের বিশ্বাসকে কেউ নিজের বলে মেনে নেবে না, সম্পাদকের বিশ্বাস কারো

নিজের বলে মনে হবে না। সকলে ভাববে, ভাবনার যে দুঃখ তা সকলের মহা দুঃখ। স্বর্গসুখে অরুচি আসবে সে যদি না থাকে।"

"মাই বয়," স্টেলা বলল হাতে হাত জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাত্রাপথে, "সব অবিশ্বাস কর, সব পরীক্ষা কর, সব জিনিসের প্রমাণ খোঁজ, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস কর, তা হলে তোমার অনেক শক্তি বাঁচবে, অন্তর্দ্বন্দ্বে তোমার শক্তি-ক্ষয় হবে না, দ্বিধায় তুমি দুর্বল বোধ করবে না, তোমার সঞ্চিত শক্তি দিয়ে তুমি সোনার স্বর্গ গড়বে।"

বাদল বলল, "না, স্টেলা, অমন স্বর্গ আমার নয়। ঈশ্বর থাকলে জগতে এত মন্দ কেন? আমি যদি ঈশ্বর হতুম তবে এর জন্যে আমি লজ্জিত হতুম। একটা বনমানুষও এমন জগৎ বানাতে পারে; একজন সর্বশক্তিমান আবশ্যক হয় না। মজা এই যে বন-মানুষও তার বুদ্ধি অনুসারে বিশ্বাস করে এই বিশ্ব একজন মহাবনমানুষের সৃষ্টি।"

"তুমি দেখছি বনমানুষের মন জানো।"

"আমি বিবর্তন মানি। মানুষের সমস্ত যখন বনমানুষ থেকে এসেছে ঈশ্বরবিশ্বাসও নিশ্চয় সেই স্তর থেকে।"

"না, তর্কে তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনে। আর তুমি যেমন জোরে জোরে হাঁটছ চলায় তোমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াও সোজা নয়।"

বাদল তার চলনের বেগ সংবরণ করল। বলল, "আমার পায়ের গতি আমার মনের গতির প্রতীক। তুমি যেমন স্থিতিশীল আমি তেমনি গতিশীল। চলনে আমাদের সন্ধি হোক, কিন্তু চিন্তায় আমি কখনো সন্ধি করিনে।"

পাহাড় থেকে নামতে নামতে স্টেলা বলল, "যেখানেই তুমি থাক আমার শুভকামনা তোমার সঙ্গে থাকবে, বাদল। আর আমার আশা থাকবে এই যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আবার এক দিন। তখন আমি কী দেখব, জান?"

"কী দেখবে, স্টেলা?"

"দেখব তোমার মুখে বিজ্ঞতার ছবি। সাংসারিক বিজ্ঞতার নয়, গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে উত্থিত যে প্রজ্ঞা সেই প্রজ্ঞার প্রভা। পৃথিবীতে স্বর্গ হয়তো নামবে, সুখ হয়তো আসবে, সকলের সব অভাব মিটবে, কিন্তু মনে রেখো, ভাই, প্রজ্ঞা কোনো দিন সুলভ হবে না, সুলভ হবে না মাধুরী। মনে রেখো, বাদল, পার্সোনাল চার্ম হচ্ছে সব চেয়ে দুর্লভ। তুমি হবে আমাদের প্রিন্‌স্ চার্মিং। আমাদের রূপকথার রাজকুমার।"

বাদল হেসে বলল, "অবশ্য আধ্যাত্মিক অর্থে?"

"হাঁ, বাদল। ধরণী তৃষ্ণার্ত। স্বর্গের তরে নয়, সেই সব জ্যোতির্ময় পুরুষ ও লাবণ্যময়ী নারীর তরে যারা প্রজ্ঞার আলোকে ঝলমল, নীরব প্রত্যয়ে নিষ্কম্প। যারা

বহু দুঃখে বিদগ্ধ, বহু শোকে শাণিত, বহু ব্যর্থতায় নিকষিত। যাদের লোভ বা ক্রোধ বা দ্বেষ নেই, নিজের জন্যে উদ্বেগ নেই, ভবিষ্যতের জন্যে ভয় নেই। যাদের ভার অতি লঘু, সাধ অতি অল্প, ক্ষুধা অতি ক্ষীণ, অর্জন ও সঞ্চয় তুচ্ছ। যারা আপনাকে চিনেছে, পরকে কিনেছে, ভালোবেসেছে ও বাসিয়েছে তারাই ধরণীর লবণ। তাদের দর্শন পেলে সার্থক মনে হয় অনায়ক জীবনের অপচয়।"

বাস যেখানে দাঁড়ায় বাদল সেখানে দাঁড়াল। স্টেলার উক্তি তাকে স্পর্শ করেছিল, যেন স্টেলার ওটা ব্যক্তিগত আকিঞ্চন। যেন স্টেলা তাকে সেধে বলছে, বাদল, আমার জন্যে তুমি রাজকুমার হও, রূপকথার রাজকুমার। আমি তোমাকে দেখি, দেখে খুশি হয়ে ভাবি যে আমার জীবন নিরর্থক নয়।

"স্টেলা," বাদল বলল স্নিগ্ধ স্বরে, "তোমার ফরমাস আরো কঠিন। ডিভাইন হওয়া তত কঠিন নয়, তবু তাও আমি ছেড়েছি। কথা হচ্ছে, আমি কী চাই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ না সমষ্টিগত উৎকর্ষ? আমি চাই ব্যক্তির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে সমষ্টির সুখ, সুযোগ, শ্রমের সবটা মূল্য, যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর উৎপাদন, ন্যায়পরতার সাহায্যে উদার বণ্টন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরমায়ু। এক কথায় আবেষ্টনের সুপরিবর্তন। তাতে ব্যক্তিরই সৌভাগ্য, তার আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রকাশের অভূতপূর্ব আয়োজন। আগে তো আবেষ্টন স্বর্গসঙ্কাশ হোক, তারপরে তোমার আমার স্বর্গীয়তা।"

স্টেলা বাদলের হাতে চাপ দিয়ে বলল, "বিদায়। মনে রেখো।" তার দৃষ্টি সজল।

৫

কাউকে ভুলতে বাদলের পাঁচ মিনিটও লাগে না, এক মিনিট যথেষ্ট। বাস চলল, অমনি বাদলের মন চলল। যানের গতি ও মনের গতি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকল। বাদল একবার ফিরে তাকাল না, তাকালে দেখত স্টেলা অনেকক্ষণ ধরে রুমাল নাড়ছে।

বিবর্তনবাদের একটা নতুন অর্থ মিলেছে, তাই নিয়ে বাদল অন্যমনস্ক। এতদিন তার খেয়াল হয়নি, এতদিনে তার চোখ ফুটেছে যে, বিবর্তনের ঝোঁক যদি পড়ে হেরিডিটির উপর তবে তার পরিণাম হয় ক্যাপিটালিস্টদের অনুকূল, কাজেই তেমন ভাষ্যের প্রতি ক্যাপিটালিস্টদের আনুকূল্য বিচিত্র নয়। বড় বড় পণ্ডিতরাও তলে তলে ক্যাপিটালিস্ট, অন্তত সেই বৃক্ষের শাখা। তাঁদের ভাই বেরাদর ক্যাপিটালিস্ট সুতরাং যে ব্যাখ্যা ধনিকদের পোষক সেই ব্যাখ্যাই তাঁরা মনের অজ্ঞাতসারে পোষণ করতে বাধ্য।

হেরিডিটির উপর ঝোঁক পড়লে যা হয় তা এই যে সমাজে মুষ্টিমেয় লোক যোগ্যতম,

যেহেতু মুষ্টিমেয় লোক ভালো খায়, ভালো পরে, ভালো ঘরে থাকে, ভালো ডাক্তার পায়, ভালো লেখাপড়া শেখে, ভালো ছেলের মা বাপ হতে পারে। যোগ্যতমের সঙ্গে যোগ্যতমার সংযোজন থেকে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। বাদবাকী লোক মরুক বা দাস হয়ে বাঁচুক, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রকৃতির নাকি অভিপ্রায় যে অস্তিত্বের সংগ্রামে ছোট একটি দল বাঁচবে ও বাড়বে, অবশিষ্টরা কমবে ও মরবে। প্রাকৃতিক বৈষম্য নাকি মানুষের সমাজেও কাজ করছে, তাই ধনীরা ধনী ও গরিবরা গরিব, সফলরা সফল ও বিফলরা বিফল। কোনো মতে একবার ধনী হতে পারলেই—তা সে চুরি করে বা কুড়িয়ে পেয়ে বা ফাঁকি দিয়েই হোক বা যেমন করেই হোক—তারপর হেরিডিটির নিয়মে ধনীর সন্তান ও ধনী তথা সফল তথা অতিমানব।

প্রাকৃতিক বৈষম্যবাদ যে সামাজিক বৈষম্যবাদের মাসতুতো ভাই তা বাদল এতদিন অনুমান করেনি। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে প্রচলিত বিবর্তনবাদের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য। এ কি কখনো পুরো সত্য হতে পারে? সত্য কি সমাজের সুবিধা মানে?

ঝোঁকটা যদি হেরিডিটির উপর থেকে নেমে আবেষ্টনের উপর চাপে তা হলে কেমন হয়, বাদল ভাবে।

জন্মসূত্রে মানুষ যা পায় তা তো একজোড়া হাত, একজোড়া পা, একজোড়া চোখ, একজোড়া কান, এই সব। এই যে মোটরবাস তার পায়ের কাজ করছে ও বহুগুণ বেশী করছে, এই যে চশমা তার চোখের কাজ সহজ করেছে, এই যে দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র, হাতের হাতিয়ার, পায়ের রেল ষ্টিমার, কানের রেডিও, এসব কি হেরিডিটির দৌলতে? না, বাদল এসব পাচ্ছে তার আবেষ্টন হিসাবে। বাদল যা হয়েছে তার গোড়ায় থাকতে পারে তার জন্মসূত্রে পাওয়া দৈহিক মানসিক গুণ, কিন্তু জন্মক্ষণ থেকে ঘিরে রয়েছে বিচিত্র সভ্যতার অজস্র উপকরণ। সে যা হয়েছে তার অনেকটার জন্যে দায়ী তার পারিবারিক আবহাওয়া, তার স্কুলকলেজের শিক্ষক ও সাথী, তার ডাক্তার কবিরাজ ড্রিল-মাস্টার, দোকান বাজার মেলা, স্টেশন ডাকঘর হোটেল, ব্যাঙ্ক খবরের কাগজ গবর্নমেণ্ট—বলে শেষ করা যায় না কত লোক কত প্রতিষ্ঠান কত ঘটনা কত আকস্মিকতা কত খাদ্য কত ঔষধ কত পোশাক কত কম্বল কত কয়লা দায়ী। বাদল যে বাদল হয়েছে সে তার আবেষ্টনের দাক্ষিণ্যে। গরিবের ছেলে হলে তার বিলেত আসা দূরের কথা শহরে পড়া-শুনাও হতো না, দেশের কোনো এক গ্রামে সে গোরু চরাত কি ঘানি ঘোরাত, ভদ্রলোকের ছেলে বলে বড় জোর পাঠশালা চালাত। বাদল যে বাদল হয়েছে তার গোড়ায় থাকতে পারে তার জন্মলব্ধ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা অন্যরূপ হলে কোথায় পড়ে থাকত সে, কোন কাজে লাগত সে? তার আবেষ্টন তাকে আজকের বাদল করেছে।

এ যেমন তার নিজের কথা তেমনি মানবজাতিরও কথা। আবেষ্টন থেকে আজকের

মানুষের আধুনিক চেহারা। আবেষ্টন উন্নত হলে মানুষ আরো উন্নত হয়। আবেষ্টন অবহেলিত হলে মানুষ অবনত হতে বাধ্য। যে মোটরবাসে চড়েছি, যেটা আমার এই মুহূর্তের আবেষ্টন, তার কল বিগড়ালে আমাদের নামতে হয়। সেটা ওলটালে আমাদের হাত পা আস্ত থাকে না, মাথাও ফাটে, প্রাণও পালায়। আবেষ্টন কি সোজা জিনিস! সমাজও আমাদের আবেষ্টন, রাষ্ট্রও। সমাজের কল বিকল হলে আমাদের চরম ক্ষতি। রাষ্ট্রের চালনা বেঠিক হলে আমাদের অধোগতি। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষ পশুর চেয়ে সুখী। কিন্তু সমাজকে নিয়ন্ত্রিত না করলে সব মানুষ সমান সুখী হবে না, যথেষ্ট সুখী হবে না, অধিকাংশ মানুষ পশুর স্তরেই থাকবে, কতক মানুষ বড়লোকের কুকুরের চেয়েও অসুখী হবে।

বিবর্তনের সোসিয়ালিস্ট ভাষ্য হচ্ছে আবেষ্টনকে নিয়ন্ত্রণ। প্রথমতঃ প্রকৃতিকে, দ্বিতীয়তঃ সমাজকে ও সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রকে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য দু'দশজন ভাগ্যবানের নয়, সব মানুষের সমান উন্নতি, সমান সুখ, সমান ভাগ্য। প্রতিভা অনুসারে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু সুযোগ সকলের সমান। একটা বিশেষ বংশে জন্ম, একটা বিশেষ শ্রেণীর অঙ্গ, এই অজুহাতে কেউ সিংহের হিস্যা দাবী করবে না। বাপ ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়েছেন বা কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন, ছেলে বসে বসে খাচ্ছে ও ছড়াচ্ছে, অপচয় করছে, যে ব্যবস্থায় এমন ব্যাপার সম্ভব হয়, সে ব্যবস্থা রহিত করতে হবে। সে ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত। তাই তার সুযোগ নিচ্ছে বিস্তর অভাজন। যারা ভাজন তারা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে কেউ খোঁজ রাখছে না। বাদলও যেত, যদি না তার বাবা বড়লোক হতেন।

একদা এই পৃথিবীতে প্রাণী ছিল না। যেই পৃথিবী শীতল হল, বায়ুমণ্ডলের উদভব হল, উপযুক্ত আবেষ্টন প্রস্তুত হল, অমনি দেখা দিল প্রাণী। আবেষ্টন অনুকূল নয় বলে অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। তা হলে আবেষ্টন কি সামান্য জিনিস? আবেষ্টন যখন অনুকূল হবে তখন এই পৃথিবীতেই স্বর্গীয় প্রাণী দেখা দেবে। আপাতত আমাদের কাজ হচ্ছে উপযুক্ত আবেষ্টন প্রস্তুত করা। ক্যাপিটালিজম এমন কোনো দায়িত্ব মাথায় নিতে রাজি নয়, সে চায় সদ্য সদ্য লাভ, বছরে বছরে মুনাফা, জনকয়েকের সুবিধা। জনতার জন্যে তার মাথাব্যথা পড়েনি। যার পড়েছে সে সোসিয়ালিজম। আর সোসিয়ালিজম হচ্ছে বিবর্তনের পতাকাবাহী।

ডরকিং স্টেশনে বাদল ট্রেন ধরল।

হাঁ, ক্যাপিটালিজমের দ্বারাও অনেক কাজ হয়েছে, হয়নি বললে অন্যায় হবে। গত দুই শতকের মধ্যে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটানো ওর পরম কীর্তি। কিন্তু ওর কাজ প্রধানতঃ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ, প্রকৃতির উপর মানুষের খোদকারী। প্রকৃতিকে মানুষের ভোগে

লাগানো। এই সব রেল স্টীমার বিদ্যুৎ বাষ্প ক্যাপিটালিজমের সাহায্যে মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। এই সকলের জন্যে আমরা ক্যাপিটালিজমের কাছে কৃতজ্ঞ।

তা বলে ভুলতে পারিনে যে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়নি ও সেই পারিশ্রমিকের বারো আনা বখরা ধনিকের পাতে পড়েছে। যাতে আর এমন না হয় তেমন ব্যবস্থা চাই, তেমন ব্যবস্থা সোসিয়ালিজম। তেমন ব্যবস্থায় শ্রমিক আরো মন দিয়ে, আরো উৎসাহের সঙ্গে, খাটবে। আরো কত কী উদভাবিত হবে। আরো প্রসারিত হবে বর্তমান উদভাবন। লীথ হিল থেকে লণ্ডনে ফিরতে এই যে সময়ের শ্রাদ্ধ এর প্রতিকার হবে। এখন এরোপ্লেন হয়েছে, কিন্তু বাদলের মতো লোকের পাথেয় জোটে না লণ্ডন থেকে লীথ হিলে ওড়বার। তখন পাথেয় জুটবে। সোসিয়ালিজম কেবল রেল স্টীমার এরোপ্লেন বানিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না, যাতে টিকিটের চিন্তা না থাকে তেমন উপায় করবে।

বাদলের তার পেয়ে স্বয়ং তারাপদ এসেছিল নিতে। বাদলের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কেমন আছ, কমরেড? কোথায় ছিলে এতকাল?"

"কেন, আমার কি খুব দেরি হয়েছে, কুণ্ডু?"

"না, দেরি নয়। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। আর দুদিন পরে এলে জায়গা পেতে কি না গ্যারান্টি দেওয়া কঠিন হত।" এই বলে তারাপদ বাদলের সুটকেস তুলল।

"জায়গার টানাটানি কেন?"

"কী করি, বল। আজকাল প্রত্যেকে কমিউনিস্ট, নিদেনপক্ষে সোসিয়ালিস্ট। দেদার আবেদন আসছে। চল দেখবে।"

৬

কী একটা অছিলায় মামার কাছ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড তার করে আনিয়ে ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ষাট পাউণ্ড হাওলাৎ নিয়ে যা করে বসেছে তারাপদ তা এক এলাহী কাণ্ড।

বাড়ী ভাড়া করেছে বিশ জনের মাফিক। মিস্ত্রি ডাকিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করেছে খাস মার্কিন পন্থায়। অর্ডার দিয়ে আসবাব বানিয়েছে কিউবিস্ট রীতির। দেয়াল মুড়ে দিয়েছে যে কাগজ দিয়ে তার নক্‌শা এমন যে আস্ত দেয়ালটাই নাস্তি বলে ভ্রম হয়। বিজলীর বাতি নেপথ্যে আত্মগোপন করছে। প্রস্তাব চলছে সেনট্রাল হীটিংএর।

পাড়াটা সুবিধের নয়। তাতেই তারাপদর সুবিধে। বাইরে থেকে বাড়ীটাও কদাকার দেখতে। তাতেও তারাপদর লাভ। যেসব বড়লোকের ছেলে বা জামাই কমিউনিস্ট বনেছেন তাঁরা চান বস্তিতে বাস করতে। এই ত কেমন বস্তি ও বাসা। আবার বস্তিতে বাস করে চান ওয়েস্ট এণ্ডের স্বস্তি। এই তো কেমন ওয়েস্ট এণ্ডের

স্বস্তি। বাইরে দারিদ্র্যের ভেক, ভিতরে লালসা ভোগ। বাইরে নিঃস্বার্থ বিজ্ঞাপন, ভিতরে সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি। তারাপদ দেশে ফিরলে নেতা হবে ঠিক। বিদেশে নেতৃত্বের তুকতাক শিখছে।

তার যেসকল ইয়ার নাইট ক্লাবে বিচরণ করতেন তাঁদের কেউ কেউ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বাস্তব জগতের পরিচয় নিতে এই লঙ্গরখানায় নোঙর ফেলেছেন। কেউ বা মার্কিন পরিব্রাজক। তারাপদর খপ্পরে পড়েছেন। সে ছিল বহুকাল মার্কিন মুলুকে। আমেরিকান টুরিস্টদের খোঁজখবর রাখে। তা ছাড়া এমন দুচারজন এখানে উঠেছেন যাঁরা অনুশোচক নন, পরিব্রাজক নন, বিদ্বান ও হৃদয়বান। মতবাদের টানে তারাপদর সঙ্গে জুটেছেন, চেনেন না যে তারাপদ কী চীজ। বাদল এদের একজন।

চার্জ তারাপদ সবাইকে সমান করে না, সে হিসাবে সে সাম্যবাদী নয়। বলে, "এখানে ওসব বুর্জোয়া বর্বরতা নেই, আমরা ঘৃণা করি বেনিয়াবৃত্তি। যার যা আছে সে তা দেবে। যার যা নেই সে তা নেবে।"

প্রায়ই কাঙাল ভিখারী ধরে ধরে আনে ও সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। বলে, "এ আমাদের দরিদ্রনারায়ণ সেবা নয়। আমরা সকলে সকলের কমরেড। যার ক্ষুধা পায় সে খায়, যার আশ্রয় দরকার সে পায়। তোমরাও যা আমিও তাই, আমিও যা তোমরাও তাই। বস, কমরেড, খাও।"

বন্ধুরা যদি অনুযোগ করে, "বড় বেশী খরচ হচ্ছে, কুণ্ডু", তারাপদ জবাব দেয়, "ঐ তো তোমাদের স্বভাব। বুর্জোয়ার মতো সঞ্চয় করতে ভালোবাস, পাই পয়সার হিসাব ধর। তা হলে তোমাদের কমিউনিস্ট হয়ে কাজ কী! যাও, স্টক এক্সচেঞ্জে দালালী কর।"

সে স্বয়ং এমন মুক্তহস্ত যে আশ্চর্য হতে হয়, কোথায় পায় এত টাকা। আমেরিকায় সে কিসের ডক্টরেট পেয়েছে সেই জানে, কিন্তু একটি মন্ত্র বেশ শিখেছে। টাকায় টাকা টানে। উড়িয়ে দিলেই উড়ে আসে, টাকা যেন পোষা পায়রা।

ঘটা করে বলে, "দেখ হে। আমি গরিবিয়ানা পছন্দ করি নে। যদি করতুম তবে কমিউনিস্ট হতুম না, কারণ গরিবিয়ানা যদি সহ্য হয় তবে বিপ্লবের আবশ্যক থাকে না। যারা গরিবিয়ানায় অভ্যস্ত তারা কি কোনো দিন বিপ্লব করবে ভেবেছ? তারা দু আনার জায়গায় নয় পয়সা মজুরি পেলেই নিরস্ত। তোমাদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব পরিপুষ্ট যাতে হয় সেইজন্যে আমার এই পুষ্টিকর আয়োজন। খাও, দাও, মজা কর—এ নয় আমার বচন। আমার বচন—খাও, দাও, বিপ্লব কর।"

হপ্তায় হপ্তায় কমিউনিস্ট ধুরন্ধরদের নিমন্ত্রণ করা হয়। কেউ রাশিয়া থেকে ফিরেছেন, কেউ খোদ রাশিয়ান, কেউ রাশিয়া না গিয়ে রাশিয়াফেরৎ। এঁরা এলে বক্তৃতার ব্যবস্থা

হয়। যারা শুনতে আসে তাদের কাছে চাঁদার বাক্স নিয়ে ঘোরে তারাপদর কোনো মহিলা কমরেড। তাতেও কিছু মেলে। কিছু না মিলুক তারাপদর দল বাড়ে। অভ্যাগত-দের সে তার জীবনযাত্রায় দীক্ষিত করে। আজকাল যেমন দোকানদাররা কোনো জিনিস গছিয়ে দিয়ে বলে, "দাম দিতে হবে না। পরখ করুন কিছুদিন। পছন্দ না হয় ফিরিয়ে দেবেন।" তেমনি তারাপদর মুখে শোনা যায়, "খরচ লাগবে না। যতদিন খুশি থাকতে পারেন। ভালো না লাগে চলে যাবেন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কমরেড।"

নামকরণ হয়েছে, অল কমরেডস ফ্রী য়্যাসোসিয়েশন। সংক্ষেপে A C F A—চারটি শব্দের আদ্য অক্ষর জুড়লে যা দাঁড়ায় তার উচ্চারণ আক্‌ফা। সকলে সেই ছোট নামটি ব্যবহার করে।

আক্‌ফার নীচের তলার একখানা কামরায় তারাপদর আপিস। সেখানে ঢুকলে দেখতে পাওয়া যায় তারাপদ একটা সেক্রেটারিয়াট চেয়ারে বসে ঘুরপাক খাচ্ছে। একে ফোন করছে, তাকে চিঠি লিখছে, এর চেক নিচ্ছে, তাকে চেক দিচ্ছে। হাতে কাজ না থাকলে কাজ তৈরি করছে, তার মানে টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে লিখে রাখছে পাড়ার প্রভাবশালী লোকদের নাম। বরো কাউনসিলের নির্বাচনে তারাপদ দাঁড়াবে, তখন ভোটের জন্যে দ্বারে দ্বারে ধর্না দিতে হবে, তাই দ্বারিকানাথদের নাম জানা দরকার। কমিউনিস্ট হলে কী হয়, ভোটের বেলায় ভিন্ন সাজ পরতে আপত্তি নেই। তখন কমিউনিস্ট বন্ধুদের এই সমঝানো যাবে যে ছলে ও কৌশলে একবার ক্যাপিট্যালিস্টদের দুর্গে ঢুকতে পারলে হয়, তারপর নিজ মূর্তি ধারণ করতে বাধা নেই।

বাদলের তার পেয়ে তারাপদ স্বয়ং চলল তাকে আনতে। তারাপদর কাছে বাদলের মূল্য সে মিসেস গুপ্তর জামাই। তার বাবাও একজন জেলা হাকিম সেকথাও তারাপদ শুনেছে। বাদলকে ঝাড়লেই টাকা ঝরবে। তা ছাড়া বাদল বিদ্বান লোক। অমন দুটি একটি শিষ্য না থাকলে তারাপদকে মানবে কে? ল্যাঙ্গোট পরা বাবাজীদেরও আজকাল পদসেবাকারী পি-আর-এস প্রয়োজন। নইলে ভিড় জমে না।

বাদলকে নিয়ে ফিরতে রাত হল। সে দিন সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেছে, অনেকে এসেছেন। লোকজন দেখে বাদল বলল, "এঁরা কারা?"

"আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তার আগে তোমার ঘর চিনিয়ে দিই। তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

তেতলায় বাদলের ঘর। ঘর দেখে বাদল হতবাক। টেলিফোন রয়েছে, গরম জল ফুটছে, আসবাব বেশী না হলেও হালফ্যাশনের। বিছানার নধর চেহারা দেখলেই ঘুম পায়।

হাই তুলে বাদল বলল, "এই আমার ঘর?"

"এই তোমার ঘর। মনে ধরেছে ?"

"এই আমার ঘর ?" বাদল ফুর্তি করে বলল। আর দ্বিরুক্তি করল না। পোশাক না খুলে, মুখ হাত না ধুয়ে, বিছানায় গা মেলে দিল।

"ও কী ! তুমি নীচে আসবে না ?"

"আজ না। আমি ক্লান্ত।"

"বল কী ! খাবে না সকলের সঙ্গে ?"

"পাঠিয়ে দিতে পার কিছু আমার ঘরে। শুয়ে শুয়ে খাব।"

তারাপদ বলল, "আচ্ছা।"

খাবার যে আনল সেটি একটি ষোড়শী কি সপ্তদশী। সে নিজেই একটি টকটকে পীচ। বাদল না হয়ে অন্য কেউ হলে কোনটি খাদ্য তা ঠাওরাতে না পেরে ভুল করতে পারত।

বাদলকে খাবার দিয়ে বলল, "পানীয় লাগবে না ?"

বাদল শুধাল, "নীচে কিসের অত হল্লা ?"

"ওহ্। আপনি জানেন না ! আমাদের এখানে প্রত্যেক বুধবার সামাজিকতা হয়।"

বাদল চাঙ্গা হয়ে উঠল। "তা হলে তো আমার নীচে নামা উচিত। না, আজ থাক। কী বলছিলে ? পানীয় ? শেরী থাকলে আনতে পার এক ফোঁটা।"

অন্য কেউ হলে বলত, তুমি আমার শেরী। ফরাসী অর্থে। বাদলটা বেরসিক। তাই শেরী আনতে দিল। ইংরেজী অর্থে।

তারপর বিছানায় আরাম করে শুয়ে মনে মনে বলল, আহ্ ! কত কাল পরে একটু শুয়ে সুখ পেলুম। কেমন নরম ও নধর। স্প্রিং এঁটেছে নিশ্চয়। এইজন্যে তো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে আমরা স্বর্গে হাজির হব নিশ্চিত।

শেরী আসার আগে বাদল ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বর্গের কল্পনায় তার আনন উদ্ভাসিত। যেন স্বপ্ন দেখছে প্রকাশ্যে।

৭

পর দিন একে একে অনেকের সঙ্গে আলাপ।

"ইনিই সেই বিখ্যাত চূড়কার।" বলল তারাপদ। "কমরেড সেন, কমরেড চূড়কার।"

অকালবৃদ্ধ শীর্ণ ভদ্রলোক। চামড়া যেন শুকিয়ে আমসি। রং মলিন বাদামী। পোশাক ঢিলেঢালা, কবেকার পুরানো, হয়তো দোসরা হাতের। চোখ দুটো অসাধারণ জ্বলজ্বলে আর নাকটাও ধারালো।

বাদলের হাতে তাঁর কনকনে ঠাণ্ডা হাত চাপিয়ে চূড়কার বললেন, "কেমন আছেন ?"

কে ইনি, কেন বিখ্যাত বাদল তা কস্মিন কালে শোনেনি। তারাপদকে সুধাতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। তারাপদ হয়তো হেসে বলবে, কোথাকার জংলী হে তুমি। চূড়কার কেন বিখ্যাত তাও তোমার অজানা।

তারাপদ নিজেও ভালো জানে না কেন চূড়কার বিখ্যাত। একালের কেউ যে ঠিক জানে তা নয়। তাঁর খ্যাতি একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সকলে সকলকে বলে, ইনিই সেই বিখ্যাত চূড়কার। বাদলও দু দিন পরে কাউকে বলবে, কোথাকার জংলী হে তুমি! চূড়কার কেন বিখ্যাত তাও তুমি জান না!

এই ভদ্রলোক লণ্ডনের এক সনাতন রহস্য। স্বদেশী আমলে কী একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ইনি দেশত্যাগী হন। লোকে বলে নির্বাসিত, ইনিও বোধ হয় তাই বলে থাকেন। আসলে এঁর ভরসা হয় না দেশে ফিরতে। তখন থেকে ইংলণ্ডেই বাস করছেন। অতি ক্লেশে দিন চলে। ভারতীয় ছাত্রদের বাসায় বাসায় কোথাও দু মাস কাটান, কোথাও ছ মাস কাটান। তাদের দাক্ষিণ্যের উপর একান্ত নির্ভর। গুণের মধ্যে চমৎকার বকতে পারেন। যে কোনো বিষয়ে আলাপ কর, দেখবে চূড়কার তোমার চেয়ে বেশী বোঝেন। লোকটা সত্যিকার জ্ঞানপিপাসু। যেখানে যত বক্তৃতা হয়, রাজনৈতিক হোক, আধ্যাত্মিক হোক, বৈজ্ঞানিক হোক চূড়কার সেখানে উপস্থিত। বক্তা হিসাবে নয়, শ্রোতা হিসাবে। ১৯১৪ সালে য়্যাসকুইথ কী বলেছিলেন ও ১৯১৮ সালে উইলসন কী বলেছিলেন এখনো তাঁর মুখস্থ। যখন উল্লেখ করেন তখন এই বলে আরম্ভ করেন, "মাই ফ্রেণ্ড য়্যাসকুইথ", "মাই ফ্রেণ্ড উইলসন", "মাই নোবল ফ্রেণ্ড লর্ড হলডেন", "মাই ওল্ড্ ফ্রেণ্ড বার্নার্ড শ।"

সেই বিখ্যাত চূড়কার বাদলের হাতে হাত চাপিয়ে বললেন, "কেমন আছেন?"

বাদল বলল, "আপনাকে দর্শন করে আহ্লাদিত।"

"বসুন। একটু গল্প করা যাক।" চূড়কার বাদলকে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। সুধালেন, "কবে দেশ ছেড়েছেন? দেশের খবর কী?"

"কবে ছেড়েছি তা তো মনে রাখিনি।" বাদল বলল অকপটে।

"য়্যাঁ! আপনি তা হলে আশৈশব এদেশে!"

"না, কমরেড চূড়কার।" বাদল লজ্জিত হল। "এত রকম এত কথা ভাবি যে দেশের কথা মনে থাকে না, দেশ আমার কাছে একটা কথার কথা, এই দেশই আমার দেশ।"

চূড়কার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। "ভুল, ভুল, ভুল।"

"কমরেড চূড়কার," বাদল বলল, "আপনি কি ন্যাশনালিস্ট, না কমিউনিস্ট?"

চূড়কার হেসে উঠলেন। "একটা হলে কি আরেকটা হতে নেই? মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, তোমরা তো সদ্য কমিউনিস্ট হয়েছ—"

"আমি এখনো হইনি, কমরেড।"

"তোমার ঐ কমরেড কথাটা কি আমার ফ্রেণ্ড কথাটার চেয়ে গরম? ঐ তো তোমাদের গোঁড়ামি।" চূড়কার জমে উঠলেন। "শোন তা হলে বলি। ভারতীয়দের মধ্যে আমিই প্রথম কমিউনিস্ট হই। সে কবে! আহ্, স্মরণ করতে দাও। রাশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব হবার আগে আমিই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করি। বলি, কমিউনিজম রাশিয়ার ললাটলিখন।"

দু একজন এসে চূড়কারকে ঘিরে বসলেন। গল্পটা ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা, এক অলিখিত পৃষ্ঠা, এই নামে চলল।

চূড়কার তো স্বনামা পুরুষ। পিতৃনামাও ছিলেন জন কয়। তারাপদ বলল, "ফিলাডেলফিয়ার ব্রুস ডি ব্রাকনারের নাম অবশ্য শুনেছ। সেই যে আইসক্রীম বিক্রী করে ক্রোড়পতি। তাঁরই ছেলে ব্রুস ডি ব্রাকনার জুনিয়ার ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে কে জান? রোবের্টো রবসন। ওর বাপ একজন গণ্যমান্য ফিল্ম ডিরেকটর।"

"আমেরিকা," তারাপদ শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "আমেরিকা উইল নট স্ট্যাণ্ড এনি ননসেন্স। দুনিয়াতে আমেরিকার একটা মিশন আছে, আমেরিকা একদা নিগ্রো স্লেভ উদ্ধার করেছে, একদিন ওয়েজ স্লেভ উদ্ধার করবে। কী বল, কমরেড ব্রাকনার? আর তুমি, কমরেড রবসন?"

"রাইট ইউ আর।" বলল রোবের্টো রবসন। ব্রাকনার তখন চিউইং গাম চিবোচ্ছিল।

বাহাওয়ালপুর রাজ্যের কোন এক জায়গিরদারের জামাতা ওসমান হাইদারী আর আবু পাহাড়ের শেঠ ঘরানা আত্মা প্রসাদ। তাদের দেখিয়ে তারাপদ বলল, "ঐ দুই জানোয়ার এখনো ধর্মের ক্রীতদাস। নিরামিষ না হলে আত্মা প্রসাদ খাবে না। ওসমান হাইদারী সব খাবে, কিন্তু বেকন ছোঁবে না। কী মুশকিলে পড়েছি। তবু রক্ষা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধছে না।"

শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "ইসলাম? আহা, ইসলামই তো কমিউনিজমের আদি। কোরান পড়েছ? পড়লে দেখবে কার্ল মার্কস তাঁর কমিউনিজম কোথায় পেলেন। হাঁ, এঙ্গেল্স কতকটা জৈন তীর্থঙ্করদের মতো নিঃস্পৃহ বটে।" আত্মা প্রসাদের মুখভঙ্গী অবলোকন করে, "কতকটা কেন, অনেকটা। অনেকটা কেন, সবটা।"

হাইদারী একটা হাইদারী হাঁক হাঁকল। "আরে ক্যা বোলতে হো, কাফের। কোরানের সঙ্গে কিসের তুলনা?"

তারাপদ বাদলকে নিয়ে সরে পড়ল। ফিস ফিস করে বলল, "কী দরকার, বাবা, কাউকে রাগিয়ে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে তর্ক কোরো না। মার্কস

এঙ্গেল্‌স্ ওরা কী বোঝে। বুঝি তুমি আর আমি।"

তারাপদ এবার যার কাছে নিয়ে গেল তার নাম জুলিয়ান বাওয়ার্স। বাদলেরই সমবয়সী লাজুক ইংরেজ যুবা। যেমন নিরীহ তেমনি সরল। দেখে মনে হয় না যে ভিতরে কিছু আছে।

তারাপদ বলল, "দেখতে অমন, কিন্তু পড়াশুনায় অদ্বিতীয়। এ দেশে ও ছাড়া আর কেউ বোঝে কি না সন্দেহ কাকে বলে ডায়ালেকটিক।"

বাদল শ্রদ্ধার সঙ্গে করমর্দন করলে বাওয়ার্স বললেন, "আপনাকে আমি চিনি। তার মানে একজনকে আমি চিনি, যে আপনাকে চেনে।"

বাদল হেসে বলল, "এই বুঝি ডায়ালেকটিকের নমুনা। শুনতে পাই সেজন কে? তার মানে, শুনতে পাই একজনের নাম, যে সেজন?"

"মার্গারেট।"

"বাই জোভ। মার্গারেট।"

তারাপদ সংশোধন করল, "বাই মার্কস্।"

বাদলের এতদিনে মনে পড়ল তার তারিণীকে। কী যে বিপদ ঘটত সে যাত্রা যদি মার্গারেট সেখানে না থাকত।

"মার্গারেট। আচ্ছা, মার্গারেট কি এ দিকে আসে না, কুণ্ডু?"

"আসে কোনো কোনো দিন। বুধবার সন্ধ্যায় হয়তো তাকে দেখবে।"

ওই মেয়েটির প্রতি তারাপদ প্রসন্ন ছিল না। কয়েক বার বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে। তারপর ইয়ের প্রস্তাব জানিয়ে জখম হয়েছে। সেই থেকে তারাপদর সিদ্ধান্ত ও মেয়ে খাঁটি কমিউনিস্ট নয়।

বাওয়ার্স বাদলকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর ঘরে। তারাপদর অন্যত্র জরুরি কাজ ছিল। বাওয়ার্সের ঘরে গিয়ে বাদল দেখল অসংখ্য বই, জানালায় বই, মেজেতেও বইয়ের খই ফুটছে। বাদল বড় বই ভালোবাসে। বই দেখলে এমন মেতে যায় যে ঘরে মানুষ থাকলে মানুষের অস্তিত্ব ভুলে যায়। একসঙ্গে সাতখানা খুলে বসে, কোনটা আগে পড়বে স্থির করতে না পেরে সব ক'টা আগলে বসে, পাছে অন্য কেউ লুট করে। দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, বৌয়ের বেলায় না হোক, বইয়ের বেলায়।

তার ভাব দেখে বাওয়ার্স বললেন, "নিতে পারেন যেটা খুশি, যত খুশি। পড়ে সমালোচনা করুন, ছাপা হবে।"

৮

যত বড় চোখ নয় তত বড় চশমা। কপালটা চওড়া। বাদলের চেয়ে বয়সে কিছু বড়।

"ও কে ? মার্গারেট ?" বাদল লাফিয়ে উঠল একদিন বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে। এত জোরে চাপ দিল যে মর্দন যাকে বলে।

"ছাড়, ছাড় ! হাতটা মচকে গেল।" মার্গারেট করুণ স্বরে বলল।

"মাফ কর, কমরেড।" বাদল লজ্জা পেয়ে হাত ছেড়ে দিল। বার বার বলল, খুব লেগেছে। বড় অন্যায় করেছি।

মার্গারেট হেসে বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলে এবার থেকে বক্সিং করবার দস্তানা পরে আসব ! কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি এত জোর তুমি পেলে কোথায়। এ বাড়ীতে খানাপিনা কেমন এই বুঝি তার বিজ্ঞাপন।"

"আমি আশা করেছিলুম," বাদল বলল, "তুমিও এ বাড়ীতে থাকবে। কেন, তোমার আপত্তি কিসের ?"

"তা হলে কী মজাই হত।" মার্গারেট বলল ব্যঙ্গের স্বরে। "দিন দিন মোটা হতুম আর সেই অনুপাতে মগজটা হতো সূক্ষ্ম। আর চব্বিশ ঘণ্টা তর্ক করতুম। আর প্রচার করতুম বিশ্ববিপ্লবের তত্ত্ব।"

"কিন্তু, মার্গারেট—"

"বল কমরেড বেকেট।"

বাদল অভিমানভরে বলল, "কমরেড বেকেট—"

"আচ্ছা, মার্গারেট বলতে পার।" মার্গারেট খিল খিল করে হাসল। "তোমার সাতখুন মাফ।"

"যা বলছিলুম তা এই যে কর্মীদের ও ভাবুকদের একত্র থেকে মত ও পথ বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। নইলে—"

"নইলে পরস্পরকে তারিফ করবার, তালি দেবার, লোক জোটে না। কী বল, বাদল ? তোমাকে বাদল বলতে পারি ?"

"একশো বার।"

"বেশ, তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভালো হল। গোয়েন বোধ করি জানেন না যে তুমি কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশছ।"

বাদল চটে বলল, "কেন, গোয়েন কি আমার অভিভাবক নাকি ? আমি কি নাবালক ?"

"বল কী ! তোমার মুখে গুরুদ্রোহ ? তুমি কি সেই বাদল ?"

"না, মার্গারেট।" বাদল নরম হয়ে বলল, "তুমি কী করে জানবে। আমারই জানানো উচিত, আমি সে বাদল নই। আশ্রম থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি।"

"সর্বনাশ। আমি ভেবেছিলুম তুমি একটু রুচি বদলে নিচ্ছ, আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরবে।"

"না।" বাদল যেন সশব্দে বন্ধ করল তার জীবনের একটা দ্বার।

"না, মার্গারেট।" বুঝিয়ে বলল, "কারো সঙ্গে আমার বিবাদ ঘটেনি, গোয়েনের সঙ্গে তো নয়ই। বন্ধুর মতো আমরা পৃথক হয়েছি।"

বাদল তার মানসিক বিবর্তনের বিবরণ শোনাল।

সব শুনে মার্গারেট বলল, "সোসিয়্যালের সঙ্গে ইণ্ডিভিজুয়াল জোড়া দিয়ে আবার একটা আশাভঙ্গ ডেকে আনছ।"

"বা, তা কেন আনব?"

"তুমি হতাশ হবে, বাদল, যদি ব্যক্তির প্রতি ন্যায়পরতা আশা কর। তা আপাতত হবার নয়। শ্রেণীর প্রতি সুবিচার আগে হোক, সমাজের গড়ন বদলাক, তারপর সেই সুপ্রতিষ্ঠ সুশৃঙ্খল নিষ্কণ্টক সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে হিসাবনিকাশ হবে।"

বাদল তর্ক শুরু করল।

মার্গারেট বলল, "তর্কে ফল কী, বাদল! ইতিহাসের সঙ্গে তর্ক খাটে না। তুমি কি মনে করছ মনোনয়নের অবকাশ আছে? জামাটা কাপড়টা বেছে বেছে কেনবার মতো ঘটনাটা ঘটিতব্যটা বেছে বেছে ঘটাতে পারে? রাশিয়ায় যা ঘটল তা অপৌরুষেয়। লেনিন না থাকলেও ঘটতে পারত, তবে লেনিন থাকাতে আয়ত্তের মধ্যে এল।"

বাদল বুঝতে পারল না।

মার্গারেট বোঝাল। বলল, "পাগল, তুমি ধরে নিয়েছ পার্লামেন্টের আইন দিয়ে সোসিয়াল জাসটিস হবে। তা নয়। হবে যখন জনতা জাগবে, যখন জনগণ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সরাসরি আদায় করবে। ইতিহাসে তাকেই বলে বিপ্লব। আর তেমন দিনে সমষ্টি তার আপনাকে বিশ্লেষণ করে শক্তিক্ষয় করতে চাইবে না। কাজেই ব্যক্তির প্রশ্ন উঠতেই পারে না, বাদল। তখনকার দিনে যদি ব্যক্তি বলে কিছু থাকে তবে তা সমষ্টির এক একটি ছোট বড় ঢেউ। সিন্ধুর কলরোলে তাদের কাকলী অস্ফুট।"

বাদল গুরুতর আঘাত পেয়ে নির্জীব বোধ করছিল। সুধাল, "তা হলে ব্যক্তির কি কোনো আশা নেই?"

মার্গারেট তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "ব্যক্তি যদি সমষ্টিতে আত্মসমর্পণ করতে পারে তবে আশাতীত আশা আছে। তুমি তো ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে। তোমার আশার অভাব কী।"

"না, আমি আত্মসমর্পণ করিনি। ভগবান তো নেইই, থাকলেও করতুম না। করতে চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু ওটা চেষ্টার অপচয়।"

"তা হলে," মার্গারেট বলল ম্লান হেসে, "তোমার আশা নেই। ইতিহাসের তেমন লগ্নে তোমার মতো ব্যক্তি বর কিংবা বরযাত্রী নয়। তোমরা বেখাপ, তোমরা অপাত্র।"

বাদল মুষড়ে পড়ল। কোনো এক বিরাট ঘটনার নায়ক হতে তার যে কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল তা নয়। সে চায় একাধারে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অধিকার। অর্থাৎ রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রে তার প্রতিভার পরিসর, বাক্যের স্বতঃস্ফূর্তি, চিন্তার স্বাধীনতা। তা যদি না জোটে তবে শ্রমশেষে শ্রমের ন্যায্য মজুরি মিললেও সব মিলল না, ফাঁকি থেকে গেল। সেইজন্যে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত তার অগ্রাহ্য।

বাদল বলল, "মার্গারেট, সত্যই আমাকে তুমি হতাশ করলে। কিন্তু আমি এই হতাশাকেও জয় করব।"

"আমিও তাই চাই। তুমি যাতে হতাশ না হও সেইজন্যে তোমাকে অগ্রিম হতাশ করতে বাধ্য হলুম, বাদল। তাতে সুফল ফলবে।"

অন্যমনস্ক বাদল কী জানি কী ভাবল। হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তুমি কি ডিক্‌টেটরশিপ স্বীকার কর?"

"আপাতত। ওটাও ইতিহাসের শাসন।"

"বল কী! ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ!"

"না, ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ না। ওটা তো নকল। নকলের কপালে নাকাল অনিবার্য। আমি যে ডিক্‌টেটরশিপ মানি সে প্রোলিটারিয়ান ডিক্‌টেটরশিপ। তার প্রতিষ্ঠা অধিকাংশের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছায়। প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু প্রমাণ করবার দায় কার কাছে?"

বাদল কী বলতে যাচ্ছিল, মার্গারেট উপেক্ষা করল। "যাদের কাছে প্রমাণের দায় তারা তা চায় না। তারা চায় কাজ, তারা চায় প্রোগ্রাম, তারা চায় দুর্গতি দূরীকরণ। ফাসিস্ট ডিক্‌টেটর তার বেলায় ফেল।" অবজ্ঞায় মার্গারেট ফুৎকার করল। "ওদিকে চেয়ে দেখ, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান।"

"তেমনি কত শত কুলাক ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, কারখানায় চালান যাচ্ছে, কত শত লোক খনিতে জেল খাটছে। কথায় কথায় গুলি খাচ্ছে কত লোক। এর কী সাফাই?"

"একমাত্র সাফাই, প্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে একজনেরও গায়ে হাত লাগছে না। প্রয়োজন। পশ্চাৎপদ বৃহৎ দেশে সহসা যদি যন্ত্রপাতির জোয়ার আসে তবে হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়, মায়ামমতার টান আলগা হয়। উৎপন্ন দ্রব্যে সভ্যতম দেশের সমকক্ষ হতেই হবে, তার জন্যে যদি ওরা বজ্রাদপি কঠোর হয় তবে তা শুধু আধুনিক জগতের আধিভৌতিক মাপকাটিতে উত্তীর্ণ হবার তাগিদে।"

"ফাসিস্টরা যদি তাই করত—"

"পারে না, বাদল, পারে না। ফাসিস্টরা মূলধনের মুনাফা বাঁচিয়ে যদি বা কিছু করে তবে তা বেগার খাটিয়ে করা।"

"কিন্তু, মার্গারেট," বাদল এই বার তার ব্রহ্মাস্ত্র হানল, "ট্রটস্কিকে যে ওরা তাড়িয়ে দিল, সাবেক বিপ্লবীদের সন্দেহ করল, এই যদি চলে তবে এর পরিণাম কী? ফরাসী বিপ্লব মনে আছে তো?"

মার্গারেট গম্ভীর হল। উত্তর না দিয়ে বলল, "এসো এক দিন আমাদের আড্ডায়। এখানে খালি থিওরী, খালি তর্কের কচকচি।"

বাণবিদ্ধ

১

দে সরকারের বাণ ব্যর্থ হল না, সুধী ও উজ্জয়িনী উভয়ের মর্মে বিঁধল। সুধীর সঙ্গে দেখা হলে উজ্জয়িনী লজ্জায় চোখ তুলতে পারে না. সুধীও সঙ্কোচে গভীর। তারা যতক্ষণ একত্র থাকে ততক্ষণ চুপ করে থাকে, যেন বলবার যা ছিল তা ফুরিয়েছে।

বিদায়ের সময় উজ্জয়িনী বলে, "চললে?"

সুধী সান্ত্বনার স্বরে সাড়া দেয়। বলে, "কাল আসব।"

উজ্জয়িনী স্বীকার করতে চায় না যে বাদলের ব্যবহারে সে মর্মাহত। তার আশাভরসা নির্মূল, তার সর্বাঙ্গে অবসাদ, তার সব কাজে অরুচি। তার শান্তি তো ছিল না, অশান্তিও গেছে। তার তৃপ্তি তো ছিল না, পিপাসাও গেছে। নির্জীব, সে একেবারে নির্জীব।

"সুধীদা ভাই," ক্লান্ত স্বরে সুধায়, "আমার মতো দুঃখিনী কি আছে?"

"কেন? তোর দুঃখ কিসের?" ইতিমধ্যে সুধী তাকে তুই বলতে শুরু করেছিল।

"না। সেজন্যে নয়।" উজ্জয়িনী যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে কবে। "না। সেজন্যে দুঃখিত হবার দিন গেছে।" আর একটু স্পষ্ট করে বলে. "তুমি ভাবছ আমি সেই জন্যে দুঃখিত? না, আমি গ্রাহ্যই করিনি। আমার দুঃখ সম্পূর্ণ আমার নিজের। তার জন্যে অন্যের দায়িত্ব নেই।"

সুধী বোধ হয় বিশ্বাস করছে না এই ভেবে খানিকটা জোর দিয়ে বলে, "নিজের পথ খুঁজে পাচ্ছিনে এই আমার পরম দুঃখ। এত বয়স হল, কী শিখেছি আমি! কোন কাজে লেগেছি বা লাগতে পারি! দেখছ তো ইংরেজ মেয়েদের। তারা ছেলেদের থেকে কোনো অংশে খাটো নয়। তাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা না একটা লক্ষ্য আছে, তারা কিছু করবে, তার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি তাদের প্রত্যেকে একনিষ্ঠ। আর আমি? আমার লক্ষ্য নেই, আছে লক্ষ রকম ক্ষ্যাপামি। আমি কী করব, সুধীদা!"

হাহাকারের মতো শোনায়, "আমি কী করব, সুধীদা!"

"জান তো, আমাদের দেশে হাজার হাজার হাসপাতাল চাই, নার্স চাই। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে দেশব্যাপী সেবাক্ষেত্র। অথচ আমার নিজেরি নেই উৎসাহ, আমার প্রেরণা গেছে হারিয়ে। আমাদের মেয়েদের জন্যে করবার রয়েছে কত। কিন্তু বিদ্রোহের উদ্দীপনা ক্রমে নিবে আসছে, যদিও আস্ফালনের ধুম যথেষ্ট। সুধীদা, আমার জন্ম বৃথা। আমার দ্বারা কোনো কাজ হবার নয়।"

বাক্যের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে সুধী বলে, "বোন, কারো জন্ম বৃথা নয়। সার্থকতার নানা বেশ।" একটু থেমে একটু হেসে গাঢ় কণ্ঠে বলে, "নইলে আমার নিজের কতটুকু আশা থাকত!"

সুধীর ইতিহাস উজ্জয়িনীর অবিদিত। সুধীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুধী স্বয়ং সংশয়ারূঢ়, উজ্জয়িনী এত জানত না।

"তোমার সঙ্গে" বলে ভঙ্গীভরে, "আমার তুলনা! থাকতে পারে তোমার কোনো খেদ, কোনো সাময়িক নিষ্ফলতা, হয়তো আর্থিক প্রতিবন্ধক। কিন্তু জীবন তোমার অনাবশ্যক নয়। তোমার জন্যে কাজ তো আছেই, কাজের জন্যে তুমিও আছ।"

"শুধু কি কাজের দ্বারাই সার্থকতার বিচার হয়!" সুধীর কণ্ঠে করুণা। "যে ফুল না ফুটিতে লুটাল ধরণীতে তার সেই না ফোটাও সার্থক। নইলে অপচয়ের অজস্রতায় প্রকৃতি এত দিনে দেউলে হয়ে যেত। ওকে দেখতে বেহিসাবীর মতো। আসলে ওর মতো হিসাবী আর নেই। তুই যদি কোনো কাজে না লাগিস তবু তোর হেলাফেলাও সার্থক। হিসাবের অঙ্ক মিলবেই।"

"বাঃ, সুধীদা," রঙ্গ করে উজ্জয়িনী, "বলেছ বেশ। কুঁড়ের কুঁড়েমি ও ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামিও সার্থক। তবে আমি মিছিমিছি ভেবে মরি কেন?"

"তোকে অত ভাবতে হবে না, পাগলী। তোর যেমন করে বাঁচতে সাধ যায় তেমনি করেই বাঁচ! ঘোরতর অসামাজিক কিছু করে বসিস নে। তা ছাড়া আর যা খুশি তা করতে পারিস, যা খুশি নয় তা না করতে পারিস। করা না করা দুই সমান। আমাদের স্থানকালের স্বল্প সীমার মধ্যে আমরা খাটতেও পারি, খেলতেও পারি, তার জন্যে জবাবদিহি যাঁর কাছে তিনি আমাদের অভিরুচির উপর আস্থাবান।"

উজ্জয়িনী আশ্বাস বোধ করলেও বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, "তা কী করে হয়, সুধীদা! সংসারে প্রত্যেকেরই একটা না একটা কর্তব্য আছে, জীবনজোড়া কর্তব্য। আমার কর্তব্য কী তা আমি জানলুমই না, করলুমই না, খেলা করে বই পড়ে স্বপ্ন দেখে সময় কাটিয়ে দিলুম। সেই হল আমার সার্থকতা!"

সুধী বোঝে বাদলের প্রতি তার স্ত্রীর জীবনব্যাপী কর্তব্যের স্থলে তেমনি কোনো জীবনজোড়া কর্তব্য খুঁজছে উজ্জয়িনী। নইলে তার জীবনের অর্থ থাকে না।

"সাংসারিক মানদণ্ডে সত্তার সার্থকতা মাপতে যাওয়া ভুল।" সুধী বোঝায়। "জীবন আপনাতে আপনি অর্থবান। তাকে তুই কর্তব্য দিয়ে পূরণ না করলেও সে পূর্ণ। আমি তো ভাবতেই পারিনে যে কারো জীবন কিছুর অভাবে শূন্য হতে পারে, নিরর্থক হতে পারে। আর তুই," সুধী বলে প্রত্যয় ভরে, "তোর জীবনের চেয়ে বড়।"

উজ্জয়িনী মুগ্ধের মতো শোনে। শুনতে তো বেশ লাগে, কিন্তু সত্য কি না কে জানে! হায়! সত্যের কি কোনো চেহারা আছে যা দেখলেই চেনা যায়!

"তুই স্রষ্টা, জীবন তোর সৃষ্টির উপকরণ। তার অপচয় ঘটতে পারে, তা হঠাৎ ফুরিয়ে যেতে পারে, তা দুঃখের হতে পারে, কিন্তু তুই তার ঊর্ধ্বে। তুই কেন দুঃখিনী হতে যাবি? তুই আনন্দরূপিণী, তুই দুঃসহ দুঃখকেও সৃষ্টির ছন্দে বাঁধবি। আর অপচয়ও সৃষ্টির অবকাশ, হেলা-ফেলাও সাধনার অঙ্গ।"

"ক'দিনের জীবন!" উজ্জয়িনী আবেগের সঙ্গে বলে, "দেখতে দেখতে বেলা যাবে, কোনো কাজে লাগব না।"

"তোর নিজের কাজ থাকলে সেই কাজে লাগবি, পরের কাজ তোর কাজ নয়। আর তোর নিজের কাজ হচ্ছে সৃষ্টি। তা মোটেই কাজের মতো নয়, তা তুই এই মুহূর্তেও করছিস। দেখতে দেখতে যদি বেলা যায় তবু যেটুকু করেছিস সেটুকু বৃথা নয়, তোর অগোচরে তার হিসাব থাকছে, সংসারের অলক্ষে তার অর্থ আছে, যিনি তোকে ভালো-বাসেন তিনি তোর তুচ্ছতম মুহূর্তের লেশতম স্বকাজের পক্ষপাতী। ওরে শিশু, তোর জননীর চোখে তুই চিরসার্থক। তোর সকলই মধুর, ওরে শিশু।"

"কী জানি!" উজ্জয়িনী উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করে। "কী জানি!" সুধী ধ্যান করে মৌন হয়।

অন্তরীক্ষে ঘুরতে থাকে তাদের সেই দুটি শেষ কথা। "তোর সকলই মধুর, ওরে শিশু।" ..."কী জানি! কী জানি!" "তোর সকলই মধুর, ওরে শিশু।"..."কী জানি! কী জানি!"

"সুধীদা," সুধীকে ধ্যানস্থ দেখে উজ্জয়িনী থেমে যায়।

"বল, কী বলতে চাস।" সুধী সাড়া দেয়।

"আমার যে কত কষ্ট হচ্ছে তা কি তুমি একেবারেই বুঝতে পারছ না! কাজ দাও, কাজ দাও, আমাকে একটা কাজ দাও। উদ্দেশ্য দাও। প্রেরণা দাও। দয়া কর। দয়া কর। আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।"

উজ্জয়িনী ভেঙে পড়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার সে কী কান্না। সুধী কোনো দিন তাকে এমন করে কাঁদতে দেখেনি। অভিমানিনী অন্তরে অন্তরে কত যে উচ্ছ্বাস জমেছে তা সে কোনো দিন জানতে দেয়নি। সুধী তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে প্রকৃতিস্থ

করতে চেষ্টা করলে সে আরো কাতর ভাবে কাঁদতে থাকে। সুধী কী করবে। তার নিজের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

কতক্ষণ কেটে যাবার পর উজ্জয়িনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পাগল মানুষ, কিছু একটা করে বসতে পারে। সুধী উদ্বিগ্ন হয়।

"যাও, তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়া ঝকমারি।" ঘরে ফিরে হেসে লুটিয়ে পড়ে উজ্জয়িনী। তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। অথচ সুধীর চোখ তখনো মলিন।

"তুমি ভাবছ আমি সত্যি কাঁদছিলুম ? মোটেই না। আমার কীই বা দুঃখ! কেনই বা কাঁদব! এই বেশ আছি, সুধীদা। খাচ্ছি দাচ্ছি মোটা হচ্ছি, ওজনে বাড়ছি। এবার বিউটি কম্পিটিশনে নাম দেব। একটা নতুন কিছু হবে। কে জানে, লেগে যেতেও পারে। আমার চেয়ে কত কুৎসিত মেয়ে প্রাইজ পেয়ে গেল।"

সুধী চুপ করে শোনে। কান্নার চেয়ে করুণ এসব উক্তি।

২

কী করব! ওগো আমি কী করব! উজ্জয়িনীকে এ জিজ্ঞাসা পাগল করে তোলে। অসংখ্য কাজ রয়েছে করবার, সামর্থ্যও রয়েছে, অথচ করতে প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন এক প্রকার পক্ষাঘাত। ইচ্ছাশক্তির পক্ষাঘাত।

সুধীদা একদা বলেছিল, আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর প্রকৃতির কাছে পাওয়া যায়। উজ্জয়িনী তাই সমাজের থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির উপর স্থাপন করে চিত্ত। মার্চ মাস, তখনো বৃষ্টির মরসুম। আকাশে তারা নেই, কাকে ডেকে সুধাবে, "ওগো তোমরা বলতে পার আমি কী করব বেঁচে! আমার জীবন কার কাছে আদরের! আদর যদি না থাকে দর থেকে কী হবে! তেমন দর তো গোরুঘোড়ার।"

স্নেহমমতা অনেকের কাছে পেয়েছে ও পাচ্ছে। জীবন তো ওই সব ছিটেফোঁটার তিয়াষী নয়। জীবন অখণ্ড বলে তার পিপাসাও অখণ্ড। আদরের প্রত্যাশা শুধু এক-জনেরই কাছে। সেই একজন কে! সে কি বাদল! না, বাদল নয়। বাদল তাকে কোনো দিন ভালোবাসেনি। তার ধারণা ছিল বাদল চিন্তাজগতের লোক, তার হৃদয়বৃত্তি নেই, কাউকে ভালোবাসতে জানে না বলেই তাকে ভালোবাসে না বাদল। এখন তো বোঝা গেল অপরকে হৃদয় দিতে বাদলের বাধল না। তবে কেন বাদলের কাছে প্রত্যাশা!

না, বাদল নয়। সুধীদা অবশ্য বাদলের বন্ধু, তার পরামর্শ চাইলে সে সম্ভবতঃ বলবে, সহধর্মিণীর জীবনে নানা বিপর্যয় ঘটে, তা বলে ব্রতের ব্যত্যয় ঘটতে পারে না। কিন্তু কার সহধর্মিণী থাকবে উজ্জয়িনী বাদল নিজেই যখন অন্যের! মনে মনে একটা পাষাণকেও দেবতা বলে পূজা করা যায়, কেননা পাষাণ কারো নয়, তাকে কেউ কেড়ে নিতে পারে

না, কারো সঙ্গে পালায় না সে। এত দিন বাদল তাই ছিল। এখন বোঝা গেল সে পাথর নয়, সে মানুষ। সে তার সহধর্মিণী বেছে নিয়েছে। এর পর তার সহধর্মিণী হতে যাওয়া অহেতুক আত্মবিড়ম্বনা। তাতে হয়তো কিছু পুণ্য হতে পারে, কিন্তু সার্থকতার ঘরে শূন্য। ভরা জীবনের বদলে মরা জীবন নিয়ে দিন কাটবে।

তার জিজীবিষা হ্রাস পেল। মনে হল সব সমস্যা সহজে মেটে যদি সকাল সকাল মরণ আসে। তা হলে আর সহধর্মিণী হতে হয় না অথবা একা একা পথ খুঁজতে হয় না। দেখতে গেলে জীবন তার বেশী দিনের নয়। এইটুকু বয়সে কী পেয়েছে সে? কেই বা তাকে তেমন করে ভালোবেসেছে? তার বাবার কাছেই তার যা কিছু পাওয়া। তিনি আর নেই।

তিনি নেই একথা যেই মনে পড়ে যায় অমনি তার গলায় কী যেন আটকায়। তার চোখ ছলছল করে। চোখের নীচেই যেন জলভরা ফল্গু, তার উপর সময়ের বালু আবরণ। যতক্ষণ ভুলে থাকা যায় ততক্ষণ আবরণ স্থির থাকে, কিন্তু মনে পড়লে আর রক্ষা নেই, তখন বালু সরে যায়, জল থৈ থৈ করে।

তখন এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে রুচি হয় না। কী হৃদয়হীন সে! নিজের জীবন নিয়ে ব্যাপৃত। ওদিকে বাবা যে কোথায় আছেন কেমন আছেন একবার ভাবেও না। কত সত্য ছিলেন তিনি এই তো সেদিন। আজ তিনি স্মৃতি! স্মরণ না করলে তাও না। তাঁর চিরদিনের পৃথিবীতে তিনি নেই, একেবারে নেই। এই তো মানুষের জীবন! কী হবে এমন জীবন রেখে? কার কাছে এর শাশ্বত মর্যাদা, মরণোত্তর মূল্য? আজ যদি উজ্জয়িনীর অন্ত হয় কাল কি কেউ তাকে মনে স্থান দেবে?

অন্তর উদ্বেল হয়। তার সেই স্নেহের বাবাটি নেই। বেচারা বাবা! কেউ তাঁর মর্যাদা বোঝেনি, না ঘরের লোক, না বাইরের লোক। কেউ তাঁকে চিনত না, তিনি ছিলেন মনের গহনে একাকী। সেই উপেক্ষিত বাবা, পরাজিত বাবা, নিরহঙ্কার ও নিঃসঙ্গ বাবা আজ নেই। এখানে তো নেই, কোনোখানে কি নেই? বাবা, তুমি কোথায়? ভগবান, বাবা কোথায়? আমাকেও নিয়ে চল সেখানে, আমাকে আর ফেলে রেখো না। আমার কেউ নেই এখানে, আমার কোনো আকর্ষণ নেই, আমার জীবন কারো জীবনের সঙ্গে বাঁশির সুরে বাঁধা নয়, হয়তো ফাঁসির দড়িতে বাঁধা।

মরণ কামনা করে, কিন্তু সে কামনা সত্য নয় তা বোঝে। জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে, তবু প্রাণের মায়া অনিবার। বাঁচতেই হবে, কী জানি কার এ হুকুম। প্রাণদণ্ড নয়, প্রাণধারণদণ্ড। অথচ নামমাত্র বাঁচা। বেঁচে করবে কী? করবার ইচ্ছা নেই, ইচ্ছার পক্ষাঘাত।

প্রকৃতির কাছে উত্তর খুঁজতে বেরয়। বৃষ্টির আধিপত্য থাকলেও কালটা বসন্তের

আদ্য। ফুলের বিপণিতে তার সূচনা লক্ষিত হয়। পথের ও পার্কের তরুরাজি নব কিশলয় সজ্জিত। সাগরপার থেকে পাখীরাও ফিরছে। তাদের পুনর্মিলনের চাঞ্চল্যে উপবন মুখর।

কই, কেউ তো মনের দুঃখে মরণের আবাহন করছে না। যে যার গোপন ব্যথাটি বয়ে প্রাণের জনতায় যোগ দিয়েছে। আমাদের চেয়ে কত অসহায় ঐ সব ছোট ছোট পাখী। অথচ অনায়াসে ওরা সাগর পারাপার করল। পথে ওদের কত না স্বজন খোয়া গেছে, তবু ক্ষণকাল পাখা থামায়নি, থামালেই সিন্ধুর অতল। আটলান্টিক অভিযাত্রীদের ছোট ছোট ডানাগুলিতে কী দুরন্ত দুঃসাহস আর তাদের ছোট ছোট প্রাণগুলিতে কী প্রখর প্রাণপিপাসা! মানুষ কেন তবে হাঁপিয়ে ওঠে, একজনকে হারালেই ফতুর বোধ করে, একজনের ভালোবাসা না পেলেই দশদিক শূন্য দেখে? মানুষ কি সত্যই এতটা অসহায়? মানুষের মন কেন একটু আঁচড় লাগলে অধীর হয়, মানুষের জীবন কেন কথায় কথায় আত্মবিশ্বাসের হাল ছেড়ে দেয়?

আমি যদি পাখী হতুম, উজ্জয়িনী ভাবে, আমার কোনো প্রশ্ন থাকত না। আমি অসংশয়ে বাঁচতুম ও তেমনি সহজে মরতুম। আমার আসাযাওয়ার চিহ্ন রইত না। আমি যদি গাছ হতুম তবে তো আমি ভাবতুমই না কোনো কথা। আমি অকারণে বাঁচতুম ও কখন এক সময় চুপ করে মরে যেতুম। কেউ মনে রাখত না যে এখানে একটা গাছ ছিল। আমি যদি পতঙ্গ হতুম তবে হয়তো জানতুমই না যে বেঁচে আছি কি মরে গেছি। আফসোসের বিষয় আমি মানুষ। তাই প্রশ্ন উঠে বেঁচে কী হবে? কার জন্যে বাঁচব? কার কাছে আমার আদর?

সন্ধ্যাবেলা তাসের মজলিসে উজ্জয়িনীর তেমন মনোযোগ নেই। অনুযোগ শুনতে হয় পদে পদে। বারণ করে দিলে হয় যে আপনারা কেউ আসবেন না। কিন্তু তা হলে বড় নির্জন বোধ হয়। যতদিন বাঁচি ততদিন পাঁচজনের সঙ্গ পেয়ে বাঁচি। নিঃসঙ্গ তো একদিন হতেই হবে জীবনের অন্তিমে। আর নিঃসঙ্গ তো সমস্তক্ষণ অন্তরে।

ভালো লাগে না সামাজিক ঠাট। পড়াশুনাতেও চাড় নেই। তবু নিয়ম রক্ষা করতে হয়। বেকারের মতো কিছু না করে থাকা যায় না অথচ কিছু করলেই প্রশ্ন ওঠে, কেন করছি। কী এমন দরকার। কে চায় আমার কাজ। শুয়ে থাকলেই বা ক্ষতি কী। ঘুমের মধ্যে মরে গেলেই বা মন্দ কী। কেউ কি অভাব বোধ করবে, কাঁদবে, কেঁদে বলবে, আহা! আমার উজ্জয়িনী কই!

কেউ কি কাউকে মনে রাখে। অমন যে জলজ্যান্ত বাবা আজ তিনি নেই। সৃষ্টি খুঁজলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না, তাঁর মুখ দেখা যাবে না, তাঁর স্বর শোনা যাবে না। দিনের পর দিন কাটবে, অথচ তিনি থাকবেন না। তিনি হীন দিন কল্পনা করা অসম্ভব ছিল, তবু তেমন দিন এল। তেমন দিন কাটবে বলে বিশ্বাস হত না, তবু তেমন দিন

কাটছে, বিশ্বাস হয় কাটবে। আশ্চর্য। আশ্চর্য। আশ্চর্যের অবধি নেই। জীবনের জন্যে লজ্জা বোধ হয়। যে নেই তার দিকে ফিরেও তাকায় না, যে আছে তাকেই নিয়ে তার সওদা। এমন ব্যবসাদার, এমন স্বার্থপর এই জীবন। এমন নির্লজ্জ, এমন নির্মম। উজ্জয়িনীর ঘেন্না ধরে যায়। এমন জীবন ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় বাদলকে। এই যখন জীবনের রীতি তখন বাদলকে দোষ দিয়ে কী হবে। উজ্জয়িনী বাদলের কে যে বাদল তার মুখ চেয়ে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবে। বাদলের চোখে উজ্জয়িনী মৃত। মৃতের জন্যে কেন সে ভাববে। কেন ফিরে দেখবে কার নয়নে বন্যা, কার শয়নে অনিদ্রা, কার আহারে অরুচি, কার বেশভূষায় অসৌষ্ঠব। জীবন বাদলকে সামনে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবনের হাতে সে অসহায়। ফিরে তাকাবার সময় নেই। জীবন যে সেটুকু সময় দেয় না। বেচারা বাদল।

রাত জেগে উজ্জয়িনী তাস খেলে, সখীদের বারোটার আগে উঠতে দেয় না। তার-পর বিছানায় শুয়ে ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ে, পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পারে না, তিনটে বাজে। জানে নিরর্থক। বিরক্তি লাগে। কিন্তু কী আর করবে, শুনি? দেশের কাজ। দশের সেবা? তার জন্যে উৎসাহ চাই, প্রেরণা চাই, জিজীবিষা চাই। এসব যার নেই সে করতে গেলে হাঁপিয়ে উঠবে, ফাঁকি দেবে, পালাবে। যুদ্ধে নেমে পরাজিত হওয়ার চেয়ে কাপুরুষের মতো সরে থাকা শ্রেয়। যদিও কোনো মতে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া আরো শ্রেয়স্কর।

রবিবারে সুধী গির্জায় যায়, সাধারণত সেণ্ট মার্টিনসে। এত দিন উজ্জয়িনী তার সাথী হয়েছে, কিন্তু ইদানীং ওর তেমন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে বলে মনে হয় না। ওর ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সময় উত্তীর্ণপ্রায়। সুধী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়। তবু অনুযোগ করে না, চুপ করে থাকে।

"ওমা সুধীদা যে। ওহ্, আজ রবিবার।" উজ্জয়িনী হাই তুলতে তুলতে সোফায় এলিয়ে পড়ে। "থাক, আজ নাই বা গেলে, গিয়ে কী হবে। বোসো, বিশ্রাম কর, এক পেয়ালা দুধ খাও। ভগবান যদি থাকেন তবে আমাদের অন্তরে আছেন, সেই আমাদের গির্জা।"

সুধী বোঝে উজ্জয়িনীর ভালো লাগছে না কোথাও যেতে, কিছু করতে, তবু তার চিত্তের প্রশান্তির পক্ষে এর প্রয়োজন আছে। যে দেশে মন্দির নেই গির্জাই সে দেশের মন্দির। ধর্মমতের ঐক্য নেই, তা বলে কি আত্মনিবেদনের ঐক্য নেই?

"ভগবান অন্তরে আছেন বৈকি। অন্তরকে গির্জায় নিয়ে গেলে গির্জায়ও আছেন।" সুধী মন্তব্য করে।

"নিয়ে যাবার দরকার?" উজ্জয়িনী পরম আলস্যভরে উদাস কণ্ঠে সুধায়।

"সেখানে আমাদের সকলের অন্তর একের আরাধনায় লগ্ন। কত জনের কত দুঃখ, কত সুখ, কত দ্বন্দ্ব, কত সাধ একত্র মিশে গিয়ে অভিন্ন হয়ে যায়, তখন কোনটা যে আমার তা চেনবার উপায় থাকে না। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা যে পরস্পরের ব্যথার ব্যথী হই, ভাগ্যের ভাগী হই, এ কি সামান্য লাভ!"

"আমার নিজের বেদনার অবধি নেই। আমি যাব কেন পরের বোঝার বাহন হতে!"

"তোর নিজের বোঝাও হালকা হবে যে। তোর নিজের বেদনার অবধি নেই, তা যদি হয় তবে তোকে পরের বেদনার অবধি খুঁজতে হবে।"

"তাতে কি আমার বেদনা সত্যি কমবে, সুধীদা? আমার তো বিশ্বাস হয় না যে দুনিয়ার মাথাব্যথার খোঁজ নিলে আমার মাথাব্যথা সারবে।"

"না, সারবে না। তোর নিজের ব্যথা তোকে বহন করতেই হবে যতদিন না তাঁর করুণা হয়। কিন্তু বসে বসে চোখের জলে সিক্ত হওয়া লজ্জার একশেষ। পরের চোখের জল না মুছাতে পারিস, অন্তত চোখে দেখিস।"

"তুমি", উজ্জয়িনী ঠোঁট ফোলায়, "তুমি ওকথা বলবেই। তোমার কী! মুক্ত পুরুষ, তিন কুলে কেউ নেই, সাংসারিক সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে তোমার আসন। তুমি কী বুঝিবে, সন্ন্যাসী।" নরম সুরে বলে, "জানি, ভাই, তোমার জীবনে শোকের ছায়া পড়েছে, সে অতি দুঃসহ দুর্ভোগ। জানিনে তুমি কী করে পারলে সইতে। কিন্তু ব্যর্থ-তার জালা আর বিভ্রমের গ্লানি তোমার জীবনে আসেনি, তাই বলছিলুম তুমি কী করে বুঝবে!"

"যদি স্বীকার না করি?" সুধী স্মিত হাসে।

"তুমিও এর ভিতর দিয়ে গেছ?" উজ্জয়িনী সবিস্ময়ে সকৌতুকে সুধায়। "এ কি কখনো সম্ভব, সুধীদা?"

"তুই দেখছি আমাকে কবুল না করিয়ে ছাড়বিনে। কিন্তু এমন কী তোর জালা আর গ্লানি যা সাধারণ মানুষের জীবনে এত বয়সেও আসে না?"

"আমি তো বলিনি যে তুমি সাধারণ মানুষ। তুমি অসাধারণ।"

"অমন করে আমায় অপাংক্তেয় করিসনে। আমি অতি সাধারণ।"

"তা হলে তুমিও এসব ভুগেছ?" জেরা করে উজ্জয়িনী।

"অল্প স্বল্প।"

"বল কী, সন্ন্যাসী! তুমিও!" উজ্জয়িনী চাঙ্গা হয়ে ওঠে। "যাঃ, আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি আমার প্রশ্নের মর্ম বোঝনি। একটু স্পষ্ট করতে পারি?"

"তোর মর্জি।"

উজ্জয়িনী সময় নিয়ে সতর্ক হয়ে বলে, "কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করেছ?"

"অনেকবার।"

"না। ঠিক বোঝনি। অনেকবার নয়, একবার?"

"হয়তো একবার।"

"প্রত্যাশা নিষ্ফল হয়েছে?"

"হয়তো তাই হবে।"

"ঐ যাঃ!" ফিক করে হাসে উজ্জয়িনী। "মনে ছিল না যে আমার একজন বৌদিদি আছেন। কী করে মনে থাকবে, বল। আমি তো কোনো দিন ভাবতেই পারিনি যে ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া সম্ভবপর। তোমার মতো বিজ্ঞ লোক যে যা সম্ভব নয় তা প্রত্যাশা করবে কী করে তা বিশ্বাস করব?"

সুধী সাড়া দেয় না, গম্ভীর হয়।

"রাগ করলে? দেখ, ভাই যা বলেছি অন্যায় বলিনি। জগতের নিয়ম তাই। হিমালয়ের মেয়ে ভিখারীকে বিয়ে করেছিলেন সেকালে। একালে কি হাইকোর্টের মেয়ে ফকিরকে বিয়ে করে?" নিজের রসিকতায় নিজে আমোদ পায়।

সুধী বলে, "মানুষের কাছে মানুষের প্রত্যাশা খাটো করলে মানুষের মনুষ্যত্ব খাটো করা হয়। মানুষের মধ্যে যে বীরত্ব আছে তার উপর আস্থা রেখে বরং নিরাশ হওয়া ভালো, তবু নিরাশ হবার ভয়ে আস্থা হারানো ঠিক নয়। গায়ে পড়ে কেন আমি কারো মনুষ্যত্বে সন্দিহান হব কেন ধরে নেব কেউ দুর্বল, কেউ অক্ষম।"

"তুমি কি সত্যিই প্রত্যাশা কর অশোকা—"

"প্রত্যাশা না করা যে তাঁর অসম্মান। যা হয় হবে, তা বলে আমি কেন আগে ভাগে তাঁর বীরত্বের অবমাননা করব।"

"মাফ কোরো, সুধীদা।" উজ্জয়িনী লজ্জিত হয়ে চুপ করে। তারপর উঠে যায় সুধীর পানীয় আনতে।

"কিন্তু আসল কথাটা যে ধামাচাপা পড়ল," ফিরে বলে উজ্জয়িনী, "তোমার জীবনে জালা কই? যা বলেছ তাতে জালার আভাস পাইনি।"

দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে সুধী বলে, "আবার জেরা শুরু হল।"

"না, জেরা নয়, তোমার সঙ্গে আমার তুলনা!"

"বাস্তবিক তোর মতো দুঃখ আমার জীবনে আসেনি, কিন্তু তোর দুঃখ যে আমারও দুঃখ তোকে তা বলবার দিন এসেছে। শোন তবে বলি।"

এই বলে সুধী গল্প করতে বসে। গির্জার সময় অতীত হয়।

"কথা ছিল আমরা দুই বন্ধু বি এ পাশ করেই বিলেত আসব। সব ঠিকঠাক, জাহাজ তৈরি, পাসপোর্ট মজুত, পোশাকের ফরমাস দেওয়া হয়েছে, এমন সময় বাদলের বাবা বেঁকে বসলেন। বললেন, বিয়ে না করে বিলেত যাওয়া চলবে না। তাঁর বিশ্বাস যারা বিয়ে না করে বিলেত যায় তারা বিয়ে করে বিলেত থেকে ফেরে। আমি ছিলুম না, গিয়ে দেখি বাদল বসে বসে কী সব লিখছে ও কাটছে। বলল, যাকে ভালোবাসিনি তাঁকে বিয়ে করতে আমার বিবেকে বাধবে, হয়তো তাঁরও বিবেকের বাধা আছে।"

"ওমা, তাই নাকি?"

"আমি বললুম, বিয়ের পরেও তো ভালোবাসা হতে পারে। সে বলল, যদি না হয়। তখন আমি বললুম, ভালোবেসে বিয়ে করলেও পরে সে ভালোবাসা না টিকতে পারে। সে ফস করে বলে বসল, তেমন হলে বিবাহচ্ছেদ। আমি তার সঙ্গে তর্ক করে অবশেষে পরিহাস করে বলেছিলুম, তুই বিয়ে করে প্রমাণ করে দে যে বিয়ে বলতে কিছুই বোঝায় না। তা শুনে সে বলল, তাই বলে তাঁকে ভালোবাসবার বা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার দায়িত্ব আমার নেই। আমি তামাশা করে বললুম, আচ্ছা, দেখা যাবে।"

উজ্জয়িনীর মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। লক্ষ করে সুধী বলে, "চিঠিখানা সে লিখছিল তোকেই। তুই পাসনি ও চিঠি?"

"না।"

"ভালোই হয়েছে, পাসনি। বিয়ে না করে তোর বা তার উপায় ছিল না। খামকা মন খারাপ হত। তবে আমার আফসোস হয় আমি কেন তার বাবাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করলুম না। তাঁর উপর আমার যতটা প্রভাব ছিল আমি অনায়াসেই তা পারতুম। বরং আমিই তাঁকে সমর্থন করেছি। ভেবেছি উজ্জয়িনীকে পেলে আমাদের দলটি বেশ জেঁকে উঠবে। বাদলটারও শ্রী ফিরবে। আমার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল যে তার মতবাদ কেবল মৌখিক, আচরণে ওর অন্যথা হবে। আমি তো কল্পনা করতে পারিনি সে এমন লক্ষ্মী মেয়েকে ভালোবাসবে না। আমি যদি জানতুম তবে তখনি বাধা দিতুম।"

উজ্জয়িনী দুই হাতে চোখ ঢাকে ও ফুলে ফুলে কাঁদে।

৪

"বাদলের চেয়ে," সুধী চুপ করে থেকে পুনরায় বলে, "আমিও কম অপরাধী নই, কেননা আমি যে ছিলুম তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আজ বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু

তখনকার দিনে আমাদের প্রতি চিন্তা প্রতি কাজ একসঙ্গে হত, আমাদের দায়িত্ব ছিল অবিভক্ত। বিয়ে যদিও বাদলের তবু দায়িত্ব উভয়ের। তোর নামটি শুনে আমার ভারি ভালো লেগেছিল, তোকে যেন মনে হত কত কালের চেনা, সেইজন্যে আমি তোকে বাদলের বন্ধুরূপে আমন্ত্রণ করে এনেছি। বাদল যে আমাকে এমন ভাবে অপ্রতিভ করবে তা যদি জানতুম তবে তোর জীবনের সঙ্গে যাতে ওর জীবনের সংস্পর্শ না ঘটে সেই চেষ্টা করতুম এবং সম্ভবতঃ সফল হতুম, উজ্জয়িনী।"

উজ্জয়িনী মুগ্ধের মতো শোনে। তার অশ্রু মিলিয়ে যায়, শুধু কাঁপুনি থাকে। ধরা গলায় বলে, "ঠিকই করেছ। এর আবশ্যক ছিল।"

বলে, "অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হলে যে অন্য রকম হত তাই বা কেন ভাবব? বিয়ে না করাই সব চেয়ে ভালো। আর আমার এখনকার অবস্থাও বিয়ে না করার সামিল। আমি চিরকুমারী। এদেশে শত শত চিরকুমারী আছে, আমি তাদের একজন।"

"গোড়ায় তোকে আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলুম তা এই কথা। পরের চোখের জল না মুছতে পারিস, অন্তত চোখে দেখিস। তুই যে দেখছিস তার প্রমাণ পাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলুম তা কি তুমি বুঝেছ? শত শত নারীর এই একই দুঃখ আছে, তা বলে কি আমার জ্বালা কিছু কম? আর তুমিও যদি আমার প্রতি সমবেদনায় জ্বলো তা হলেও আমার কতটুকু তৃপ্তি? তবে তোমার সমবেদনার মর্যাদা মানব, আমি ধন্য যে আমার জন্যে তোমার হৃদয় ব্যাকুল হয়। সংসারে এও যে দুর্লভ।"

"যদি আমার সমবেদনার মর্যাদা মানিস তা হলে পরের প্রতি তোর সমবেদনাও প্রসারিত কর। সংসারে বেদনার ইয়ত্তা নেই, যদি জানিস সে কথা তবে ঘরে বসে কাঁদিস কেন? চল তা হলে বাইরে যেখানে তোর জন্যে প্রতীক্ষা করছে বিধুর জনতা, যেখানেই মানুষ সেখানেই তোর আহ্বান।"

উজ্জয়িনী কী ভাবে। তারপর বলে, "না। আমাকে দিয়ে কারো কোনো কাজ হবার নয়। আমি অকেজো।"

জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে লাঞ্ছিত হয়ে জিজীবিষা হারিয়েছে যে বালিকা তার কানে জীবনের আহ্বান যেন নব পরাজয়ের সূচনা। সিন্দুরবর্ণ মেঘের প্রতি পূর্বে দগ্ধ প্রাণীর যে মনোভাব বৃহত্তর জগতের প্রতি উজ্জয়িনীরও তাই। সে আর জ্বলতে পুড়তে চায় না, পরের জন্যেও না, নিজের জন্যেও না। সে চায় কোনো মতে ভেসে চলতে, কোনো মতে কালক্ষয় করতে। তার কোনো লক্ষ্য নেই। সেই ভালো। লক্ষ্য থাকলে লক্ষ্যভেদের দায় থাকে, পরাজয়ের শঙ্কা থাকে। তার চেয়ে স্রোতের তৃণ হয়ে সোয়াস্তি আছে!

"না, সুধীদা। আমি কারো আহ্বান কানে তুলব না। আমার জীবন ফুরিয়ে নিঃশেষ

হয়েছে, শুধু আয়ুর অবশেষ আছে। এই বেশ। এমনি করে একদিন মরে যাব, তাতে জগতের কোনো ক্ষতি হবে না, কেউ মনেও রাখবে না যে উজ্জয়িনী নামে কেউ ছিল। তখন যদি আমাকে বাদ দিয়ে দুনিয়া চলে তবে আজো অচল হবে না। খবর নিলে শুনবে আজ সেণ্ট মার্টিনসের গির্জা আমার অভাবে শূন্য ছিল না, সার্ভিস আমার খাতিরে বন্ধ ছিল না। বুঝলে ?"

সুধী নিঃস্পন্দ ভাবে শুনে যায়। বলবার কী আছে! বেচারির জন্যে মনটা হায় হায় করে। প্রার্থনা জাগে, কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক, দূরে যাক আত্মলাঘবতা, দূরে থাক জীবন্মৃত দশা।

"তুমি এ বেলা এখানে খাচ্ছ তো ?"

"না, বোন। আমার যে মার্সেলকে দেখতে যেতে হবে।"

"ওহ্! মার্সেল। আমারও ইচ্ছা করে তাকে দেখতে। কিন্তু আজ নয়। আমি একজনকে আসতে বলেছি। তুমি তাকে চেন ?"

"নাম না শুনলে কী করে চিনব ?"

"ললিতা রায়। ওদের সঙ্গে আলাপ হয় আমি যখন খুব ছোট। হঠাৎ চিঠি পেয়ে চমকে উঠলুম। আমার তা হলে সত্যিই এক সময় বারো তেরো বছর বয়স ছিল। এখন তো বুড়ী বললেও চলে, চুল পাকতে বাকী, এই যা তফাৎ। ললিতা কেমন হয়েছে দেখতে হচ্ছে একবার! ওকে লণ্ডন ঘোরাতে হবে, অনুরোধ করেছে। তুমি নেবে এ ভার ?"

সুধী সন্ত্রস্ত স্বরে বলে, "রক্ষা কর। ওদিকে অশোকা আর মার্সেল, এদিকে তুই আর আণ্ট এলেনর, মাঝখানে আমার কোয়েকার বন্ধুরা। তা ছাড়া মিউজিয়াম তো আছেই। আমার চেয়ে লণ্ডনের দৃশ্য তুই বেশী দেখেছিস।"

"আমি নড়তে নারাজ। ললিতাকে কার উপর গছাব তাই ভাবছি। অমন একজন নামকরা কালো মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরতে আমার স্বদেশীয় বন্ধুদের সরমে বাধবে। ইংরেজ বান্ধবী ছাড়া অন্য গতি নেই।"

সুধী উঠতে চাইলে উজ্জয়িনী হাত ধরে বসিয়ে দেয়। বলে, "মার্সেল কিছু মনে করলে আমার কথা বোলো। বোলো তার নাম না জানা দিদির কাছে ছিলে। তার জন্যে এক বাক্স চকোলেট দেব। একটা ছোট্ট ডল আছে আমার, সেটাও দেব।"

রবিবারে মিসেস গুপ্ত বাড়ী থাকেন না, সাধারণতঃ লণ্ডনের বাইরে যান। সন্ধ্যায় ফেরেন। উজ্জয়িনীর সেদিন চিড়িয়াখানায় যাওয়া চাই, তা ছাড়া সুধীদার আগ্রহে গির্জায়। কাজেই মার সঙ্গে সেদিন তার সম্পর্ক থাকে না। ইদানীং চিড়িয়াখানাতেও তার অরুচি ধরেছে। কী হবে কোথাও গিয়ে! বাড়ীর মতো আরাম নেই বাইরে।

"তারপর সুধীদা। চুপ করে রইলে যে ? বল কিছু। অন্তত আমাকে আরো বকবক করাও।"

"ভাবছি তোর জন্যে কী করতে পারি।"

"কিছুই করতে হবে না। শুধু মাঝে মাঝে আসবে, রাঁধতে বলবে, খাবে। যদি রান্নায় ইস্তফা দিই তবে ক্ষমা করবে। এই আর কী। মোট কথা, ভুলো না।"

"তুই বড় বেশী ভেঙে পড়ছিস। অমন করলে ক'দিন বাঁচবি ?"

"বাঁচতে কে চায় !"

"ছি। ও কথা বলতে নেই। জীবন কি তোর নিজস্ব সম্পত্তি ? যিনি তোকে দিয়েছেন তিনি স্বয়ং না নিলে তোর সাধ্য কী যে তুই ফেরৎ দিবি ? বাঁচতে হবেই, ইচ্ছা না থাকলেও বাঁচতে হবে। বাঁচতে যখন হবেই তখন সাধ করে কষ্ট পাস কেন ?"

"কষ্ট কি সাধ করে পাচ্ছি ? কোনো সাধই আমার নেই—না কষ্টের, না সুখের। সময় কাটে না বলে তাস খেলি, নভেল পড়ি। ঘুম আসে না বলে রাত জাগি। ক্ষিদে পায় না বলে হাত গুটিয়ে তোমাদের খাওয়া দেখি।"

"তোর চেয়ে যারা অসুখী তাদের দিকে চেয়ে দেখলে তোর অসুখ সারবে, সেই একমাত্র ওষুধ।"

"আমি তো ওদের দিকে চেয়ে দেখব। আমার দিকে চেয়ে দেখবে কে ?"

"কেউ না কেউ দেখবে।"

"তাতে আমার মন মানে না।" উজ্জয়িনী উত্তেজিত হয়।

"তোমরা কত মানুষ তো দেখছ, ফল কী হচ্ছে ! আমার যে কোনখানে বাজছে তা তোমরা নির্ণয় করতেও অপারগ। তুমি তো আমাকে ভালো করেই চেন, শুধু চোখে দেখছ তাই নয়। তবু আমার অসুখের ইতিহাস তুমি কী জান ?"

সুধী উত্তর করে না।

"কিছু মনে কোরো না, ভাই। আমি তোমাকে খোঁটা দিচ্ছিনে। আমি যা বোঝাতে চেষ্টা করছি তা এই যে তোমার মতো প্রাজ্ঞ পুরুষ যখন আমার সম্বন্ধে এত জেনেও নিশ্চিত বিষয়ে অজ্ঞ, সুতরাং অসুখ সারাতে অক্ষম, তখন সামান্য মানুষ আমি আর পাঁচজনের অসুখ চোখের দেখা দিয়ে সারাব ?"

সুধী মোলায়েম স্বরে প্রতিবাদ করে। "আমি তো বলিনি যে তুই অসুখ সারাবি। আমি বলেছি তোর অসুখ সারবে।"

উজ্জয়িনী হেসে বলে, "হেঁয়ালি।"

"তুই বোধ হয় ভাবছিস তোকে আমি নার্স হয়ে হাসপাতালে যেতে বলছি। তা নয়। অসুখ হল তোর, তুই কেন যাবি পরের অসুখ সারাতে ? না, আগে সেরে ওঠ তুই নিজে,

কিন্তু সেরে ওঠার একটা পদ্ধতি আছে। ঘরে বসে মাথাব্যথা সারে না, বাইরে বেড়াতে হয়। তেমনি মনের ব্যথার প্রতিকার হচ্ছে নিজের মনের বাইরে বেরিয়ে পরের মনের সঙ্গে পায়চারি করা।"

"বুঝেছি।" উজ্জয়িনী চিন্তা করে। "বুঝেছি। কিন্তু তাতে কি সত্যি কোনো ফল হবে? হয়তো আমার চেয়ে আরো অসুখী আছে। কিন্তু ঠিক আমার মতো কেউ নেই, থাকতে পারে না। থাকলেও আমার অসুখ সারবে না, সারবার নয়, সুধীদা। এক যদি—" এই বলে সে হঠাৎ উঠে যায়।

৫

জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়ায়। বাইরেও বর্ষণ, ভিতরেও বর্ষণ সব ঝাপসা দেখায়। চোখের জলে না মেঘের জলে?

আবছায়ার মতো দেখে জীবনের শোভাযাত্রা চলেছে। চলেছে দিকে দিকে, পলে পলে। চলেছে অবিচ্ছিন্ন স্রোতে। কারা এরা? কোনখান থেকে আসছে এরা? কোথায় এরা যাচ্ছে? কোনখানে এদের সত্যিকার দেশ? সে কি এই পৃথিবী? কেমন করে তা হবে? স্বয়ং পৃথিবীও তো যাত্রী। তারও ঠিকানার ঠিক নেই, মানুষের মতো তারও মরণ অনিবার্য। স্বয়ং সূর্যেরও শৌর্য ক্ষয়িষ্ণু। তারও আয়ুর শিখা এক দিন দপ করে নিবে যাবে। আকাশের তারাদের কী আমি সুধাব? ওরাও শঙ্কায় সংশয়ে কম্পমান। এত বড় জগতে কেউ নেই, কেউ নেই, যার কাছে জিজ্ঞাসার উত্তর আছে।

কোথায় আমার সত্যিকার দেশ? কোথায় আমার সত্যিকার কাজ? তা যদি না জানি তবে মিথ্যা খেটে প্রাণপাত করে কী হবে? মানবজাতি! হায় রে! কত দিন তার মেয়াদ! হাজার হোক পৃথিবীর চেয়ে তো বেশী নয়। মানবতা, মানবতা বলে যতই হাঁক ছাড় মানবতা যেন ভাসমান তৃণদের তৃণতা। ভাসমান তৃণদের সেবায় ভাসমান তৃণকে আহ্বান করা এক তামাশা। নিজেকে বাঁচাতে পারে না, পরকে বাঁচাবে? বাঁচালেই বা ক'দিনের জন্যে বাঁচাবে? তৃণগণ দল পাকালেও বাঁচে না, একা থাকলেও বাঁচে না, তবে একত্র হলে কতকটা ভরসা পায় বটে, তাই গির্জায় যাওয়া। ছাই ভরসা! একজন ডুবলে অন্যেরা টেনে তুলতে পারে না, কেউ বা সঙ্গে ডোবে, কেউ বা মাথায় হাত দিয়ে ভেসে যায়, একে একে ডুবে যায়।

কেন আসি, কেন ভাসি, কেন ডুবি, কী আমার পরিণতি কিছুই জানিনে, বুঝিনে, সুধালে উত্তর পাইনে। আমাকে দিয়ে আমারই মতো জনকয়েক তৃণের কতটুকু উপকার হবে, ভাসমানকে দিয়ে ভাসমানের কী কল্যাণ! ওদের দিকে চেয়ে দেখলেই কি ওদের আসল অসুখ সারবে? আর আমার অসুখ? হায় রে! আমার অসুখ যে ভাসমানতার

অধিক। আমি শুধু স্রোতের ফুল নই, এপ্রিল ফুল। আমার বিয়ে যদিও এপ্রিলের পয়লা তারিখে হয়নি তবু সে দিনটা ছিল বর্ণচোরা পয়লা এপ্রিল।

"তুমি ভেবো না, ভাই সুধীদা। আমার অসুখ আপনি সারবে! মৃত্যু একদিন ঘটবেই। ভয় পেয়ো না, আমি আজ এখনই মরতে বসিনি। যদিও এক একবার মনে হয় জানালা দিয়ে লাফ—"

"ছি। অমন কথা মুখে আনতে নেই। মনেও আনিস নে।"

"কিন্তু কেন বাঁচব?"

"বাঁচলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাবি।"

"এত কাল বেঁচে যা পেলুম না আর কত কাল বাঁচলে তা পাব? বরং যতই বাঁচছি ততই বোকা বনছি। জীবনে যে আমাকে পদে পদে বঞ্চনা করছে।"

"না, বোন। জীবন কাউকে বঞ্চনা করে না। জীবনের সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনার কারবার নয় যে পদে পদে হিসাব রাখতে হবে কী হারালুম, কী পেলুম। জীবনের প্রিয় পাত্র বলে যাদের মনে হয় তাদেরও লোকসান অনেক, তাদেরও ধারণা তারা ঠকেছে।"

উজ্জয়িনী মাথা নেড়ে বলে, "ওসব শুনব না। আমি যে ঠকেছি তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। অন্যের ঠকা না ঠকায় আমার কী যায় আসে? বরং এই প্রমাণ হয় যে মানুষমাত্রেই অসহায়। জীবন আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা করছে। আমরা তার হাতের ক্ষণভঙ্গুর খেলনা।"

"এক দিক থেকে দেখতে গেলে তাই বটে। যিনি সোনার কাটি রুপার কাটি নিয়ে খেলা করছেন তাঁর হাতে আমাদের জীবন মরণ সুখ দুঃখ আশা নিরাশা সব সমান। কিন্তু বঞ্চনা কোথায়? সে শুধু আমাদের কল্পনায়। আমাদের অভিমানে। আমাদের ভ্রমে।"

"তুমি তো সব জান!" উজ্জয়িনী রুষ্ট হয়। "আমি যে কষ্ট পাচ্ছি তা আমার কল্পনায়—"

"তুই যে কষ্ট পাচ্ছিস তা কাল্পনিক নয়, তা বাস্তবিক। কিন্তু তা বলে তোকে কেউ বঞ্চনা করেছে এমন নয়। যা ঘটা বিচিত্র নয় তাই ঘটেছে। সব ঘটনার নায়ক যিনি তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য কালের। তাঁর যেমন আমরা খেলনা তেমনি খেলার সাথীও। তাঁর অন্তরঙ্গ বলে আমাদের নিত্যকার মূল্য রয়েছে। আমরা যে অমূল্য। আমাদের মূল্য হতে আমাদের কে বঞ্চিত করবে?"

"কী জানি! যে মানুষ কষ্ট পায় তার একমাত্র ভাবনা কেমন করে কষ্ট শেষ হবে। আমি তো মনে করি বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না, যদি বেঁচে থাকার সঙ্গে কষ্ট

জড়িয়ে থাকে। তারপর দুদিন বেশী বেঁচেই বা হবে কী, মরণ যখন অনিবার্য ? হাসপাতালের নার্স হয়ে রোগীকে বাঁচিয়ে আনন্দ কোথায়, লোকটা যদি ত্রিশ বছর পরে মরবেই ? আর মরণ যদি আরাম আনে তবে দুদিন আগে আনলেই তো আরো ভালো হয়।"

সুধী সমবেদনায় বিধুর হয়। বলে, "মৃত্যুকে তুই চরম বলে ধরে নিয়েছিস, কিন্তু সেইখানে তো সমাপ্তি নয়। আর্টের খাতিরে গল্প এক জায়গায় শেষ করতে হয়। তা বলে সেইখানেই কি শেষ ? পাঠক সে রকম মনে করতে পারে, কিন্তু লেখক তো জানেন আরো আছে।"

"আমাদের জীবন কি এক একটি গল্প ?"

"হাঁ, তাই। এক একটি ছোট গল্প। কোনো কোনোটি এত ছোট যে এক এক ফোঁটা অশ্রুর মতো করুণ।"

"শেষের পরেও আরো আছে ? আরো জীবন ? আরো গল্প ?"

"হাঁ, ভাই। তার পরেও আরো আছে। আরো জীবন, আরো গল্প। আরো দুঃখ, আরো কষ্ট। আবার আনন্দও আছে—রসের আনন্দ, আর্টের আনন্দ। যিনি আমাদের স্রষ্টিকর তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন যে বিদায় দিয়েও বিদায় দিতে চান না, বিদায় দিয়ে ফিরিয়ে আনেন, আমরা যে তাঁর নিত্যলীলার লীলাসাথী।"

উজ্জয়িনী সুধীর কাছে সরে এসে বলে, "তবে এত দুঃখ দেন কেন ? আমি যে সইতে পারিনে।"

"তাঁর দৃষ্টিতে দুঃখ নয়, আনন্দ। আর সইবার সঙ্গী তিনি স্বয়ং। অন্যের সুখের সঙ্গে তুলনা করি বলে ক্ষুব্ধ হই, সেই ক্ষোভে অন্ধ না হলে লক্ষ করতুম তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। সাংসারিক উদ্বেগ এসে অতিষ্ঠ করে তোলে, নইলে দুঃখকেও উপভোগ করতুম অকারণ পুলকের মতো।"

"বিশ্বাস হয় না, সুধীদা, বিশ্বাস হয় না।"

"কী বিশ্বাস হয় না ?"

"কিছুই বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না যে তিনি আছেন। বিশ্বাস হয় না যে জীবন মরণ সুখ দুঃখ সব সমান।"

"তবে তোর কী বিশ্বাস হয় তাই বল।"

"কিছুই না। মানুষ এমন নিঃসহায় যে তার পক্ষে বিশ্বাস করা না করা দুই বৃথা। যারা করে তারাও পশতায়, যারা করে না তারাও পশতায়। আমি বিশ্বাস করে ঠকেছি। না করেও ঠকব, তাও জানি।"

সুধী মৌন থেকে বলে, "তবে তুই অন্তত এটুকু বিশ্বাস করিস যে তুই আছিস ?"

"ওটুকু করি।"

সুধী ঈষৎ হেসে বলে, "ওটুকুর মধ্যে সমস্ত রয়েছে। ওটুকু বিশ্বাস করলে সবটা বিশ্বাস করা হয়।"

"আমি যদি থাকি তবে আমার অন্তরতম যিনি তিনিও থাকেন, যাঁর অন্তরস্থ আমি তিনিও থাকেন। আমি ঢেউ, সমুদ্র আমার ভিতরে ও বাইরে। আমি অঙ্গ, সমগ্র আমাকে নিয়ে ও আমাকে ভরে। আমি তো বিচ্ছিন্ন নই, আমি তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, অভিন্ন। আমি যদি থাকি তবে তিনিও থাকেন। বরং তিনি আছেন বলেই আমি আছি। তিনি সূর্য, আমি তার কিরণ।" বলতে বলতে সুধী তন্ময় হয়।

উজ্জয়িনী বিমূঢ়ভাবে তাকায়। কী ভেবে বলে, "তবে মৃত্যু কেন?"

"মৃত্যু? মৃত্যু বলতে এই বুঝি যে আমার নয়, আমার একটি সম্ভাবনার অন্ত হল। আরো অযুত সম্ভাবনা রয়েছে, অশেষ আমার সম্ভাবনা। যা হয়ে উঠেছিল তা হয়ে চুকল, কিন্তু যা হয়ে ওঠেনি তেমন অনেক হয়ে ওঠা সামনে আছে। মৃত্যু কি আমার মৃত্যু? আমার অতীতের। আমি নিত্য বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ অবারিত।"

উজ্জয়িনী চুপ করে ভাবে। সুধী ওঠে। যাবার সময় বলে, "আত্মার স্বাভাবিক ঐশ্বর্যে আস্থা রাখিস। আত্মা এমন ধনে ধনী যে জীবন তাকে কীই বা দিতে পারে, মরণ তার কীই বা কেড়ে নিতে পারে! সুখ দুঃখ দুই তার সমান, কারণ সে সমান অনাসক্ত। একটিমাত্র প্রার্থনা আছে তার। সে চায় পরমাত্মার সঙ্গ। ভিতরে ও বাইরে তাঁকে নিত্য পেতে চায়, নইলে যেন তার আপনাকেই পাওয়া হয় না। তাঁর সঙ্গ হতে বঞ্চিত হওয়াই একমাত্র বঞ্চনা। উজ্জয়িনী, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে তুই পূর্ণ হবি।"

৬

"আমাকে চিনতে পারছ, বেবী?"

উজ্জয়িনী চোখ মুছে দেখে সুধীদা কখন চলে গেছে, সামনে দাঁড়িয়ে একটি কালো-পানা মেয়ে, কালোপানা ও রোগাপানা, বয়সে বড় হলেও দেখতে তার সমবয়সী। ইনিই ললিতা রায়, এক কালে তাকে পড়িয়েছেন। এক ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়, বিয়ের পর মাদ্রাজে না কোথায় চলে যান। বছর ছয় সাত পরে এই প্রথম সাক্ষাৎ।

"কেন চিনতে পারব না, ললিতাদি? আপনি যে একটুও বদলাননি। আসুন। কী করে এলেন?"

ললিতা উজ্জয়িনীর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, "কই, আর কাউকে দেখছিনে? মা কোথায়?"

"ব্রাইটনে। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না।"

"তাই নাকি ?" উজ্জয়িনীকে মুক্তি দিয়ে, কিন্তু কাছে বসিয়ে, বললেন, "তারপর ? বিয়ে হয়েছে শুনলুম। বর কোথায় ?"

"কার কাছে শুনলেন ? মিছে কথা।"

"ওমা, তাই নাকি। তবে তো ভুল শুনেছি।"

"না, ঠিকই শুনেছেন। তবে হওয়া না হওয়া দুই সমান।" সুধীর উক্তির অনুকরণে বলে, "কারণ আমি সমান অনাসক্ত।"

ললিতা বুঝতে না পেরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। কিন্তু কিছুই ভেদ করতে পারেন না। কী ভেবে বলেন, "হু"। গ্রাস উইডো। বিরহিণী।"

প্রতিবাদ করতে পারত, করতে রুচি হল না। বলল, "আপনার খবর তো বললেন না।"

"আমার খবর।" উদাস স্বরে বললেন ললিতা, "আমার খবর আমার কপালে লেখা আছে। এখনো পড়নি ?"

উজ্জয়িনী কী একটা বিষাদের আভাস পায়, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারে না কী ব্যাপার।

"কেমন ? সিঁথিতে লেখা নেই ?"

উজ্জয়িনী চমকে ওঠে। এত অল্প বয়স। আহা ! এই বয়সেই ! মুখ ফুটে জানাতে চেষ্টা করে, মুখ দিয়ে কথা সরে না। হাতে হাত রাখে।

এই তো জীবন। একজন স্বামীর প্রেম লাভ করেনি বলে জর্জর, আরেক জনের প্রেমের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেন এমন হয় ! ভগবান যদি আছেন তবে এসব কেন আছে !

"শুনছিলুম তোমার বাবাও—"

"হাঁ, তিনিও—"

দুজনেই চোখে রুমাল চাপে। কে কাকে সান্ত্বনা দেয় ! সামলে নিয়ে বলে উজ্জয়িনী, "আপনাকে কিছু পানীয় দিতে পারি ?"

"কাকে ? আমাকে ? না, থাক।"

"তবে খাবার দিতে বলি ?"

"আচ্ছা। খেতে যখন হবেই।" বৈরাগ্যের স্বরে বললেন ললিতা। "কিন্তু আমি যে বড় কম খাই তা বোধ হয় তোমাকে লিখতে ভুলে গেছি।"

"লিখেছেন, ললিতাদি। না লিখলেও চলত, কেননা আমারও আয়োজন স্বল্প। আসুন, আমাদের ফ্ল্যাট ঘুরে দেখুন।"

ললিতা উঠলেন। "কে ভেবেছিল তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ? তাও কিনা লণ্ডনে।"

"বাস্তব হচ্ছে কল্পনার চেয়ে অদ্ভুত। কিন্তু আমাকে আপনি ভুলে যাননি এর মতো আশ্চর্যের কী আছে।"

চলতে চলতে ললিতা বললেন, "বেশ মেয়ে! তোমাকে ভুললে আমার জীবনের কয়েকটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ বৎসর ভুলতে হয়। জীবনে রাশি রাশি সুখ পাইনি যে কণা-মাত্র ভুলতে পারি, বেবী।"

"কেন, ললিতাদি? আমরা তো মনে করতুম আপনার মতো ভাগ্য ক'জন—" বলতে যাচ্ছিল ক'জন কালো মেয়ের। বলল, "—মেয়ের!"

ললিতা তার মুখ দেখে বুঝলেন কোন শব্দটি উহ্য। হেসে বললেন, "সত্যি, কালো মেয়ের কপালে অমন সৌভাগ্য হয় না। হলে সয় না।"

উজ্জয়িনী এ কথা গায়ে পেতে নিল। ললিতা কি এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন?

"তা কী করব বল? বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করে কে কোন দিন জিতেছে? তিনি মাথা হেঁট করে মাটিতে মিশিয়ে দেন। একটু অহঙ্কার করেছি কি মরেছি। তুমি ছেলে-মানুষ, তুমি ঠিক বুঝবে না।"

"আপনিও বুড়োমানুষ নন।"

"নই? কী জানি। আমার তো মনে হয় আমার বয়স সত্তর বছর। আমার জীবন ফুরিয়ে এসেছে। বেঁচে আছি, কারণ না বেঁচে পারিনে।"

"আমারও," উজ্জয়িনী একমত হয়, "অনেক সময় সেরকম লাগে।"

"তোমার?" ললিতা বিস্মিত হন। "কোন দুঃখে?"

"আছে, ললিতাদি, আছে কোনো দুঃখ। জগতের সব দুঃখ কি আপনি নিঃশেষ করেছেন?"

"অধিকাংশ। বিয়ের পর থেকে একটা না একটা লেগে আছে।"

"আমারও।" উজ্জয়িনী প্রকাশ করে দিল।

ললিতা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "না, বিশ্বাস করব না। তোমার বয়সের মেয়েরা নিজেদের যতটা দুঃখিনী ভাবে আসলে ততটা নয়। ওটা তোমাদের বয়সের অতিরঞ্জন।"

উজ্জয়িনী আহত স্বরে বলে, "আমার বয়সের মেয়েদের কথা জানিনে, কিন্তু আমার কথা জানি। শুনলে বিশ্বাস করবেন।"

ফ্ল্যাট পরিদর্শনের পর ললিতাদিকে নিয়ে খেতে বসল উজ্জয়িনী। ললিতা যা খেলেন তার চেয়ে না খেলেন অনেক বেশী। উজ্জয়িনী এই ভেবে লজ্জিত হল যে একজন দুঃখিনীর পক্ষে তার আহার কম নয়।

ললিতা বললেন, তিনি লণ্ডনে কয়েক দিন কাটিয়ে ইংলণ্ড স্কটলণ্ড আয়ারলণ্ড

বেড়িয়ে আমেরিকা যাবেন। সেখান থেকে জাপান।

"আমারও ভালো লাগে না এদেশে পড়ে থাকতে। আমিও আপনার সাথী হব। যদি রাজি হন।"

"তা হলে তো চমৎকার হয়। তোমার মা কিন্তু রাজি হবেন না।"

"কেন হবেন না। আমি গেলে তিনি নিষ্কণ্টক হবেন।"

"তাই নাকি। আচ্ছা, তিনি না হয় নিষ্কণ্টক হলেন। কিন্তু তোমার কর্তা।"

উজ্জয়িনী লজ্জার মাথা খেয়ে বলে, "তিনিও।"

ললিতা গম্ভীর হন। উজ্জয়িনীর লজ্জা ফিরে আসে দারুণ বেগে। সে কী একটা অছিলায় উঠে যায়।

"আগে তো আমাকে লণ্ডন দেখাও।" ললিতা বললেন। "তারপরে তোমার মা'র মত নিয়ে যা হয় হবে।"

"কেন, আমি নাবালিকা নাকি।"

"নাবালিকা কিনা জানিনে। আমার চোখে তো বালিকা।"

"আমি যাবই। আমার দায়িত্বে আমি যাব।" উজ্জয়িনী ক্ষেপে যায়।

"এই দেখ। এসব কী ব্যাপার বল দেখি। তোমার মা ভাববেন আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে পালাতে। তোমার কর্তা—"

উজ্জয়িনী মুখ টিপে বলে, "স্বয়ং পলাতক।"

"না। না। স্বামীর নামে যা তা লাগাতে পারবে না। তোমাকে সহ্য করতে হবে, নম্র হতে হবে। সিঁথির সিঁদুর যে কত বড় সৌভাগ্য তা তুমি হৃদয়ঙ্গম করনি। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে ক'জন! তুমি কেন ভাগ্যহীনার সঙ্গ নেবে।"

"আপনি," উজ্জয়িনী প্রত্যয়ভরে বলে, "আমার জীবনের সন্ধিক্ষণে এসেছেন। আমি পথ খুঁজে মরছিলুম, পথ যে এত সহজে পাব তা কি জানতুম! হঠাৎ কোন দিক থেকে আপনি কেনই বা আসবেন, যদি আমার প্রয়োজনে না আসেন!"

ললিতা অভিভূত হয়ে উজ্জয়িনীর দিকে তাকান। এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নয়, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। এই ভেবে তাঁর চোখে জল আসে যে তাঁকে কারো প্রয়োজন হতে পারে। দেশ ছেড়ে যেদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন সেদিন কেউ তাঁর সাথী হয়নি, আজ তাঁর এই মায়ার বাঁধন জুটল।

"বেবী, আমার কাছে এসে বোস।"

৭

ফরেস্ট অফিসারকে বনে বনে বিচরণ করতে হয় মাসের অধিকাংশ দিন। ললিতার স্বামী নিবারণ রামের মতো বনবাসে গেলে ললিতাও সীতার মতো তাঁর সঙ্গে যেতেন, কায়িক

ক্লেশ গ্রাহ্য করতেন না। তখনকার দিনে তিনিও স্বামীর মতো হাফ প্যাণ্ট পরতেন, হাফ প্যাণ্ট ও হাফ শার্ট। স্বামীর মতো বন্দুক নিয়ে তিনিও গুলি ছুঁড়েছেন। হাতী মারতে পারেন নি, বাঘ মারতে চেষ্টা করেছেন, চিতা মেরেছেন।

তারপর অসুস্থ হয়ে বনে যাওয়া বন্ধ করলেন। তার ফলে স্বামীর সান্নিধ্য হারালেন। স্বামী সদরে আসেন কখনো তিন সপ্তাহ পরে, কখনো চার সপ্তাহ পরে। থামেন ফাইল জমে থাকলে, নতুবা বিশেষ থামেন না। নিবারণের এটা বাড়াবাড়ি। তাঁর বিশ্বাস তিনি জঙ্গলে না গেলে গাছ পাতা বাঘ ভালুক যেখানে যা আছে সব চুরি যাবে, সরকারী জমিতে গ্রামবাসীর গোরু চরবে, সরকারী নালায় জেলেরা মাছ ধরবে। অধীনস্থ রেন্‌জার ও গার্ডগুলো ঘুষখোর, সিঁদেল চোরকে ছেড়ে দিয়ে ছিঁচকে চোরকে পাকড়ায়, তাই তাদের উপর হরদম নজর রাখা চাই। শুধু কি অধীনস্থ কর্মচারী? বড় বড় সাহেবরা শিকার করতে গিয়ে সরকারী বাংলার ছুরি কাঁটা প্লেট পর্যন্ত সরিয়েছেন এমন উদাহরণ আছে। নিবারণ নাছোড়বান্দা, নালিশের ভয় দেখিয়ে সে সব মাল উদ্ধার করেছেন।

অনবরত জঙ্গলে বেড়িয়ে নিবারণ হয়েছিলেন জঙ্গলের জীব। লোকালয়ের লোকদের তিনি অবজ্ঞা করতেন। ওগুলো কি মানুষ! মানুষ হবে দুর্দমনীয়, দুরন্ত, ভাবনাহীন, ভীষণ। মানুষ হবে আরণ্যক, যাযাবর, এক স্থানে থাকবে না দুরাত্রি। মানুষের পক্ষে রুগ্ন হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ, সে অপরাধের একমাত্র দণ্ড মৃত্যু। নিবারণের চেহারাটিও বনমানুষের মতো। চিরকাল অমন ছিল তা নয়, ছাত্রবয়সের ফোটো একটি নিরীহ নধর সুবোধ বালকের। বনে বনে বিচরণ করে, বাঘ ভালুক শিকার করে, অধীনস্থদের নাসপেণ্ড ও ডিসমিস করে, বনচরদের ধরপাকড় করে, গণ্যমান্যদের সঙ্গে ঝগড়া করে সেই মানুষ শেষে বনমানুষ বনেছেন। যেমন গুণ্ডার মতো জোর তেমনি মুণ্ডার মতো চাল। ভদ্র সমাজে তাঁকে মানায় না, তিনিও ভদ্র সমাজের শ্রাদ্ধ করেন। বলেন, ভদ্রতা মানে ভণ্ডতা ও ভীরুতা।

মানুষের সমাজে মেলামেশা করতে যতটুকু আদবকায়দা দরকার ততটুকুও নিবারণ মানতেন না, যে কয়দিন সদরে থাকতেন তারই মধ্যে এমন এক একটা বেয়াদবি করে বসতেন যে তার জের অনেক দূর গড়াত। কাজেই ললিতাকে কতকটা একঘরের মতো থাকতে হত। নিবারণ বনে গেলে তিনিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন। অথচ স্বামীর জন্যে মন কেমন করত। তিনি বেশ বুঝতেন তাঁর স্বামী বন ব্যতীত অন্যত্র সুখী হবেন না, শহরে তাঁর আকর্ষণ নেই। অপর পক্ষে তিনিও স্বামীর সঙ্গে বনে যেতে পারবেন না, গেলে ভুগবেন ও ভোগাবেন। এই যে সমস্যা এর কি কোনো মীমাংসা আছে? বনের পাখীর সঙ্গে খাঁচার পাখীর কি সামঞ্জস্য হয়? তিনি ভেবে কূল পেতেন না, তবু ভাবতেন।

অপটু শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন অথবা বারান্দায় বসে সেলাই করেন। আশা করেন হয়তো একদিন সামর্থ্য ফিরবে, তখন স্বামীর সঙ্গে আবার বনবাসী হবেন। আপাতত এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তা দেখে নিবারণ বলতেন, "হল কী! এই বয়সেই ইনভ্যালিড। ইচ্ছা করলেই তুমি বাঘিনীর মতো বলবান হতে পারো। হচ্ছ না, তার একমাত্র কারণ ইচ্ছা নেই। আরাম করে শহরে থাকতে চাও, সমাজে থাকতে চাও, তাই তোমার শরীর সারে না। প্রকৃতি মানুষকে গড়েছে বনের উপযোগী করে, আমাদের শরীর যেন বনের প্রাণী। তাকে এনে শহরের চিড়িয়াখানায় পুষলে সে টিকবে কেন?"

ললিতা বলতেন, "বনেও যে টেকে না। যদি সেখানে গিয়ে রোগে ভুগি তবে কি তোমার ভালো লাগবে?"

"রোগে ভুগবে কেন? রোগে ভোগা অন্যায়।"

"আমি কি ইচ্ছা করে ভুগব বলছি? যদি ভুগি—।"

"যদি টদি মানিনে। রোগে ভুগলে এই ধরে নিতে হয় যে সুস্থ থাকবার সংকল্প নেই, সংকল্প নেই বলে শক্তি নেই। দেখছ তো আমাকে। আমার অসুখ করলে আমি কেয়ার করিনি, দ্বিগুণ উৎসাহে ঘুরি। কই আমার তো শরীর ভেঙে পড়ে না?"

শেষকালে এর মীমাংসা হল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ললিতার একটি খোকা হল। খোকাটি দেখতে এত সুন্দর যে ললিতার তৃপ্তি হত না তাকে দেখে। খোকাকে নিয়ে তার দিন রাত কাটত, খোকার জন্যে খাটতে খাটতে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হল।

ললিতার আশা ছিল খোকার টানে তার বাবা সদরে বেশীর ভাগ সময় কাটাবেন, কিন্তু নিবারণের অভ্যাস ক্রমে নেশায় পরিণত হয়েছে। তিনি খোকাকে সুদ্ধ, জঙ্গলে টানতে চান।

"এখন থেকেই একে অরণ্যের দীক্ষা দিতে চাই, তবে তো হবে মানুষের মতো মানুষ। নইলে হবে সভ্য মানুষ, নরম মানুষ, ঠুনকো মানুষ। তেমন মানুষের বরাতে আজ ডাক্তার, কাল হোমিওপ্যাথ, পরশু কবিরাজ, তরশু যমরাজ।"

তিনি অবশ্য জানতেন না যে তাঁর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। যখন ফলল তখন তিনি মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে মনোমালিন্য ঘটল। ললিতা দোষ দিলেন নিবারণকে। বাপ হয়ে ছেলের জন্যে দরদ নেই, রুগ্না স্ত্রীর ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজে ফেরার, এরই নাম মনুষ্যত্ব! নিবারণ সে দোষ মাথা পেতে নিলেন। অনুতাপে তাঁর মন হু হু করতে লাগল। ছুটির দরখাস্ত পেশ করলেন, যদি পান তবে স্ত্রীকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণ করবেন।

সংসার ললিতার কাছে বিষের মতো লাগল। এমন কি স্বামীকেও তিনি বিষ

নজরে দেখলেন। তখন থেকে তাঁর সাধনা হল হৃত পুত্রের অন্বেষণ। সেই অন্বেষণ সমাপ্ত হয়নি, তাকে তিনি খুঁজছেনই! যার যাবার কথা নয় সে কেন যায়, কত সহজে যায়, কোথায় যায়, কত দূরে যায়। যার বৃহৎ ভবিষ্যৎ, সুদীর্ঘ আয়ু, প্রচুর প্রতিশ্রুতি সে সহসা অন্তর্হিত হল, কিছুই পেয়ে গেল না, দিয়ে গেল না। নিয়তির যদি একজনকে নিতে ইচ্ছা ছিল তবে ললিতাকে নিতে পারত, তিনি রাজি ছিলেন।

সে যে চিরতরে গেছে তা বিশ্বাস হয় না, সে যে একেবারে গেছে তা বিশ্বাস হয় না। তা যদি বিশ্বাস হয় তবে জগতের উপর জগদীশের উপর অবিশ্বাস জন্মায়, জীবনে ঘৃণা ধরে যায়। কত বার আত্মহত্যার কথা মনে উদয় হয়েছে, কিন্তু তাতে হয়তো পাপ হবে, পাপের ফলে প্রিয়জনকে পাবে না। হারানোর দুঃখ দুর্বহ, কিন্তু ফিরে না পাওয়ার দুঃখ অনন্ত।

ললিতা জানতেন না নিবারণের শোকের ধারা অন্তঃসলিলা বইছে। একদিন তিনি জঙ্গল থেকে ফিরলেন জ্বর নিয়ে।

চিকিৎসা চলল, কিন্তু জ্বরটা কিসের তা নির্ণয় হল না। নিবারণ ললিতার একটি হাত ধরে বললেন, "আমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। এবার আমি যাব।"

"যাবার আয়োজন করছি। মাদ্রাজে গেলে ঠিকমত চিকিৎসা হবে।"

"না, মাদ্রাজে নয়। বিশ্বভ্রমণে।"

"হাঁ, সেরে উঠলেই বিশ্বভ্রমণে।"

"না, সেরে উঠলে নয়।"

ললিতা স্তম্ভিত হলেন। নিবারণ ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "অসুখ একটা অপরাধ। আমাকে দণ্ড দাও, ললিতা। কিছু খাইয়ে দাও। যদি সাহস না থাকে তবে আমার পিস্তলটা দাও।"

মাদ্রাজে সাব্যস্ত হল ব্ল্যাক ওয়াটার জ্বর। যথাবিধি চিকিৎসা হল। কিন্তু নিবারণের বদ্ধমূল ধারণা তিনি বাঁচবেন না। রোগী যদি রোগের সঙ্গে সংগ্রাম না করে তবে আর উপায় কী! ললিতা কাঁদেন। তা দেখে নিবারণ বলেন, "কেঁদো না। আবার আমাদের দেখা হবে। আমি তো একজনকে দেখতে যাচ্ছি।"

এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন যৌবন! কয়েক দিনের অসুখে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো ক্ষয় হল। অমাবস্যার দেরি নেই দেখে ললিতার শুধু কান্না পায়। তিনি ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা করেন।

মনে হল তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না, সত্যবানকে সাবিত্রী ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিবারণের ইচ্ছা জয়ী হল। নিবারণ বিশ্বভ্রমণে বাহির হলেন—সঙ্গীহীন, একা।

নিবারণের এ যাওয়া অভিমানের যাওয়া। মনোমালিন্যের পরিণাম দেখে ললিতা যেন কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর যদি তেজ থাকত তিনি সহমৃতা হতেন। তিনি দুর্বল, তাই জীবনের মায়া কাটাতে পারলেন না, বেঁচে থাকলেন। বিধাতার ডাক যতদিন না আসে ততদিন অপেক্ষা করতেই হবে, অনাহুত গিয়ে যদি কাউকে না দেখেন।

ললিতাও বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন—সঙ্গীহীন, একা।

অশ্রুমোচন করে উজ্জয়িনী বলল, "দিদি, আপনি বয়সেও বড়, দুর্ভাগ্যেও বড়। আপনার দুঃখের তুলনায় আমার দুঃখ সামান্য।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ললিতা বললেন, "বেবী, কারো দুঃখের সঙ্গে কারো দুঃখের তুলনা হয় না। হলেও দুঃখের উপশম হয় না। যা ভুগতে হবে তা ভুগতেই হবে, উপায় নেই।"

"তবু," উজ্জয়িনী নীরব থেকে বলল, "তবু তো আপনার জীবনে স্বামীর প্রেম এসেছে, তবু তো আপনি সন্তানের মুখ দেখেছেন। এ কি কম আনন্দ! শুধু এইটুকু আনন্দের জন্যে কত লোক কত কী বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তারা তপস্যা করে যা পায়নি আপনি তপস্যা করে বা না করেই তা পেয়েছেন।"

"তপস্যায় মেলে কি না জানিনে। তাই বিনা তপস্যায় পেয়েছি বলতে আপত্তি নেই। তবে পেয়েছি তা ঠিক। নারীমাত্রের যা কাম্য তা আমি সত্যই পেয়েছি। একশোবার স্বীকার করব যে আনন্দের পাত্র আমার পূর্ণ হয়েছিল, উচ্ছল হয়েছিল। এক একবার মনে হতো এত আনন্দ—এত আনন্দ নিয়ে আমি কী করব! কী করে সইব! কিন্তু এও তোমাকে বলি, আমার কথা বিশ্বাস কর—হৃষ্টপুষ্ট সতেজ সবল চতুর চপল শিশু যখন খেলাধুলো ফেলে শয্যায় আশ্রয় নেয়, অব্যক্ত যাতনায় ম্লানমুখে তাকায়, কটুতিক্ত ওষুধ খায়, ইনজেকশনে বিদ্ধ হয়, যখন—"

ললিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হল। তিনি তাঁর উদগত ক্রন্দনের বেগ সংবরণ করতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। উজ্জয়িনী তাড়াতাড়ি তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, তিনি তার হাত চেপে ধরে তাকে আরও কাছে টানলেন।

"বুঝেছি, ললিতাদি, আর বলতে হবে না।"

"শোন। মা হবার আগে শুনে রাখ। মাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারত না যে ছেলে, মার কোলে না বসলে খাওয়া হতো না যার, মাকে জড়িয়ে না ধরলে যার ঘুম আসত না, অন্ধকারে মার স্পর্শ না পেয়ে কেঁদে উঠে বসত যে ছেলে সেই ছেলে যখন মৌন চোখে মিনতি জানায়, মা, মা, আমায় যেতে দিয়ো না, আমায় যেতে দিয়ো না, তখন—"

অনেকক্ষণ অবশ হয়ে পড়ে থাকার পর সহসা সজাগ হয়ে বললেন, "যাক, যা বলতে

যাচ্ছিলুম তা এই যে আমার আনন্দের পাত্র যদি বা পূর্ণ হয়েছিল তা শূন্য হয়েছে। এই বেদনা পোহাতে হবে জানলে সেই আনন্দ কামনা করতুম না। মা হ'য়ে সন্তানকে অসহায় ভাবে তলিয়ে যেতে দেখার চেয়ে মা না হলেই ভালো মনে করতুম। গোড়ায় যে তা মনে হয়নি তা নয়। মনে হলে কী হবে, প্রলোভন যে প্রবল। গলায় যে কাঁটা বিঁধবে মাছ কি তা জানে না? জানলেও আশা করে পালাতে পারবে। নিয়তি যে ফাঁদ পেতে রেখেছে সে ফাঁদে জেনেশুনে পা দিয়েছি, তখন লুব্ধ হয়েছি, এখন ছটফট করে মরছি। তখন যদি দৃঢ়ভাবে বলতুম, না, চাইনে মা হতে তবে কি এখন এই দশা হত?"

"তাতে কী লাভ হত, ললিতাদি? দুঃখ এড়াতে গিয়ে সুখও এড়াতেন। তেমন জীবন থাকা না থাকা সমান।"

"সেও ভালো বেবী, সেও ভালো। এর চেয়ে যে কোনো অবস্থা ভালো, যে কোনো দুর্ভোগ ভালো। যদি কোনো দিন তোমার খেদ হয় যে তুমি মা হবার সুযোগ পাওনি তবে আমার কথা ভেবো।"

উজ্জয়িনী লজ্জায় উচ্চবাচ্য করল না।

"বিয়ের সময়," ললিতা অশ্রুজড়িত স্বরে বললেন, "কত দিবাস্বপ্ন দেখেছি। তখন মনে হত আমার মতো সুখী কে, সৌভাগ্যবতী কে! অনুকম্পা হত সকলের প্রতি। প্রার্থনা করতুম সকলে আমার মতো সুখী হোক। তখনকার দিনে চক্রান্ত চলত দুটিতে মিলে নীড় রচনা করব, সুখের নীড় না হোক, স্বস্তির নীড়, সম্পদের নীড় না হোক, শান্তির নীড়। ভাগ্যের কাছে বেশী কিছু দাবী করিনি, চেয়েছি ঘরে বাইরে সান্নিধ্য ও সাহচর্য। আর চেয়েছি দুটি একটি দেবশিশু, যাদের দিকে চেয়ে সংসার ভুলব, যাদের অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হব। তখন তো খেয়াল হয়নি যে নীড় সুন্দর হলেও নীড় অস্থায়ী : পাখী উড়ে যায়, নীড় ভেঙে যায়। মাটির স্বর্গ মাটি হতে কতক্ষণ লাগে?"

উজ্জয়িনীরও তেমন একটি দিবাস্বপ্ন ছিল। কিন্তু সে কত দিনের কথা। এত দিনে তার অবসান হয়েছে।

"ললিতাদি, যা অস্থায়ী তা কি সেই অপরাধে অগ্রাহ্য? আমিও বলি, আনন্দ যদি একটি দিনের জন্যেও আসে তবে একটি দিনই একটি জীবনের তুল্য।"

ললিতা হেসে বললেন, "বুঝেছি, ভাই, বুঝেছি তোমার গোপন কথাটি। যা পাওনি তাকে তুমি পরম নিধি মনে করেছ। ভেবেছ একটিবার পেলে সারা জীবন সেই আনন্দে কাটবে। তা হয় না, বেবী। সেই একটি দিনের পর আরো অসংখ্য দিন আছে, কাটবে কেমন করে সেই সব অন্তহীন দিন?"

তারপর আপন মনে বললেন, "তার চেয়ে বেশ ছিল আমার আদিম নিরানন্দ, আমার দীন-হীন জীবন। আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে এসব দিলেন কেন তিনি, দিলেন তো

কেড়ে নিলেন কেন ? না পেলে তো আমি নালিশ করতুম না। আমার মতো একটা সামান্য জীবকে ধরতে এত বড় একটা মায়ার ফাঁদ। হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। এক এক সময় ভয় হয় পাগল হয়ে যাব।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে উজ্জয়িনী বলল, "আজ সুধীদার সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল।"

"সুধীদা কে ?"

"আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারল না, ওর কাজ ছিল। আমার দার্শনিক বন্ধু। একদিন আলাপ হবে, হলে দেখবেন আশ্চর্য লোক।"

"বেশ তো। কিন্তু কী নিয়ে তর্ক হচ্ছিল ?"

"জানতে চাইছিলুম কেন বাঁচব।"

"কেন বাঁচব ! বাঃ বেশ বিষয়টি। ডিবেট করার পক্ষে বেশ !" তিনি তামাশা করলেন। "তারপর ? সুধী কী বলেন ?"

"ও বলে, বাঁচলেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে।"

"তার মানে," তিনি পরিহাস করলেন, "আগে তো ফাঁসি যাও, তা হলেই বুঝবে কেন ফাঁসি গেলে।"

"কিন্তু," উক্তিটা উজ্জয়িনীর মনে লাগল ভেবে যুক্তি দেখালেন, "বাঁচন মরণ কি আমাদের হাতে ? যদি আজকেই পরওয়ানা আসে তবে কী উত্তর পেয়ে মরব ?"

"তাই তো।" উজ্জয়িনী সুধীকে সুধায়নি ও কথা।

"এ প্রশ্নের উত্তর আছে কি না সন্দেহ। থাকলে হয়তো মিলতেও পারে।"

উজ্জয়িনী অন্যমনস্কের মতো উচ্চারণ করল, "আছে কি না সন্দেহ।" তারপর বার বার আবৃত্তি করতে থাকল, "কেন বাঁচব ? কেন বাঁচব ? কেন ? কেন ?"

ললিতা কিছুকাল মৌন থেকে সস্নেহে বললেন, "ও প্রশ্ন কিন্তু আমার না, বেবী। আমার প্রশ্ন তোমার দার্শনিক বন্ধুর কাছে তুলবে ?"

"তুলব।"

"আমার প্রশ্ন তোমার প্রশ্নের বিপরীত। তুমি জানতে চাও, কেন বাঁচবে ? আমি জানতে চাই, কেন বাঁচবে না ?" উজ্জয়িনীকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখে বিশদ করলেন, "তুমি জীবনের স্বাদ পেয়েছ, যদিও সাধ মেটেনি তোমার। তোমার পক্ষে বলা সাজে, জীবন নিয়ে কী করব ? কিন্তু জীবনের সিংহদ্বারে প্রবেশ করবার সময় যার চোখের উপর দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, প্রাণের পেয়ালাখানি তুলে ধরে পান করবার সময় যার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছি আমি, কেন বাঁচবে না ?"

উজ্জয়িনী আশ্বাস দিল, "আচ্ছা, সুধীদাকে সুধাব।"

"কেন বাঁচবে না ?" উত্তেজিত স্বরে দাবী করলেন ললিতা, "জীবন কি তার জন্মস্বত্ব

নয় ? পৃথিবী কি তার আপন দেশ নয় ? এখানে কি সে অনধিকার প্রবেশ করেছে ? কেন তবে এমন ঘটে ? জানি এর ঐহিক কারণ আছে, বিনা কারণে কিছু ঘটে না। কিন্তু কারণেরও তো কারণ আছে। না অকারণ ? জগৎটার কি রাজা আছে ? না অরাজক ?"

"আচ্ছা, সুধীদাকে সুধাব। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি সুধান।"

"দূর !" তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন, "এসব প্রশ্নের কি উত্তর আছে যে কেউ উত্তর দেবে ! যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, জীবনের দস্তুর ঐ। জীবনের পায়ে পায়ে মৃত্যু।"

"সুধীদা," উজ্জয়িনী বলল, "সুধীদা সম্ভবত এই উত্তর দেবে যে জীবনটা একটা আর্ট। আর্টের খাতিরে কোনো কবিতা কয়েক ছত্রে শেষ হয়, কোনো কবিতা কয়েক কাণ্ডে, আবার কোনো কবিতা অনেক পর্বে। সকলের জীবন যে মহাভারত হবে তার প্রয়োজন নেই। আর্ট হলেই হল।"

ললিতা উপহাস করলেন। "আর্ট ! আমার জীবনটা একটা আর্ট !"

"হবে না কেন ?" তিনি আপনি বললেন। "আর্ট বলতে কার্টুনও বোঝায়। আমার জীবনটা একটা কার্টুন ছাড়া কিছু না !"

উজ্জয়িনী অন্যমনস্ক থেকে অনেকক্ষণ পরে বলল, "আপনার কথাই ঠিক। কেন বাঁচব না ? সেইটেই আসল প্রশ্ন। কেন বাঁচব না ? কেন বুঝে নেব না আমার অধিকার ? বুঝে নেব না কেন ?"

এই বলে উজ্জয়িনী রণরঙ্গিনীর মতো দৃপ্ত নয়নে তাকাল।

৯

ক্রিস্টিনকে খবর দিয়ে রেখেছিল ললিতাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বলল, "দেরি করলে আবার বৃষ্টি নামবে।"

"হাঁ। শুনেছি এদেশের আকাশ বিশ্বাসঘাতক।"

বাসে চড়লে শহর দেখার সুরাহা হয়। দুজনে বাস ধরল। যেমন হয়ে থাকে, সকলের কৌতূহলী চাউনি এই দুটি শাড়িপরা মেয়ের উপর পড়ল। প্রথম প্রথম উজ্জয়িনীর অপমান বোধ হত। মনে হত তার রংটাই যত অপরাধ করেছে। ক্রমে সহ্য হল। ইদানীং সে ভ্রূক্ষেপ করে না। কাগজ কিংবা বই খুলে বসে।

ললিতা নবাগতা। তিনি ঘেমে উঠে উজ্জয়িনীর কানে কানে বললেন, "ট্যাক্সি করলে হয় না ?"

"কোন দুঃখে ? ওরা দর্শন করতে চায়, করুক। আমরা দর্শন দিচ্ছি। ট্যাক্সিতেই যদি একা পড়ি তবে মানুষ চিনব কী করে ? যদিও মানুষ বললে বাড়িয়ে বলা হয়।"

রবিবারের লণ্ডন। চারিদিকে জনস্রোত। প্রত্যেকে নিজের নিজের সেরা পোশাক

পরেছে, তবে ভিড়ের ভিতর ভিখারীও আছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে মলিন মুখও নজরে পড়ে। ললিতা কত লোকের মুখে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখলেন। দুঃখীরা দুঃখীদের এক আঁচড়ে চিনতে পারে, তাদের দৃষ্টি যেন এক প্রকার দূরবীণ, আর তাদের হাবভাব যেন একপ্রকার পরিচয়পত্র।

টেমস নদীর উপর দিয়ে যখন বাস চলল তখন উজ্জয়িনী বলল, "এটা কী তা বলতে পারেন? না, খাল নয়। সুপ্রসিদ্ধ টেমস।"

"হ্যাঁ! টেমস! দেখি দেখি। ফুরিয়ে গেল যে।"

"যেমন ছোট দেশ তার তেমনি ছোট নদী। অথচ এরাই আমাদের মালিক। কেমন, দেখে বিশ্বাস হয়?"

"তা হয়। দেশে অনেক শহর দেখেছি, কোথাও দেখিনি যে দুজন মানুষ একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটছে। আমাদের রাজপথের বিশৃঙ্খল জনতার সঙ্গে এদের এই সুশৃঙ্খল জনপ্রবাহ তুলনা করলেই বুঝতে পারি এদের শক্তির উৎস কোথায়। শৃঙ্খলায়।"

"তা যদি বলেন তবে আমাদের মেয়েরা তো পায়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটতেই শেখেনি, পা ব্যবহার করা কি হাঁটা?"

ললিতা হাসি চাপলেন: "না হাঁটিলে সব ভারতললনা এ ভারত আর হাঁটে না হাঁটে না।"

উজ্জয়িনীর রণরঙ্গিনীভাব তখনো বিদ্যমান। রাগটা ইংরেজের উপর থেকে সরে গিয়ে ভারতীয়দের ঘাড়ে পড়ল।

"শুধু হাঁটলে হবে না, হান্ট করতে হবে। রক্ষণশীল সনাতনপন্থীদের গায়ে কুত্তা লেলিয়ে দিতে হবে।"

ললিতা শিউরে উঠলেন। "কী নিষ্ঠুর তুমি! চণ্ডী না চামুণ্ডা!"

"হাঁ, আমি চণ্ডী। আমি কালী। আমি মোটেই লক্ষ্মী মেয়ে নই। লক্ষ্মী মেয়েরা হাঁটতে জানে না, পেঁচার পিঠে পেঁচার মতো বসে থাকে। আর কালী কিনা নেচে নেচে ত্রিভুবন ঘোরে। আমি কালী।"

ললিতা বললেন, "চুপ। চুপ। অত জোরে না। ওরা শুনছে।"

"শুনছে। এতক্ষণ দর্শন করছিল, এখন শ্রবণ করছে। আহা বেচারিরা! কখনো কালো মানুষ দেখেনি, কালো মানুষের কথা শোনেনি। ভাবছে কী শুক্ষণে বাসের টিকিট কিনেছে, এক টিকিটেই দুই কাজ হয়। নিশ্চয় বাড়ী গিয়ে বড়াই করবে দুজন ভারতীয় মহারানীর সঙ্গে করমর্দন করেছে।"

"আমাকে," ললিতা হাসলেন, "মহারানী বলে ভুল করবে না। আমি মহারানীর লেডী ইন ওয়েটিং।"

উজ্জয়িনীর মনটা ক্রমে নরম হল। তাকে যে কেউ মহারানী বলে ভুল করতে পারে ললিতার এই পরোক্ষ স্বীকৃতি তার বড় উপাদেয় লাগল।

বাকী পথটুকু তারা নিঃশব্দেই কাটাল।

বাস থেকে নেমে খানিক হাঁটতে হয়। উজ্জয়িনী ললিতাকে সাবধান করে দিল। "দেখবেন, যেন তালে তালে পা পড়ে।"

ললিতা চেষ্টা করে পারলেন না। বললেন, "আমরা ভারতের লোক, আমরা ভারতীয় স্টাইলে হাঁটব।"

"তা হলে কিন্তু ভারতের উপর থেকে ভার নামবে না।"

"বিস্তর নেতা রয়েছেন ও ভাবনা ভাবতে। ওরা আগে হাঁটুন, পরে আমরা হাঁটব।"

"না, ললিতাদি, তর্ক শুনব না। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হবে। মনে করুন যেন আমিই আপনার নেতা।"

ললিতা বললেন, "দেশে যেমন সিবিল ডিসওবিডিয়েন্সের তোড়জোড় চলছে মনে হয় মেয়েরাও এবার অবতীর্ণ হবেন।"

"কী চলছে, ললিতাদি?"

"জান না? দেশের লোক আর অপেক্ষা করতে চায় না। এরা যদি আমাদের স্বরাজ না দেয় আমরা এদের আইন অমান্য করব। তার মানে যদি গুলি চালায় তবে গুলি খাব। যদি ধরে নিয়ে যায় তবে জেলে যাব।"

"তাই নাকি?" উজ্জয়িনী পরম উন্মাদনা বোধ করল। "গুলি চলবে? গুলি!"

"অসম্ভব নয়। সব চেয়ে যেটা খারাপ সেইটে ধরে নিতে হয়।"

"তা হলে তো আমাকে দেশে ফিরতে হয়, আপনাকেও।"

"বিশ্বভ্রমণ শেষ করে ফিরব।"

"তার আগে যদি শুরু হয়ে যায়, ঐ যে কী বললেন, সিবিল—"

"ডিসওবিডিয়েন্স যদি শুরু হয় তা হলেও সারা হবে না এ বছর। আমার প্রোগ্রাম এই বছরের শরৎকাল অবধি। জোর বড়দিন অবধি।"

উজ্জয়িনী উৎফুল্ল হয়ে বলল, "জেলখানায় জায়গা থাকলে হয়। আর বন্দুকে গুলি থাকলে হয়। দেশশুদ্ধ লোক যদি বুক পেতে দেয় তবে গুলিও বিশেষ বাকী থাকবে না।"

যেমন হয়ে থাকে, বিদেশী পথিক দেখলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁ করে তাকায়। তাদের কেউ কেউ সাহসে ভর করে শুধায়, "মাফ করবেন। আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?" কিংবা "মাফ করবেন। চার্চ লেন যাব কোন পথে?"

ললিতা ভালোমানুষের মতো ইংরেজীতে উত্তর দিতে যান। উজ্জয়িনী তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে হিন্দুস্থানীতে জবাব দেয়।

ললিতা বলেন, "ছি। যারা জানতে চায় তাদের জানা ভাষায় বললে কি জাত যায় ? জাতীয়তা মানে কি ভদ্রতাবর্জন ?"

"তা নয়, ললিতাদি। যারা জানতে চায় তারা সময় জানতে চায় না, রাস্তা জানতে চায় না। তারা আসলে জানতে চায় আমরা ইংরেজী কতদূর জানি। কেন আমরা যাব ইংরেজীর পরীক্ষা দিতে ?"

ললিতা হেসে বললেন, "পাগলামি দেখছি ছ'সাত বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে।"

"না, না, হাসির কথা নয়," উজ্জয়িনী গম্ভীরভাবে বলল, "আমরা যে পরাধীন জাতি তার একটা প্রধান কারণ আমরা পরের কাছে পরীক্ষা দিতে অদ্বিতীয়। এই যে এত ছেলে বিলেত এসেছে এদের প্রায় প্রত্যেকের ভাবনা কী করে ইংরেজের মতো নিখুঁৎ উচ্চারণ করবে, নিখুঁৎ পোশাক পরবে, নিখুঁৎ ছুরিকাঁটা চালাবে। একটু খুঁৎ ঘটলে এমন এক ক্ষমাকাতর ভাব দেখায় যেন কী একটা অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। যেন সভ্যতার পরীক্ষায় ফেল!"

"তা হলেও," ললিতা মৃদু হাসলেন, "ইংরেজের প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতেই দেওয়া উচিত।"

"যদি সে প্রশ্ন পরীক্ষার প্রশ্ন না হয়।"

"সব সময় কি বোঝা যায় কিসের প্রশ্ন ? এমন তো হতে পারে যে একটি ছেলে সত্যি পথ হারিয়েছে, পথের ঠিকানা চায়।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু আরো তো পথিক আছে ! দুধারে দোকান আছে। না, ললিতাদি, ভদ্রতার নামে দুর্বলতা চলবে না। শক্ত হতে হবে।"

১০

ব্লিজার্ডদের বাড়ীর বাইরে বাগান। গেটের ওধারে ক্রিষ্টিন পায়চারি করছিলেন, উজ্জয়িনীদের দেখে অভ্যর্থনা করতে অগ্রসর হলেন।

"হাউ আর ইউ, জিনী ? হাউ ডু ইউ ডু, মিস—"

"মিসেস রায়। মিসেস ব্লিজার্ড জুনিয়র।" আলাপ করিয়ে দিল উজ্জয়িনী। ক্রিষ্টিন দুজনকে দুই হাতে ধরে নিয়ে চললেন বাড়ীর ভিতরে।

এই কোয়েকার পরিবারটির সঙ্গে উজ্জয়িনীর ও সুধীর বিশেষ ভাব হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের প্রতি এঁদের অসামান্য সহানুভূতি, শ্রদ্ধাও প্রভূত। তা ছাড়া সোনিয়ার উপর উজ্জয়িনীর আন্তরিক টান।

সোনিয়াকে দৌড়িয়ে আসতে দেখে উজ্জয়িনী দেশ উদ্ধার করতে ভুলে গেল।

"সোনিয়া, সোনা আয়। ছাখ, তোর জন্তে কী এনেছি।"

"কী এনেছ? কী এনেছ? আমার জন্যে কী এনেছ?" বলে সোনিয়া বেড়ালছানার মতো লাফ দিতে লাগল কিন্তু নাগাল পেল না।

উজ্জয়িনী তাকে অনেকক্ষণ নাচিয়ে অবশেষে নিরাশ করল। বেচারি মুখখানা আঁধার করে মা'র কোলে ঢাকল।

"সোনামোনা, রাগ করলি? এই নে।" টার্কিশ ডিলাইট।

তার মা অনুযোগ করলেন, "কেন ওসব।"

"কেন? তুমি যখন ওর বয়সী ছিলে তোমাকে কেউ উপহার দেয়নি!"

"আমাকে? আমি যখন ছোট ছিলুম আমার ইষ্ট দেবতা কে ছিলেন জান? Santa Claus. সব দিন ছিল আমার বড়দিন।"

"তবে? মেয়ের বেলায় কেন ওসব?"

সোনিয়াকে ডেকে বলল, "সোনা, লক্ষ্মী মেয়েরা কী করে জানিস তো? ঠাকুরমাকে, ঠাকুরদাকে দেয় সকলের আগে। তারপর মাকে আর দুই মাসিমাকে দেয়। আর ঐ যে কেনারী পাখীটা আছে ওটাকে ভোলে না। আর বাবার জন্যেও কিছু রাখে।"

এত লোককে বখরা দেবার প্রস্তাবে সোনিয়ার সম্মতি থাকার কথা নয়। তা হলে অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে। বেচারির দুঃখ দেখে ললিতা বললেন, "না, আমাকে দিতে হবে না, আমার ভাগ আমি সোনিয়াকে দিলুম।"

"ও কী!" ক্রিষ্টিন বাধা দিলেন। "আপনি রাখুন। আরো অনেক আছে ও বাকসটায়।"

বাস্তবিক খুব বেশী ছিল না। সোনিয়ার চোখের হাসি চোখে মিলিয়ে গেল।

বৃদ্ধ ব্লিজার্ড জিজ্ঞাসা করলেন, "সুধীকে দেখছিনে। সুধী কোথায়?"

"সুধী গেছে উত্তরপশ্চিমে।"

"হুঁ। সুধীর সঙ্গে আমার কথা ছিল। ওর চিঠির জবাব লিখতে চেষ্টা করছি। লিখে বলবার চেয়ে মুখে বলা সহজ।"

"আপনাকে চিঠি লিখেছে নাকি?"

"হাঁ। এই প্রথম নয়। কিছু দিন থেকে আমাদের চিঠি লেখা-লেখি চলছে।···ওর বয়সে আমিও ওর মতো ভাবনায় পড়েছি। একজন যুবকের কি কম ভাবনা!"

উজ্জয়িনী কৌতূহল ব্যক্ত করল না। ব্লিজার্ড আপনা হতে বললেন, "জিনী, তোমার কী মনে হয়? যুদ্ধ আর শান্তি যে স্তরের প্রশ্ন হিংসা আর অহিংসা কি সেই স্তরের প্রশ্ন?"

ব্লিজার্ডগৃহিণী কণ্ঠক্ষেপ করলেন, "থাক, সুধীর বোঝা জিনীর ঘাড়ে চাপিয়ো না। অমন করলে জিনীও আর আসবে না।"

উজ্জয়িনী কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "আণ্ট, আমি বোধ করি আর বেশী দিন থাকছিনে এদেশে।"

"বল কী! বল কী!" বিস্ময় প্রকাশ করলেন যুগপৎ তিনজনেই।

"ইনি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন। এঁর সঙ্গে যোগ দিচ্ছি আমিও।"

ললিতার উপর যুগপৎ তিনজনের দৃষ্টি পড়ল। ললিতা আত্মদোষক্ষালনের জন্যে বললেন, "এটা আমার নয়, জিনীর নিজের প্রস্তাব। এখনো ওর মা'র অনুমোদন ও স্বামীর মঞ্জুরি মেলেনি।"

বৃদ্ধা বললেন, "আমরা আশা করি ওর মা রাজী হবেন না, স্বামীর তো আপত্তি থাকবেই।"

ক্রিস্টিন বললেন, "না থেকে পারে না।"

"আপত্তি থাকলে শুনব কেন? আমার কি এতটুকু স্বাধীনতা নেই?" নালিশ করল উজ্জয়িনী।

একমাত্র ক্রিস্টিন বুঝলেন ব্যাপার কী। মিসেস ব্রিজার্ড একালের মেয়েদের থই পান না, তারা এতই অতল। তিনি ললিতার সঙ্গে গল্প করতে বসলেন।

উজ্জয়িনী সুধাল, "কী বলছেন, আঙ্কল? যুদ্ধ না শান্তি?"

"যুদ্ধ না শান্তি?" স্মরণ করে ব্রিজার্ড বললেন, "কথা হচ্ছে যুদ্ধের প্রয়োজন যদি থাকে তবে অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করলেও তা যুদ্ধই, তা শান্তি নয়।"

"তা তো নয়ই।"

"তা হলে শান্তি বলতে আমরা শান্তিবাদীরা কী বুঝব? অহিংস তথা সহিংস সংগ্রামের অবসান? না, কেবলমাত্র সহিংস সংগ্রামের অবসান?"

উজ্জয়িনী যে ঠিক অনুধাবন করছিল তা নয়। বলল, "তাতে কী আসে যায়?"

"আছে অনেক কথা।" ব্রিজার্ড বললেন চশমা পরে ও পকেট থেকে সুধীর চিঠি বের করে। "আমি অহিংস সংগ্রামকেও শান্তির পরিপন্থী ভাবি। ওর মধ্যে হিংসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাপের আধিক্য হলে অহিংসাও হিংসায় পরিণত হতে পারে। আমি কোনো-রকম সংগ্রামকেই আমল দিতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু তা যদি হয় তবে অন্যায়ের প্রতিকার হবে কী করে?"

উজ্জয়িনী বলল, "অন্যায়কে পরিপাক করাও তো অশান্তি। বোধ হয় যুদ্ধের চাইতেও অশান্তি।"

"অপর পক্ষে, প্রতিরোধ করাও যে হয় গুঁড়িয়ে যাওয়া, নয় হিংস্র হওয়া।" ব্রিজার্ড সুধীর চিঠিতে মনোনিবেশ করলেন।

"শুনছ, রনি?" মিসেস বললেন উৎফুল্ল হয়ে, "মিস মেয়োর কেচ্ছার এক সুফল

হয়েছে এই যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শারদা আইন পাশ হয়েছে।"

"সুসমাচার। মন্দের ভিতর থেকে ভালোর আবির্ভাব হয়।"

ললিতা প্রশ্ন করলেন, "ও কথা কি সব সময় খাটে, মিস্টার ব্রিজার্ড ?"

"সব সময় খাটে, মিসেস রায়, সব সময় খাটে। নতুবা জীবন অচল হত। Life would not work out", বৃদ্ধ বললেন পরম প্রত্যয় ভরে।

"কোথা থেকে একটা রোগের বীজ এসে যখন একটি সুন্দর জীবন নাশ করে যায়," ললিতা বললেন বিচলিত স্বরে, "তখনো মানতে হবে আপনার ঐ প্রবচন ?"

"আহা!" বলে উঠলেন মিসেস ব্রিজার্ড।

"শুনে ব্যথিত হলুম, মিসেস রায়।" ব্রিজার্ড বললেন চামর কেশে হাত বুলাতে বুলাতে। "কত আফসোস দিয়ে ভরা আমাদের জীবন। সেইজন্যে তো জগতের পরিবর্তন চায় এত লোক। জগৎটা ভালো হোক মন্দ হোক, এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচব ও মরব যে মন্দের ভিতর থেকে ভালোর আবির্ভাব হয়। তা যদি না হত তবে একটু আগে যা বলছিলুম, Life would not work out."

"আপনি দেখছি," ললিতা সবিনয়ে বললেন, "অপরাজেয় আশাবাদী। আমি কিন্তু পরিবর্তনবাদীও নই, আশাবাদীও নই, আমি পলায়নবাদী।"

"পরিবর্তনবাদও," ব্রিজার্ড হাসলেন, "এক হিসাবে পলায়নবাদ। যা আছে তার থেকে পলায়ন।"

"তা হলে," ললিতা টিপ্পনী কাটলেন, "পলায়নবাদীরাই দলে ভারী। আপনার মতো আশাবাদী ক'জন!"

"ঠিক বলেছেন, মিসেস রায়," সমর্থন করলেন ব্রিজার্ডঘরণী। "বাড়ীতেও তিনি একমাত্র আশাবাদী।"

"আমি ও সোনিয়া।" বৃদ্ধ ব্রিজার্ড সোনিয়ার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন।

সোনিয়ার ততক্ষণে টার্কিশ ডিলাইট সাবাড় হয়েছে। খালি বাক্সটা হাতে করে সে যেন মনে মনে কাঁদছে, "শূন্য মন্দির মোর। শূন্য মন্দির মোর।" অবশ্য বাপের জন্যে একটি তুলে রেখেছে ও সেটির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি হানছে।

ক্রিস্টি চুপি চুপি বললেন, "তুমি সত্যি যাচ্ছ নাকি ?"

"সত্যি।"

"কোনো বাঁধন নেই ?"

"না। বাঁধন আপনি খুলে গেছে।"

"তবে আর কি ? তুমি ঈর্ষার পাত্রী।"

"ঈর্ষা ?" উজ্জয়িনী সজল নয়নে বলল, "না, ভাই, ঈর্ষা নয়। করুণা। আমি

থাকতে পারছিনে বলেই যাচ্ছি, থাকতে পারলে কেন যেতুম।"

১১

ললিতাকে ব্লিজার্ড দম্পতীর কাছে গছিয়ে উজ্জয়িনী উঠে গেল বাইরে ক্রিস্টিনের সঙ্গে। সোনিয়াকে ছাড়ল না।

"জনকে দেখছিনে আজ?"

"জন?" ক্রিস্টিন তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে বললেন, "না, তিনি নেই। পার্টির কাজে বেরিয়েছেন। নির্বাচনের শুনছি দেরি নেই, মাত্র কয়েক মাস বাকী। এবার যদি লেবার জয়ী হয় তবে হয়তো দেশের দশা ফিরবে। দুনিয়ারও।"

"বটে?" জিনী অবাক হল। দুনিয়ার দশা ফিরবে বিলেতের লেবার পার্টির দৌলতে, এ কি কম সৌভাগ্য! হয়তো ভারতকেও স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম করতে হবে না, লেবার পার্টি স্বেচ্ছায় অর্পণ করবে।

"একবার সুযোগ দিয়ে দেখা যাক। তবে লেবারকে ওরা বেশী দিন টিকতে দেবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। লেবার নেতাদেরও সাহসের অভাব, বিপক্ষের করতালির প্রতি মূঢ় আসক্তি।"

রাজনীতি নিয়ে জিনী কোনো দিন মাথা ঘামায়নি। এসব শুনতে তার আশ্চর্য লাগছিল।

"আঙ্কল ব্লিজার্ড কোন দলে?"

"তিনি? তিনি কোনো দলকেই ভোট দেবেন না।"

"বাঃ! দেশের দশা ফিরে যাবে এ কি তিনি জানেন না?"

"মানেন না। তিনি বলেন, শ্রেণীর ভিত্তির উপর যে দলের প্রতিষ্ঠা সে দলের দৃষ্টি সংকীর্ণ, সমষ্টির কল্যাণ তার দৃষ্টির অতীত। আমার স্বামী বলেন, যে শ্রেণীর কথা হচ্ছে সে শ্রেণী সমাজের বারো আনা। অবশিষ্টের জন্যে তার দ্বার চির দিন মুক্ত। আমরা সকলেই যদি শ্রমিক শ্রেণীর শামিল হই, শ্রমিক দলের সদস্য হই, তা হলে দলের দৃষ্টি আপনা আপনি উদার হয়, কল্যাণ হয় সকলেরই।"

জিনী তারিফ করে বলল, "অতি সত্য কথা। আঙ্কল স্বীকার করেন না?"

"তিনি বলেন, মানুষকে একবার শ্রেণীসচেতন করে তুললে সে যা দেখবে তা শ্রেণীর চশমা পরে দেখবে, তার শ্রেণী বাড়তে বাড়তে সমষ্টির সমার্থক হলেও তার দৃষ্টি থেকে যাবে শ্রেণীদৃষ্টি। আমরা শ্রমিক বলে পরিচয় দিলেও শ্রমিকরা আমাদের তলে তলে সন্দেহ করবে, শ্রমিক দলে নাম লেখালেও তারা আমাদের নিজের লোকের মতো বিশ্বাস করবে না। ফলে আমরাও আরো বেশী শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠব।"

জিনী হেসে বলল, "তা হলে পিতাপুত্রে রীতিমতো মতভেদ।"

"তাঁরা সেই মতভেদ মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আমরা দ্বিমত হতে একমত হলুম। We agree to differ."

জিনী তা শুনে তুমুল হাসল। বলল, "একমাত্র ইংরেজের পক্ষে সম্ভব। তোমরা ফরাসীরাও কি গোঁজামিল দিতে জানো?"

"না। আমরা অত সহজে পরস্পরকে ছাড়িনে। আমরা তিনশো তেষট্টি দিন তর্ক করে একটা তৃতীয় মতবাদ উদ্‌ভাবন করি। ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে তাই অগুনতি দল। কিন্তু, জিনী, আমি কিসের ফরাসী? আমি যে এদেশেই মানুষ হয়েছি।"

"কিন্তু তুমি তো তোমার নিজের মতবাদ ব্যক্ত করলে না? তুমি কি তোমার স্বামীর দলে না শ্বশুরের দলে?"

"অবশ্য আমার স্বামীর দলে।" হেসে বললেন, "জানো তো, সেই ভয়ে ফরাসী মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়নি। এদেশেও অনেক ব্যাপার করে মেয়েরা ভোট স্বত্ব পেয়েছে, তবে সতর্ক হতে হয় যাতে গৃহযুদ্ধ না ঘটে।"

এতক্ষণ উজ্জয়িনীর মনে কেবল একটি প্রশ্ন ঘুরছিল। সাহস হচ্ছিল না তুলতে। সেইজন্যে রাজনীতি নিয়ে বক বক করে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল।"

"গৃহযুদ্ধ! বেশ বলেছ, ভাই ক্রিস্টিন।" জিনী যেন এতক্ষণে সুযোগের দিশা পেল। "হা হা। গৃহযুদ্ধ। কখনো ঘটেছে নাকি?"

ক্রিস্টিন হঠাৎ গম্ভীর হলেন। জিনীরও মুখ চুপ। সে যেন সোনিয়াকে নতুন আবিষ্কার করল, তাকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাল ও কাঁদো কাঁদো করে ছাড়ল।

"কী বলছিলে, জিনী! গৃহযুদ্ধ?" ক্রিস্টিন প্রশান্ত মুখে বললেন. "না, জিনী। আমার কোনো ক্ষোভ নেই, আমি আশার অধিক পেয়েছি। তবে কী জানো? জনের জন্য দুঃখ হয়। তুমি বোধ হয় লক্ষ করনি আমার শ্বশুর পরিবর্তনবাদীদের কটাক্ষ করছিলেন। জন পরিবর্তনবাদী। তিনি প্রাণপণে আকাঙ্ক্ষা করেন যে আজ এখনি সমাজের পরিবর্তন হোক। এ সমাজে বাস করে তিনি এক মুহূর্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না। তোমাকে বলিনি যে তিনি অবসর সময়ে নাটক লেখেন। বলেন, অবসর আমি সারাদিন সারারাত চাই, নইলে ঠিকমতো লিখতে পারব না। অথচ টাকার জন্যে চাকরি করতে হয়, সারাদিনের চাকরি; তাতে যেমন খাটুনি তেমনি ব্যাঘাত। তারপর অত লিখলেও থিয়েটার মালিকের মন পাওয়া যায় না, তাই নাটকের অভিনয় হয় না।"

জিনী অনুকম্পাভরে বলল, "তাই তো, উপায় কী!"

"উপায় কী!" ক্রিস্টিন বলল, "অনেক সময় ভাবি তিনি যদি অবিবাহিত থাকতেন তাঁর চাকরির দরকার হত না। লিখে যেমন করে হোক নিজের খরচ চালাতেন। আমিও

গান শিখিয়ে কিছু পাই, কিন্তু তাও এমন কিছু নয়।"

"আমার ধারণা ছিল," জিনী বলল, "কোয়েকাররা খুব বড়লোক।"

ক্রিস্টিন হেসে বললেন, "সকলে নয়। আমার শ্বশুরের অবস্থা বড়লোকের মতোই ছিল। যুদ্ধের সময় সেই যে বিপর্যয় হয় তারপরে আর সুদিন আসেনি। কিন্তু যা বলছিলুম। সব দেখেশুনে জন সিদ্ধান্ত করেছেন সমস্যা তাঁর একার নয়। বেশীর ভাগ লেখকেরই সেই দুর্গতি। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা আর ক'জন! তাঁদের বিস্তর বাজে লিখতে হয়, ভেজাল দিতে হয়। সমাজের পরিবর্তন না হলে লেখকের উদ্ধার নেই, এই তাঁর একান্ত বিশ্বাস। এবং সে পরিবর্তন আসবে শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের ফলে। এও তাঁর বিশ্বাসের অঙ্গ।"

"কিন্তু অবসরকালে যদি রাজনীতিই করলেন তবে লিখবেন কখন?"

"লেখেন, যখনি সময় পান। তাঁর নাটক কয়েকটি এমেচার থিয়েটারে অভিনয় হয়েছে, সেদিক থেকে চাহিদাও আছে। আমরা জনকয়েক মিলে একটা ছোট্ট থিয়েটার খুলব ভাবছি, জনের নাটকের অভিনয় করতে। কিন্তু অভিনয়ের বিরুদ্ধে শ্বশুরশাশুড়ীর সংস্কার প্রবল।"

"তাই নাকি? কেন বল তো?" জিনীর কাছে এ এক সংবাদ।

"কালেভদ্রে অভিনয় করলে কেউ কিছু মনে করেন না, কিন্তু নিয়মিত অভিনয় করলে প্রাচীনদের সংস্কারে বাধে।"

"আমাদের দেশেও সেই একই মনোভাব।"

"তা সত্ত্বেও", ক্রিস্টিন চিন্তিত হয়ে বললেন, "আমাদের নিয়মিত অভিনয় করতেই হবে। জন তা হলে তাঁর কোথায় কী ত্রুটি থাকছে টের পাবেন। বড় নাট্যকার মাত্রেরই অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই মুকুরে তাঁরা তাঁদের রূপ অবলোকন করেন, খুঁৎ খুঁজে পান।"

"তা তো জানতুম না।"

"তা ছাড়া জনের রচনার যে বাণী তা সকলের কানে পৌঁছানো দরকার। তার সামাজিক তাৎপর্য, social significance আছে। সে বাণী কানে শুনলে তবে তো মানুষ জাগবে, উঠবে, নিজের অধিকার বুঝে নেবে।"

জিনী স্বীকার করল।

ক্রিস্টিন বললেন, "তা ছাড়া ভাবী যুগে থিয়েটারই হবে চার্চ, যেমন চার্চ হয়েছিল একদা থিয়েটার। আমরা ভাবী যুগের চার্চের পত্তন করে রাখি, প্রদর্শন করি এখানেও মানুষের আত্মা মহান আবেগে অনুপ্রাণিত হয়, মহান ব্রতের দীক্ষা নেয়। আমাদের পরিকল্পিত থিয়েটার অর্থের জন্যে নয়, পরমার্থের জন্যে। এর যে প্রয়োজন সেটা

আধ্যাত্মিক।"

ললিতা ইতিমধ্যে খোঁজ করতে বেরিয়েছিলেন। "বাঃ। আমাকে ত্যাগ করে আপনারা কী করছেন এখানে? কিসের চক্রান্ত?"

ক্রিস্টিন বললেন, "আমরা আপনার অপেক্ষা করছিলুম, আসুন। চক্রান্ত হচ্ছে একটা ছোট থিয়েটারকে ঘিরে। আপনি অভিনয় করবেন?"

"সর্বনাশ!" ললিতা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "আমি। এমন কথা কে আপনাকে বলছিল? জিনী?"

১২

ফেরবার পথে ললিতা বললেন, "চমৎকার লোক মিস্টার ও মিসেস ব্লিজার্ড। বৌমাটিও বেশ।"

"সোনিয়াকে বাদ দিলেন যে।"

"ওমা, তাই তো। লক্ষী মেয়ে সোনিয়া।"

"জনের সঙ্গে আপনার আলাপ হল না। সোনিয়ার বাবা। দেখতেন তিনিও কেমন মিষ্টালাপী।"

ভেবে বললেন ললিতা, "যে কয়জন ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সকলেই তো ভালো, ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের একটুও দোষ নেই। অথচ জাতি হিসাবে ইংরেজ আমাদের স্বাধীন হতে দিচ্ছে না।"

অন্যমনস্ক হয়ে উজ্জয়িনী বলল, "এদের ছাড়তে মায়া হয়, কিন্তু ছাড়তেই হবে, ছাড়তেই হত এক দিন।"

"কী বলছ, বেবী?"

"বলছি এই সব বন্ধুদের ছাড়তেই হবে—"

"পাগলী! তুমি কি সত্যি এদেশ থেকে বিদায় নিচ্ছ এখনি?"

"নিশ্চয়। আমি কি এদেশে থাকতে এসেছিলুম? এসেছিলুম একটা কাজে। কাজ হল না, হবার নয়। পরের দেশে শুধু শুধু পড়ে থেকে কী হবে? দেশেই ফিরব। তবে আমেরিকার পথে।"

"তোমার মা কিন্তু আমাকে মাফ করবেন না, তোমার স্বামীও। তাঁরা ধরে নেবেন আমিই তোমাকে ভজিয়েছি।"

"তাতে আপনার কী এমন হবে? বদনাম? হলে ক্ষতি কী?"

ললিতা মাথা নাড়লেন। "তুমি ছেলেমানুষ, ঠিক বুঝবে না এসব।"

উজ্জয়িনী জেদ ধরল, "আমি যাবই। আমি নাবালিকা নই যে জবাবদিহি করতে

হবে। আমার বয়সের মেয়েরা একা দুনিয়া ঘুরছে, আমি তবু আমার দিদির সঙ্গে ঘুরব।"

ললিতা তখনকার মতো নিরস্ত হলেন। উজ্জয়িনীকে সঙ্গে নিতে তাঁরও যে আগ্রহ ছিল না তা নয়। বিলেত পর্যন্ত আসতে তাঁর ভারতীয় সহযাত্রীর অভাব হয়নি। এখান থেকে আমেরিকা যাবার সময় ভারতীয় সহযাত্রী পাবেন কিনা সন্দেহ। উজ্জয়িনী যদি সহযাত্রী হয় তবে ভ্রমণের ভীতি লাঘব হয়।

উজ্জয়িনী ভাবছিল আরো কিছুক্ষণ ক্রিষ্টিনের কাছে থাকলে তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করত, কেন সে ঈর্ষা করতে চায় উজ্জয়িনীর মতো অভাগিনীকে? এমন যার স্বামী, এমন শ্বশুরশাশুড়ি, এমন সন্তান তার কিসের অতৃপ্তি? তবে কি নারীর পক্ষে সুখের সংসারও সোনার শিকল, স্বামীর প্রেমও কোমল বন্ধন? তবে কি বিবাহের পর নারী মাত্রেরই ভাগ্যে domestication?

"না, আমি ঠকে যাইনি।" উজ্জয়িনী উচ্চারণ করল অস্ফুট স্বরে।

"কী বলছ, বেবী?" প্রশ্ন করলেন ললিতা।

"না, আপনাকে বলছিনে। মনে মনে বলছি।"

ললিতা আহত হলেন ভেবে মোলায়েম করে বলল, "কিছু নয়, একটা উড়ো চিন্তা। শুনলে হয়তো রাগ করবেন।"

"রাগ করব। এমন কী চিন্তা?"

"দেখুন, আমার মনে হয়, বিয়ের পর মেয়েরা—থাক, বলব না।"

ললিতা মুখ টিপে হাসলেন।

"আচ্ছা, বলছি। রাগ করলে করবেন।" কেশ দুলিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল, "বিয়ের পর মেয়েরা আর বনের পাখী থাকে না, তারা হয় ঘরের মুরগী।"

ললিতা হেসে বললেন, "রাগ করার কী আছে। কথাটা সত্যি।"

"কেমন, ঠিক বলছি কিনা!" উজ্জয়িনী ফুর্তি করে বলল। "যিনি যত চঞ্চলা হন না কেন, বিয়ের পরে মুরগীর মতো সুস্থির, মুরগীর মতো স্থিতু এবং অনেকেই মুরগীর মতো মোটা।"

"কাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে শুনি?" ললিতা সন্দিগ্ধ স্বরে সুধালেন। তাঁকে নয়তো!

"বিশেষ কাউকে না, সবাইকে। আমাকেও।" এটুকু মিথ্যা।

"না, তুমি এমন কী মোটা!" ললিতা বললেন অনুকম্পাভরে।

"আপনার চেয়ে নিশ্চয়।"

ললিতা আপ্যায়িত হলেন। কোন মেয়ে না হয়?

"কিন্তু কথাটা উঠল কোন উপলক্ষ্যে ?" ললিতা ছাড়লেন না।

"কথাটা উঠল ক্রিস্টিনের একটি উক্তি থেকে। আমরা বিশ্বভ্রমণে চলেছি শুনে তিনি বললেন তাঁর ঈর্ষা হয়। কেন, তাই ভাবছি। তাঁর ঈর্ষার হেতু হয়তো এই যে স্বামী আর সন্তান যত মধুর হোক না কেন, মুক্তি হচ্ছে তাদের চাইতেও মধুর।"

"ক্রিস্টিনকে," ললিতা দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "তুমিই ভালো জানো। আমার পক্ষে তাঁর উক্তির অর্থ করতে যাওয়া অব্যাপার। তবে স্বামী ও সন্তান ফেলে মুক্তি যদি কেউ চায় আমি বলব তেমন মুক্তি আমার নয়।"

"ক্রিস্টিনের মনে কী ছিল তিনিই ভালো জানেন, আমার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু, ললিতাদি, স্বামী ও সন্তান যদি বনের পাখীকে পোষ মানিয়ে ঘরের মুরগী বানায় তবে কি আপনি মানবেন না যে মুক্তি হচ্ছে পোষ মানার চেয়ে শ্রেয়ঃ ! আমি তো মনে করি ভালোবাসার উৎপাত আমাদের যা ক্ষতি করে হিংসাদ্বেষও তা করে না। পোষা পায়রার বকম বকম যেমন পক্ষিত্বের অপমান স্বামীসন্তানবতীর গৃহসুখ তেমনি নারীত্বের অপমান।"

ললিতা চুপ করে থাকলেন।

উজ্জয়িনী আরো কী বলতে যাচ্ছিল, ললিতা বাধা দিয়ে বললেন, "থাক, ও প্রসঙ্গ থাক। সব নারীর জন্যে এক আইন নয়। আমার প্রিয়জনের উৎপাত যতদিন ছিল ততদিন আমি মুক্তি কামনা করিনি। আজ আমি মুক্ত, তবু ভগবান জানেন এ মুক্তি আমার কামনার ফল নয়, আমার কোনো অজ্ঞাত পাপের প্রতিফল। আমাকে এই মুক্তির জ্বালা থেকে মুক্তি দিলেই আমি কৃতার্থ হব। আর সেই আশা নিয়ে আমি যাত্রা করেছি।"

উজ্জয়িনী শঙ্কিত হয়ে সুধাল, "ও কী বলছেন, ললিতাদি ?"

"কিছু না, বেবী। ও প্রসঙ্গ থাক।"

কী এক অজানা ভয়ে উজ্জয়িনীর বাক্‌স্ফূর্তি হল না। সে ললিতার হাত ধরে টিউব ট্রেনে উঠল। রবিবারের ভিড়। দাঁড়িয়ে থাকতে হল আরো অনেকের মতো। মহিলা দেখে কেউ স্থান ছেড়ে দিল না, তাতে আশ্চর্য হলেন ললিতা।

"ইংরেজেরা কি ম্যানার্স ভুলেছে ?" ললিতার প্রশ্ন।

"মেয়েরা সব বিষয়ে পুরুষের সমান, দাঁড়ালে দোষ কী ?" বেবীর উত্তর।

"ওহ্। তাই ওরা দাঁড়াবার অধিকার পেয়েছে।"

"আমি তো মনে করি স্ত্রী পুরুষ ভেদ যত কমে তত মঙ্গল। পদে পদে স্মরণ করতে চাইনে যে আমি নারী।" এই বলে উজ্জয়িনী সিগরেট বের করল।

দুবার পায়ে হেঁটে ললিতা ক্লান্ত হয়েছিলেন, বসতে না পেয়ে কাহিল বোধ করছিলেন। ভাবছিলেন ট্রেন থেকে নেমে গাড়ী করবেন কি না। এমন সময় একটা

জংশন এসে পড়ল, বহুলোক নামল।

"এই বেলা বসে পড়ুন, ললিতাদি। দেখছেন তো কত লোক ঢুকছে।"

ললিতা গম্ভীরভাবে আসন নিলেন। উজ্জয়িনীর মুখদর্শন করলেন না, কেননা তার মুখে সিগরেট।

উজ্জয়িনী দু একবার তার সঙ্গে বাক্যালাপের চেষ্টা করল, তিনি আমল দিলেন না। সে বেচারিরও খেয়াল হল না যে মেয়েদের মুখে সিগরেট তিনি দু চক্ষে দেখতে পারেন না, তাও তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীর মুখে। বরাত ভালো উজ্জয়িনী তাঁকে অফার করেনি।

বেলসাইজ পার্কে তাঁর বাসা। উজ্জয়িনী তাঁকে পৌঁছে দেবে বলে এতদূর এসেছিল। কিন্তু তিনি প্ল্যাটফর্মে নেমে বললেন, "ফিরতি ট্রেনে তুমি ফিরে যাও, বেবী। তোমার মা হয়তো অপেক্ষা করছেন।"

"চলুন, আপনাকে দিয়ে আসি। নতুন মানুষ, যদি পথ খুঁজে না পান।"

"এই তো, স্টেশনের সামনে হিউয়েট রোড। বাড়ী ফিরে যাও, বেবী।"

উজ্জয়িনী তাঁর সঙ্গে লিফট দিয়ে উপরে উঠল। তার ভারি ইচ্ছা করছিল তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলতে। টিউবের হাওয়ায় ও সিগরেটের ধোঁয়ায় তার মাথা ধরে গেছল।

একজন ফুল বিক্রী করছিল। বসন্তের পূর্বাভাস। এক রাশ টুলিপ কিনে উজ্জয়িনী ললিতার দিকে বাড়িয়ে দিল। "এই রংটি আমার পছন্দ হয়। আর এই গড়নটিও। নিন, ললিতাদি, আমাদের পুনর্দর্শনের মাঙ্গলিক।"

ললিতা প্রসন্ন মনে করলেন। তিনিও এক তোড়া ক্রোকাস কিনে প্রত্যুপহার দিলেন। বললে, "আজকের দিনটি বেশ কাটল। আশা করি যে কয়দিন এখানে আছি তোমার সঙ্গে এমনি আনন্দে কাটবে। কিন্তু একটি কথা, বেবী। সিগরেট খেলে রাগ করব। কেমন? মনে থাকবে?"

হৈ হৈ

১

বাদল জানত না যে তার সম্বন্ধে তারাপদর একটা প্ল্যান আছে। সে ভেবেছিল আরাম করে মার্কস্ লেনিন পড়বে, বাওয়ার্সের সঙ্গে তর্ক করবে, ক্রমে আয়ত্ত করবে মার্ক্স্ মার্কা ডায়ালেকটিকস। মানবের অভীষ্ট যদি হয় দুঃখমোচন তবে মার্ক্স্ কথিত সুসমাচার মানবের অভীষ্ট সাধন করে কি না চিন্তা করতে হবে, বিচার করতে হবে। এর জন্যে অবসর দরকার, অভিনিবেশ দরকার। বাদলের ভরসা ছিল তারাপদর ওখানে সময়ের অভাব হবে না।

কিন্তু তারাপদর মতলব অন্ত। বাদল বই হাতে নিয়ে বসেছে দেখলে তারাপদ তাড়া দেয়। "গজদন্তের গম্বুজে আশ্রয় খুঁজলে চলবে না, কমরেড। ওদিকে যে দুনিয়া পুড়ে ছারখার হচ্ছে। তুমি কি মনে করেছ সমাজ তোমাকে অন্ন দিয়ে পুষছে বই পড়ে বাবুয়ানা ফলাতে? না, কমরেড, তোমাকে ঝাঁপ দিতে হবে আগুনে। যোগ দিতে হবে শোষিতদের দৈনন্দিন সংগ্রামে। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা সেই তো আসল শিক্ষা। নইলে বই পড়ে শিখতে সবাই পারে।" তারাপদ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে।

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে অনুযোগ করে, "মার্কসবাদ বস্তুটা কী তাই আগে বুঝতে দাও আমাকে।"

"বুঝে কী হবে? যারা কাজের লোক তারা ওসব বোঝে না, বুঝতে চায় না। তারা বোঝে কাজ। পার্টি থেকে যে কাজ করতে আদেশ পেয়েছে সেই কাজ সেরে তবে তাদের ছুটি। তারা বোঝে বিশ্বাসে মিলয় মার্কস তর্কে বহু দূর।"

বাদলের মনে ধরে না। কিন্তু কী করবে! যস্মিন দেশে যদাচার। তারাপদর সঙ্গে থাকলে তারাপদর কথা মানতে হয়। তারাপদর মতে বই পড়া একটা ব্যসন, বুর্জোয়াদের পক্ষেই তা সাজে। সে নিজে সর্বক্ষণ টো টো করছে, তার দলের লোক কেউ চুপ করে বসে থাকছে না, কেবল বাওয়ার্সকে কতকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি লেখক। বাদলও লেখার ভান করেছিল, সফল হয়নি। সে নিছক পাঠক। নিছক পাঠকের উপর কেউ প্রসন্ন নয়। তারা খেটে মরছে আর পাঠক মশাই মোটা হচ্ছেন, সাম্যবাদীর চক্ষে এই বৈষম্য বিসদৃশ।

কাজ করতে বাদল রাজি, কিন্তু তারাপদ যখন বলে সাকলাতওয়ালার পক্ষে ক্যানভাস করতে তখন বাদল মাথা নাড়ে। বাদলকে দিয়ে ক্যানভাস করানো! তা হয় না।

"তবে তুমি শোভাযাত্রায় যোগ দাও।"

"শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আরো অনেক লোক আছে।"

"তোমারও থাকা দরকার, নইলে ওদের চালক হবে কে!"

বাদল আপ্যায়িত হয়ে বলে, "না, তাও আমি পারব না।"

"তোমাকে নিয়ে তা হলে করব কী!" তারাপদ বিব্রত বোধ করে।

"আমি বক্তৃতা করতে পারি, যদি প্রয়োজন হয়।"

তারাপদ তা শুনে বলে, "বক্তৃতা করতে সাকলাতওয়ালা স্বয়ং পারেন না? জানো না বোধ হয়, তাঁর মতো বাগ্মী ইংলণ্ডে নেই।"

বাদলকে নিয়ে তারাপদ মুশকিলে পড়ে। লোকটা বসে বসে বই পড়বে, তার কুদৃষ্টান্ত অপরে অনুকরণ করবে, তাই যদি হয় তবে শ্রমিক রাষ্ট্র কী করে সম্ভব হবে।

আলস্যের জন্যে কঠোর সাজা রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। তারাপদর এই যে আস্তানা এও তো এক হিসাবে সোভিয়েট। তারাপদ এই সোভিয়েটের স্টালিন, তারাপদই এর ভোরোশিলভ, মোলোটভ, য়াগোডা। কিন্তু শাস্তিবিধানের ক্ষমতা তারাপদর নেই। কী আফসোস!

"না, বসে বসে বই পড়া চলবে না, কমরেড! তোমাকে উঠতে হবে, ছুটতে হবে, চিঠি বিলি করতে হবে, জবাব আনতে হবে। তুমি এই সোভিয়েটের রাজদূত। না, রাজদূত কথাটা বুর্জোয়াগন্ধী। রাষ্ট্রদূত।"

এই বলে তারাপদ ফিস ফিস করে। "খবরদার, কেউ যেন টের না পায়। যে কাজ তোমাকে বিশ্বাস করে দিচ্ছি সে কাজ অতি বিপজ্জনক। বিপদের মুখে তোমাকে ঠেলে দিচ্ছি বলে দুঃখ হয়, কিন্তু সাহসে তোমার সমকক্ষ নেই, তাও জানি।"

বাদল কৃতার্থ হয়ে যায়। কাজ তো চিঠি নিয়ে এর কাছে ওর কাছে দেওয়া। বাদল এর মধ্যে বীরত্বের লক্ষণ দেখে অভিভূত হয়। এক একখানা চিঠি যে এক এক টুকরো ডাইনামাইট তার সন্দেহ কী! বাদল মহা সাবধান হয়ে চিঠি বিলি করতে বেরোয়।

বাদল অবশ্য চিঠির বাহকমাত্র। জানে না যে আসলে ওগুলি চাঁদার জন্যে আবেদন। তারাপদ একটা ফিল্ম সোসাইটি করছে, তার সদস্য যারা হবে তারা হপ্তায় হপ্তায় সোভিয়েট ফিল্ম দেখবে। এখনো কথাবার্তা চলছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দেবেন কি না বলা যায় না। সুতরাং তারাপদ প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে চায় না, তলে তলে চিঠি লিখে নাড়ী টিপতে চায়। চাঁদাটা অগ্রিম হস্তগত হলে সব দিক থেকে সুবিধা, চিঠিতে ওকথার উল্লেখ থাকে।

"বুঝলে, কমরেড। যদি কেউ কিছু দেয় তবে বুর্জোয়ার মতো ধন্যবাদ জানিয়ো না। বোলো, কমরেড কুণ্ডু salutes you। কেমন? মনে থাকবে?"

"থাকবে। কমরেড কুণ্ডু salutes you।"

"বেশ। কিন্তু কথা বলবার সময় পদে পদে কমরেড সম্বোধন করতে ভুলো না। মিস্টার কিংবা মিস বললে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। আশা করি তোমাকে তা শেখাতে হবে না।"

"না, আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, মিস্টার—"

"সেইজন্যেই বলছি। যদি বেফাঁস বেরিয়ে যায় তবে তোবা করতে ভুলো না। বোলো, পার্ডন মি, কমরেড। কেমন?"

"আচ্ছা, বলব।"

"শোন। তুমি মার্কসের বই পড়তে চেয়েছিলে, আমি পড়তে দিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একখানা চটি বই তোমাকে পড়তে দিলে ভালো করতুম। সেখানা অবশ্য

মার্কসের নয়। পড়ে দেখো। তাতে আছে আমাদের পার্টির থীসিস। যখনি যার সঙ্গে কথা কইবে থীসিস জ্ঞানের পরিচয় দিয়ো। বোলো, revolutionary role of the working class। আর বোলো, historical inevitability of social revolution."

বাদল বলে, "গায়ে পড়ে বলতে যাব কেন?"

"না, গায়ে পড়ে নয়। কথাচ্ছলে, ঘোড়দৌড় কিংবা ক্রিকেট সম্বন্ধে গল্প করতে করতে এক সময় মন্তব্য করবে, আর কত কাল এই class structure of society স্থায়ী হবে! আপনার কি মনে হয় না যে classless society অবশ্যম্ভাবী?"

বাদল অনুযোগ জানায়, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, কুণ্ডু—"

তারাপদ সংশোধন করে, "কমরেড কুণ্ডু।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ, কমরেড কুণ্ডু যে আমি এখনো এ বিষয়ে স্থিরমত হইনি। তুমি কি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস কর যে শ্রেণীভেদ উঠে যাবে, ডিউক ও ডিউকের গাড়োয়ান পাশাপাশি বসে পানাহার করবে?"

তারাপদ কাঁধ উঁচু করে মুখ বাঁকায়। তার মানে, সেও সন্দেহ করে।

"তবে?"

"কী তবে?" তারাপদ তাড়া দেয়। "ডিউক তার গাড়োয়ানের সঙ্গে খাবে না বলে কি ইতিহাস তার জন্যে অপেক্ষা করবে? কমরেড সেন, তুমি আমাকে হাসালে। ডিউকের নাতিরা যে ডিউক হয় না, মিস্টার হয়, সে খবর তো রাখ। তবে গাড়োয়ানের সঙ্গে খাবে না কেন, শুনি! যদি রাষ্ট্র গাড়োয়ানদের হাতে যায়?"

বাদল ভাবে। তারাপদ বলে, "তুমি বিদ্বান হলে কী হয়, social dynamics তোমার জানা নেই। জগৎ যে দিন দিন বদলে যাচ্ছে। ফরাসী দেশের বড়লোকেরা যে চাকরকেও 'আপনি' বলে। ডিউক গাড়োয়ানের সঙ্গে না খায় তো ওর ডিউক উপাধি কেড়ে নিয়ে ওকে গাড়োয়ানের সমান করে তার পরে খাওয়াব।"

বাদলের সংস্কার এখনো লিবারলপন্থীর। নীচ ক্রমে ক্রমে উচ্চ হবে, গাড়োয়ান ক্রমে ক্রমে ডিউক হবে, এরই নাম ক্রমবিকাশ। এর বিপরীত তো ক্রমবিকাশ নয়, ক্রমিক অধোগতি।

"ফরাসী দেশে চাকরকে 'আপনি' বলে বটে, কিন্তু বড়লোককে 'তুই' বলে না। সমান যদি করতে হয় তবে গাড়োয়ানকে ডিউক উপাধি দিয়ে ডিউকের সমান কর।" বাদল বলে।

"তা হলে", তারাপদ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, "তুমি এখনো বুর্জোয়া রয়েছ। ডিউক উপাধি কি পৈতে যে কোটি কোটি মানুষের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের সেনশর্মা কিংবা

দাসবর্মা বানাবে। তুমি কমিউনিজমের অ আ ক খ শেখনি দেখছি। তোমাকে তালিম না করলে তুমি নাকাল হবে, কমরেড। দাঁড়াও, তোমার তালিমের বন্দোবস্ত করি।"

২

বুধবার রাত্রে সামাজিকতা হয়। অনেকে আসেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতনামা মনীষীও এক আধজন। রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা জমে, রাজা উজীর মরে, সিগারেট পোড়ে, কফির পেয়ালা খালি হয়, মদের পাত্র বার বার ভরে। তারাপদর খোঁজ করলে দেখা যায় সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, তাকে ঘিরেছে তার সেই নাইট ক্লাবের দল, তাদের কারো হাতে মদিরা, কারো হাতে কফি। বাদল তাদের নিকটবর্তী হলে বাঙালীরা বলে ওঠে, "এস, এস, মামা, এস।" মাতুল সম্বোধন বাদলের কানে নেহাৎ ভালগার শোনায়। সে ঐ দলটিকে এড়াতে পারলে খুশি হয়।

"মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড," বলে দুই হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হন চূড়কার। বাদল লাফ দিয়ে সরে যায়। যদি ধরা পড়ে তবে চূড়কার বেশ একটুখানি নাড়া দিয়ে বলেন, "জীবনটা কেমন কাটছে? কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে? পরিচয় করিয়ে দেব?"

"না, কমরেড চূড়কার। আজ থাক।"

"কেন? তোমার আপত্তি কিসের? এস, আমার বন্ধু রোমানেস্কুর সঙ্গে পরিচিত হও। দুদিন পরে রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেও হতে পারেন তিনি, যদি একটা ক্রাইসিস হয়। রোমানেস্কু—"

বাদল ইতিমধ্যে পলায়ন করেছে। যেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে বাওয়ার্স কথা বলছেন জন দুই যুবকের সঙ্গে। তাঁরা সাময়িক পলিটিক্স আলোচনা করছেন না, করছেন থিওরীর মারপ্যাঁচ। বাদলের এই ভালো লাগে। সে জানতে চায় কমিউনিস্ট থিওরী আর সেই থিওরীর কার্যকারিতা। বাওয়ার্সের সঙ্গে বাদলকে মিশতে দেয় না তারাপদ, তার মতে দুজন তার্কিক একত্র হলে দুজনেরই সময়ক্ষেপ হয়। তাই সামাজিকতার রাত্রে বাওয়ার্সের সঙ্গে জোটার সুযোগ পেলে বাদল ছাড়তে চায় না।

"আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়?" বাওয়ার্স বাদলকে দেখে কথার খেই ধরিয়ে দেন। "মূলধন কি একটা বস্তু, না একটা পারস্পরিক সম্পর্ক, যা বস্তুজগতের মধ্যে দৃশ্যমান?"

বাদল ফাঁপরে পড়ে। এসব সে কোনোদিন ভাবেনি।

বাওয়ার্স অবশ্য বাদলের উত্তর প্রত্যাশা করেননি, বাদলকে নীরব দেখে বিস্মিত হন না। অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে তাঁর তর্ক বিতর্ক চলে। মূলধন থেকে শ্রম, শ্রম থেকে

উৎপাদনের উপায়, তার থেকে বিনিময়, বিনিময় থেকে কখন এক সময় ঐতিহাসিক জড়বাদ পর্যন্ত গড়ায়। বাদল সন্তর্পণে যোগ দেয়, যোগ না দিলে পাছে ওরা ঠাওরায় লোকটা অজ্ঞ। বাদলের সঙ্গে ওর বাড়া অপমান আর নেই। এ কি কখনো সহ্য হয় যে বিবর্তনের উচ্চতম স্তরে দণ্ডায়মান বিংশ শতাব্দীর বাদল অজ্ঞ!

"কমরেড সেন?" বাদল পিছন ফিরে দেখল মার্গারেট। তাকে স্বাগত সম্ভাষণ করবার আগে সে বলল, "শোন, কথা আছে।"

মার্গারেট বাদলকে নিয়ে গেল একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। ভদ্রলোকের নাসিকা লক্ষ করে বাদল বুঝল তিনি ইহুদী। কোন দেশের ইহুদী তাও অনুমান করল যখন শুনল তাঁর নাম ব্রনস্কি। মার্গারেট পরে বলেছিল তিনি রুশ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, কিন্তু কারণ কী তা মার্গারেট বলেনি। বাদল সিদ্ধান্ত করেছিল তিনি সম্ভবত ট্রটস্কির দলে।

ব্রনস্কি মধ্যবয়সী সুপুরুষ। তাঁর পোশাক দেখে কেউ বলবে না যে তিনি কুলিমজুর শ্রেণীর। বরং তাঁর তুলনায় বাদলকে তেমন দেখায়। পরিষ্কার ইংরেজীতে সম্ভাষণ জানিয়ে ব্রনস্কি বললেন বাদলকে, "প্রীত হলুম।"

বাদল বলল, "আমিও।"

ভারত সম্বন্ধে দু'চার কথার পর ব্রনস্কি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি কমিউনিস্ট!"

বাদল ভাবল, কে জানে। হয়তো স্পাই কিংবা সেই জাতীয়। আমতা আমতা করে বলল, "না। কমরেড কুণ্ডু আমার বন্ধু, সেই সূত্রে এখানে আছি।"

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ।" তারপর জানতে চাইলেন, "কমিউনিজম সম্বন্ধে আপনার কী মত? ইংলণ্ডের মতো দেশে কি এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে?"

"কেন থাকবে না? যদি এর মধ্যে সত্য থাকে।"

"সত্য বলতে আপনি কী বোঝেন, জানিনে।" ভদ্রলোক তাঁর সোনার চশমা খুলে এক'হাতে ধরলেন। "কিন্তু অবস্থা অনুকূল না হলে কোনো সত্যই কাজে লাগে না। কমিউনিজম," তিনি চশমা চোখে দিয়ে বললেন, "নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর অনমনীয় সংকল্পের উপর। সে সংকল্প কেবল আয়বৃদ্ধির সংকল্প নয়, উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব করার সংকল্প। যাদের মূলধন খাটছে তারা যেমন কর্তৃত্ব করছে তেমনি কর্তৃত্ব করবে যাদের শ্রম খাটছে। মূলধনের স্থান নেবে শ্রমিক। তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখছেন?"

বাদল, "আমার তো মনে হয় না, কমরেড। এ বিষয়ে আপনি পাকা খবর পাবেন কমরেড বাওয়ার্সের কাছে।"

মার্গারেট কণ্ঠক্ষেপ করল, "না, কমরেড। তেমন কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সংকল্প হল সুবিধাবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধি। ক্ষমতা করায়ত্ত

করবার সংকল্প যেটুকু আছে সেটুকু পার্লামেন্টের মারফৎ।"

"সেই বা কম কী?" বাদল জেরা করল। "পার্লামেন্টের আইন দিয়ে কি ক্ষমতার প্রয়োগ হয় না, মার্গারেট?"

"ওর মতো ভ্রান্তি আর নেই।" মার্গারেট বাদলকে শক্ দিল। আর একটু মন দিয়ে মার্কস পোড়ো। ওটা ক্যাপিটালিস্টদের ক্লাব, ওকে পার্লামেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।"

ত্রনস্কি এতক্ষণ সিগার টানছিলেন। বললেন, "ক্যাপিটালিস্টদের ক্লাবও কমিউনিস্ট-দের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, কমরেড বেকেট। শ্রমিকরা যদি শ্রেণী সচেতন হয় তবে পার্লামেন্টে তাদের নিজের লোকই পাঠাবে। তবে তাদের পক্ষে শ্রেণী সচেতন হওয়া সোজা নয়। শ্রেণী বর্জন করে ঊর্ধ্বে ওঠার মোহ রয়েছে এসব দেশে, ঊর্ধ্ব থেকে প্রলোভনও ঝুলছে।"

বাদল পার্লামেন্টে পরম বিশ্বাসবান; সুতরাং ত্রনস্কির মুখে পার্লামেন্টের সমর্থন শুনে প্রফুল্ল হল। মার্গারেট কিন্তু প্রতিবাদ করে বলল, "না, কমরেড ত্রনস্কি! আমাদের ইংরেজ জাতির উচ্চাভিলাষের মূর্ত বিগ্রহ ঐ পার্লামেন্ট আমাদের শ্রমিক শ্রেণীকে মুগ্ধ করবে, কিন্তু আত্মস্থ করবে না। ওর মায়া কাটানো ভালো।"

"রাশিয়াতেও," ত্রনস্কি বললেন, "দুদিন পরে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবেই। ওর সঙ্গে কমিউনিজমের সত্যিকার শত্রুতা নেই। যারা মনে করে শত্রুতা আছে তারা গোঁড়ামি ছাড়তে পারছে না, ছাড়লে দেখবে শ্রমিকদের শত্রু পার্লামেন্ট নয়, ডেমক্রেসী নয়, তাদের শত্রু তাদের সংকল্পের শিথিলতা।"

মার্গারেট চোখের ইশারায় বাদলকে বলল, এইবার ওঠ। বাদল উঠল। ত্রনস্কি তাকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে যেতে। সে রাজি হল।

"ত্রনস্কি সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?" বাদল সুধাল মার্গারেটকে।

"সোশ্যাল ডেমক্রাট।" মার্গারেট এক কথায় উড়িয়ে দিল।

"তুমি কি বলতে চাও তিনি কমিউনিস্ট নন?"

"রাশিয়ায় যারা বাস করে তারা কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু সবাই কি কমিউনিস্ট? কারা কমিউনিস্ট, কারা নয়, তা চেনবার একটা সহজ উপায়, কে ডেমক্রাট, কে নয়।"

"সে কী, মার্গারেট!" বাদল শক্ পেয়ে বলল, "তুমি কি বলতে চাও, যে কমিউনিস্ট সে ডেমক্রাট নয়?"

"হাঁ, বাদল। আমি আরো বলি, যে ডেমক্রাট সে কমিউনিস্ট নয়। ডেমক্রেসীতে অন্ধ বিশ্বাস শ্রমিকস্বার্থের অনুকূল নয়, সুতরাং ওর প্রতি নির্মম হতে হবে। শ্রমিক স্বার্থই

একমাত্র মাপকাটি ।"

"আমি মানব না যে তুমি ত্রনস্কির চেয়ে অভিজ্ঞ ।" বাদল ঝগড়া করল। "খাস সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবী তিনি, শ্রমিকসচেতনতায় আস্থাবান। অথচ পার্লামেন্টকেও প্রয়োজন বলে গণ্য করেন।"

"ত্রনস্কির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবার পরিণাম যদি এই হয় তবে আমি অনুতপ্ত।" মার্গারেট হাসল। "কিন্তু আমার মনে হয় ওঁর কাছে তোমার শেখবার আছে অনেক। চিন্তাশীল বলে ওঁর সুখ্যাতি আছে, যদিও সে চিন্তা সব সময় আমাদের মনঃপূত হয় না।"

তারাপদ তার অতিথিদের তদারক করছিল। মার্গারেট ও বাদলের সম্মুখীন হয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, "আশা করি তোমরা উপভোগ করছ। এই উপভোগের নিদর্শনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে ভুলো না। কলেকশনের বাক্স এক মিনিটের মধ্যে আসছে।"

মার্গারেট অস্ফুট স্বরে বলল, "সার্কাসের ক্লাউন।"

বাদল শুনতে পেল না। ভাবছিল ত্রনস্কির কথা।

৩

এক দিন ত্রনস্কির সঙ্গে বাদল দেখা করতে গেল। তিনি থাকেন হাইগেট অঞ্চলে। খুব অস্বচ্ছলভাবে থাকেন বলে মনে হয় না। মাদাম ত্রনস্কি বাদলকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনিও ইংরেজী জানেন, তবে উচ্চারণ ফরাসী ঘেঁষা। ত্রনস্কির তুলনায় তাঁর বয়স বেশী নয়, কেশ আর বেশ হাল ফ্যাশনের। তারাপদর ওখানে তিনি যাননি। তাঁর অসুখ করেছিল। বাদলকে তিনি কমরেড সম্বোধন না করে মিস্টার বললেন। বাদলও তাই চায়। কমরেড শব্দ শুনতে শুনতে বলতে বলতে তার অরুচি ধরে গেছে।

"আসুন। আপনি যে সত্যি এত দূর আসবেন তা আমি প্রত্যাশা করিনি।" বললেন ত্রনস্কি।

ম্যান্টেলপীসে রক্ষিত লেনিনের মূর্তি বাদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জিজ্ঞাসা করল, "ইনি কি লেনিন?"

"হাঁ, তিনিই। কার হাতের তৈরি জানেন?"

"না।"

মাদাম ত্রনস্কি বলে উঠলেন, "থাক, বলতে হবে না।"

বাদল বুঝল কার কীর্তি। তারিফ করল, "রাশিয়ায় আজকাল এত ভালো কাজ হচ্ছে তা তো জানতুম না।"

মাদাম খুশি হয়ে তাকে আরো কয়েকটি বাস্ট দেখালেন। সবগুলি সোভিয়েট নেতাদের। তাদের মধ্যে একটি তাঁর স্বামীর। তিনি আভাস দিলেন যে কেউ যদি কিনতে চায় তবে তিনি বেচতে রাজি আছেন। বাদলেরও শখ ছিল, সে পছন্দ করল গর্কির মূর্তি।

"গর্কির নাটক আপনি ভালোবাসেন?" সুধালেন মাদাম।

"সেদিন দেখতে গেছলুম তাঁর লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌। চমৎকার অভিনয়। শুনলুম ওরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের শাখা দল।"

"আসল দল দেখলে আরো আনন্দ পেতেন। বাস্তবিক রাশিয়ার বাইরে এসে আমাদের প্রধান আনন্দ নিবেছে।" তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন। "এদেশের থিয়েটার আমাদের মনে ধরে না। কী সব ভাসা ভাসা ইমোশন। কৃত্রিম ব্যবহার। মামুলি পরিণতি। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ ইংরেজ পোশাক দেখতে ও সাজ শিখতে থিয়েটারে যায়।"

বাদল থিয়েটারের কথা শুনতে আসেনি, ব্রনস্কির যে একজন মাদাম আছেন তাও সে জানত না। গর্কির বাস্ট কিনে তাঁকে এড়াতে পারবে ভেবেছিল, কিন্তু তিনি সোভিয়েট স্টেজের যেরূপ গুণ গান করলেন তা শুনে মেয়ারহোল্‌ডের মূর্তিটিও কিনতে হল। বাদল মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে ইহুদীর পাল্লায় পড়লে অল্পে নিস্তার নেই। এর পর যদি ব্রনস্কি তাঁর সোভিয়েট সিগারের প্রশংসাবাদ করেন তবে বাদলকে ধরে নিতে হয় যে সিগারগুলিও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। তখন পর্যন্ত সে আন্দাজ করেনি যে এঁরা বিতাড়িত ও বিপন্ন, সম্বল বেচে-এদের সংসার চলে, আর এঁদের এই বড়লোকের মতো চালও বড়লোক খরিদদার পাকড়াতে।

"বসুন, কমরেড সেন।" ব্রনস্কি অনুরোধ করলেন।

"ধন্যবাদ।" বাদল ব্রনস্কির কাছাকাছি আসন নিল। মাদাম গেলেন মূর্তি দুটি প্যাক করতে।

"কমরেড ব্রনস্কি," বাদল জিজ্ঞাসা করল যথেষ্ট সম্ভ্রম সহকারে, "কমিউনিজমের ভিত্তি কি এই বিশ্বাসের উপর নয় যে আমরা যা হয়েছি তা আবেষ্টনের দরুন হয়েছি এবং আবেষ্টনের পরিবর্তন ঘটলে আমাদেরও পরিবর্তন ঘটবে?"

ব্রনস্কি প্রস্তুত ছিলেন না। ভেবে বললেন, "ও বিশ্বাস কেবল কমিউনিস্টদের নয়, তাদের শত্রুদেরও। ওর গায়ে কমিউনিস্ট কোম্পানীর পেটেণ্ট লেখা নেই। আধুনিক জগতের সব আদর্শবাদীর ঐ একই বিশ্বাস যে সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের কিংবা পাঠশালার কিংবা খেলাঘরের পরিবর্তন ঘটলে মানুষেরও পরিবর্তন ঘটে। কমিউনিস্টরা যে পরিমাণে আদর্শবাদী সে পরিমাণে আবেষ্টনবাদী। কিন্তু তারা প্রধানত আদর্শবাদী নয়, তাদের

মতে ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগে কমিউনিজম অবশ্যম্ভাবী, কোন দেশে সেই যুগ কখন আসবে তাই নিয়ে যা কিছু মতভেদ। কমিউনিজম যখন ঘটবেই তখন তাকে মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তার ফলে যে পরিবর্তন ঘটবে তা ঐতিহাসিক পরিবর্তন। যে সব শক্তিকে আমরা ইতিহাসের পটভূমিকায় ক্রিয়াপরায়ণ দেখি সেই সব শক্তির গাণিতিক সমাধান। তাদের উপর প্রভুত্ব করা আমাদের সাধ্য নয়, আমরা তাদের সামিল, আমরাও ঐতিহাসিক শক্তিকণা।"

"কিন্তু এ কি ঠিক নয় যে ইচ্ছা করলে আমরা সব কিছু বদলে দিতে পারি?" বাদলের মনে লেগেছিল যে সে শুধু ঐতিহাসিক শক্তিকণা।

"ইচ্ছারও ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। সমুদ্রে সমীপবর্তী হলে নদীরও ইচ্ছা হয় সমুদ্রে মিশতে। তার বিপরীত ইচ্ছা হচ্ছে নিছক খেয়াল।"

"আপনি তা হলে ডিটারমিনিস্ট?"

"তর্কের খাতিরে।" ব্রনস্কি করুণভাবে হাসলেন।

বাদলের জানতে ইচ্ছা করছিল ব্রনস্কি যা বলছেন তা আন্তরিক, না সরকারী। কমিউনিস্টদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকতে পারে, কিন্তু বাক্যের স্বাধীনতা নেই। পার্টির যা বক্তব্য তাদের প্রত্যেকের তাই বক্তব্য। কিন্তু বাদলের সাহস হল না সে প্রশ্ন করতে।

মাদাম প্রবেশ করলেন মূর্তির পার্সেল হস্তে। বাদল তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পার্সেলের ভার নিল। ব্রনস্কি সুধালেন, "এসব কী?"

"গর্কি আর মেয়ারহোল্ড্।" তাঁর স্ত্রী সমর্পণের স্বরে বললেন। তাঁর এত সাধের ধন কী জানি কোন বিদেশে চালান যাবে, সেখানে হয়তো নিখোঁজ হবে, ভাবীকাল সন্ধান পাবে না যে মাদাম ব্রনস্কির গর্কি ও মেয়ারহোল্ড্ নামে কোনো সৃষ্টি ছিল।

"গর্কি আর মেয়ারহোল্ড্।" ব্রনস্কি শুধু প্রতিধ্বনি করলেন। তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হয়েছিলেন গর্কি আর মেয়ারহোল্ড্। সে সব দিন ফিরবে না, স্মারক যা ছিল তাও দৃষ্টির অতীত হল।

"দয়া করে খুলুন তো, শেষবার দেখি।"

বাদল অন্যমনস্ক ছিল, তার কানে ঢুকল না। পরে এক সময় সজাগ হয়ে সুধাল, "কিছু বলছিলেন আমাকে?"

ততক্ষণে ব্রনস্কি আত্মসংবরণ করেছেন। বললেন, "না। দরকার নেই।"

তাঁর স্ত্রীর চোখের কোণে জল। তিনি হঠাৎ উঠে গেলেন।

"আমি কস্মিন্‌কালে ডিটারমিনিস্ট হতে পারব না। যদি হতে যাই তবে নিজের উপর অত্যাচার করব।" কতকটা আপন মনে বলল বাদল।

"কোনো প্র্যাকটিকল তফাৎ আছে কি ?" ত্রনস্কি মন্তব্য করলেন। "বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি। কাজের কথা হচ্ছে এই যে সাপের মাথায় পা পড়লে সে ফোঁস করে ওঠে, কামড় দেয়। ইচ্ছা করে পা ফেললেও যা ঘটনাক্রমে পা ফেললেও তাই।"

"ঠিক বুঝলুম না।"

"অর্থাৎ চাষী মজুরের স্বার্থহানি হলে তারা চুপ করে সহ্য করবে না। যে ধর্ম তাদের সইতে শেখায় তাকেও তারা নাকচ করবে। ছিঁটেফোঁটা রিফর্মে বিশেষ ফল হবে না। প্রোপাগাণ্ডায় পেট ভরবে না। সাম্রাজ্য হাতে থাকলে সাময়িক পিত্তরক্ষা হতে পারে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যেরও দাবীদার অনেক। যুদ্ধ বাধিয়ে, মুদ্রার বিনিময়হার বাড়িয়ে কমিয়ে, মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে, নানা উপায়ে বেকারদের দুর্গতি ঠেকানো যায়। কিন্তু বাঁধ দিয়ে বন্যার সঙ্গে কুস্তি করে শেষপর্যন্ত লাভ নেই, তাতে জমি শুকিয়ে যায়, অগত্যা কেউ না কেউ বাঁধ কেটে দেয়।"

মাদাম ত্রনস্কি একটি ট্রে'তে করে রাশিয়ান চা এনেছিলেন। বাদলকে সাধাসাধি করতে হল না। কিন্তু একটিবার মুখে দিয়ে সে দ্বিতীয়বার মুখে ছোঁয়াল না। তার চেয়ে কেক খাওয়া মন্দ নয়। আবার ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উঠল। সেখানে কী খায়, কখন খায়, কী ভাবে খায়, এই সব তথ্য। বাদল তো নিজের দেশ সম্বন্ধে ছাই জানে, যেটুকু জানত সেটুকুও ভুলেছে।

"ভালো কথা।" মাদাম বললেন, "আপনার কিংবা আপনার বন্ধুদের যদি বাস্ট গড়াবার বাসনা থাকে আমি গড়তে রাজি আছি। এর মধ্যেই আমি আপনার একটা নক্সা এঁকে নিয়েছি। দেখবেন ?"

৪

সেদিন আর কোনো কথা হল না। বাদল মূর্তিসমেত বাসায় ফিরল। তার ঘরে মূর্তি লক্ষ্য করে ফূর্তি বোধ করল তারাপদ। বলল, "বাঃ। বুদ্ধমূর্তি জোগাড় করলে কোথায় ?"

"বুদ্ধমূর্তি কাকে বলছ তুমি ? ও যে গর্কি আর এ যে মেয়ারহোল্ড্।"

"যাও, ইয়াকি করতে হবে না।" তারাপদ অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়ল। "আমি আর্ট ঘাঁটতে ঘাঁটতে বুড়ো হয়ে গেলুম, বুদ্ধমূর্তি চিনিনে ? কে তোমাকে বুঝিয়েছে গর্কি আর মেয়ারহোল্ড্, শুনতে পারি ?"

বাদল নাম করল না। সে যে মাদাম ত্রনস্কির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তা গোপন রাখল।

"বললেই হল গর্কি আর মেয়ারহোল্ড্।" তারাপদ নাসাভঙ্গি করল।

"তুমি কমিউনিস্ট না হয়ে ফাসিস্ট হলে এদের নাম হত মুসোলিনি আর দাস্থুন্‌ৎসিও। ক্রেতার রুচি অনুসারে নামকরণ হয়েছে। কিন্তু আমি ঠিক জানি এ দুটি তিব্বতী বুদ্ধ।"

তারাপদ সর্বজ্ঞের মতো রায় দিল। বাদলের প্রতিবাদ কানে তুলল না।

"ওসব ধর্মকর্ম," তারাপদ বলল, "এখানে শোভা পায় না। তোমার দৃষ্টান্ত দেখে কে কোন দিন হিন্দু মূর্তি এনে পূজা করতে আরম্ভ করবে। না, কমরেড সেন, তোমাকে আমার অনুরোধ তুমি তোমার মূর্তিযুগল কোথাও সরিয়ে রাখ। নইলে কে কোন দিন কালাপাহাড়ী কাণ্ড করে বসবে, তুমি আমাকে দুষবে।"

বাদল বিরক্ত হয়ে মূর্তি দুটিকে সরিয়ে রাখল। ভাবল কাউকে দান করে দেবে। কিন্তু তারাপদর মূর্তি বিদ্বেষ বাদলের মনে বড় লাগল। কমিউনিস্ট হলে কি ধর্মের ছায়া মাড়াতে নেই? ভারতবর্ষের লোক যদি কমিউনিস্ট হয় তবে কি তাদের দেবমন্দির-গুলি ধূলিসাৎ করতে হবে? ধর্মের সঙ্গে কমিউনিজমের যদি এতই বিরোধ তবে মসজিদ ও গির্জা ও সিনাগগ কোনোটাই টিকবে না, সব গুঁড়িয়ে যাবে। এই যদি হয় কমিউনিজমের প্রয়োগ তবে কয়জন ইংরেজ কমিউনিস্ট হতে রাজি হবে? বাদল ইস্ট এণ্ডের দীনহীনদের সঙ্গে মিশেছে, সে ভাবতেই পারে না যে তারা ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে কমিউনিস্ট হবে।

"আপনার কাছে জানতে চাই, কমরেড ব্রনস্কি," বাদল বলল সিটিং দিতে গিয়ে, "ধর্মের সঙ্গে কমিউনিজমের এমন কী বিরোধ? যদি সে বিরোধ ভিত্তিগত হয় তবে যেসব দেশে ধর্মের ভিত্তি গভীর সেসব দেশে কমিউনিজমের কী আশা? রাশিয়ার মতো বিপ্লব ছাড়া গতি নেই?"

"কঠিন প্রশ্ন।" ব্রনস্কি ভাবলেন। "কিন্তু তার আগে জানতে হয় কমিউনিজম বস্তুটা কী।"

"বেশ তো। শোনা যাক।" বাদল চাঙ্গা হয়ে বসল।

"উঁহু। আপনার কাছে শুনতে চাই।" ব্রনস্কি উৎসাহ দিলেন।

"আমি কমিউনিজমের অ আ ক খ জানিনে। আমার পক্ষে কিছু বলা অশোভন। যদি অভয় দেন তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, কমিউনিজমের কাছে আমি কী আশা করি। আমি আশা করি মানবের দুঃখমোচন। কমিউনিজম হবে এমন এক ব্যবস্থা যার দৌলতে উৎপাদন সহস্রগুণ বাড়বে, অথচ মুনাফা কারো পকেটে যাবে না। বণ্টন প্রয়োজন অনুসারে হবে। কেউ বেকার থাকবে না, কেউ অভুক্ত থাকবে না, সকলের সুচিকিৎসা জুটবে, সকলের সুশিক্ষা জুটবে।"

"আপনি যে বর্ণনা দিলেন," ব্রনস্কি মন্তব্য করলেন, "তা ক্যাপিটালিজমের আমলেও সম্ভব, তফাৎ শুধু এই যে মুনাফা কারো কারো পকেটে যাবে। কিন্তু তাতে কী? যদি

ফল সমান হয়।"

"তার মানে, আপনি কি বলতে চান যে ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থায় কেউ বেকার থাকবে না, কেউ না খেয়ে মরবে না, কেউ"—

"আমার বিশ্বাস ক্যাপিটালিজম এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। যদি না পারে তবে সেটা রাষ্ট্রিক গঠনের ত্রুটি। সমগ্র বিশ্ব যদি এক রাষ্ট্র হত তবে ক্যাপিটালিজম কমিউনিজমের অর্ধেক আকর্ষণ চুরি করত।"

"কমিউনিজমের বাকী অর্ধেক আকর্ষণটা তা হলে কোথায়?" বাদল জেরা করল।

"বাকী অর্ধেক? সেইখানেই তো বিরোধ।" ত্রনস্কি বিষণ্ণ হলেন। "কমিউনিজম কেবল একটা আর্থিক ব্যবস্থা নয়, জীবনযাপনের আদর্শ। সে দিক থেকে কমিউনিজম একটা ধর্ম। যারা কমিউনিস্ট তারা সমষ্টির কল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের ব্যক্তিত্ব নেই, তারা সমষ্টিচক্রের মধুমক্ষি। তাদের স্বধর্মে তাদের এত প্রবল নিষ্ঠা যে তারা পর ধর্মের মর্ম গ্রহণ করে না, বলে ওসব আফিং। এ বিরোধ ভিত্তিগত। একজন কমিউনিস্টের পক্ষে খ্রীস্টান হওয়া সাজে না, হলে গোঁজামিল দিতে হয়।"

বাদলও বিষণ্ণ হল। বিরোধ যদি ভিত্তিগত হয় তবে দেশে দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, ধর্ম কমিউনিজমকে পথ ছেড়ে দেবে না, কমিউনিজম ধর্মের আসন কেড়ে নিতে চাইবে। বিরোধের পরিণাম একের উচ্ছেদ, অপরের উদ্বর্তন। হাজার হাজার বছরের ধর্ম একেবারে লুপ্ত হবে, ভাবতে মন কেমন করে। অপর পক্ষে কমিউনিজম পরাস্ত হলে আধুনিক মানবের আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরাভব ঘটে। তা যদি হয় তবে শুধুমাত্র আর্থিক সুখ সুবিধায় কী হবে? দুঃখমোচন হয়তো ক্যাপিটালিজমের দ্বারাও সম্ভব। কিন্তু ওর মধ্যে সর্বস্বত্যাগের ইঙ্গিত নেই, আত্মসমর্পণের সংকল্প নেই। কেবল স্বার্থ, কেবল লোভ, কেবল লাভ।

"কমিউনিজম," ত্রনস্কি বললেন, "কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষকে দিতে চায় আত্মপ্রকাশের আনন্দ। শ্রমিক চাষী—যারা কোনো দিন আপনার শক্তি উপলব্ধি করেনি—তাদেরকে দিতে চায় আত্মচেতনা। খ্রীস্ট ধর্ম এক দিন মানুষকে, বিশেষত দীনহীন জনকে, আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত করেছিল। সেই উদ্দীপনা আজ কমিউনিজমের। কমিউনিজম একটা আর্থিক ব্যবস্থামাত্র নয়, একটা জীবনাদর্শ। জীবনযাপনের ধারা। ধর্ম।"

"তা তো বুঝলুম," বলল বাদল, "কিন্তু বিরোধ বাধলে কী উপায়? মানুষে মানুষে মারামারি করেই যদি মরল তবে প্রাকৃতিক ধনসম্পদ বৃদ্ধি করবে কে? ভোগ করবে কে? পৃথিবী যদি শ্মশান হয় তবে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে কোথায়! ভবিষ্যতে যদি বিরোধ ছাড়া আর কিছু না থাকে তবে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে কবে? কমরেড ত্রনস্কি, আমি অপেক্ষা

করতে পারিনে, আমি এই জীবনেই দেখে যেতে চাই দুঃখমোচন ও দুঃখমোচনের স্থায়ী ব্যবস্থা। কমিউনিজম যদি বিরোধ বাধায়, বিরোধ যদি অনিবার্য হয়, তবে রক্তপাতের সীমা থাকবে না, কমরেড ত্রনস্কি।"

ত্রনস্কি কপালে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি প্রশ্ন করলেন, আমি উত্তর দিলুম, ও ছাড়া অন্য উত্তর জানিনে। রক্তপাতের কথা যদি তোলেন আমারও সেই আশঙ্কা আছে, সেইজন্যে আমি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির পক্ষপাতী। আমি বিশ্বাস করিনে যে রাশিয়ার দৃষ্টান্তই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত।"

বাদল আশ্বস্ত হয়ে বলল, "আমারও পক্ষপাত পার্লামেন্টের উপর। তবে এর দোষের দিকটা ভুললে চলবে না। এ যাবৎ মাত্র একজন কমিউনিস্ট পার্লামেন্টের মেম্বর হয়েছেন, সামনের নির্বাচনে ক'জন হবেন কেউ বলতে পারে না। তিন চারজনের বেশী নয় নিশ্চয়। এই হারে পার্লামেন্টের ভূয়িষ্ঠ আসন পেতে কত কাল লাগবে কে জানে! তত দিন মানুষের দুঃখ অপেক্ষা করবে না। কী উপায়?"

"আমি," ত্রনস্কি সিগার টানতে টানতে বললেন, "একটা বিপ্লব চাক্ষুষ দেখেছি। আর দেখতে চাইনে। অপেক্ষা করা অনেক ভালো, যদি এই সঙ্গে সংকল্পের দৃঢ়তা থাকে। সংকল্প শিথিল হলে অবশ্য আশা নেই।"

"কাদের সংকল্পের কথা বলছেন? সাধারণ শ্রমিকের কোনো সংকল্প নেই। তারা উপস্থিত কিছু সুযোগ সুবিধা চায়, কমিউনিস্ট জীবনাদর্শ তাদের ধর্ম হতে দেরি আছে। আমরা কি ততদিন আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তা রক্ষা করতে পারব, আমাকে যদি কমিউনিস্ট বলে গণ্য করেন? ইতিমধ্যেই এদেশের অনেক কমিউনিস্ট বুঝতে পেরেছে কমিউনিস্ট টিকিটে লোকের ভোট পাওয়া দুষ্কর, তারা লেবার দলে নাম লিখিয়েছে। তারা বলে, এই বছরই লেবার দলকে দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারি যদি, তবে অনর্থক কমিউনিস্ট দলে থেকে সময় নষ্ট করি কেন?"

"বলেন কী! এমন লোক আছে এদেশে।" ত্রনস্কি দুষ্ট হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, "সব দেশে আছে এমন লোক। কিন্তু আমি এদের ধার্মিক বলতে পারিনে। যারা সত্যিকার কমিউনিস্ট তারা রাশিয়ার মতো রাতারাতি বিপ্লব বাধাতে অনিচ্ছুক, আবার এদেশের মতো লেবার দলে ঢুকে রাতারাতি পরিবর্তন ঘটাতেও ব্যগ্র নয়। তারা যা চায় তা সবুরে ফলে।"

৫

সবুর! সবুর করতে হবে! বিপ্লবীর মুখে এ কী উক্তি! যে ব্যবস্থা সমাজের অধিকাংশ মানুষকে অল্পাংশের মজুরি-দাস করেছে সেই ব্যবস্থার ওলটপালটের জন্যে সবুর করতে

হবে। ততদিন সবুর যদি করতে হয় তবে কমিউনিজম কেন? কমিউনিজম ছাড়া কি অন্ত ব্যবস্থা হয় না? ত্রিশ বছর সময় পেলে কি বাদল নিজেই একটা সমাজগঠনের ধারা উদভাবন করতে পারবে না? জীবনযাপনের ধারা বলতে ব্রনস্কি কী বোঝেন তিনিই জানেন, কিন্তু সমাজগঠনের একটা ধারা কমিউনিজম ছাড়াও সম্ভব।

বাদলের যুক্তি শুনে ব্রনস্কি বললেন, "আমি তো বলেছি যে, ক্যাপিটালিজম যেসব দুর্গতি ডেকে এনেছে ক্যাপিটালিজম সেসব দুর্গতি দূর করতে পারে। ক্যাপিটালিস্টরা একজোট হতে শেখেনি, প্রতিযোগিতা করে পরস্পরের গলা কাটছে। যদি কোনো দিন একজোট হয় তবে যে টাকাটা নানা ভাবে অপচয় হচ্ছে সেটা শ্রমিককে দিয়ে ও লাভের পরিমাণ কমিয়ে তারা একটা নতুন ব্যবস্থা পত্তন করতে পারে। তার আগে অবশ্য রাষ্ট্রিক ফেডারেশন আবশ্যক। এতগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র থাকতে ক্যাপিটালিজমের নব পর্যায় সম্ভবপর নয়। আমার মনে হয় কমিউনিজমের ভীতি যতই ব্যাপক হবে ক্যাপিটালিজমের নব পর্যায় ততই আসন্ন হবে। আরও দু' একটা যুদ্ধ ঘটে রাষ্ট্রের সংখ্যাও সংক্ষেপ করবে। আপনি যা চান তার প্রায় সবটাই পাবেন, বন্ধু সেন। কিন্তু আমি যা চাই তা সহজে পাবার নয়। আমাকে সবুর করতে হবে।"

যুদ্ধের নাম শুনে বাদল অন্তমনস্ক হয়েছিল। বলল, "আবার যুদ্ধ? আপনি কি ক্ষেপেছেন? যুদ্ধ কে চায়? গত যুদ্ধের পর মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি কি?"

"বটে!" ব্যঙ্গ করলেন ব্রনস্কি। "গত মহাযুদ্ধের পর এ যাবৎ কয়টা খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে হিসাব রাখেন? হৃদয়ের পরিবর্তন! তাই যদি হত তবে এত কনফারেন্স কেন? কোনটাই বা সফল হয়েছে? তলে তলে সকলেই সন্দিগ্ধ। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ঈর্ষায় প্রত্যেকে জর্জর।"

বাদল স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছিল যে যুদ্ধের দিন গেছে, আর কোনোদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। তার সেই ধারণায় আঘাত লাগায় সে মনের মধ্যে যন্ত্রণা বোধ করল। যেন ব্রনস্কিই এর জন্তে দায়ী, যেন বাদলকে ব্যথা দেবার জন্তই তিনি যুদ্ধের অবতারণা করেছেন। বাদল তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করে বলল, "কতক লোক আছে তারা যুদ্ধহীন জগৎ কল্পনা করতে পারে না, যুদ্ধ তাদের চাইই। আবার যদি যুদ্ধ বাধে তবে এই সব লোকের আগ্রহে তা বাধবে, নইলে বাধবার কারণ তো দেখছিনে।"

ব্রনস্কি বাদলের শ্লেষ গায়ে মাখলেন না। গর্বিতভাবে বললেন, "দোষ কতক লোকের উপর চিরকাল বর্তায়, তাদের অপরাধ তারা বাস্তববাদী। কিন্তু কথা হচ্ছিল এই যে কমিউনিজমের সার যদি হয় নয়া ব্যবস্থা তবে একদিন ক্যাপিটালিজম তা ধার করতে পারে, চুরি করতে পারে। আমার বিশ্বাস রাশিয়ার ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যদি কার্যকর হয় তবে অন্তান্ত দেশেও প্ল্যানিংএর হিড়িক পড়ে যাবে, কার্যকর হোক বা না।

হোক। আপনি কি লক্ষ করেন নি সোশিয়ালিজমের বহু অভিপ্রেত সংস্কার কনসারভেটি-ভরাই প্রবর্তন করেছে ?"

"হাঁ, লক্ষ করেছি বটে।" বাদল স্বীকার করল।

"পলিটিকসে এই রকমই হয়। মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার দিচ্ছে কে ? না বলডউইন গবর্ণমেণ্ট।"

বাদল হেসে উঠল। "হাঁ, ইতিহাসে অনেক প্রহসন ঘটে।"

"তেমনি কমিউনিজমের সারবস্তু বলতে যদি নয়া ব্যবস্থা বুঝতে হয় তবে তা একদা কনসারভেটিভদের হাত দিয়ে হবে। ওরা মূর্খ নয়। কখন কতটুকু আপোস করতে হয় তা ওরা অনেক ঠেকে শিখেছে। কিন্তু কমিউনিজমের সার হচ্ছে জনসাধারণের অনমনীয় সংকল্প। স্বর্গ যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে তারা নিজেরা করবে, পরের প্রতিষ্ঠিত স্বর্গ তাদের আপন স্বর্গ নয়। ছোট ছেলেদের স্বভাব তো জানেন। মা করে দিলে হবে না, বাবা করে দিলে হবে না, আমি নিজে করব, আমি নিজে করব। ছোট ছেলেদের সেই জেদ জনসাধারণের হলে তারই নাম হবে কমিউনিজম। রাতারাতি একটা বিপ্লব ঘটলেই কমিউনিজম অবতীর্ণ হয় না। তার জন্যে সবুর করতে হয়, শুধু সবুর করলে চলবে না, প্রচার করতে হয়, প্রতিপক্ষকে স্বপক্ষে আনতে হয়। কঠিন কাজ।"

বাদল খুশি হয়ে তালি দিয়ে উঠল। "এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি আপনি কী চান। কমিউনিজমের সঙ্গে ডেমক্রেসীর সমাহার। এক কথায় ডেমক্রাটিক কমিউনিজম। কেমন ?"

একটা নতুন বচন বানিয়ে বাদল উল্লাসে অধীর হল। ডেমক্রাটিক কমিউনিজম— এই সরল সূত্রটা এতদিন কারো মগজে গজায়নি। বাদল আপনাকে আপনি অভিনন্দন করল।

"বেশ বলেছেন, বন্ধু সেন।" ব্রনস্কি তারিফ করলেন। "ডেমক্রেসীর সঙ্গে কমিউ-নিজমের স্বতোবিরোধ তো নেইই, বরং কমিউনিজম হচ্ছে ডেমক্রেসীর পরাকাষ্ঠা। মুশকিল হয়েছে এই যে কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচয় দেয় তারা সবুর করবে না। ভোটে হারলে তারা গায়ের জোরে জিতবে, বিপ্লব করবে, ডিকটেটরশিপ স্থাপন করবে। তাতে সময় বাঁচতে পারে, কিন্তু প্রতিপক্ষ বাঁচে না। এবং দলের ভিতর থেকে যদি প্রতিপক্ষ জন্মায় তবে তারও বাঁচন নেই। কমিউনিজমের সঙ্গে বিপ্লব ও ডিকটেটরশিপ জড়িত হয়ে ঐ নবীন ধর্মের অসীম ক্ষতি করেছে। ওর প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যেক দেশে ফাসিজম মাথা তুলছে। কী যে আছে পৃথিবীর অদৃষ্টে তা বছর চার পাঁচের মধ্যে মালুম হবে। কিন্তু ক্ষমা করবেন আমাকে, আমি যদি আশঙ্কা করি যে প্রথম চোট পড়বে ইহুদীদের গায়ে।"

বাদল চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেন, ইহুদীদের কী অপরাধ ?"

ত্রনস্কি ধরা গলায় বললেন, "ইহুদীদের কী অপরাধ ? আপনি ইউরোপীয় হলে এমন প্রশ্ন করতেন না, বন্ধু সেন। মাফ করবেন, যদি অভদ্রতা হয়। ইহুদীদের অপরাধ ওরা ইহুদী। এবং সেই এক অপরাধে ওরা সব অপরাধে অপরাধী।"

বিষয়ান্তরে যেতে বাদলের মন প্রস্তুত ছিল না। সে ভাবছিল তার উদ্ভাবিত ডেমক্রাটিক কমিউনিজমের কথা। নামটি খাসা। এই নামে একটি পার্টি সংস্থাপন করতে হবে। ইংলণ্ডের লোককে আশ্বাস দিতে হবে, মা ভৈঃ। ডেমক্রাটিক কমিউনিস্টরা বোলশেভিক নয়, তারা বিপ্লব চায় না, তারা ধীরে ধীরে ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, তারা চায় সোশিয়াল তথা ইণ্ডিভিজুয়াল জাসটিস। আপনারা সবাই ভোট দিন ডেমক্রাটিক কমিউনিস্ট প্রার্থীকে।

সেদিন বিদায় নিয়ে বাদল বাসায় ফিরল। সেখানে বাওয়ার্সের সঙ্গে দেখা। "কমরেড বাওয়ার্স," বাদল প্রশ্ন করল, "কমিউনিজমের সঙ্গে ডিকটেটরশিপ জড়িয়ে যাওয়া কি আকস্মিক না স্বাভাবিক ? কমিউনিজমের সিদ্ধি কি ডিকটেটর-সাপেক্ষ ?"

বাওয়ার্স চকিত হলেন। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বাদলকে কবুল করতে হল যে ত্রনস্কির সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে।

"ত্রনস্কি! হো হো!" বাওয়ার্স উপহাস করলেন। "ত্রনস্কি! আপনি বোধ হয় খবর রাখেন না যে ত্রনস্কি এক সময় গোঁড়া ডিকটেটরবাদী ছিলেন। যতদিন কমিউনিস্ট মহলে ত্রনস্কির প্রতিপত্তি ছিল ততদিন তাঁর মুখে ডেমক্রেসীর নামগন্ধ ছিল না, বরং তিনি ইংলণ্ডের কমিউনিস্টদের প্রচ্ছন্ন ডেমক্রাট বলে খোঁচা দিয়েছেন। আমরা তখন যা ছিলুম এখনো তাই আছি, আমরা পার্লামেণ্টে যেতে চাই পার্লামেণ্টে বিশ্বাস করি বলে নয়, ঘাঁটি দখল করে শক্তিশালী হতে। আমাদের আসল কাজ পার্লামেণ্টের বাইরে, তা আমরা তখনো ভুলিনি, এখনো ভুলছিনে, কোনো দিন ভুলবও না—পার্লামেণ্টে সংখ্যা-গুরু হয়ে গবর্ণমেণ্ট গঠন করলেও আমাদের আসল কাজ থাকবে বাইরে। আর ত্রনস্কি ? সেদিনকার সেই সব গরম গরম বুলি এত দিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তার কারণ কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর স্থান নেই।"

"তাই নাকি ?" বাদল বিস্মিত হল।

"আছে অনেক কথা। কিন্তু আমরা এমন অকৃতজ্ঞ নই যে তাঁকে আদৌ আমল দেব না। লোকটার বিদ্যা আছে, ক্ষমতা আছে, দলের জন্যে কাজও করেছেন এককালে।" বাওয়ার্স মেনে নিলেন।

"ত্রনস্কির ব্যক্তিগত ইতিহাস যাই হোক, এটা তো ঠিক যে কমিউনিজম জনসাধারণের ভোট না পেলে তার বিশেষ মূল্য নেই। তাকে উপর থেকে চাপানো," বাদল বলল,

"তার মূল্যের দিক থেকে ক্ষতিকর।"

"হো হো।" বাওয়ার্স উপহাস করলেন। "ত্রনস্কির মুখে এও শুনতে হল। জনসাধারণ কি মাথাগুনতি সাড়ে চার কোটি ইংরেজ? ধরুন দশ লাখ কমিউনিস্ট কি জনসাধারণ হতে পারে না? এদের ইচ্ছা কি জনসাধারণের ইচ্ছা নয়? কমরেড সেন, কমিউনিজম সম্বন্ধে এ কথা বললে ভুল হয় না যে ও গাছ উপর থেকে চাপালে নিচে শিকড় গাড়ে ও নিচের থেকে রস পায়।"

৬

বাদল প্রত্যাশা করেনি যে দুজন কমিউনিস্টের চিন্তাপ্রণালী পরস্পরবিরোধী হবে। তাই যদি হল তবে কমিউনিজমের জয় কী করে সম্ভব?

"কমরেড বাওয়ার্স," বাদল অন্য এক সময়ে তাকে পাকড়াও করল, "তখন বলছিলেন পার্লামেন্টে আপনার বিশ্বাস নেই। সংখ্যাগুরু হয়ে গবর্ণমেন্ট গঠন করলেও কি বিশ্বাস আসবে না?"

"ওহ্! এই নিয়ে আপনি এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন? আচ্ছা, আপনাকে অভয় দিচ্ছি যে পার্লামেন্টে যেদিন আমরা সংখ্যাগুরু হব, গবর্ণমেণ্ট গঠন করব, সেদিন আপনাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়ে আপনাকেই বিচার করতে বলব, পার্লামেন্টকে বিশ্বাস করা যায় কি না।"

"কিন্তু, কমরেড," বাদল বাস্তবিক গলদঘর্ম হয়ে বলল, "আমরা যদি সংখ্যাগুরু হই তবে কে আমাদের বাধা দিতে যাচ্ছে? আমরা যদি আইনের দ্বারা কমিউনিজম প্রবর্তন করি তবে—"

"তবে অপর পক্ষ তা মাথা পেতে নেবে। এই তো?"

বাদল বলল, "এই।"

"নাঃ। আপনি দেখছি আশাবাদী।" বাওয়ার্স বক্রোক্তি করলেন। "আপনার ধারণা কোনো মতে একটা আইন পাশ করতে পারলেই যেখানে যত ব্যাঙ্ক আছে, রেল আছে, খনি আছে, জাহাজ আছে, কারখানা ও দোকান আছে, সব চলে যাবে রাষ্ট্রের খাস দখলে? কেউ টাকা খাটাতে, মজুর খাটাতে পারবে না? কেউ মুনাফা কিংবা সুদ টানতে পারবে না? রাষ্ট্র থেকে যাকে যে কাজ দেওয়া যাবে সে তাই করবে, যা পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে তাই নেবে? এক কথায় যাদের অধিকারে আজ উৎপাদনের উপকরণ রয়েছে, সঞ্চিত ধন রয়েছে, তারা ক্ষতিপূরণ না নিয়ে সমস্ত সমর্পণ করবে? কেমন?"

বাদল বলল, "ক্ষতিপূরণ দিতে পারা যায়।"

"দিতে পারা যায় ?" বাওয়ার্স হাসতে হাসতে বললেন, "অঙ্ক কষে দেখেছেন ক্ষতি-পূরণের বহর কত ?"

বাদল এ বিষয়ে কোনোদিন ভাবে নি। নির্বাক হল।

"হিসাব করলে দেখবেন," বাওয়ার্স বোঝালেন, "সে টাকা এত বেশী টাকা যে নগদ দেবার সাধ্য নেই রাষ্ট্রের। আর দিলেও সে টাকা কার কাজে লাগবে ? খাটাবার রাস্তা বন্ধ। বিদেশে চালান দেওয়া বারণ। সুতরাং পার্লামেন্টের আইন যাই হোক না কেন, যাদের খনি খামার কারখানা দোকান তারা বিনা দ্বন্দ্বে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়বে না। বল প্রয়োগ করতেই হবে, কমরেড সেন, যদি না মানুষের প্রকৃতি বদলায়। আর বল প্রয়োগ যদি করতে হয় তবে তা সিভিল ওয়ার।"

"এত দূর গড়াবে ?" বাদল অবিশ্বাসের স্বরে বলল।

"বিন্দুমাত্র মোহ পোষণ করবেন না।" বাওয়ার্স কঠোর কণ্ঠে বললেন। "মানুষ তার লাভের ব্যবসা বিনা বাক্যে পরের হাতে তুলে দেয় না, পর যদিও স্বদেশের রাষ্ট্র। তারপর রাষ্ট্রের উপর এতটা বিশ্বাস সকলের নেই যে সার্বজনীন সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হবে। চুরির সম্ভাবনা পদে পদে। যেই রক্ষক সেই ভক্ষক হতে কতক্ষণ ? দেশব্যাপী কলকারখানা দোকান-হাটের খুঁটিনাটি পার্লামেন্টের কর্ণগোচর হবে কি না কে জানে ?"

"তা হলে," বাদল বিচলিত ভাবে বলল, "কমিউনিজমের কোনো আশা নেই বলুন।"

"কমিউনিজমের পথে কত যে বিঘ্ন তাই বিশদ করতে চেষ্টা করেছি," বাওয়ার্স মৃদু হাসলেন, "একেবারে হতাশ হতে বলিনি।"

"পার্লামেন্টের কানুন যদি কেউ না মানে, বল প্রয়োগ করলে যদি সিভিল ওয়ার বাধে, তবে হতাশ হবারই কথা।" বাদল গম্ভীরভাবে বলল।

"কিন্তু পার্লামেন্টের কাছে বড় বেশী আশা করিনে আমি, তাই হতাশ হতে পারিনে।"

"কার কাছে আশা করবেন তবে ?"

"ইতিহাসের কাছে। কার্যকারণপরম্পরার কাছে। ক্যাপিটালিজম আপনা হতে ভেঙে পড়বেই, না পড়ে পারে না। যারা শাসনের দায়িত্ব নিয়েছে তারা দেখবে বেকার সমস্যার তারা কোনো প্রতিকার করতে পারছে না, সুদ উত্তরোত্তর নেমে যাচ্ছে, মুনাফা ক্রমে কমছে। নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে যখন কিছুতেই কিছু করতে পারবে না তখন শ্রমিককে নামমাত্র মজুরি দিয়ে বেগার খাটাবে। তাতেও যখন সুবিধা হবে না তখন যুদ্ধের আয়োজন করবে, তাতে সাময়িকভাবে সমস্যার হাত এড়াবে। যুদ্ধে হারজিৎ যাই হোক না কেন, যুদ্ধের পরে বাজার মাটি হয়ে যাবে, বেকার সমস্যা চরমে

উঠবে। লোকে বুঝবে যে ফাঁকির রাজত্ব বেশী দিন চলতে পারে না। লোকে বুঝবে কোথায় রোগের জড়। প্রাইভেট প্রফিট যার ভিত্তি সে ব্যবস্থায় লোকের আস্থা লোপ পাবে। তখন সেই অনাস্থা যে কেবল পার্লামেণ্টে প্রতিবিম্বিত হবে তাই নয়, হবে দেশের সর্ব স্তরে। দেশের পুলিশ, সৈন্য, কেরানী, কুলি, সকলের মনে অসন্তোষ ঘনাবে। তারা দিনের পর দিন চিন্তা করবে, যে ব্যবস্থা বেকার বানায় তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কি নেই। বহু জনের বহু কল্পনা যখন ব্যর্থ হবে তখন আপনা আপনি দেশের একধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত ছেয়ে যাবে ছোট ছোট পঞ্চায়েৎ বা সোভিয়েট। প্রকৃত ক্ষমতা গিয়ে পড়বে এই সব নামহীন গোত্রহীন প্রতিষ্ঠাহীন পঞ্চায়েতের হাতে। পার্লামেণ্ট হাঁ করে বসে থাকবে বাহাত্তুরে বুড়োর মতো। তার ফোকলা মুখের বাদবিতণ্ডায় কেউ কর্ণপাত করবে না।"

বাদল স্তম্ভিত হয়েছিল। বলে উঠল, "সর্বনাশ! এ যে সোভিয়েট ইংলণ্ডের কল্পনা!"

"তা ছাড়া আর কী! কমিউনিজম কি ছেলেখেলা? কমিউনিজম হচ্ছে প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। পার্লামেণ্ট প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। কিন্তু পরিবর্তন যদি প্রচলিত ব্যবস্থার ভিত্তিলোপ করে তবে পার্লামেণ্ট কার সঙ্গে খাপ খাবে? মানুষের মন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবে। তার পরেও যদি পার্লামেণ্ট কোনো গতিকে টেকে তবে তা হাউস অফ লর্ডসের মতো শোভার জন্যে ব্যবহৃত হবে।"

বাদল আহত বোধ করল। পার্লামেণ্টের উপর বাল্যাবধি তার অতুল শ্রদ্ধা। যে-দেশে পার্লামেণ্ট নেই সেদেশে সভ্যতা নেই, পার্লামেণ্ট হচ্ছে সভ্যতার মাপকাটি। পার্লামেণ্টের মেম্বর হবে এ অভিলাষ তার আবাল্য। ডেমক্রেসীর পুণ্যপীঠ সেই পার্লামেণ্ট কিনা নতুন প্রতিষ্ঠানের কাছে নিষ্প্রভ হবে।

বাদলের আপত্তি শুনে বাওয়ার্স বললেন, "পার্লামেণ্টারি ডেমক্রেসী ছাড়া কি অন্য প্রকার ডেমক্রেসী হয় না? সোভিয়েটও ডেমক্রেসীর ভিন্ন রূপ। সে ক্ষেত্রেও নির্বাচন আছে, প্রত্যেকে ভোট দেয়। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার মর্যাদা সে ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হয়। তবে তার উদ্দেশ্য আলাদা। রাষ্ট্রচালনা তার উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য উৎপাদন বণ্টন বিনিময় ইত্যাদির পরিচালনা। রাষ্ট্রচালনার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে, পার্টির যাঁরা বিশ্বাসভাজন নেতা তাঁরা রয়েছেন। সাধারণ লোক যখন প্রস্তুত হবে, বাইরের দিক থেকে যখন বাধা থাকবে না, সব দেশে যখন এই ব্যবস্থার প্রসার হবে তখন রাষ্ট্র চালনার ভারও সাধারণ লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত হবে। কিন্তু তত দিন পরে হয়তো রাষ্ট্র বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব থাকবে না, শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীপ্রাধান্যের এই বাহনটিও অবলুপ্ত হবে। সুতরাং রাষ্ট্রচালনার ভার বলতে ঠিক যা বোঝায় তা ন্যস্ত

হবার আগেই হয়তো তার প্রয়োজন অন্তর্হিত হবে।"

"তার মানে কী, কমরেড বাওয়ার্স?" বাদলের ধাঁধা লাগল। "রাষ্ট্র না থাকলে রাষ্ট্রচালনাও থাকে না, সুতরাং সাধারণের পক্ষে অধিকার লাভও ঘটে না। ডেমক্রেসী কী করে বলবেন সেই রাজনৈতিক নির্বাণকে?"

এর উত্তরে বাওয়ার্স যা বললেন তা উচ্চাঙ্গের দার্শনিকতা। তার অর্থ বোধ হয় তাঁর নিজেরও বোধগম্য নয়। শ্রেণীহীন সমাজ বোঝা যায়, কিন্তু রাষ্ট্রহীন সমাজ কী ব্যাপার? তার আকৃতি কেমন, গতি কেমন, নিরাপত্তার ভরসা কী?

বাওয়ার্স আমতা আমতা করে বললেন, "ওসব আপাতত ভেবে কাজ নেই। ওর অনেক দেরি আছে। আগে তো কমিউনিজম জয়ী হোক, তারপর জয়ের অংশ প্রত্যেকে পাবে।"

৭

বাওয়ার্স কিংবা ত্রনস্কি, যাঁর কথা সত্য হোক না কেন, নতুন ব্যবস্থার বিলম্ব আছে, নিকট সম্ভাবনা নেই। বাদল এতে ক্ষুণ্ণ হয়। উপস্থিত কিছু দুঃখমোচন করবে, এই যার আদর্শ তার পক্ষে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করা কায়িক যাতনার মতো দুর্বহ। বাদলের মনের আকাশ মেঘলা থমথমে। সেখানে কেবল হাওয়ার হাহাকার, আলোকের অসহায় অদর্শন।

আমি কী করতে পারি? আমি কী করতে পারি? বাদল ভাবে আর ভেবে আকুল হয়। তারাপদর দল নির্বাচনের জ্বরে আচ্ছন্ন। শুধু তারাপদরা নয়, ইংলণ্ডের লোক। বাইরে পা দিলে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন চোখে ঘা দিয়ে যায়। দেয়ালে দেয়ালে প্রচারপত্র, ছবি, স্লোগান। রাস্তায় রাস্তায় জটলা। রাস্তার কোণে কোণে একখানা টুল কিংবা কাঠের বাক্স জোগাড় করে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বক্তা। তাঁকে ঘিরে দু'দশ জন শ্রোতা। শ্রোতাদের মধ্যে বিপক্ষের চরও আছে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা যায় পতাকাহস্তে শোভাযাত্রী দল। পার্কে পার্কে সভা চলেছে।

তারাপদরা আহারনিদ্রা ভুলেছে। তাদের সঙ্গে কচিৎ চোখাচোখি হলে বকুনি শুনতে হয়। "বেশ, মামা, বেশ। আমরা মরি খেটেখুটে, আর তুমি বসে বসে আয়েস কর। আসছে, আসছে, দিন আসছে। তোমার মতো বুর্জোয়াদের ধরে ধরে গুলি করা হবে। রক্ষা নেই, তোমাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।"

তাদের শাসানি বাদলের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে শুধু ভাবে, আমাকে দিয়ে কী হতে পারে? আমাকে দিয়ে কী হতে পারে? নির্বাচনের ভাঁড়ামি তার সহ্য হয় না।

Father, Mother, Brother, Sister,
Vote for Philip Cunliffe Lister.

এক জায়গায় লিখেছে। অন্য সময় হলে হাসি পেত। কিন্তু জগতের ইতিহাস যখন যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে তখন তাকে বিরক্ত করে তোলে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি।

মানুষের এত দুঃখ। কেউ কি সে বিষয়ে সত্যি তন্ময়! দলাদলির ঘূর্ণীপাকে যার যেটুকু শক্তি সবটুকু তলিয়ে যাচ্ছে। কেন এরা সব দলের কর্মীরা মিলেমিশে কাজ করে না। জয়পরাজয়ের প্রশ্ন কেন উঠে? যুদ্ধের সময় যেমন সব দলের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় শান্তির সময় সেই বন্দোবস্ত বহাল থাকে না কেন? চারি দিকে এত দারিদ্র্য, এত দুর্গতি, এত দুর্ভাগ্য! তবে কেন যার যতটুকু ক্ষমতা সবটুকু একত্র হয়ে মানবের সেবায় নিযুক্ত হয় না? পার্টি গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক কী? নির্বাচনের হুল্লোড় কী দরকার? বৃথা, বৃথা এই শক্তিক্ষয়। বৃথা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মার্গারেট এ কথা শুনে বলল, "তুমি কি মনে করেছ মিলেমিশে কাজ করা সম্ভবপর? যাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করব আমরা, তারা কি আমাদের পরামর্শ মানবে? কী করে মানবে, তাদের কি শ্রেণীস্বার্থ নেই?"

"ওহ্! শ্রেণীস্বার্থ!" বাদল কানে আঙুল দিল। "শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। সোভিয়েট রাশিয়াতেও সকলের মজুরি সমান নয়, তা নিশ্চয় জানো। যারা কম পায় তাদেরও একটা শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা স্বীকার কর তো?"

"না। স্বীকার করিনে। মজুরির উনিশ বিশ মার্কসবাদের সঙ্গে বেখাপ নয়। আসল কথা, যারা বেশী মজুরি পায় তারা উদ্বৃত্ত টাকা জমিয়ে অন্য দশজনকে মজুর খাটাতে পারে না, কিংবা সে টাকায় ব্যবসা করতে পারে না। বড় জোর ভোগ বিলাসে ব্যয় করতে পারে। তা করুক। আমাদের মন অত ছোট নয় যে ঈর্ষা করব।"

"তবে তুমি বলতে চাও," বাদল উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এদেশের ক্যাপিটালিস্টরা বিস্তর লোককে মজুর খাটায়, সেটা তাদের অপরাধ! তাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ পরিবার প্রতিপালিত হচ্ছে, এই অন্নদানকে তুমি অপরাধ বলবে, মার্গারেট!"

"আহা! অত রাগ কর কেন?" মার্গারেট বাদলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল। "কমিউনিস্টদের আড্ডায় থাকলে কী হয়, তুমি যে হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। তোমাকে গোড়া থেকে বোঝাই, শোন। মনে কর তুমি একটা রেল কোম্পানীর অংশীদার। বছরের শেষে তুমি চাও তোমার বাঁধা মুনাফা। কোম্পানীর যাঁরা ডিরেক্টর তাঁরা তোমার প্রতিনিধি। তোমার স্বার্থটি কিসে বজায় থাকে তাই তারা সর্বপ্রথম দেখবেন। তোমার স্বার্থ বাঁচিয়ে তার পরে যদি সম্ভব হয় তবে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে, তাদের জন্যে বাড়ী বানাতে, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল বসাতে,

তাদের নানা রকম সুবিধা দিতে তাঁদের আপত্তি হবার কথা নয়। তাঁরা গাফিলতি করলে রাষ্ট্র শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে চাপ দিতে ছাড়বে না।"

"এসব কি আমি জানিনে, মার্গারেট ?" বাদল অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দিল।

"জানলে কি আবার জানতে নেই ?" মার্গারেট হাসল। "আমি যা বোঝাতে চাই তা এই যে ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্র এই পর্যন্ত পরোপকার করতে পারে, করেও। তার জন্যে তোমার সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে হবে না, টোরি গবর্ণমেণ্টও তা প্রাণপণে করবে। ওরা পাকা ব্যবসাদার। দুধ পেতে হলে গোরুকে ভালো করে খাওয়াতে হয়, তা ওরা বই না পড়েও সুন্দর বোঝে। ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধে তখনই, যখন ওরা কোম্পানীর লোকসান হচ্ছে দেখে শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দেয়, কিংবা সংখ্যা কমিয়ে দেয়; কোম্পানী সে বেচারিদের দায়িত্ব নেয় না, রাষ্ট্র যেটুকু দায়িত্ব নেয় সে শুধু মুষ্টি ভিক্ষা জোগাবার। তোমার সম্মিলিত গবর্ণমেণ্টকে যদি বলা হয় তাদের চাকরি গেলে চাকরি দিতে, চাকরি না দিতে পারলে চাকরির সমান মাইনে দিতে, মাইনে কমালে কমতিটুকু পুষিয়ে দিতে, ক্ষতিপূরণ করতে, তবে কি তোমার টোরি বন্ধুরা কর্ণপাত করবেন ?"

বাদল চিন্তিত হল। তাই তো।

"বুঝলে, বাদল ? আসল কথা হল এই যে, শ্রমিকদের দায়িত্ব হয় কোম্পানীকে নয় রাষ্ট্রকে, নিতে হবে। কোম্পানী চিরকালের মতো অমন দায়িত্ব নিতে পারে না, কোম্পানীর অংশীদাররা পরের বোঝা বইতে নারাজ। তুমি তোমার মুনাফার টাকা পরকে খাওয়াতে চাইবে না, তা ছাড়া কোম্পানী যদি দেউলে হয় তবে তোমার অংশের টাকায় টান পড়বে। তুমি এ দায়িত্ব কিছুতেই নিতে পার না, এ দায়িত্ব ব্যক্তির নয়। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই পর্যন্ত যদি মানো তবে বাকীটুকু মানতে কষ্ট হবে না। রাষ্ট্র যদি শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেয় কিংবা প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয় তবে সে দায়িত্ব করদাতার উপর বর্তায়। অথচ ট্যাকসেরও একটা সীমা আছে। তোমার সম্মিলিত গবর্ণমেণ্টে আমার যদি স্থান হয় আর আমি যদি বলি মালিকদের উপর আরো ট্যাক্স বসুক, তবে টোরিরা আমার সে পরামর্শ গ্রাহ্যই করবে না।"

"তা হলে," বাদল অধৈর্য হয়ে বলল, "কী করে এ সমস্যার সমাধান হবে ? কমিউ-নিজম দিয়ে ? তার মানে, বিপ্লবের পরে ?"

"কমিউনিজম কি গাছে ফলে ? কমিউনিজম একটা নাম। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, এমন একটা ব্যবস্থা যাতে শ্রমিক স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয়েছে। তুমি যদি ক্যাপিটালিজমকে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করাতে পার তবে আমি কমিউনিজমের ধার ধারব না, বাদল। কিন্তু তুমি পারবে না। মুসোলিনি পারেনি। ফাসিজমের উদ্দেশ্য কী ? উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ক্যাপিটালিজমকে প্রাণে না মেরে তার

সঙ্গে আপোসে শ্রমিকস্বার্থের উন্নয়ন। কিন্তু কার্যকালে বিপরীত ফল ফলেছে। শ্রমিক সহজে বেকার হয় না, কিন্তু তাকে এক রকম বেগার খাটতে হয়। মজুরি এত কম যে তাতে কায়ক্লেশে সংসার চলে। ফাসিজমের বকলমে ক্যাপিটালিজম রাজ্য শাসন করছে।"

বাদল তা জানত। ফাসিজমের উপর তার কবে থেকে ক্রোধ—সেই ম্যাট্রিকুলেশনের সময় থেকে। মুসোলিনি যে ডেমক্রেসীর শত্রু, সুতরাং বাদলের শত্রু, তা পাটনা কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য শুনেছে। তবে ফাসিজম যে ক্যাপিটালিজমের ছদ্মবেশ সে কথা আবিষ্কার করতে বাদলের বহু দিন লেগেছে।

"চুলোয় যাক ফাসিজম।" বাদল জলে উঠল। "কিন্তু শ্রমিক স্বার্থের জন্যে শেষকালে একটা সিভিল ওয়ার বাধুক তা বোধ হয় তুমি চাও না। তোমাকে বলে রাখছি, মার্গারেট, তোমাদের এই শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে যদি যুদ্ধ বাধে তবে সেই যুদ্ধের আগুনে সব পুড়ে ছারখার হবে, সভ্যতার অবশেষ থাকবে না। মানুষের দুঃখ মোচনের পরিণাম যদি এই হয় যে মানুষ বলে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না তবে—"

"আপদ যায়।" মার্গারেট খিল খিল করে হেসে উঠল।

বাদল গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসল, সত্যি কি মানুষের জন্যে কেউ কাঁদে! যে যার দলগত স্বার্থ নিয়ে পাগল।

৮

"মার্গারেট," বাদল ভয়ে ভয়ে বলল, "আমার কী মনে হয়, বলব?"

"কী মনে হয়, বাদল?"

"আমার ভয় হয়, তোমরা বিপ্লবের প্রেমে পড়েছ। বিপ্লব তোমাদের চাইই। শ্রমিক স্বার্থটা উপলক্ষ্য। বিপ্লবটাই লক্ষ্য। মানুষকে তোমরা ভালোবাস না, ভালোবাস বিপ্লবকে। মানুষ তোমাদের কাছে বিপ্লবের ইন্ধন, যেমন মিলিটারিস্টদের কাছে cannon fodder."

মার্গারেট রাগে ঠোঁট কাটল। তারপর করুণায় আর্দ্র স্বরে বলল, "ইউ সিলি ফুল।"

বাদল ক্ষমা চেয়ে বলল, "হয়তো অন্যায় অভিযোগ করেছি। তবু যা সত্য বলে মনে হয়েছে তাই বলেছি, মার্গারেট।"

"আমারও সত্য বলে মনে হয় যে তুমি একটি আস্ত নির্বোধ। কী করে তোমার মনে হল মানুষ আমাদের কাছে কামানের খোরাক!"

"এই দেখ। তুমি শুনতে ভুল করেছ। কামানের খোরাক তোমাদের কাছে নয়, যুদ্ধ-পিপাসুদের কাছে। তোমাদের কাছে বিপ্লবের ইন্ধন।"

"বিপ্লবের ইন্ধন ?" মার্গারেট রুষ্ট স্বরে বলল, "বিপ্লবটা কার সুখের জন্য ? যার সুখের জন্যে, সে যদি যোগ দেয় তবে কি সে ইন্ধন হয় ? বাদল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"বলতে পার। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় শ্রমিকের প্রতি তোমাদের দরদ নেই, তোমরা তাদের দুঃখ বোঝ না, তাদের সুখের জন্যে যা ঘটাতে চাও সেটা তোমাদেরই নাটকীয় ঘটনার প্রতি টান থেকে।"

"লাইবেল।" মার্গারেট কুপিত হয়ে বলল, "শ্রমিকের প্রতি আমাদের দরদ নেই এ কথা শ্রমিকের মুখে শুনিনি, তোমার মুখে এর কোনো মানে হয় না।"

তাদের দুজনের বন্ধুতা এতদিনের যে এই নিয়ে তাদের কলহ শোভা পায় না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তারা করমর্দন করছে। বাদল বলছে, "আমি যদি সিলি ফুল হই তুমি কী ?"

তার উত্তরে মার্গারেট বলছে, "আমি ওল্ড্ ফুল।"

"কিন্তু বিচার কর, বাদল, এছাড়া আর কী উপায় আছে ? ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লাভের উপর যে ব্যবস্থার বনিয়াদ কী করে তাকে তুমি সমষ্টিগত কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে ? কিসে দু' পয়সা লাভ হবে এই যাদের একমাত্র ধ্যান তারা লাভের সুযোগ হারালে এমন কোলাহল বাধাবে যেন তাদের স্বার্থই দেশের স্বার্থ, দশের স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সমন্বয় যদি সম্ভব হত তবে এই বিজ্ঞানের যুগে কারুর কোনো অভাব থাকত না। উৎপাদনের বাহুল্য যে যুগের বৈশিষ্ট্য সে যুগে কেন এত লোক নিঃস্ব ?"

বাদল ভেবে বলল, "সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।"

"আচ্ছা, আমি যদি সপরিবারে বেকার হই তবে আমার দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা গড়পড়তা বাড়লে আমার কী সান্ত্বনা ! এমন এক ব্যবস্থা চাই যাতে বেকার কেউ থাকবে না, ক্রয়ক্ষমতা প্রত্যেকের বাড়বে। সে ব্যবস্থা ক্যাপিটালিজম কিংবা তার ছদ্মনাম ফ্যাসিজম নয়। তা কমিউনিজম।"

বাদল বলল, "তাই হোক। কিন্তু তা যেন হয় ডেমক্রাটিক কমিউনিজম।"

"হাসালে।" মার্গারেট হাসল না কিন্তু। "তোমার ধারণা পার্লামেন্ট এদেশ শাসন করছে, মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের কর্মসচিব। যদি তলিয়ে দেখতে তবে বুঝতে, আসলে এ দেশের শাসনকর্তা মন্ত্রীরা নয়, মন্ত্রীদের বল্গা যাদের হাতে সেইসব ব্যাঙ্ক, কোম্পানী, জমিদার। যার যেটুকু সঞ্চয় আছে সে সেটুকু রেখেছে ব্যাঙ্কে, তা দিয়ে শেয়ার কিনেছে, ইনশিওর করেছে। এইভাবে তার প্রাণ রয়েছে ব্যাঙ্কওয়ালাদের বীমাওয়ালাদের কলওয়ালাদের মুঠোর মধ্যে। ইংলণ্ডের লোক অর্থনৈতিক সঙ্কটকে জুজুর মতো ডরায়।

তাই ব্যাঙ্কওয়ালা ইত্যাদির অপরিসীম প্রেস্টিজ। তাদের সঙ্গে যদি মন্ত্রীদের সংঘর্ষ বাধে তবে তারা সঙ্কট সৃষ্টি করে এমন ভয় পাইয়ে দেবে যে মন্ত্রীদের যারা গাছে উঠিয়েছে তারাই মই কেড়ে নেবে।"

বাদল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলল, "এ কি কখনো সম্ভব?"

"সবই সম্ভব, কিছু অসম্ভব নয়। ডেমক্রেসী কাকে ঠাউরেছ, বাদল? এ যে প্লুটোক্রেসী। পার্লামেণ্ট একটা পর্দা। তার আড়ালে বসে সুতো টানছে জনকয়েক প্লুটোক্রাট! পুতুল নাচ দেখাচ্ছে যত ডেমোক্রাট। বাইরের ঠাট ঠিক আছে, কিন্তু কলকাটি রয়েছে আড়ালে।"

"না।" বাদল প্রতিবাদ জানাল। "পার্লামেণ্ট এতটা অপদার্থ নয়। আর ক্যাবিনেটকে ম্যারিওনেট মনে করা হাস্যকর।"

"বেশ, তোমার যদি তাই ধারণা হয় তবে আমার আর বক্তব্য নেই।" মার্গারেট উঠল। "কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে লিখে রাখতে পার যে এবার যদি লেবার পার্টির জয় হয় তা সত্ত্বেও লেবার পদে পদে বাধা পাবে ও আপনা হতে ভেঙে যাবে। এদেশে টোরি পার্টি ছাড়া অন্য কোনো দল টিকতে পারবে না, কেননা অন্য কোনো পার্টি ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সমর্থন পাবে না। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের ভোট পেতে পারে। কিন্তু জনগণের পুঁজি যাদের সিন্দুকে তাদের গায়ে হাত পড়লে তারা জনগণের পকেটে এমন চাপ দেবে যে জনগণ পার্টির পিছন থেকে সবে দাঁড়াবে।"

বাদল বলল, "তোমার ভবিষ্যদ্বাণী যদি সফল হয় তবে দেশে কেবল একটিমাত্র পার্টি থাকবে—টোরি পার্টি। অন্যান্য পার্টির কী দশা হবে?"

"ওরা টিকলেও মাথা তুলতে পারবে না, বসে বসে সমালোচনা করবে। টোরিদেরও ইচ্ছা যে নামমাত্র একটা অপোজিশন থাক, তা হলে দুনিয়াকে দেখাতে পারবে যে ইংলণ্ডের লোকের সিভিল লিবার্টি আছে, ওরা যত খুশি বকতে পারে। কিন্তু কর্মের অধিকার? তা শুধু টোরি পার্টির।"

বাদল বিশ্বাস করল না। এ কি কখনো সম্ভব যে ইংলণ্ডের মতো দেশে একটি মাত্র পার্টি রাজত্ব করবে? তা যদি হয় তবে ইটালির সঙ্গে তফাৎ কোথায়? সেখানেও তো একটিমাত্র পার্টি সর্বময়। রাশিয়ার সঙ্গে তফাৎ কোথায়? সেখানেও একটিমাত্র পার্টি সর্বশক্তিমান। ডেমক্রেসীর মর্ম এই যে একটির বেশী পার্টি থাকবে। একবার একটির হাতে রাষ্ট্র, একবার অন্যটির হাতে। ক্রিকেট খেলায় যেমন একবার এরা ব্যাট ধরে, ওরা বল করে। একবার ওরা ব্যাট ধরে, এরা বল করে। একতরফা খেলা কি ক্রিকেট?"

মার্গারেট তা শুনে বলল, "না। ক্রিকেট নয়। কিন্তু ক্রিকেটের দিন গেছে। একথা ওরাও জানে, আমরাও জানি, জানে না তোমার মতো ডেমক্রাটরা, যাদের অর্থ নৈতিক

কাণ্ডজ্ঞান নেই, যারা পার্লামেণ্ট বলতেই অজ্ঞান।"

ক্রিকেটের দিন গেছে। বলে কী এ মেয়ে! ডেমক্রেসীর দিন গেছে! একটিমাত্র পার্টি থাকবে, সেটি হয় কমিউনিস্ট পার্টি, নয় কনসারভেটিভ পার্টি! দ্বিতীয় কোনো পার্টি থাকবে না। এই কি ইতিহাসের পরিণতি? এরই জন্যে এত আন্দোলন! জনসাধারণের ভোট অধিকার, স্ত্রীজাতির ভোট যোগ্যতা। কিসের জন্যে নির্বাচন, কেন এত হৈ হৈ, কী এর মূল্য, যদি একটিমাত্র পার্টি একেশ্বর হয়, অন্য কারো অস্তিত্ব না থাকে?

"মার্গারেট," বাদল স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "তুমি যে কী বাজে বকছ তা তুমি নিজেই বোঝ না। কার কাছে এসব শিখেছ? কোমিন্‌টার্নের কাছে?"

মার্গারেট রাগে ও লজ্জায় লাল হয়ে বলল, "আমি চললুম।" তারপর বাদলের দিকে যেন ছুঁড়ে মারল এই উক্তি, "তোমার কাছে উদ্দেশ্যটা গৌণ হয়েছে, মুখ্য হয়েছে উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। নইলে পার্লামেণ্টের মধ্যে তুমি এমন করে আটকে যেতে না, মধুভাণ্ডে মক্ষিকা যেমন। দুঃখমোচন করতে চাও, অথচ হাত পা বাঁধা পার্লামেণ্টের খুঁটিতে। আমরা অবশ্য পার্লামেণ্টকে উপেক্ষা করিনে। ওটা দখল করা দরকার! বিপ্লবী-দের কাছে রেল স্টীমার মোটর যেমন ব্যবহার্য পার্লামেণ্টও তেমনি। ওখানে ঢুকে খেলা করতে স্পৃহা নেই, বক্তৃতারও অবসর নেই। ওটা একটা যান, ওটায় চড়ে যাত্রা করতে হবে। এবং যাত্রা কেবল একটি দিকে। একবার এদিকে, একবার ওদিকে নয়। একবার ওরা মেজরিটি, একবার আমরা মেজরিটি হলে দিগ্‌ভ্রম ঘটবে। চিরকাল আমরাই মেজরিটি হব এবং আমাদের চালনায় দুঃখীরা তাদের দুঃখের শেষে পৌঁছবে।"

বাদল মার্গারেটকে বিদায় দিয়ে শয্যার আশ্রয় নিল। সেই যে তার মাথা ধরা শুরু হল তার পরে ছাড়ল না। দিনের পর দিন জের টানল।

এরা কি সত্যি মানুষকে ভালোবাসে? ভালোবাসলে সংঘর্ষের প্রস্তাব তোলে কেন? সংঘর্ষ যদি বাধে তবে তার দ্বারা দুঃখের কি উপশম হবে, আরোগ্য হবে? না দুঃখ গভীরতর, তীব্রতর হবে? যুদ্ধে কোনো পক্ষের সুবিধা হয় না, জয় যারই হোক, ক্ষয় উভয় পক্ষেরই। সুখীদের বিরুদ্ধে দুঃখীদের অভিযান উভয়কেই দুর্গত করবে, দুঃখীজনের সংখ্যা বাড়াবে। পক্ষান্তরে—

৯

গুছিয়ে ভাবলে এই দাঁড়ায় যে ব্যক্তিগত বা যূথগত লাভের উপর যে ব্যবস্থার বনিয়াদ সে ব্যবস্থা ক্যাপিটালিজম। তার সারমর্ম এই যে আমার সঞ্চয় আমি লাভের জন্যে খাটাব, তুমি খাটবে ও মজুরি পাবে, আমি তোমার খাটুনির ফল বেচে আমার খাটানো টাকা তুলব ও সেই সঙ্গে কিছু লাভ করব। এই ব্যবস্থায় তোমার আপত্তির ন্যায়সঙ্গত

কারণ নেই, তোমাকে তো তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটতে বলছিনে, মজুরি না পোষায় তো চলে যেতে পার। বাজারের অবস্থা অনুসারে মজুরির বাড়তি ও কমতি, বাজার না থাকলে একেবারে মজুরি বন্ধ। তাতে তুমি না খেতে পেয়ে মরলে আমি কী করব? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী হতে পারত যদি আমার লাভ চিরস্থায়ী হত। কিন্তু আমি আমার লাভ লোকসানের উঠতি পড়তি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, আমি তোমার চিরদায়িত্ব নিই কী করে? কাজেই তুমি যদি বেকার হও সে আমার দোষ নয়, বাপু।

ক্যাপিটালিস্টদের দলে কালো ভেড়া আছে, তারা ভীষণ লাভখোর, তারা রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে বহু লোকের রক্ত চুষে নেয়। আইন করে এদের সায়েস্তা করা সহজ নয়, তা বলে একেবারে অসম্ভব নয়। যেসব দেশে শ্রমিক আন্দোলন বেশ শক্তিশালী, ট্রেড ইউনিয়নগুলো বাঘা তেঁতুল সে সব দেশে বুনো ওলদের ঝাঁঝ তত নেই। এসব খারাপ লোককে বাদ দিলে মোটের উপর ক্যাপিটালিস্টরা মানুষ হিসাবে মন্দ নয়। তা সত্বেও তাদের ব্যবস্থা মন্দ। কারণ তারা বেকারের দায়িত্ব নিতে নারাজ। তারা না নিলে কে নেবে বেকারের দায়িত্ব? বেকার তার নিজের দায়িত্ব নিজে নেয় না কেন? তার আত্মীয় স্বজন নেই কি?

বাদল এতকাল ভেবে এসেছে, যার দায়িত্ব সে নিজে নিলেই সমস্যা মেটে। কিন্তু তা আজকাল সম্ভব নয়। এখনকার দিনে যার মূলধন নেই সে পরের কাছে মজুরি করতে কিংবা রাষ্ট্রের অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হয়। তখনকার মতো বিড়াল বিক্রয়ে বড়-মানুষ হবার উপায় নেই। ব্যক্তির দায়িত্ব যদি ব্যক্তির হাতে থাকে তবে বেকারত্বের দায়িত্বও ব্যক্তির। তাতে সমস্যা মেটে না। পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম যুবক দিনের পর দিন কাজের খোঁজে এখানে ওখানে ঘুরছে, মাসের পর মাস নিষ্কর্মা ও বছরের পর বছর অসহায় হয়ে রয়েছে, মানুষের পক্ষে এর মতো অমর্যাদা আর নেই। এই গ্লানি মনুষ্যত্বনাশক। এরা কাজ চায়, ভিক্ষা চায় না। রাষ্ট্র থেকে এদের ডোল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তাতে জান বাঁচে, মান বাঁচে না। তা ছাড়া বছরের পর বছর অনিশ্চিত ভাবে থাকলে পরে কোনো কাজে মন বসে না। যারা দীর্ঘকাল বেকার হয় তাদের যদি বা কাজ জোটে তারা মন দিয়ে কাজ করে না, করতে পারে না, সুতরাং বিদায় হয়। এর চেয়ে ভালো ছিল সেকালের বেগার প্রথা, দাস প্রথা। তাতে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু স্থায়িত্ব ছিল। এবং পরের উপর দায়িত্ব ছিল। তাতে মনে শান্তি আসে। দশজনে খোঁটা দেয় না, বলে না যে অকর্মণ্য। এখন বিনা দোষে বেকার হলেও লোকে বলে অযোগ্য।

একথা সত্য যে কোনো ক্যাপিটালিস্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বেকার সৃষ্টি করে না। তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে রাষ্ট্র থাকার কোনো অর্থ হয় না, যদি না রাষ্ট্র বেকার

সৃষ্টিতে বাধা দেয় অথবা বেকারদের জন্তে জীবিকা সৃষ্টি করে। আগেকার দিনে রাষ্ট্রের ঘাড়ে এত বড় একটা বোঝা চাপত না, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র এ বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। রাষ্ট্রকেই করতে হবে সমস্যার সমাধান। নতুবা রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য। এই হল ইতিহাসের লজিক।

ব্রনস্কি বলছেন, ক্যাপিটালিজমের কাঠামো বজায় রেখেও এর সমাধান হয়। বাদল ভাবে। কিন্তু কূল পায় না। ব্রনস্কি যে শর্ত উল্লেখ করেছেন তা পূরণ করা অসাধ্য। সব কয়টা মিলে এক রাষ্ট্র হবে, তা হলে পরে ক্যাপিটালিজমের দ্বারা সমস্যার কিনারা হবে। এর মানে ন্যাশনালিজমের সীমার মধ্যে কোনো সমাধান সম্ভব নয়। ইংলণ্ডের তবু একটা সাম্রাজ্য আছে, যাদের তাও নেই তারা কী করে চালাবে। অগত্যা যেখানে যত নেশন আছে সব একত্র গেঁথে এক বিশ্বরাষ্ট্র বিন্যাস করতে হবে। সেই বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতি অংশের অবাধ বাণিজ্য, কোথাও কোনো নিষেধ নেই, পক্ষপাত নেই, মাশুল নেই, quota নেই। সমগ্র পৃথিবী একটি দেশ, যেখানে যত কিছু উৎপন্ন হয় সমস্ত স্বদেশী। যেমন ইংলণ্ড ওয়েলস্ স্কটলণ্ড একটি একান্নবর্তী রাষ্ট্র, তেমনি ইংলণ্ড জার্মানী জাপান চীন মেক্‌সিকো মিশর সব হবে একান্নবর্তী।

পৃথিবীর মতো ক্ষুদ্র একটা গ্রহ যে এক রাষ্ট্র হবে, বাদলের কাছে এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়। বরং হয়নি কেন, তাই আশ্চর্য। হবে, হতে সময় লাগবে। লীগ অফ নেশনসের মধ্যে বিশ্বরাষ্ট্রের বীজ রয়েছে, সে বীজ কালক্রমে বনস্পতি হবে। কিন্তু পৃথিবীময় এক রাষ্ট্র হলেই যে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের দুঃখ দূর হবে, বাদল তা বিশ্বাস করে না। বিশ্বরাষ্ট্র হোক, তার সঙ্গে আরও কিছু হোক। সেই আরো কিছুর নাম সোশিয়ালিজম না হলে ক্ষতি নেই, কমিউনিজম না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু বস্তুত সেটা হবে এমন এক ব্যবস্থা যার দ্বারা বেকার সমস্যার নিরসন হবে, অথচ বেগার খাটবে না কেউ। নিক্তির ওজনে সকলের আয় হয়তো সমান হবে না, কিন্তু প্রত্যেকের আয় তার জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। পৃথিবী এক রাষ্ট্র হলে যদি এরূপ ব্যবস্থা সুগম হয় তবে বাদল আনন্দিত হয়। কিন্তু তার সম্ভাবনা কোথায়? পৃথিবীর কয়েকটা বড় বড় খণ্ড ইংলণ্ড ফ্রান্স হলাণ্ড পর্টুগালের ভাগে পড়েছে। তারা তো তাদের সাম্রাজ্যে কোনো সুব্যবস্থাই করেনি। তাদের রাজধানীতেই চরম দুর্দশা। সাম্রাজ্যওয়ালারা একজোট হলে যা হয় তা বিশ্বরাষ্ট্রের কাছাকাছি। কিন্তু তাতে যে আফ্রিকার কাফ্রিদের বা দক্ষিণ সমুদ্রের আদিমদের অভাব ঘুচবে তা বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্বরাষ্ট্র যদি বিশ্বের পুঁজিপতিদের ঘরোয়া ব্যাপার হয় তবে তাতে তাদেরই লাভ, অন্যের ব্যবস্থা যথা পূর্বং।

বিশ্বরাষ্ট্র বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে কিংবা তার আগে বাঞ্ছনীয় সামাজিক ন্যায়, সামাজিক সুব্যবস্থা, যার ফলে প্রত্যেকে কাজ পাবে, কাজের বদলে পর্যাপ্ত মজুরি পাবে,

বেকার হবে না, বেগার দেবে না। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে যদি এর খাপ খায় তবে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু কী করে খাপ খাবে পুঁজিপতিরা যত দিন লাভের প্রশ্নটাকে অপর সব প্রশ্নের উপর স্থান দিতে থাকবে! লাভ, লাভ, লাভ—এই যদি তাদের মূলমন্ত্র হয় তবে চলতি ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তন যা হবে তা যন্ত্রপাতির, কর্মকৌশলের, সংগঠনের, রাজনীতির। ব্যক্তিগত অথবা যূথগত লাভ যতদিন রাষ্ট্রের সমর্থন পাবে ততদিন রাষ্ট্র প্রকারান্তরে ধনিক শ্রেণীর ট্রাস্টি হবে। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র হলে ধনিক শ্রেণীর ট্রাস্টি হত না।

শেষপর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে অধিকাংশ মানুষের দুর্গতি অল্পাংশ মানুষের লাভপরায়ণতার ফল। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে কী হবে, লাভপরায়ণতা যতদিন থাকবে দুর্গতি ততদিন থাকবে। যদি এমন দিন আসে যেদিন লাভ করা একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে, লাভ যারা করে তারা নাগরিক অধিকার হারাবে, তবে সেই দিন ক্যাপিটালিজমের পতন হবে, সেই দিন নূতন ব্যবস্থার উত্থান হবে।

তেমন দিন কি আসবে? কবে আসবে? ততদিন কি অপেক্ষা করতে হবে? কেন হবে? বিপ্লবের দ্বারা কি সংক্ষেপ করা যায় না অপেক্ষার কাল? কেন করা যায় না?

বাদল ভাবে। ভেবে কূল পায় না। লাভের মায়া মানুষের মজ্জাগত। দু পয়সা হাতে জমলে কে না তার থেকে আরো এক পয়সা লাভ করতে চায়। কে না ব্যাঙ্কে রাখে, শেয়ার কেনে, জুয়া খেলে। সকলের সেই একই আশা—লাভ হবে। যে লক্ষপতি তার যে স্বভাব, যে দশ টাকা পুঁজিদার তারও সেই স্বভাব। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে, শেয়ার কিনেছে। তাদের সেই টাকা দুনিয়ার চার দিকে ঘুরছে, ঘুরে ফিরে দ্বিগুণ আকারে তাদের পকেটে আসছে। তারাও প্রকারান্তরে ক্যাপিটালিস্ট। প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে তাদেরও স্বার্থ জড়িত। তারা যে এই ব্যবস্থার অবসান কামনা করে তা নয়। তারা এরই কাঠামোর ভিতর তাদের সমস্যার সমাধান চায়। ক্যাপি-টালিজম যেমন করে পারুক তাদের রুটি দিক, তাদের বেকার দশা থেকে উদ্ধার করুক, তাদের সুখসুবিধার দাবীদাওয়া মেটাক। এবং তারাও ক্রমে ক্যাপিটালিস্ট হোক। এই তাদের স্বপ্ন।

শ্রমিকদের মনের কথা বাদলের অজ্ঞাত ছিল না। অন্যান্য মানুষের মতো তাদেরও মনে লাভের আশা বাসা বেঁধেছে। ধনিকদের সঙ্গে তাদের কলহ বেশীকমের কলহ। সেদিক থেকে চিন্তা করলে বাদল শ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাতের কারণ খুঁজে পায় না। ধনিকরা যে লাভের জন্যে ঝুঁকি নিচ্ছে সে কি তুচ্ছ কথা!

কিন্তু অন্য দিক থেকে চিন্তা করা যায়। লাভের আশা যারই হোক রাষ্ট্র সে আশায়

ইন্ধন দেবে না। লাভ করলে রাষ্ট্র একা করবে, অন্য কেউ করবে না। তা যদি হয় তবে কলহের জড় মরবে, শোষণও থামবে।

১০

বাদলদের এখানে দিনে দুখানা করে ইস্তাহার জারি হয়। তাতে থাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণ, কমিউনিজমের অবশ্যম্ভাবিতা, লেবার পার্টির কুৎসা, টোরি পার্টির মুণ্ডপাত, লিবারল পার্টিকে উপহাস। সেসব ইস্তাহার ঘুরে ফিরে বাদলের হাতে আসে, তার স্বাক্ষর না হলে চলবে না। বাদল দ্বিধায় পড়ে। যদি বলে, "আমি কেন সই করব, আমি তো লিখিনি," তবে কমরেডরা উচ্চাঙ্গের উপদেশ দেন।

বলেন, "কমরেড, কালস্রোত জলস্রোত কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। এই তোমার শেষ সুযোগ। যদি অমর হতে চাও তবে এই বেলা হয়ে নাও। বুঝলে, ইতিহাস তোমার জন্যে পায়চারি করবে না, ইতিহাস এগিয়ে যাবে, তুমি পিছনে পড়ে থাকবে।"

"কিন্তু," বাদল অনুযোগ করে, "আমি যে এসব কথা লিখিনি, লিখতে পারিনে।"

"হুঁ"। এখনো তোমার ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। তুমি দেখছি বড় বেশী বুর্জোয়া। তোমার স্বাক্ষরের মূল্য কী, কমরেড? তুমি ইতিহাসের বাহন, ইতিহাসের আদেশ মানতেই তোমার জন্ম। যদি অস্বীকার কর, ইতিহাস তোমাকে ঝাঁট দিয়ে কোথায় ফেলে দেবে।"

বাদল ভয় পায়। ইতিহাস ঝাঁট দেবার আগে এই সব কমরেডরাই হয়তো গুলি করবে। চোখ বুজে সই করে দেয়, ভাবে এই শেষ। বৃথা আশা। দেখতে দেখতে আরেকখানা ইস্তাহার এসে হাজির। মজা মন্দ নয়। কফি কিংবা হুইস্কি খেতে খেতে চার ইয়ারের শখ হল একখানা ইস্তাহার ছাড়তে। কাগজ এল, কলম ছুটল, লেখা চলল টগবগিয়ে, যত রাজ্যের গরম গরম বুলি ভিড় করল, লেনিন স্টালিন কালিনিন ইত্যাদির নাম ইতস্তত: ছড়িয়ে রইল, তারপর হুঙ্কার দিয়ে ডাক দেওয়া গেল নির্যাতিত প্রোলিটারিয়ানকে। ওঠ, জাগ, কাজ কর, কাজের সময় সমাগত, দিন আগত ঐ। কালস্রোত ও জলস্রোত অপেক্ষা করে না।

চার ইয়ারের সেই ইয়ারকি টেবলে টেবলে ঘুরতে ঘুরতে নামাবলী অঙ্গে এঁটে বাদলের টেবলে উপস্থিত হয়। বাদল মুখ ভার করে। তা দেখে পার্শ্ববর্তীরা বলে, "অত গম্ভীর হবার কারণ কী আছে? ওরা লিখেছে, আমরা সই করব। আমরা লিখলে ওরাও সই করবে।"

বাদল লক্ষ করল যেই লিখুক না কেন, সব ইস্তাহারের একই ধুয়া, একই ভাষা। কাজেই চোখ বুজে সই করলে জানা জিনিসেরই সমর্থন করা হয়। বরং সই না করলেই

কথা ওঠে, নতুন কী বলবার আছে। নতুন যা কিছু তা রাশিয়ার লোকই বলবে, কেননা কমিউনিজমের পরীক্ষা একমাত্র রাশিয়াতেই হচ্ছে। অন্যেরা যতদিন না বিপ্লব ঘটিয়েছে ততদিন বিপ্লবীদের নকল করবে, নকল ইস্তাহার রচবে।

দেখাদেখি বাদলও ইস্তাহার বের করে। কেউ পড়ে না। না পড়েই সই করে। পড়ে কী হবে, ইস্তাহার কি স্বাক্ষরকারীদের পড়ার জন্যে? ইস্তাহার হচ্ছে বাইরের লোকের পড়ার জন্যে। তা হোক, কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, "কমরেড সেন যে আমাদের দিয়ে কী কবুল করিয়ে নিচ্ছেন কে জানে! হয়তো ভারতের স্বরাজ কি তেমনি কোনো বুর্জোয়া ব্যাপার।"

ভারতের স্বরাজকেও এরা লাঘব করে। গান্ধী এদের কাছে তামাসার পাত্র। এদের মতে স্বরাজ হচ্ছে দেশী ক্যাপিটালিস্টদের মোটা মুনাফার ফন্দী। যারা স্বরাজের নামে ক্ষেপে তারা দেশী বণিকের হাতের পুতুল। শ্রমিকরা অমন স্বরাজ চায় না, তারা চায় তাদের নিজেদের স্বরাজ। তেমন স্বরাজ সেই দিন আসবে যেদিন দেশে দেশে বিপ্লবের অনল জ্বলবে। সেদিনকার সে অনলে বুর্জোয়াদের স্বরাজকেও আহুতি দেওয়া হবে, সুতরাং তেমন স্বরাজ অর্জন করে লাভ কী?

"কমরেড সেন লেখেন বেশ।" মন্তব্য করেন একজন স্বাক্ষরকারী। "কিন্তু এমন ঠাণ্ডা ইস্তাহার পড়ে কেউ কি একবার লাফ দিয়ে উঠবে, কেউ কি একদম ঝাঁপ দিয়ে মরবে? না, কমরেড সেন, তোমার ইস্তাহার অচল। আমরা সই করেছি বটে, কিন্তু এতে যথেষ্ট গরম মশলা নেই। দাঁড়াও, দু লাইন যোগ করে দিই।" এই বলে একটি "পুনশ্চ" জুড়ে দেন।

সেই লেজুড়টি দেখে আরেকজনেরও সেই খেয়াল হয়। ক্রমে আরো অনেকের। পুনশ্চ, পুনঃপুনশ্চ, পুনঃপুনঃপুনশ্চ—এই হারে বাড়তে বাড়তে ইস্তাহারটির চেহারা যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। যেটুকু বাদলের সেটুকু কেউ পড়ে না, পড়ে সবশেষের পুনশ্চ। তা পড়ে লাফ দেয় না অবশ্য।

"য়্যাকশন! য়্যাকশন! য়্যাকশন চাই। চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। পৃথিবী চলেছে, তোমরাও চল। চল, মাড়িয়ে যাও, গুঁড়িয়ে দাও। আসুক নতুন যুগ, নয়া ব্যবস্থা, সকলের নব অভাব মিটুক। বরবাদ হোক পুঁজিপতিদের চোরাই মাল, ফাঁকি দিয়ে পাওয়া চোরাই মাল।"

এই ধরনের যত পুনশ্চ তাদের দায়িত্ব বাদলের ইস্তাহারকে বইতে হয়। তবে ইস্তাহারের অন্তিম রূপ বাদলের নজরে পড়ে না, পড়লে বোধ হয় সে শিউরে উঠত। "লুটের মাল লুট কর। রক্ত দিয়ে ইতিহাস লেখ। বাহুবলে বেদখল কর। যারা বুভুক্ষু তারা আইন মানবে না, তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। যারা নিরাশ্রয় তারা শীতে মরবে না, তারা প্রাসাদ অধিকার করবে।"

বেশীর ভাগ ইস্তাহার নির্বাচন সম্বন্ধে। কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দেবেন কেন? এগারোটি কারণ আছে। কমিউনিস্ট পার্টি কী চায়? সতেরোটি দাবী। কমিউনিস্ট পার্টির নায়ক কারা? তেইশটি ফোটো। কিংবা কার্টুন। কার্টুন যদিও হাস্যকর তবু এদেশে তার দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধা। লোক একটু মন দিয়ে দেখে ও মনে রাখে।

নির্বাচনের ব্যস্ততায় তারাপদকে আজকাল বাসায় পাওয়া দুষ্কর। কখন এক সময় এসে কখন এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়, হঠাৎ দেখা হলে ইঙ্গিতে অভিবাদন জানায়। তারাপদ যে একজন মস্ত লোক তা বাদল যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল। প্রায়ই তার সঙ্গে তিন চারজন নানাদেশের মানুষ থাকে, দেহরক্ষীর মতো তারা তাকে চোখে চোখে রাখে। তাদের এক আধজন যে গুপ্তচর নয়, তা কে জোর করে বলবে।

বাওয়ার্সকেও বক্তৃতার জন্যে বেরোতে হয়। তাঁরও সময় কম। বাসায় আর যারা আসে ও যায় তাদের সঙ্গে বাদলের মৌখিক আলাপ, অন্তরঙ্গতা নেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচয় দেয় তারা বাদলকে ক্রমাগত ব্যঙ্গ করে। বাদল তাদের থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসে। কেবল চূড়কার মাঝে মাঝে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন ও নিজের স্বাস্থ্যের বিশদ বিবরণ দিয়ে আপ্যায়িত করেন। "মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, সেদিন মুখার্জি নামে একটি ছেলে যক্ষ্মায় ভুগে মারা গেল। সেইজন্যে বলি, সাবধান! তুমি যখন খাবে তখন আমাকে ডাকবে, আমি দেখব তুমি কী পরিমাণ খাচ্ছ, তোমার খাদ্যে ভিটামিন থাকছে কি না আমাকেই সেটা খেয়ে দেখতে হবে, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড।"

বাদলের মাথাব্যথা সারল না। একদিন তার এত খারাপ লাগল যে তার মনে হল তার দ্বারা কাজকর্ম হবে না। সে বিছানায় শুয়ে শুয়েই নিচে টেলিফোন করল তার খাবার তার ঘরে দিয়ে যেতে। তারপর ঘুমের চেষ্টায় ছটফট করল। তার চিরশত্রু ইন্‌সম্‌নিয়া তাকে রাত্রে জাগিয়ে রাখে, দিনে তন্দ্রা লাগায়। ঘুম যদি আসত বাদল লাখ টাকা দিত, কিন্তু ঘুম ঐ প্রলোভনে ভোলে না।

নিদ্রাদেবীর পরিবর্তে যে দেবী তার শয্যাপার্শ্বে আবির্ভূতা হন তিনি তার পূর্ব-পরিচিতা ষোড়শী "পীচ"। তার নাম অবশ্য পীচ নয়, সেও একজন কমরেড, সকলে ডাকে, কমরেড জেসি। আমরা কিন্তু তাকে পীচ বলব।

পীচ মেয়েটির দয়ামায়া আছে। সে বাদলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেয়, তাকে শাসন করে বলে, "আজ উঠতে হবে না। উঠলে ডাক্তার ডাকব।" বাদল যে ডাক্তারকে ডরায় তা সে কী করে জানল সেই জানে। হতেও পারে সেটা তার আন্দাজ। কিন্তু তাতে ফল হয়। বাদল চুপ করে শুয়ে থাকে, শুয়ে

শুয়ে বই পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। পীচ যতক্ষণ থাকে খোশগল্প করে, বাদলের ভালো লাগে।

এখন হয়েছে কী, সেইদিন কে একজন ভদ্রলোক এসে বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। পোর্টার ভেবেছে বাদলের স্বদেশবাসীর মতো দেখতে, সুতরাং বাদলের ঘরে যেতে দিলে দোষ কী। বলেছে, "আপনি সোজা তেতলায় গিয়ে পাঁচ নম্বর ঘরে খোঁজ নিন। তিনি আজ ভিতরেই আছেন। বাইরে যাননি।"

ভদ্রলোক বাদলের ঘরে টোকা মারলেন। দেখলেন দরজা বন্ধ নয়, ভেজানো। একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঠিক সেই সময় পীচ যেন বলছিল, "ওয়েট এ মিনিট।"

বাদল লাফ দিয়ে উঠে বসল। "আরে, এ যে আপনি। আসুন, কমরেড—না, না মিস্টার দে সরকার।"

দে সরকার পীচের কাছে গিয়ে একটি পরিপাটি বাউ করল। ক্ষমাকাতর ভাবে বলল, "অধীনের অপরাধ হয়েছে। তা বলে পলায়ন করবেন না, অবস্থান করুন।"

১১

পীচ থাকল না। পালিয়ে গেল।

দে সরকার জমিয়ে বসল। বলল, "তারপর সেন্ট বাদল! তোমার সন্ধান পেতে আমি কোথায় না ঘুরেছি? এতকাল পরে আমার ঘোরাঘুরি সার্থক। আহা, আমিই ধন্য। তোমাকে দর্শন করে তো বটেই, তোমার আধ্যাত্মিক শয্যাভাগিনীকে—"

"কার কথা বলছ! চুপ, চুপ!" বাদল লজ্জায় লাল হয়ে বাধা দিল। "ও যে কমরেড জেসি। ও যে আমাদের কর্মসহচরী।"

"কর্মসহচরী কি নর্মসহচরী তা কী করে জানব, বল। যেই হোক, ও যে দর্শনযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। সেইজন্যে বলছিলুম, আমি ধন্য।"

"আমার মাথা ধরেছে, তাই এসেছিল বেচারি একটু সেবা করতে।" বাদল সসঙ্কোচে ব্যাখ্যা করল।

"আহা, মরে যাই। মাথা ধরেছে তোমার! তোমার মাথাধরা আমাকে দিতে পার তো আমিও একটু সেবা পাই। কী বল, বাদল?"

বাদল বিরক্ত হয়েছিল, উত্তর দিল না। দে সরকার বলে চলল, "তুমি অনেক মাথা খরচ করে মাথা ধরিয়েছ তা আমি বুঝতেই পারছি। আমার মাথায় অত বুদ্ধি থাকলে আমিও কি তোমার পথের পথিক না হতুম?"

বাদল রেগে বলল, "মাথাধরা কাকে বলে তা যদি জানতে তবে তুমি ওসব ইতর

পরিহাস বাদ দিতে। উঃ আমার মাথা যে জ্বালা করছে।"

দে সরকার বাদলের মাথায় হাত দিয়ে দেখল সত্যিই দপ দপ করছে। তখন বাদলকে শুইয়ে নিজে তার কাছে বসল ও তার সেবার ভার নিল। অনেকক্ষণ টিপে বলল, "কেমন! একটু কম বোধ হচ্ছে?"

"হাঁ! ধন্যবাদ!"

"বাদল", দে সরকার গম্ভীর স্বরে বলল, "কাজটা কি ভাল হচ্ছে?"

"কোন কাজটা?"

"ভয় নেই, নর্মসহচরীর কথা বলছিনে।" রঙ্গ করল সরকার। "বলছিলুম, এই যে তুমি কমিউনিস্ট মহলে মিশছ এটা কি তোমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো? নাম নিশ্চয় পুলিশের খাতায় উঠেছে।"

বাদল কম্পিত স্বরে বলল, "তা-তাই নাকি? পু-পুলিশের খাতায়?"

"স-সম্ভব। তো-তোমার আই সি এস হওয়া শক্ত হবে।"

বাদলের অবশ্য আই সি এস হবার সাধ ছিল না। তবু পুলিশের লিস্টভুক্ত হতে আপত্তি ছিল। কে জানে কোন দিন কী বিপত্তি হয়। সে বার বার বলতে থাকল, "তাই তো! তাই তো!"

"তারপর তোমার বাবার দশা কী হবে, ভাবতে পার? যাঁর ছেলে লেনিন কি স্টালিন তিনি কি সাহেব সুবোর নেকনজরে পড়বেন? তাঁকেও সকলে কমিউনিজমের উৎপত্তিস্থল ঠাওরাবে। চাকরি রাখতে পারলে হয়।"

বাবার উপর বাদলের শ্রদ্ধাভক্তি থাক বা না থাক তাঁর টাকার উপর নির্ভরতা ছিল। তাঁর টাকাতেই কমিউনিজমের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। সুতরাং বাবার চাকরি রাখা দায় হবে শুনে বাদল মুষড়ে পড়ল। তার দশা দেখে দুঃখিত হল দে সরকার।

"যাক, তোমার বাবার কথা বাবা ভাববেন। নিজের কথাই তুমি ভাব। তুমি যদি সত্যি কমিউনিস্ট হতে আমি চিন্তা করতুম না, কেননা তোমার যেমন মস্তিষ্ক তুমি নেতা হতেও পারতে। কিন্তু তুমি সত্যি কমিউনিস্ট নও। তবে কেন এখানে রয়েছ?"

বাদল বলতে পারত, দুঃখমোচনের উপায় অন্বেষণে এখানে এসেছি। কিন্তু তখনো ভাবছিল তার বাবার কথা। বেচারা বাবা! চাকরিটা যদি যায় এই বুড়ো বয়সে খাবেন কী! পরের বেকার সমস্যার চেয়ে ঘরের বেকার সমস্যা কম ধারালো নয়।

দে সরকার কী জন্যে বাদলের সন্ধান করছিল বাদলকে বলল না। বাদলও জিজ্ঞাসা করল না।

"কী করে তোমাকে খুঁজে বের করলুম, জান?" দে সরকার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

"জানিনে।" বাদল অন্যমনস্কভাবে বলল।

"তোমার ওই তারাপদকে আমি যেমন চিনি তুমি তেমন চেন না। ওটি একটি ডক্টর জীকল ও মিস্টার হাইড।"

তা শুনে বাদল চাঙ্গা হয়ে উঠল। এ যে রীতিমত নভেল!

"ডক্টর জীকল ও মিস্টার হাইড! কে! তারাপদ!"

"না, ওর নাম ঠিক আছে। উভয়ত্র ওর নাম ডক্টর কুণ্ডু। তবে এখানে যেমন ও একজন কমিউনিস্ট অন্যত্র তেমনি এ একজন ফিল্ম ডিরেক্টর।"

তারাপদ যে ফিল্মের ব্যবসা করে তা বাদল কোনো দিন সন্দেহ করেনি। লোকটা কেউকেটা নয়, ফিল্ম ডিরেক্টর।

"ফিল্ম ডিরেক্টর!" বাদলের স্বরে প্রশংসা।

"অন্তত সেই তার পরিচয়। ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম এক্স্‌চেঞ্জ নাম দিয়ে একটা কোম্পানী খুলেছে, তার জন্যে যাদের মাথায় হাত বুলিয়েছে তোমার শাশুড়ী মিসেস গুপ্ত তাদের একজন।"

"মাথায় হাত বুলিয়েছে কী রকম!" বাদল বিস্মিত হয়।

"এই যে রকম আমি তোমার মাথায় হাত বুলচ্ছি।" দে সরকার ইয়ারকি করল।

"না, বল, আমি শুনতে চাই।"

"শুনবে কয়েক দিন বাদে। এত সকালে নয়। কোম্পানী যে কোথায় কাজ করছে তা কেউ দেখতে যায়নি, সবাই দেখছে রিজেণ্ট স্ট্রিটে কোম্পানীর ডিরেক্টর কাজ করছেন। লোক লস্কর অনেক, যত রাজ্যের রিজেক্‌টেড অভিনেতা ও অভিনেত্রী আবেদন-পত্র হাতে করে বাইরে অপেক্ষা করছে। কখন ডাক আসে, নিয়োগপত্র জুটে যায়।"

বাদলের মনে পড়ল তাকে দিয়ে তারাপদ যা করিয়ে নিচ্ছে তাও তো ফিল্ম সংক্রান্ত। এটার সঙ্গে ওটার যোগাযোগ থাকতে পারে।

"যা বলছিলুম। তোমার শাশুড়ীর কিছু টাকা আছে, কী করে সে খবর তারাপদ পেয়েছে। তোমার নাম করে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। তোমার লেখা ইস্তাহার দেখিয়ে তাঁর বিশ্বাসভাজন হয়েছে। তাঁকে বুঝিয়েছে তুমিও এই কোম্পানির একজন অংশীদার ও তোমার ইস্তাহারখানা নাকি ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন।"

"হাঁ! বল কী! বল কী!" বাদল উঠে বসতে চায়। দে সরকার বাধা দেয়।

"তোমার ইস্তাহার পড়ে বোঝবার বিদ্যা তোমার শাশুড়ীর নেই, তা হয়তো তুমি জান, হয়তো জান না। কিন্তু এটা ঠিক যে কমিউনিস্টদের ইস্তাহার দেখে তিনি সাব্যস্ত করেছেন ওটা ফিল্মওয়ালাদের বিজ্ঞাপন কৌশল।"

বাদল চমৎকৃত হল। তার শাশুড়ী সম্বন্ধে তার ধারণা কোনো দিন সমুচ্চ ছিল না। তিনি যে এমন বিদুষী তা কিন্তু অনুমান করেনি।

"তারপর তাঁর কাছে কয়েকবার আসাযাওয়া করে তাঁকে তার আপিসে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছে যে তিনিও ইচ্ছা করলে ফিল্মস্টার হতে পারেন। তাঁর এমন কী বয়স! তাঁর চেহারা দেখে যদি বা মনে হয় ত্রিশ তাঁর মেকআপ দেখে মনে হয় বাইশ। আপাতত টাকার দরকার, কোম্পানীর ক্যাপিটাল যথেষ্ট নয় বলে ছবি তুলতে পারছে না।"

"তারপর?"

"তারপর তিনি সরল বিশ্বাসে তারাপদর হাতে বিস্তর টাকা সঁপে দিয়েছেন। আমি যখন টের পেলুম তখন too late. আমি আর কী করতে পারি, বল? আমি যদি বলি তারাপদ চোর তিনি কেন তা মেনে নেবেন? ভাববেন তারাপদর সঙ্গে শত্রুতা আছে। কথাবার্তায় এটুকু জানলুম যে তারাপদর কাছে তিনি তোমার ইস্তাহার পেয়েছেন। তখন আমার চেষ্টা হল তারাপদর ঠিকানায় তোমার তল্লাস করা। তার বাসার ঠিকানা তোমার শাশুড়ী কিংবা কেউ জানেন না, তার আপিসের লোক পর্যন্ত অজ্ঞ। কাজেই আমাকে বহুৎ মেহনৎ করতে হয়েছে। সে সব প্রকাশ করব না কিন্তু।"

বাদল স্তম্ভিত হয়েছিল। কাকে বিশ্বাস করবে স্থির করতে পারছিল না—তারাপদকে না দে সরকারকে। যদি দে সরকারকে বিশ্বাস করে তবে তারাপদর সংশ্রব ত্যাগ করতে হয়, সেই সঙ্গে নানা মনীষীর, বাওয়ার্সের, ব্রনস্কির। আর যদি তারাপদকে বিশ্বাস করে তবে দে সরকারের এই অভিযানের অর্থ কী?

১২

দে সরকার আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বিদায় নিল, বিদায়ের সময় বলল, "তুমি যে এখানে আছ সে সংবাদ উজ্জয়িনী জানেন না। যখন জানবেন তখন হয়তো এখানে এসে খোঁজ নেবেন। তখন কিন্তু সাবধান।"

বাদল নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কেন? সাবধান কেন?"

"সাবধান কেন? ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ!" দে সরকার করুণভাবে বলল, "তোমার মাথা ধরার সাফাই তিনি কানে তুলবেন না, বাদল। সন্দেহ করবেন।"

বাদল ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করব না যে তাঁর এত ছোট মন। আর যদি সন্দেহ করেনই তবে কী হয়েছে? আমি স্বাধীন মানব, আমার কি এটুকু স্বাধীনতা নেই যে আমি একজন স্বাধীন মানবীর সেবা গ্রহণ করব?"

"কী করে তিনি বুঝবেন তুমি কতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োগ করছ?"

"বেশ, না বোঝেন তো ফুরিয়ে গেল। কে কী বুঝবে না বুঝবে তাই ভেবে আমি আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করব, একে আমি স্বাধীনতা বলিনে। আমি তো তাঁকে ভুল বুঝতে যাচ্ছিনে, তাঁর যদি আমাকে ভুল বুঝতে মর্জি হয় তবে আমি নিরুপায়।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব যে কমরেড জেসি তোমার নর্মসহচরী নয়।" দে সরকার আশ্বাসনা দিল। "আমি আজকেই তাঁকে বুঝিয়ে বলব যে তুমি অমন লোক নও, তুমি সেণ্ট বাদল।"

বাদল লক্ষ করল না যে দে সরকার গায়ে পড়ে উজ্জয়িনীকে জানাবার ভার নিল। বাদল তখনো তার স্বাধীনতার হিসাবনিকাশ করছিল, তর্কের খাতিরে বলল, "নর্মসহচরী বলতে তোমার কী ধারণা তাও জানিনে, কিন্তু সে ধারণা যদি সত্য হয় ততঃ কিম্? আমি স্বাধীন, আমাকে ভুল বুঝলেও আমি যা আমাকে ঠিক বুঝলেও আমি তাই। আমাদের এ বাসায় তোমাদের ওসব চারিত্রিক সংস্কার অচল। এখানে কে কার সঙ্গে শোয় তা জানতে চাওয়া বেআদবি। আমি তো ইচ্ছা করেই অজ্ঞ।"

দে সরকার রসিকতা করল, "তুমি কোনদিন প্রাজ্ঞ ছিলে?"

দে সরকার উজ্জয়িনীকে কী সংবাদ দিল কে জানে। যে এল সে উজ্জয়িনী নয়, সে সুধী।

বাদল সেদিন একখানা ইস্তাহারের খসড়া লিখছিল। তার মাথাব্যথা না সারলেও কাজের প্রতিকূল নয়। সামনে খানকয়েক সোশিয়ালিস্ট কমিউনিস্ট পুঁথিপত্র। পাতা উল্‌টিয়ে পড়ছিল আর চোখ বুজে ভেবে লিখছিল।

দরজায় মৃদু আঘাত তার কানে যেত না, যদি না বাংলা ভাষায় শুনত, "বাদল আছিস?"

সুধীদার গলা। ভুল হতে পারে না। বাদল আহ্লাদে অধীর হয়ে স্বয়ং দরজা খুলতে গেল, হাত বাড়িয়ে দিল হাতে হাত মিলাতে। সুধী তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে বন্দী করল। দুজনেই নির্বাক। দুজনেই অবিচল। কতকাল পরে দুই বন্ধুর দেখা। ভালো মনে পড়ে না কবে শেষ দেখা হয়েছিল। গোয়েনডোলেন স্টানহোপের আশ্রয়ে নিশ্চয়।

বাদল নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে বলল, "তোমাকে আমার দরকার ছিল। আমি একটা ইস্তাহার লিখছি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

"আমার সঙ্গে? আমি যে নেহাৎ সেকেলে।" সুধী বাদলের ঘরে গিয়ে বসল।

"দুনিয়া যেমন দ্রুতবেগে বদলাচ্ছে আমি সেদিক থেকে সেকেলে।" বাদল সবিনয়ে বলল। সেটা কিন্তু তার মনের কথা নয়। বাদল কখনো সেকেলে হতে পারে! দুনিয়া কে? সে বাদল।

বাদল তার ইস্তাহারের খসড়া সুধীকে পড়তে দিল। সুধী ঈষৎ হেসে সেখানা পড়ল। তারপর তেমনি ঈষৎ হেসে ফেরৎ দিল।

"কিছু বললে না যে?"

"কী আশা করিস? সমর্থন, না সমালোচনা?"

"যা তোমার রুচি।"

"এই যে বলছিলি পরামর্শ করবি!"

"হাঁ। তাও করব। কিন্তু তার আগে তুমি বল কেমন হয়েছে। ইতিহাসে স্থান পাবে?"

"কী জানি, বাপু। ইতিহাসের ছাত্র আমি নই। ইতিহাসের উপর আস্থাও আমার অল্প। ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে বলতে পারি, শুনবি?"

"শুনব না? তুমি যে সুধীদা।"

"তুই যে লিখেছিস," ইস্তাহার সম্পর্কে সুধী বলল, "যাবতীয় কারবারের পরিচালন-ভার রাষ্ট্রের হাতে গেলে বেকার সমস্যা থাকবে না, এর মানে কী?"

"মানে, রাষ্ট্রই হবে প্রত্যেক কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট। তা যদি হয় তবে এক জায়গার বেকারকে অন্য জায়গায় বাহাল করতে পারবে, যেখানে যেমন দরকার।"

"কোথাও যদি দরকার না থাকে? সর্বত্র যদি স্থানাভাব হয়?"

"তা কখনো হতে পারে!" বাদল হাসল। "স্থানাভাব হলে স্থান সৃষ্টি করতে পারা যায়।"

"না, বাদল। সমস্যা অত সরল নয়। যার উপর পরিচালনভার সে যাই হোক না কেন সে প্রয়োজন অনুসারে আয়োজন করবে, সে বাহুল্যের প্রশ্রয় দেবে না। সে যদি আশ্রিতপোষণ নীতি অবলম্বন করে, পরিচালনভার তার হাত থেকে খসে পড়বে, অন্য কারো হাতে যাবে।"

বাদল বহুক্ষণ চিন্তা করল। "এই সরল সত্যটা তুমি যে কেন অস্বীকার করছ আমি বুঝতে পারছিনে, সুধীদা। আমি যদি পরিচালক হতুম তবে এমন উপায় করতুম যাতে সকলের জীবিকা থাকে, অথচ কোথাও কোনো অপচয় না হয়।"

"আমিও তাই করতুম, বাদল। কিন্তু দেশশুদ্ধ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে নয়। আমি বলতুম প্রত্যেক মানুষকে একটি নিজস্ব কারবারের মালিক করে দাও, সে অন্যান্য কারবারীর সঙ্গে সহযোগিতাও করুক, প্রতিযোগিতাও করুক, তার যাতে খুব লোকসান না হয় তাও দেখতে হবে, যাতে খুব লাভ না হয় তাও দেখতে হবে। এমন ব্যবস্থা সম্ভব কি না, জানিনে। আমি অর্থনীতির ছাত্র নই। কিন্তু নীতির দিক থেকে এই সব চেয়ে ভালো, সুতরাং এই শেষপর্যন্ত টিকবে। যা নৈতিক তাই অর্থনৈতিক।"

বাদল তর্ক করতে যাচ্ছিল, সুধী হেসে বলল, "দেখা হতে না হতেই তর্ক। আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

বাদল ও সুধী দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। আসন্ন নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। বাদল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন পক্ষে ভোট দিচ্ছ?"

"আমি ? কই, আমাকে তো ভোটের কাগজ পাঠায়নি ?"

"আমাকেও পাঠায়নি। ছয় মাস এক বাসায় না থাকলে পাঠায় না। কিন্তু তুমি তো একই বাসায় আরো বেশী দিন আছ।"

"আমি বাসা বদলেছি।"

"ওঃ। তাই নাকি। কোন পাড়ায় বাসা করলে ?"

"আর্ল্‌স কোর্ট।"

"ইস। অনেক দূর যে।"

"সেই কারণে তোর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সচরাচর ঘটবে না। এক উপায় তুই যদি বাসা বদলাস।"

বাদল ভেবে বলল, "একটা দলের মধ্যে দলচর জীব হয়ে আছি। দলের বাইরে গেলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হবে। সুধীদা, আমার যে কত পরিবর্তন হয়েছে তোমাকে দু' কথায় বোঝানো শক্ত।"

সুধী পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বলল, "মাঝে মাঝে আসিস আমাদের কাছে। একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তো তোর দলের রীতি নয়।"

"না। তা নয়। আমি আসব একদিন।"

"আসিস। কথা আছে।"

বাদল ভাবছিল হয়তো তারাপদ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার। কিংবা সে যে কমিউনিস্টদের দলে মিশছে তা নিয়ে কোনো বিপদের সম্ভাবনা।

সুধী নিজেই পরিস্ফুট করে বলল, "উজ্জয়িনীর সঙ্গে তোর একবার দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর দেরি করা চলে না। সে একজনের সঙ্গে আমেরিকা যেতে প্রস্তুত আছে।"

"আমেরিকা।" বাদল উৎসুক হয়ে বলল, "অতি চিত্তাকর্ষক ! আচ্ছা, তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। আমি দেখা করতে চেষ্টা করব, কিন্তু যদি দৈবাৎ না পারি তবে আমার হয়ে তাঁকে বোলো, Bon Voyage." দিন ফেলল আগামী বৃহস্পতিবার।

বোঝাপড়া

১

আর কয়েক মাস পরে সুধীর সংসারপ্রবেশ। কোথায় কী ভাবে আরম্ভ করবে সেই জল্পনার সঙ্গে অফুরন্ত অধ্যয়ন যোগ দিয়ে তাকে দিবারাত্র ব্যাপৃত রেখেছিল। তা সত্ত্বেও সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশার অবসর পাচ্ছিল। বিশেষ করে ইংলণ্ডের শান্তিবাদী

মহলে তার অবারিত গতি। ব্লিজার্ড তাকে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় প্রায়ই তাকে ঘরোয়া বৈঠকে ডাক পড়ে। জিজ্ঞাসা করা হয়, "নিরস্ত্র প্রতিরোধ কি যুদ্ধকালে কার্যকর হতে পারে? গান্ধী কি আক্রমণকারীকে দেশ ছেড়ে দিতে বলেন?"

সুধী এ সম্বন্ধে এক সময় তুমুল চিন্তা করেছিল, অসহযোগ আন্দোলনের সময়। তখনকার দিনে তার স্থির বিশ্বাস ছিল শত্রু যেই হোক, যেখান থেকেই আসুক, সে মানুষ, সে মিত্র। তাকে অক্রোধে জয় করতে হবে, অহিংসার বশ করতে হবে। একই আত্মা তার মধ্যে রয়েছেন। আত্মার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আত্মদ্রোহের সমান। শত্রুহত্যাও আত্মহত্যা। আর অস্ত্র ধরলেও হিংস্র পশুর মতো ব্যবহার করতে হয়, তাতে মনুষ্যত্বের অধঃপাত।

তারপর কত কাল কেটেছে। সুধী এ নিয়ে ভাবেনি। ইংলণ্ডে এসে লক্ষ করেছে ইংরাজমাত্রেরই প্রধান ভাবনা কী করে দেশরক্ষা সাম্রাজ্যরক্ষা বাণিজ্যরক্ষা হয়। তারা এতদিন পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ত্র নির্মাণ করেছে, দেশের চার দিকে জাহাজের প্রাচীর গড়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে মহাযুদ্ধ ঘটে গেল তার শিক্ষা ভুলতে পারছে না, অপরিসীম দুঃখক্লেশের বিনিময়ে এমন কিছু পায়নি যাতে তাদের সান্ত্বনা হতে পারে, বরং আরো একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় এখন থেকে উপায় চিন্তা করছে। যুদ্ধ যাতে না বাধে সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, তথাপি যদি যুদ্ধ বাধে তবে সশস্ত্র প্রতিরোধ না করে নিরস্ত্র প্রতিরোধ করলে কেমন হয়?

গত যুদ্ধে ব্লিজার্ড ছিলেন বিবেকচালিত আপত্তিকারী। তাঁর জেল হয়েছিল। আরো অনেকের। দেশের লোক তাদের দুচক্ষে দেখতে পারত না, টিটকারি দিত, কাপুরুষ বলে গালাগালি দিত, বয়কট করত। কিন্তু ক্রমে তাঁদের মর্যাদা বেড়েছে। এখন তাঁদের বহু সমর্থক। তাঁদের মতবাদ এখন আর অপরিচিত নয়। গত মহাযুদ্ধের বীর সেনা-পতিদের মধ্যেও তাঁদের পক্ষপাতী আছেন। মোটের উপর বলা যেতে পারে ইংলণ্ডের জনমত তাঁদের প্রচেষ্টার জয় কামনা করে।

"একদা আমরা মুষ্টিমেয় ছিলুম," ব্লিজার্ড বললেন সুধীকে, "আজ আমাদের সভ্য-সংখ্যা লক্ষাধিক, সমর্থকসংখ্যা ততোধিক। সংখ্যা যদি সব কথা হয় তবে হয়তো আমরা এক দিন পার্লামেন্টের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জনমত আমাদের পশ্চাতে। কিন্তু মনের সন্দেহ একটুও মিটছে না, চক্রবর্তী। এক মিনিটও শান্তি দিচ্ছে না শান্তিবাদীকে।"

"কিসের সন্দেহ?"

"ওই যে বলছিলুম। নিরস্ত্র প্রতিরোধ কি যুদ্ধকালে কার্যকর হতে পারে? যুদ্ধ বাধবে না, আশা করি। কিন্তু যদি বাধে? কে জানে মুসোলিনীর কী মতলব? যদি

বাধে আর লীগের মেম্বর হিসাবে ইংলণ্ড যদি জড়িয়ে পড়ে তবে মুসোলিনীর মারণাস্ত্রের সামনে আমরা কী নিয়ে দাঁড়াব ? বিনা যুদ্ধে দেশ ছেড়ে দেব কি ?"

সুধী সহসা উত্তর দেয় না। বাস্তবিক এর কোনো বাঁধা উত্তর নেই। ভারতবর্ষ হলে সে বলত, আমরা তো নিরস্ত্র হয়েই রয়েছি, আমাদের যা কিছু প্রতিরোধ তা নিরস্ত্র হতে বাধ্য। কিন্তু ইংরেজকে স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র হতে পরামর্শ দেওয়া বিদেশীর পক্ষে সুষ্ঠু নয়, সঙ্গত নয়। ইংরেজেরা নিজেরাই বিবেচনা করুক কোনটা তাঁদের দিক থেকে কার্যকর—সশস্ত্র না নিরস্ত্র প্রতিরোধ।

"দেশ যদি ছেড়ে না দিই," ব্রিজার্ড বললেন, "তবে ওরা কি ওদের আক্রমণ ছেড়ে দেবে ? আর দেশ যদি ছেড়েই দিই তবে ওরা কি লুটপাটের কিছু বাকী রাখবে ? দুদিনেই আমাদের লক্ষ কোটি মুদ্রার ধনসম্পত্তি যাবে, আমাদের উপনিবেশ তো যাবেই, স্বাধীনতায় টান পড়বে। তাই যদি হয় তবে আমরা বিবেকচালিত আপত্তিকারীরা জেলখানায় বসে কার কল্যাণ করব ? দেশটাই একটা জেল হয়ে উঠবে।"

সুধী মনে মনে বলল, "ঠিক ওই কথা আমরাও বলে থাকি।" মুখ ফুটে বলতে সঙ্কোচ বোধ করল। নিজেদের পরাধীনতা জাহির করে কী গৌরব! সে যে পরাধীন দেশের সন্তান এ তার গোপন দুঃখ, এ দুঃখ কাউকে জানাবার নয়। জানালে তো প্রতিকার হবে না, শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশা অপ্রীতিকর হবে। ভারতের আত্মা অপরাজেয় সেই প্রত্যয় সুধীকে তার ইংরেজ বন্ধুদের পূর্ণ সমকক্ষ করেছিল, তাঁরাও তাকে সমীহ করে চলতেন। ভারতের প্রসঙ্গ উঠলে আফশোষ জানাতেন ও আশা করতেন ভারত অবিলম্বে স্বাধীন হবে।

"গান্ধী ইংরেজ হলে কী করতেন ? তিনি কি শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করে বিশেষ ফল পেতেন ?" জিজ্ঞাসা করেন মিস মড মার্শল, স্বনামধন্য শান্তিবাদী।

"ইংরেজ হলে কী করতেন," সুধী উত্তর দেয়, "তা বলা কঠিন। ইংলণ্ডের ঐতিহ্য অন্যরূপ। কিন্তু অহিংসার প্রভাব আমাদের দেশে সেই বৌদ্ধ যুগ থেকে বিদ্যমান। আমাদের চির পরিচিত অহিংসা যে রাজনীতিতে প্রয়োগযোগ্য তা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি, গান্ধীজী তার আবিষ্কারক। কিন্তু ভাবটা পুরাতন, প্রভাবটাও প্রায় তিন হাজার বছরের। সুতরাং ইংরেজ হলে তিনি কী করতেন তা বলতে না পারলেও ভারতীয় হয়ে তিনি কী করছেন তা বলতে পারি।"

শান্তিবাদীদের আগ্রহ এক জায়গায় এসে আটকে যায়। মরতে তাঁরা রাজি আছেন কিন্তু দেশ পরাধীন হবে তা কী করে সহ্য করবেন! দাস হবেন কী করে!

"সেইখানেই অহিংসার সম্যক প্রয়োগ।" সুধী যেটুকু বোঝে সেটুকু বোঝায়। দেশশুদ্ধ লোক যদি একবাক্যে বলে যে, আমরা হুকুম মানব না, আমরা খাজনা দেব না,

আমরা কোনো রকম সাহায্য করব না, তা হলে বিদেশীর পক্ষে রাজত্ব করা কঠিন হয়, বার বার মারের আশ্রয় নিয়ে তার নিজের মনে বিকার আসে, তার আর্থিক লাভও থাকে না।"

"সে যদি দশ লাখ বিদেশী এনে বসবাস করায়, যেমন বিজেতা উইলিয়াম করে-ছিলেন ?" ব্লিজার্ড কণ্ঠক্ষেপ করলেন।

"তা হলে সেই দশ লাখ এক দিন স্বদেশী হয়ে যাবে যেমন এদেশের নর্ম্যানরা হয়েছেন।"

"হুঁ।" কথাটা ব্লিজার্ডের মনে ধরল না। "দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে চেয়ে দেখো।"

দক্ষিণ আফ্রিকার উল্লেখে সুধীর দক্ষিণ ভারত মনে পড়ল। "ভারতবর্ষেও যে সময় আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হয় সে সময় আর্যদের আচরণ আফ্রিকার শ্বেতকায়দের অনুরূপ ছিল। এখনো তার চিহ্ন আছে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদের ব্যবহারে।"

"তা হলে তুমি বলতে চাও," ব্লিজার্ড আক্ষেপ করলেন, "সেটা যুদ্ধের তুলনায় স্পৃহনীয় ?"

"আদৌ না।" সুধী প্রতিবাদ জানাল। "সেও অন্যায়, সেও প্রতিরোধযোগ্য। আমি শুধু বলতে চাই যে প্রতিরোধের পদ্ধতি হবে অহিংস।"

"বুঝেছি।" মন্তব্য করলেন মিস মার্শল। "আপনার কথায় আমাদের ধারণা হয়ে-ছিল যে আপনি বিদেশীকে স্বদেশী হতে দেবার পক্ষপাতী।"

"তাও এক হিসাবে সত্য।" সুধী স্বীকার করল। "ইতিহাসে বহু নজীর আছে, ইতিহাসেরও শেষ হয়নি। কে জানে, একদিন হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় মিলে একপ্রকার যৌথ সভ্যতার পত্তন করবে। আমার দেশের সভ্যতাও আদিম ও আর্যের যৌথ কীর্তি। আমরা হিন্দুরা যে সমন্বয়ের উপর এতটা জোর দিই তার কারণ সমন্বয় আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার বনিয়াদ। সমাজ থেকে ক্রমে তা ধর্মবিশ্বাসে সঞ্চারিত হয়েছে।"

মিসেস ব্লিজার্ড অবুঝভাবে বললেন, "কী জানি! এক দল জার্মান বা ইটালিয়ান উড়ে এসে জুড়ে বসবে এদেশে, আমরা তাদের অত্যাচার চেয়ে দেখব এই আশায় যে হাজার বছর পরে কী এক অপূর্ব সমন্বয় সংঘটিত হবে। মড, তোমার কী মনে হয় ?"

"আমরা প্রতিরোধ করব। কী ভাবে প্রতিরোধ করলে ওদের কিংবা আমাদের কোনো পক্ষের বিশেষ ক্ষতি না হয় সেই আমার জিজ্ঞাস্য।"

"আমারও।" এক সঙ্গে বলে উঠলেন ব্লিজার্ড, মিসেস ব্লিজার্ড ও অন্যান্য কয়েক-জন অতিথি।

"চক্রবর্তী", এবার বললেন ব্লিজার্ডপুত্র জন, "অস্ত্র ধরতে আমার ঘৃণা হয়। একবার ধরেছি, আর ধরব না বলে সংকল্পও করেছি। কিন্তু আমি যদি অস্ত্র না ধরি, কেউ যদি না ধরে, তবে কি ব্রিটেন রক্ষার অন্য কোনো উপায় আছে? যদি না থাকে তবে এইখানেই এ তর্কের ইতি হোক। কেননা আমরা শান্তিবাদী হই আর যুদ্ধবাদী হই আমরা দেশকে ভালোবাসি, দেশ যদি যায় তবে আমরা প্রাণে বাঁচতে চাইনে, মেরে মরব, অথবা না মেরে মরব, তৃতীয় পন্থা নেই।"

"আমরাও, আমরাও।" একসঙ্গে বলে উঠলেন দু' একজন ছাড়া অন্য সকলে। ব্লিজার্ড চুপ করে থাকলেন।

"আমার কথাটা বুঝলেন?" জন বোঝাতে চেষ্টা করলেন। "আমরা এ বিষয়ে একমত যে শান্তির জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পেতে হবে। প্রয়োজন হলে ছেড়ে দিতে হবে উপনিবেশ, তবে তার আগে উপনিবেশবাসীদের সম্মতি নিতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে আর্থিক ক্ষতি সইতে হবে, বাণিজ্যের বখরা দিতে হবে, বাজার ছেড়ে দিতে হবে—"

কে একজন ঠিক এ সময় কাশলেন। বোধ হয় বাজার ছেড়ে দিতে দোকানদারের জাতি রাজি নয়।

"হাঁ, বাজার ছেড়ে দিতে হবে, যদি সত্যি প্রয়োজন হয়। কিন্তু শান্তির জন্যে দেশ ছেড়ে দিলে অন্যের শান্তি হতে পারে, আমাদের নয়, আমরা একটা দিনও শান্তি পাব না। সুতরাং বিদেশী যেদিন ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করবে সেদিন আমাদের শান্তিবাদের অগ্নিপরীক্ষা। তার আগেই আমরা জাহাজ দিয়ে জাহাজকে ঠেকাব, বিমানকে ঠেকাব বিমানধ্বংসী কামান দিয়ে।"

"বুঝেছি।" সুধী নীরব থেকে বলল, "আপনারা সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করবেন শত্রুকে নিরস্ত্র করতে, তা সত্বেও যদি সে আক্রমণ করে তবে তাকে পরাস্ত করতে। কেমন?"

"ঠিক।"

"আমি আপনাদের দেশ সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার অধিকার রাখিনে। কেন অনধিকার চর্চা করব? কিন্তু আপনিও একবার ছোট ছোট দেশগুলির দশা ভেবে দেখবেন। ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, সুইটজারলণ্ড ইত্যাদির এমন কী ক্ষমতা আছে যে তারা অপরের বিনা সাহায্যে প্রবল প্রতিবেশীর কবল এড়াবে? তাদের দুর্দিনে যদি তারা আপনাদের ডাকে, যদি আপনারা তাদের জন্য অস্ত্র ধরেন, তবে আপনাকে আবার যেতে হবে ফ্রান্সে। তখন দেশরক্ষা নয়, বিদেশরক্ষা। পারবেন?"

২

ব্লিজার্ড এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, স্থধীর প্রশ্ন শুনে বললেন, "আমিও সেই কথা বলি। কেউ যে কোনো দিন গায়ে পড়ে আমাদের আক্রমণ করবে সে সম্ভাবনা স্বল্প। আমাদের বিপদ হচ্ছে এই যে বেলজিয়ম আমাদের আশ্রিত, ফ্রান্স আমাদের আশ্রয়-যোগ্য। এরা যদি আক্রান্ত হয় তবে আমাদের শান্তি নেই, পরের জন্যে আমাদের যুঝতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ জিনিসটাই জঘন্য। আর যুদ্ধ যারা ঘটায় তারা কেউ সাধুপুরুষ নয়, দু'পক্ষেই অন্যায়কারী থাকে। ফস করে বেলজিয়মের জন্যে তলোয়ার ধরতে হলে তার আগে তলোয়ার বানাতে দিতে হয়, অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন করতে হয়। আর আয়োজন করা মানে রণদেবতার আবাহন করা। আমি তৈরী হচ্ছি দেখলে তুমিও তৈরী হবে। তারপর তোমাকে ও আমাকে তৈরী করার ভার যাদের উপরে তারা অতি চতুর ব্যব-সাদার। তাদের বিক্রীর স্থবিধার জন্যে তারা তোমাকেও উস্কে দেয়, আমাকেও ভয় দেখায়। নিত্য নতুন অস্ত্র উদ্‌ভাবন করে তোমাকে যদি যোগায়, আমি বলি আমারও ওটি চাই। আমাকে যদি যোগায়, তুমি বল তোমারও ওটি দরকার। এমনি করে তৈরী হতে হতে একদিন সেরাজেভোয় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ খুন হন, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ সন্তান বেলজিয়মে ফ্রান্সে গ্যালিপোলিতে প্রাণ হারায়।"

মিসেস ব্লিজার্ড তাঁর স্বামীকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "যথার্থ।"

মিস মার্শল বললেন, "অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এই গোলকধাঁধার থেকে নিগমের পথ কোথায় ?"

"সোশিয়ালিজম।" জন অম্লান বদনে বললেন। "পরিবর্তন চাই সমাজে ও রাষ্ট্রে, ক্রয়বিক্রয়ে, বাণিজ্যে। তা হলে যুদ্ধের জঁড় মরবে, কেউ বেলজিয়ম আক্রমণ করবে না। আমাকে যেতে হবে না এই বাড়ীর বাইরে।"

"জন, ছেলেমানুষী কোরো না।" তার মা ধমক দিয়ে উঠলেন। অবশ্য হাস্য মুখে। সোনিয়া ও ক্রিস্টিন সেখানে ছিলেন না, স্থতরাং জনই বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁর পিতামাতার কাছে।

"না।" ব্লিজার্ড প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "এর উত্তর সোশিয়ালিজম নয়। এর উত্তর নিরস্ত্র প্রতিরোধ। আমি চৌদ্দ বছর আগে যা করেছি চৌদ্দ বছর পরেও তাই করব। আমি অস্ত্র ধরব না। তবে জেলে গিয়ে আমার তৃপ্তি নেই। দুনিয়ায় পলিটিসিয়ান থাকবেই, ব্যবসাদারও থাকবে, জন যাই বলুক। তারা ও সেনাদলের সর্দারেরা মিলে যুদ্ধ একদিন বাধাবেই, জন যতই চেষ্টা করুক। সেদিন আমি কি জেলে আটক থেকে স্বস্তি পাব ? না, আমি বাইরে থেকে এমন কিছু করতে চাই যাতে যুদ্ধ থেমে যায়। তা করতে গেলে হয়তো ওরা আমাকে গুলি করে মারবে, তবু নিজের লোকের হাতে গুলি খেয়ে মরা ভালো। জানব যে শান্তির জন্য প্রাণ দিলুম।"

মিসেস ব্লিজার্ড পছন্দ করলেন না। বললেন, "ওসব পাগলামি আমি সহ্য করব না।"

ব্লিজার্ড রুখে বললেন, "কী করবে তুমি!"

"এবার তোমাকে পাগলাগারদে পাঠাব। আমার ভাই ডাক্তার, সে certify করবে।"

ব্লিজার্ড হতাশ হয়ে বললেন, "হা ভগবান!"

"বাইরে থেকে এমন কী করা যায় যাতে যুদ্ধ থামে?" জানতে চাইলেন মিস্টার বেন টাউনসেণ্ড, তিনিও একজন বিবেকবাদী।

"আমি কী করে বলব, বেন?" ব্লিজার্ড আকুল কণ্ঠে বললেন। "লিখতে পারি, কেউ পড়বে না। বকতে পারি, কেউ শুনবে না। কিন্তু কিছু একটা করা উচিত। জেলে গিয়ে বোবার মতো বসে থাকলে কার কী উপকার হবে? আমি যদি শ্রমিক নেতা হতুম আমি শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাতুম, তাতে হয়তো মন্ত্রীদের চেতনা হত। কিন্তু আমার দলবল নিয়ে আমি বড় জোর একটা শোভাযাত্রা করতে পারি। মন্ত্রীরা হাসবে।"

"কিন্তু বাবা," জন বিব্রত স্বরে বললেন, "আপনি আমাদের লেবার দলের অসুবিধার দিকটা দেখছেন না। আমরা ধর্মঘট বাধালে যে শত্রুর সহায়তা হয়, দেশের লোক ধরে নেয় আমরা শত্রুপক্ষের চর, আমরা দেশদ্রোহী। যুদ্ধ থামুক, তা আমরাও চাই, কিন্তু শত্রুর বল বাড়ুক তা কি আমরা চাইতে পারি? লোকে ভাববে কী! শুধু তাই নয়। ধর্মঘটীদের দয়া করবে না কেউ। পুলিশ তাদের বেঁধে নিয়ে যাবে, সৈনিক তাদের গুলি করবে। তাদের স্ত্রী-পুত্র খেতে পাবে না। মরেও শান্তি নেই। এ কেমনতর শান্তিবাদ!"

ব্লিজার্ড গুম হয়ে বসলেন। কথা কইলেন না। ছেলেও তাঁর বিপক্ষে!

টাউনসেণ্ড দু' একবার কেশে বললেন, "আমাদের মুশকিল হয়েছে এই যে আমরা এখন আর ছোট্ট একটি গ্রূপ নই, আমরা একটা সংঘ, আমাদের সভ্যসংখ্যা অনেক, আমাদের সহানুভবী অগণ্য। লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মুখ চেয়ে আছে, আমাদের কাছে নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছে। যুদ্ধ যদি বাধে তবে ব্লিজার্ড আমি জেলে যেতে পারি অক্লেশে, মরে যেতে পারি অনায়াসে, কিন্তু মনের মধ্যে এই অস্বস্তি থাকবে যে সমস্যার সমাধান করে যেতে পারলুম না।"

ব্লিজার্ড সায় দিয়ে বললেন, "সত্য।"

"একবার কল্পনা কর, মড। ওপার থেকে মুসোলিনীর বিমান আসছে, এপার থেকে আমাদের মিলিটারিস্ট বাবাজীরা তাকে ভূমিসাৎ করতে অপেক্ষা করছে, দেশময় যুদ্ধের উত্তেজনা, হাজার হাজার ছেলে নাম লেখাচ্ছে, তাও যথেষ্ট নয় বলে গবর্ণমেণ্ট শাসাচ্ছে জোর করে ছেলে ধরে নিয়ে যাবে। তখন আমাদের লক্ষাধিক সভ্য আর বহু লক্ষ

সহানুভবী বলছে, ব্লিজার্ড, টাউনসেণ্ড, মিস মার্শল আপনারা কোথায়? আমরা বলছি, আমরা জেলখানায়, তোমরাও এস।"

টাউনসেণ্ডের শেষ উক্তিতে শ্লেষ মেশানো ছিল। সকলে হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু হাসিও হাস্যকর, তা সকলে জানত।

"এই সমস্যা সমাধান করতে হবে, মড। যদি না পারি তবে স্পষ্ট বলব, ভাই সব, ভগিনী সব, আমরা তোমাদের নেতা হবার অযোগ্য, আমরা যে দায়িত্ব নিতে অপারগ। তোমরা পরিখা খুঁড়ে তার মধ্যে ঢোক, ছেলেকে সিপাহী দলে ভর্তি হতে বল, মেয়েকে বল নার্স হতে। তা ছাড়া আর কী করবে না করবে তা তোমরা তোমাদের পলিটি-শিয়ানদের জিজ্ঞাসা কর। আমরা একেবারে ফেল।"

ব্লিজার্ড উচ্চবাচ্য করলেন না। মিস মার্শল ক্ষুণ্ন স্বরে বললেন, "ওরা আমাদের crucify করবে।"

"certify করার চেয়ে crucify করা ভাল।" ব্লিজার্ড গুমরে উঠলেন।

একজন রেভারেণ্ড ছিলেন সেখানে। তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তা হলে স্বীকার করতে হয় খ্রীস্ট স্বয়ং ফেল।"

"বব," টাউনসেণ্ড তাঁকে সম্বোধন করলেন, "তুমিই আলোক দাও।"

৩

সুধীর মন উড়ে গেছল দেশকাল পেরিয়ে ১৯২০ সালের ভারতে।

ভারতবর্ষ আপনার পরাক্রম আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কার করেছে অতি অমোঘ অস্ত্র আর ভয় নেই তার। ভূমণ্ডলে এমন রাজা নেই, সে রাজার এমন অস্ত্র নেই, সে অস্ত্রের এমন ধার নাই যে ভারতের অঙ্গে দাগ রাখতে পারে। ভারত যেন মহাসাগর, জলের গায়ে খাঁড়ার ঘা, সঙীনের খোঁচা, গুলির চোট, গোলার গহ্বর মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। ভারতের প্রতিরোধ যেন সাগরের প্রতিরোধ, ঘাতকের গতিরোধ। ভারত এত মহান যে সে নীচের পর্যায়ে নেমে নীচ হতে পারে না, পশুর প্রতিপক্ষ হয়ে পশু হতে পারে না। সে বলে "I strove with none, for none was worth my strife."

আমরা যুদ্ধ করব না, অথচ পরাজিত হব না। আমরা কোনো আঘাত গায়ে মাখব না, কোনো আঘাত ফিরিয়ে দেব না। আমরা চূর্ণ হয়ে যাব, তবু অন্যায় করব না। আমরা চূর্ণ হয়ে যাব, তবু অন্যায়কে মেনে নেব না।

অন্য কথায়, যুদ্ধ করব। কিন্তু নৈতিক অর্থে ও নৈতিক অস্ত্রে। আমাদের হতে হবে কায়মনোবাক্যে অহিংস, আমাদের হতে হবে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। আমাদের সম্মুখে এলে শত্রুর মাথা সসম্ভ্রমে নত হবে। পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট ভারতের নগ্ন চরণের ধুলা পেয়ে

ধন্য হবে। তাদের হয়ত সহস্র সৈনিক, আমাদের দশটি নিবেদিত কর্মী। সেই দশজন যদি দৃঢ় কণ্ঠে একটিবার বলে, "না, মানব না", তবে তাদের সেই উক্তির পশ্চাতে কোটি পুরুষের পৌরুষ সার বেঁধে দাঁড়াবে, মার খেয়েও টলবে না, মরে গেলেও হারবে না। আমাদের ক্ষুদ্র একটি "না" অশেষ শক্তির আধার। ঠিকমতো বলতে জানলে ওটি একটি মন্ত্র, ওর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি মহাজাতির বীর্য। বড় বড় মন্ত্রণা পরিষদের ছল কৌশল ঐ একটি মন্ত্রের কাছে নিষ্প্রাণ। বড় বড় মানুষ মারণের যন্ত্র ঐ একটি মন্ত্রেব কাছে নিষ্ফল। একবার যদি সত্য করে উচ্চারণ করতে পারি "না", তবে সেই উক্তির ইস্পাত শত্রুপক্ষের সব আক্রমণ ব্যর্থ করবে। তারা সব পাবে, কিন্তু আমাদের সহযোগ পাবে না।

কেমন করে "না" বলতে হয় তাই শিক্ষা দিয়েছেন গান্ধীজী। তাঁর সঙ্গে সুধীর মতভেদ এই যে সুধী বলে, আগে আমাদের দেশ প্রস্তুত হোক, দেশের শতধা বিভক্ত পরস্পরবিরোধী প্রত্যঙ্গ আপন নিয়মে গ্রথিত হোক, তাদের মধ্যে এমন এক সহযোগিতার ভাব ও অভ্যাস আসুক যা শত্রুনিরপেক্ষ, তাদের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক পাতানো হোক যা প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, এমন একটি বিশ্বাস বিরাজিত হোক যা নিঃশ্বাসের মতো সহজ। আমাদের ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খল দেশ যদি আপন ইচ্ছায় এক ও অবিভাজ্য হয়, আপন সাধনায় আপনাকে মানে, আভ্যন্তরিক স্বতোবিরোধ হতে মুক্তি পায়, নিজের ঘরে "হাঁ" মন্ত্র পাঠ করে তবেই তার কণ্ঠে শোভা পাবে "না" মন্ত্র। "না" মন্ত্রের পিছনে যদি "হাঁ" মন্ত্র থাকে তবেই তার মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হয়। শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ সার্থক হয় তখনি, যখন ভাইয়ের সঙ্গে সহযোগ থাকে। যে দেশে সকলে সকলের পর, কেউ কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, স্পর্শ করলে স্নান করে, যে দেশে পরস্পরের প্রতি সর্বব্যাপী সংশয়, সে দেশের প্রাথমিক মন্ত্র হবে "হাঁ" মন্ত্র। নতুবা কেবল শত্রু বিতাড়নের জন্যে রাজনৈতিক জোড়াতালি দেখা দেবে, তার মধ্যে সহস্র গোঁজা-মিল। সে জিনিস সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। সে জিনিস তেল আর জলের মিতালি। ব্যর্থতায় তার পর্যবসান। "না" মন্ত্র নিশ্চয়ই অমোঘ, কিন্তু তার প্রয়োগ যেন হয় দেশকে প্রস্তুত করে।

বব বার্নেট বলছিলেন বেন টাউনসেণ্ডকে, "আমার যিনি ত্রাতা তাঁরই আলোক নিয়ে আমার আলোক। আমার স্বতন্ত্র আলোক নেই, বেন। তার কি সাধ্য ছিল না বাধা দিতে? তথাচ তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। আমরা প্রত্যেকে যদি তাঁর অনুসরণ করি তবে আমাদের মৃত্যুর পর ইংলণ্ড থাকবে কি না, থাকলে ইংরেজ থাকবে কি না, থাকলে স্বাধীন থাকবে কি না, এত ভেবে কাজ কী? আমরা যে তাঁর অনুগামী, তিনি যে স্বয়ং আমাদের চালক, তিনি যে ভ্রান্ত হতে পারেন না, এই আমাদের যথেষ্ট। তাঁর উপর যদি

আস্থা না থাকে তবে অবশ্য অন্য কথা।”

টাউনসেণ্ড চিন্তাকুল হলেন। ব্লিজার্ড উসখুস করতে লাগলেন। জন বললেন, “সার, যে সৈনিক যুদ্ধ করতে যায় তার একমাত্র প্রেরণা এই যে তার স্ত্রী-পরিবার নিরাপদ হবে, তার দেশবাসী নিরাপদ হবে ; এই প্রেরণা তাকে বীরের মর্যাদা দেয়, তাকে দুর্বার করে। ভেবে দেখুন, সার, সে যদি সাংসারিক দায়িত্বের অতীত হয়, যদি কার কী দশা হবে বিবেচনা না করে, যদি নিজের প্রাণ দিয়ে শত্রুকে অক্ষত ছেড়ে দেয়, তবে কি সে তার স্ত্রীপরিজনকে বাঘের মুখে ফেলে যায় না ? দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না ? প্রাণ দেওয়া অতি মহৎ কাজ, কিন্তু প্রাণ নেওয়াও কি কর্তব্য কাজ নয় ?”

বার্নেট বিপন্ন হয়ে সুধীর দিকে তাকালেন। “মিস্টার চক্রবর্তী, ভারতের কী উত্তর ?”

“ভারতের উত্তর,” সুধী ইতস্তত করে বলল, “তিনিই দিতে পারেন যিনি ভারতের বাণীস্বরূপ। আমি তো পারিনে। আমি শুধু বলতে পারি আমার কথা। মানুষকে যদি বাঘ বলে মনে করি তবে স্ত্রীপরিজনের দশা ভেবে বন্দুক হাতে নিতে বাধ্য হই, নতুবা আমারও প্রাণনাশ, ওদেরও সর্বনাশ। অমনভাবে প্রাণ দেওয়া মূঢ়তা। কিন্তু মানুষ তো ব্যাঘ নয়। সে যখন শত্রুর রূপ ধরে আসে তখন সে স্বার্থান্ধ, গর্বান্ধ, কামান্ধ কিংবা ক্রোধান্ধ। আধুনিক যুদ্ধে দেখা যায় সে স্বদেশপ্রেমান্ধ। ফরাসী ও জার্মান, ইংরাজ ও বেলজিয়ান, সকলেরই দৃষ্টি ছিল স্বাদেশিকতায় আবৃত। তা যদি হয় তবে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা অবান্তর! সেক্ষেত্রে আমার উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত। আবার আমার উত্তর—না।”

“না!” সকলে আশ্চর্য হয়ে প্রতিধ্বনি করলেন। “না!”

সুধী বিশদ করল। “আমি যুদ্ধ করব না, অথচ সহযোগিতা করব না। আমি অস্ত্র ধরব না, অথচ খাদ্য সরবরাহ করব না। আমি আঘাত করব না, অথচ খাজনা দেব না। নেপোলিয়ন যখন মস্কো দখল করেন তখনকার ইতিহাস মনে আছে কি ? এত বড় পরাভব তাঁর জীবনে আর ঘটেনি। ওয়াটারলুতে তাঁর অন্তত এই সান্ত্বনা ছিল যে তিনি দারুণ লড়াই করেছেন। মস্কোতে কিন্তু তাঁর সেটুকু সান্ত্বনাও ছিল না। দারুণ লড়াই না করে দারুণ হারলেন সেখানে। আর সেই যে তিনি হারলেন, তার পরে তাঁর আত্ম-বিশ্বাস ফিরল না।”

ব্লিজার্ড যেন নতুন আলো আবিষ্কার করলেন। বলে উঠলেন, “শোন হে। আমি বুঝেছি তোমাদের গান্ধী অসহযোগ নীতি কার কাছে পেলেন। টলস্টয়ের কাছে। আর টলস্টয় কার কাছে পেলেন ? মস্কোর কাছে। পড়েছ তো ‘War and Peace ?’ চমৎকার বর্ণনা। মস্কো! মস্কো এ যুগের পথপ্রদর্শক।”

টাউনসেণ্ড স্বীকার করলেন, "হাঁ। ইতিহাসে নজীর আছে বটে। মস্কৌ সে হিসাবে পথপ্রদর্শক বটে।"

"কিন্তু ওটা কি প্র্যাকটিকল?" জন প্রশ্ন করলেন। "লণ্ডনের উপর বোমা পড়বে যখন, তখন কি মস্কৌর অনুকরণ করে ফল আছে?"

"মাই ডিয়ার ফেলো," টাউনসেণ্ড বললেন, "লণ্ডনের উপর বোমা পড়লে শহরের লোকজন কি এখানে বেশী দিন টিকবে? স্থানত্যাগ করতেই হবে আমাদের। মস্কৌর লোক তাই করেছিল। নিজের নিজের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। খাদ্য বস্ত্র যেখানে যা ছিল সব জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল ওরা। বিজেতা এসে ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর দলবল খেতে পায় না, চুরি করে সোনাদানা যা পায় তার দাম নেই, সব দিক থেকে তাদের সঙ্গে অসহযোগ, একটা ফল কি তরকারিও কেউ বেচে না বহু স্বর্ণের বিনিময়ে।"

"চমৎকার আইডিয়া।" ব্লিজার্ড বলছিলেন। "জানি অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। তবু কী চমৎকার আইডিয়া, বব। তুমি কী মনে কর?"

বব বোধ হয় তখন যীশুর ধ্যান করছিলেন। চমকে উঠে বললেন, "কী বলছ, রনি?" তারপর ব্লিজার্ডের কাছে শুনে বললেন, "ভেবে দেখব।"

জন আবার প্রশ্ন করলেন, "ওটা কি প্র্যাকটিকল?"

এর উত্তর দিলেন মিস মার্শল। "আমরা থাকি একটা দ্বীপে। আমাদের কৃষি থেকে যা মেলে তা দিয়ে দু'মাসও চলে না। বাইরের উপর নির্ভর না করে উপায় নাই, তাই জাহাজ রাখতে হয়। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হলে অন্য জিনিস রপ্তানি করতে হয়, সুতরাং কলকারখানার প্রশ্রয় দিতে হয়। এমন যে দেশ, এমন যার আর্থিক বনিয়াদ, তার পক্ষে মস্কৌর অনুকরণ করা দুঃসাধ্য। ওরা যদি আমাদের জাহাজ আটক করে তবে আমরাই না খেয়ে মরব, হয়তো মরার আগে মাথা হেঁট করব।"

ব্লিজার্ডের বুদ্ধি ফিরে এল। "তা বটে। তা বটে। আমিও সে কথা আগে ভেবেছি। কিন্তু মনে ছিল না। আমরাই না খেয়ে মরব। তার আগে বছর খানেকের খোরাক সংগ্রহ করে গ্রামে গ্রামে সঞ্চয় করা উচিত। অস্ত্রশস্ত্র দেবার খরচ না করে পাঁচ বছরের খাদ্য কিনলে কেমন হয়, বেন?"

বেন বললেন, "বিষয়টি চিন্তার যোগ্য।"

৪

সেদিন সুধীর সঙ্গ নিলেন জন, সুধীকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে।

"চক্রবর্তী, আপনি কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে এটা প্র্যাকটিকল? আক্রমণকারীর সঙ্গে যুদ্ধ না করেও তাকে প্রতিরোধ করা যায়?"

"এটাও এক প্রকার যুদ্ধ, তবে এর টেকনিক স্বতন্ত্র।" সুধী বলল। "ইংলণ্ডের সম্বন্ধেও আমার ধারণা অস্পষ্ট, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে আমার স্থির বিশ্বাস, ইচ্ছা করলেই আমরা বিনা অস্ত্রে বিজেতার গতিরোধ করতে পারি।"

"আমার সন্দেহ হয় যে।"

"শুধু আপনার কেন, আমাদের নিজেদেরই সন্দেহ হয়। আমরা প্রস্তুত হতে শিখিনি, যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন পৃথিবী এক অপূর্ব দৃশ্য দেখবে।"

জন বললেন, "সাফল্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান, কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে পরম উৎসাহবান। পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে কোনো দেশ রাজি নয়, এক যদি আপনার দেশ রাজি হয়। ভারতবর্ষই আমাদের একমাত্র আশার স্থল।"

"শুনে সুখী হলুম, ব্রিজার্ড। প্রার্থনা করি যেন আপনাদের আশা পূর্ণ হয়।" সুধী ভারতবর্ষের জ্যোতির্ময় মূর্তি ধ্যান করল।

বলল, "আমি জানি আমার দেশ আপনাদের নিরাশ করবে না। অলৌকিক ঘটনার যুগ এখনো অতীত হয়নি।"

"আমাকে একটু আভাস দিতে পারেন?" জন অনুরোধ করলেন।

"কতকটা পারি। আমরা আমাদের দেশকে এমন ভাবে গঠন করব যে সাত লাখ গ্রাম মোটের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, গ্রামের কাঁচা মাল গ্রামেই রাখবে ও বাইরের তৈরী মাল গ্রামে ঢুকতে দেবে না, গ্রামিকদের মোটা ভাত ও মোটা কাপড় গ্রামের মধ্যেই উৎপন্ন হবে ও গ্রামের মধ্যেই বিলি হবে, গ্রামের সঙ্গে গ্রামান্তরের যোগাযোগ থাকবে ও যাবতীয় গ্রামের পরিচালকমণ্ডলী একই কেন্দ্রের অধীন হবে। এসব যদি হয় তবে বাইরে থেকে দেশকে হস্তগত করলেও চাবী খুঁজে পাবে না বিদেশী।"

জন মন দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন, "অসম্ভব নয়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্বাচ্ছন্দ্যের মান নিম্নতর হয়। সেটা কি ঠিক হবে?"

সুধী উচ্ছ্বাস দমন করে সহজ স্বরে বলল, "ব্রিজার্ড, আমার দেশের শতকরা সত্তর জন লোক যে কী ভয়ানক গরিব তা আমাদের বাবুরাও জানেন না। আমি আমাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাদের দুরবস্থা, আমি তাদের দুরবস্থার ভাগ নিয়েছি, এক বেলা খেয়েছি ও এক বেলা অভুক্ত রয়েছি, সুতরাং আমি যদি বলি যে ভারতের গণ্ডগ্রামে আট ঘণ্টা মেহনতের মজুরি চার পয়সারও কম, আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন না, বিশ্বাস করবেন।"

জন চলতে চলতে হঠাৎ থামলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, "না, না। আপনি ভুল করেছেন।"

সুধী হেসে বলল, "আমি জানি।"

জন অনেকক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর রেগে বললেন, "আপনারা তবু হাসিমুখে সহ্য করছেন ?"

সুধী গম্ভীর ভাবে বলল, "না, সহ্য করছিনে। আমরা সংগ্রাম করছি। তবে আমাদের সংগ্রামের পদ্ধতি স্বতন্ত্র।"

জন মুষ্টি উদ্যত করে বললেন, "আমরা হলে অন্য পন্থা ধরতুম।"

তারপর কী ভেবে বললেন, "মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের এমন এলাহি বন্দোবস্ত করেছে বিজ্ঞান, বড় বড় কলকারখানা দিয়ে সারা দেশের অভাব মেটানো যায়। আপনারা তা সুযোগ না নিয়ে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ করবেন, সেটা কি ঠিক ?"

"বড় বড় কলকারখানা দিয়ে ভোগসামগ্রীর অভাব মিটতে পারে, কিন্তু তার ফলে কোটি কোটি লোক বেকার হয়। যারা আজ চার পয়সাও পাচ্ছে না তাদের মজুরি দু'পয়সা দাঁড়াবে। আপনি যদি সেইসব অভাগার দিক থেকে বিবেচনা করেন তবে হৃদয়ঙ্গম করবেন যে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির একমাত্র উপায় তাদের কাঁচামাল তাদেরই হাত দিয়ে তৈরী মালে পরিণত করা। তাদের তৈরী মাল তাদেরই ক্রয়যোগ্য করা। নীতিমাত্রেরই নিপাতন আছে, এরও থাকবে। কার্যকালে অনেক ইতরবিশেষ হবে। কিন্তু মোটের উপর এই হবে আমাদের অর্থনীতি।"

জন সন্তুষ্ট হলেন না। "আমি অবশ্য কলকারখানার উপর ধনিকের কর্তৃত্ব সমর্থন করিনে, কিন্তু কলকারখানা যদি না থাকে তবে দরিদ্রের দারিদ্র্য যে থেকে যায়। যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে গিয়ে আপনি যে উল্টো বিপত্তি ডেকে আনছেন।"

"বিজ্ঞানের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে।" সুধী চলতে চলতে বলল। "কিন্তু বিজ্ঞানের উপর যদি নীতির শাসন না খাটে তবে মানুষের অপকার হয়। আমার দেশের পক্ষে একমাত্র নীতি হবে গ্রামিকের পোষণ। সেই নীতির শাসন মানলে বিজ্ঞানেরও স্থান আছে আমার দেশে।"

"চেয়ে দেখুন," টিউব ট্রেনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে জন বললেন, "মানববুদ্ধির এই উদ্ভাবন আপনার বিস্ময় সঞ্চার করে না ?"

"আমাকে মুগ্ধ করে, স্তম্ভিত করে, প্রলুব্ধ করেও। কিন্তু আমি জানি, বড় বড় কলকারখানা, রেল স্টীমার, বিমান বহর, যুদ্ধ জাহাজ, বিষ বাষ্প, এগুলি হচ্ছে এক বৃন্তের ফুল। ধনিকের কর্তৃত্ব গিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গিয়ে বিশ্বরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যদি আসে তা হলেও এদের এই মৌলিক সম্পর্ক ঘুচবে না। ঐশ্বর্যের প্রলোভন ত্যাগ করতে হবে, নতুবা শান্তির আশা নেই।" সুধীর কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় প্রত্যয়।

জন করমর্দন করে বিদায় নিলেন। যাবার বেলায় বললেন, "শান্তির আশা নেই, চক্রবর্তী। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

শান্তির আশা নেই, সুধীও তা উপলব্ধি করেছিল। পশ্চিমের সভ্যতা যে পথ ধরেছে সে পথ শান্তির পথ নয়, সংগ্রামের পথ। সে পথে গৃহবিবাদ, ধনিক শ্রমিক মনোমালিন্য। যখন গৃহবিবাদের সম্ভাবনা তীব্রতর হবে, তখন ক্ষমতা নিয়ে ধনিকে শ্রমিকে কাড়া-কাড়ির উপক্রম হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে আন্তর্জাতিক সঙ্কট বাধিয়ে তোলা হবে। তখন ধনিক ও শ্রমিক পারস্পরিক পার্থক্য ভুলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে রণ করবে। আগামী মহাযুদ্ধ যতই প্রাণান্তিক হোক না কেন গৃহবিবাদ তার চেয়েও মারাত্মক। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া এখন শ্রেণীসংঘর্ষের ধূমে আচ্ছন্ন। ধোঁয়ার নিচে আগুন রয়েছে, সেই আগুন একদিন প্রখর হতে পারে। যেদিন তার দ্বারা ঘর বিপন্ন হবে ঠিক সেই দিন ঘরের লোক গিয়ে পরের ঘর আক্রমণ করবে। যুদ্ধ হবে শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। তারপরে কী হবে কে জানে। হয়তো সমগ্র সভ্যতা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, হয়তো সেই ভস্মের ভিতর থেকে নবজীবনের শিখা উদ্গত হবে।

গত দুই শতাব্দীকাল নানা দেশের ধন আহরণ করে ও কলকারখানার সাহায্যে ধন উৎপাদন করে ইউরোপের লোক ধনের উপাসক হয়েছে। অথচ সেই ধন সমাজের নিম্ন স্তরে অবতরণ করেনি, এখনো উপরের স্তরে আবদ্ধ রয়েছে। এর ফলে নিচের দিকের অসন্তোষ দুশো বছর ধরে জমেছে। সমাজের ফাটলে ফাটলে বারুদ ঠাসা। কবে যে সমাজ চৌচির হয় তার স্থিরতা নেই। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বারুদ থাকতে বাইরের গোলাবারুদের দরকার করে না, আকাশ থেকে বোমা না পড়লেও চলে। কিন্তু বুদ্ধি-মানদেরও ধারণা আকাশ থেকে বোমা পড়লে সমাজের যেখানে যত অসন্তোষ জমেছে সব চাপা পড়বে, দেশসুদ্ধ লোক বিদেশীকে তাড়াতে একত্র হবে ও সেই একতার দ্বারা সংঘর্ষ এড়াবে। জনসাধারণের প্রতি ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের অজ্ঞতা ও অনাস্থা তাদের আচরণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে। বুদ্ধিজীবীরাই যেন ব্রাহ্মণ, জনসাধারণ যেন শূদ্র। ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরাও ধনসম্পদ ভালোবাসে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তারা ধনিকদের পক্ষ নেয়। শ্রমিকের পক্ষে যারা আছে তারাও ধনকে মহামূল্য মনে করে ও ধনের অভাবকে মহা দুর্ভাগ্য। এমনি করে উভয়ত ধনেরই মাহাত্ম্য। ধনই হয়েছেন মহাদেব।

উপরের দিকের দশ বিশ হাজার পরিবারের হাতে ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, জাহাজের লাইন, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, বড় বড় কারখানা, সিবিল সার্ভিস, স্থল সৈন্য, আকাশ সৈন্য, জল সৈন্য, পুলিশের উচ্চপদ, চার্চ, হাসপাতাল, পার্লামেন্ট। ক্রমেই তাদের নিজের স্বার্থই তাদের চোখে দেশের স্বার্থের স্থান নিচ্ছে, তাদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নই তাদের চিন্তা অধিকার করছে। তাদের চালিত গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের দৃষ্টিতে জাতীয় গবর্ণমেন্টের মর্যাদা হারাচ্ছে, বিজাতীয় গবর্ণমেন্টের মতো নিঃসম্পর্কীয় মনে হচ্ছে।

তাই জন যখন বলেন, "শান্তির আশা নেই," সুধী বিশ্বাস করে। আকাশচুম্বী অট্টালিকার উপর নজর পড়লে ভাবে, কতদিন পরমায়ু। আকাশ থেকে বোমা ও পাতাল থেকে বিদ্রোহ, দুই মিলে এর স্থিতিনাশ করবে। এ সভ্যতা টিকতে পারে না। এর শত্রু আকাশে পাতালে। এক শত্রুর গায়ে অপর শত্রু লেলিয়ে দিয়ে কিছুকাল টিকতে চেষ্টা করবে, করে ব্যর্থ হবে।

৫

সেদিনকার আলোচনা সেইখানে সাঙ্গ হলেও সুধীর মনে তার অনুরণন চলল। ভারত কি পশ্চিমের পথে জাপানের অনুগামী হবে, না ভারতের পথ হবে স্বতন্ত্র?

সুধীর আশঙ্কা যদি সত্য হয়, যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসের দিন আসন্ন হয়, তবে ব্রিটেন তার নিজের ঘর সামলাতে নিজের ঘরে ফিরবে, ভারতের রক্ষণাবেক্ষণ ভারতের উপর বর্তাবে। সহসা মুক্ত হয়ে ভারত যে দু'দিন বাহু তুলে নাচবে তেমন সম্ভাবনা নেই। তৎক্ষণাৎ তাকে দেশরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। সেইখানেই তার অগ্নিপরীক্ষা।

ভারত কি জাপানের মতো অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হবে, সিপাহীসংখ্যা দশগুণ বাড়াবে, নৌবহর গড়াবে, বিমানবহর বানাবে? ভারত কি কামানবন্দুকের সাঁজোয়া গাড়ীর বোমারু বিমানের কারখানা খুলবে, গোলাবারুদের কারবার চালাবে? বিষবাষ্প প্রস্তুত করবে ভারত?

আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভ করা মুখের কথা নয়। তার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর ধনবল, কোটি কোটি টাকার ছিনিমিনি। দিনে এক কোটি টাকাও কিছু নয়। কোনো গতিকে টাকা যদি বা জুটল দেশের মধ্যে বা দেশের কাছে লোহার খনি, কয়লার খনি, তেলের খনি থাকা দরকার। তা ছাড়া আরো অনেক ধাতু আছে যা দেশে বা দেশের কাছে না পেলে দূর থেকে খরিদ করতে হবে। তারপর অসংখ্য কলকারখানা থাকবে রাশি রাশি যুদ্ধ সম্ভার সরবরাহ করতে, অসংখ্য শ্রমিক থাকবে যারা যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করতে ওস্তাদ। সব চেয়ে বড় কথা, দেশের আর্থিক বনিয়াদ এমন হবে যে যুদ্ধের দৈনন্দিন তাগিদ, মুহুর্মুহু তাগিদ, অবিলম্বে মেটাতে পারবে। বিলম্ব ঘটলে আর রক্ষে নেই। নিপুণ সৈন্যও অকর্মণ্য হবে, সঙ্গে যদি খাদ্য বস্ত্র ঔষধ অস্ত্র আর বারুদ না থাকে। যত দূর সম্ভব দেশের মধ্যেই এসব কিনতে হবে, রাতারাতি কিনতে হবে, বিদেশের আশায় বসে থাকলে চলবে না। তার মানে দেশের যেখানে যত কাঁচা মাল আছে সব পরিণত হবে যুদ্ধোপকরণে। অথচ তার দরুন সাধারণ গৃহস্থের অসুবিধা যেন খুব বেশী না হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত।

জয়লাভের পরেও নিষ্কৃতি নেই। সব তছনছ হয়ে রয়েছে, পুনর্গঠন করতে হবে।

ঋণের বোঝাটিও বিরাট, সুদ জোগাতে গিয়ে গবর্ণমেন্ট ফতুর। গত মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে কবে, এখনো ইংলণ্ড তার ঋণ শোধ করতে পারেনি, আমেরিকার সঙ্গে তর্কাতর্কি করছে। এক একটা যুদ্ধের পর এক একটা যুগ লাগে দেশের অবস্থা পূর্ববৎ হতে। অবস্থা পূর্ববৎ হতে না হতে পরবর্তী যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়।

ভারত কি যুদ্ধজয়ের আশায় আর্থিক ও আত্মিক যত সম্পদ আছে সব আহুতি দেবে? দেশের জন্যে মানুষ মারবে, মানুষ মারবার যত রকম ফন্দী আছে সব অবলম্বন করবে, আরো উদ্ভাবন করবে? ভারতের সন্তান আকাশ থেকে বোমা ফেলবে বিষবাষ্প ছড়াবে? ভারতের শ্রমিক গোলাবারুদের কারখানায় হাত কলুষিত করবে? ভারতের নারী তেমন কারখানায় শ্রমিক হবে?

তা যদি হয় তবে পশ্চিমের যে পরিণাম ভারতেরও তাই। ভারত স্বাধীন হতে না হতে তার আত্মাকে হারাবে। দুনিয়া জয় করে কী হবে, যদি আত্মাকে হারায়! পশ্চিমের হৃদয়হীন আত্মাহীন সভ্যতা দুনিয়া গ্রাস করেছে, তবু তার ক্ষুধা মেটেনি, ইংলণ্ডেই কত লোক বেকার। এত বড় সাম্রাজ্য থেকেও দারিদ্র্য আছে, বস্তি আছে, রকমারি রোগ আছে। ভারত বরং হারবে, বরং পুনশ্চ পরাধীন হবে, তবু এমন করে দেশের আর্থিক ও আত্মিক অপচয় ঘটতে দেবে না। ভারত তার নৈতিক উচ্চতা রক্ষা করবে। দেশরক্ষার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় নীতিরক্ষা। ভারতের পথ ধর্মের পথ।

অহিংসাই এ যুগের ধর্ম। সুধী যতই চিন্তা করে ততই উপলব্ধি করে ওছাড়া আর পথ নেই। অন্য যেটা আছে সেটা পথ নয়, বিপথ। তাতে মহতী বিনষ্টি। তাতে মানুষকে অমানুষ করে তার স্বভাব দশ হাজার বছর পেছিয়ে যায়, সে হয় বর্বর, বনমানুষ। যুদ্ধের পরেও তার সেই বনমানুষী ঘোচে না। তার স্বভাব সারতে বহু কাল লাগে।

এক এক করে প্রত্যেক দেশকেই ধ্বংসের পরে অহিংসার শরণ নিতে হবে, ভারতই হবে তাদের গুরু, যদি ইতিমধ্যে অহিংসাকে কার্যকরী করে। পৃথিবীর লোক একদিন ভারতের কাছে মাথা নত করবে, যদি ভারত পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়েও অহিংস সংগ্রাম চালায়।

পারবে কি? অবশ্য পারবে। পারতেই হবে। ভারত যদি না পারে তবে আর কোন্ দেশ পারবে? ভারতই পৃথিবীর একমাত্র আশা। ভারত যদি ব্যর্থ হয় সেই ব্যর্থতাও ভালো, সেই অভিজ্ঞতা অন্য কারো সাফল্যের সোপান হবে।

পশ্চিম এতদূর এগিয়েছে যে তার ফেরবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে ওকথা খাটে না। ভারত যদি বা বিপথের তালিম নেয় তবু বিপথে বেশী দূর যাবে না, তার শুভ-বুদ্ধি প্রতিবাদ করবে। বিপথের সম্মোহন তো আছেই। রণক্ষেত্রে বীর হতে কে না চায়? কিন্তু সুপথেরও আকর্ষণ আছে। বরং প্রাণ দেব, তবু অন্যায় সইব না। বরং প্রাণ

দেব, তবু অন্যায় করব না। নিজের প্রাণ দিয়েও শত্রুর প্রাণ রক্ষা করব। মরি কিংবা বাঁচি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমাকে দিয়ে অন্যায় করাতে কিংবা সওয়াতে পারবে না। ইচ্ছা আমার অনমনীয়, ইচ্ছা আমার ইস্পাত। আমার দেহ যাবে, প্রাণ যাবে, তবু ইচ্ছার এদিক ওদিক হবে না। শত্রুর এমন শক্তি নেই যে আমার ইচ্ছাকে এক চুল সরায়।

সমস্যা হচ্ছে এই যে ভারতের জনসাধারণকে কী করে অহিংসায় শিক্ষিত করা যায়। তারা থাকে সাত লাখ গ্রামে। তাদের সংঘবদ্ধ করা সাত লাখ কর্মীর কমে হবে না। এই সাত লাখ কর্মী খাবে কী? এদের খাওয়াবে কে? এদের একটা পেশা থাকা উচিত। রাষ্ট্রের কাছ থেকে এদের এক পয়সাও নেওয়া ঠিক নয়। এরা যা নেবে তা গ্রামের কাছ থেকেই নেবে, গ্রামের অন্য দশ জন লোকের মতোই চাষ করে বা চরকা কেটে বা তেমনি কোনো রকম কায়িক শ্রম করে নেবে। এরা ভিক্ষা করবে না, দান গ্রহণ করবে না। সাধারণ গৃহস্থের সঙ্গে এদের কিছুমাত্র প্রভেদ থাকবে না বাইরে। ভিতরে অবশ্য এরা কল্যাণব্রতী, এদের জীবনের সব কাজ পরের জন্যে, পরের অন্তরে যে দেবতা আছেন সেই দেবতার পূজার জন্যে। এরা কাউকে জানতেও দেবে না যে এরা সেবাকর্মী। এরা বলবে, "আমরাও তোমাদেরই মতো গৃহস্থ, আমাদেরও ঘরসংসার আছে, আমরাও তোমাদেরই মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, আমরা অসাধারণ নই।"

অথচ এরা সংঘবদ্ধ। ভারতবর্ষের এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত যেখানে যত গ্রাম আছে সেখানে এদের শাখা থাকবে, সেখানে হেড কোয়ার্টার্স থেকে উপদেশ আসবে। মাঝে মাঝে নিকটবর্তী গ্রামের কর্মীরা একত্র হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নেবে, দশখানা গ্রাম ঘুরে কে কোথায় কোন ধারায় কাজ করছে দেখবে। মাঝে মাঝে উপর থেকে পরিদর্শক আসবেন, দেখে শুনে উপদেশ দিয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে নিচের থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হবে, প্রতিনিধিদের সম্মেলন হবে, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান হবে। এমনি করে নিখিল ভারত এক সূত্রে গ্রথিত হবে। এবং সেই সূত্র দৃশ্যত আর্থিক হলেও বস্তুত আত্মিক। সাত লাখ সাধকের জীবন্ত সাধনায় ভারতের আত্মা তার মনোমতো উপায়ে অন্যায় প্রতিরোধের মহাশক্তি অর্জন করবে। ঘরে বাইরে কোথাও এমন শত্রু থাকবে না যে আত্মনিষ্ঠ ভারতের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হবে। সাত লাখ সাধকের শিক্ষায় ত্রিশ কোটি গ্রামবাসীর ইচ্ছা ইস্পাতের চেয়ে কঠোর হবে, তার ইস্পাতের হাতিয়ার আবশ্যক হবে না। একখানা লাঠিও লাগবে না। শুধুমাত্র ইচ্ছার প্রয়োগে তারা সঙীন বন্দুক বোমারু বিমানকে ব্যর্থ করবে। অকাতরে প্রাণ দেবে, যদি প্রাণ নিয়েই শত্রু ক্ষান্ত হয়। অকাতরে ধন দেবে, ধন বলতে যদি কিছু থাকে। কিন্তু মানুষের যা সার সম্পদ তার উন্নত মস্তক, তার অনমনীয় মেরুদণ্ড, তার বীর্যবান ইচ্ছা, এমন কোনো শত্রু নেই যে

এই সম্পদ হরণ করতে পারে। ভারতের ত্রিশ কোটি গ্রামিক তাদের এই সম্পদ রক্ষা করতে শিখবে ও পৃথিবীকে শেখাবে। তাদের অক্ষর পরিচয় নেই, কিন্তু তিন হাজার বছরের ঐতিহ্য আছে। মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসীরা তাদের পনেরো আনা প্রস্তুত করেছেন, —বাকী এক আনা আমাদের কাজ। আমরা তাদের এমন করে সংঘবদ্ধ করব যে প্রদেশ কিংবা ভাষা, ধর্মবিশ্বাস কিংবা আর্থিক তারতম্য, তাদের মাঝখানে ব্যবধান রচবে না, ঘরোয়া বিভেদ তারা ঘরোয়া ভাবেই মেটাবে।

অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে ভারত, ভারতের সভ্যতা, ভারতের ধর্ম। নীতির জন্যে ব্যক্তিবিশেষ সর্বস্ব দিতে পারে, জাতিবিশেষ পারবে না? তবে কি আমরা শত্রুর আক্রমণের চাপে নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব? দেশসুদ্ধ লোক সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে সত্যিকার পরাধীন হবে, কারণ মিথ্যার অধীন হবে। মানুষের সম্পর্ক যে হিংসার সম্পর্ক, হত্যার সম্পর্ক, এর মতো মিথ্যা কী আছে?

৬

আণ্ট এলেনর ডেকেছিলেন ডাচ আর্ট এগজিবিশন দেখতে। সুধীর সঙ্গে উজ্জয়িনীও ছিল।

ওলন্দাজ চিত্রকরদের যত প্রসিদ্ধ কীর্তি সবগুলির একত্র সমাবেশ এই বোধ হয় প্রথম। যারা ওলন্দাজ চিত্রকলার সমঝদার তাদের কাছে এই প্রদর্শনী অশেষ মূল্যবান। নানা দেশের নানা চিত্রশালায় ঘোরাফেরা করতে হবে না, একটি তীর্থে ই সকল তীর্থের ফল।

রুবেন্‌স্‌, রেমব্রাণ্ট, ভান গখ প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন "মাস্টার"দের পরিচিত ও অপরিচিত শত শত ছবি এক এক করে দেখাতে দেখাতে আণ্ট এলেনর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "এক দিনে কি সব দেখা সম্ভব? আসতে হয় আরো কয়েক দিন।"

উজ্জয়িনীর হাতে দিন বেশী ছিল না। সে বলল, "আসতে হলে সুধীদা আসবে। আমাকে মাপ করবেন, আণ্টি।"

"কেন, তোমার ডাচ আর্ট ভালো লাগে না? আমি ভেবেছিলুম তোমার আগ্রহ আছে।"

"তা নয়।" উজ্জয়িনী দ্বিধাভরে বলল, "আপনার সঙ্গে হয়তো বেশী বার দেখা হবে না।"

তিনি বিস্মিত হলেন। "কী মনে করে ওকথা বললে?"

"বলছিলুম আমি হয়তো বেশী দিন এ দেশে নেই।"

তিনি সকলের সামনে কিছু বললেন না, পাশের রাস্তায় একটা রেস্টোরাণ্ট ছিল,

সেখানে ধরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। বললেন, "দেশে ফিরে যাওয়া স্থির করলে ?"

"না। আমেরিকা যাচ্ছি।"

"আমেরিকা!" তিনি চমকে উঠলেন, "আমেরিকা যাবে কী করতে ? এ দেশে তোমার কিসের অস্থবিধা ?"

তিনি ভেবেছিলেন হাসপাতালে নার্স হওয়া কিংবা তেমনি কোনো কল্পনা নিয়ে উজ্জয়িনী আমেরিকা যাত্রা করছে। সেটা ইংলণ্ডের উপর অনাস্থাসূচক। কেন, ইংলণ্ডের কী এমন অপরাধ!

"অস্থবিধা কিছুমাত্র নয়, আণ্টি। আপনারা থাকতে অস্থবিধা কিসের ? দেশ দেখতে চাই বলেই যাচ্ছি। একজন সাথী পাওয়া গেছে।" উজ্জয়িনী নাম করল।

আণ্ট এলেনর খুশি হলেন না। তবে আশ্বস্ত হলেন। "দেশ দেখতে যাচ্ছ। তাই বলতে হয়। তা মন্দ নয়, আমার ক্ষমতা থাকলে আমিও যেতুম।"

"আপনিও আস্থন না। তা হলে তো অর্ধেক ভাবনা যায়। আমরা দুটি ভারতের মেয়ে না জানি কোন মুশকিলে পড়ব। হয়তো গ্যাংস্টার কি আর কিছু। আচ্ছা, আমেরিকার গ্যাংস্টারদের পাল্লায় পড়লে কি লাখ টাকা পণ দিতে হয় ?"

আণ্ট এলেনর হেসে বললেন, "কী জানি, বাপু। কোনো দিন তাদের তল্লাট মাড়াইনি। সাবধানে চলাফেরা কোরো। আমার দু'চার জন বন্ধু আছেন সে দেশে। তাঁদের ঠিকানা দেব।"

সুধী অন্যমনস্ক ছিল, তাঁদের দুজনের কথায় যোগ দিচ্ছিল না। তার কানে বাজছিল জন ব্লিজার্ডের প্রশ্ন, "চক্রবর্তী, ওটা কি প্র্যাকটিকল ?" যদি প্র্যাকটিকল না হয় তবে প্র্যাকটিকল করতে হবে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না! ও ছাড়া অন্য পন্থা নেই। ইউ-রোপের পন্থা চটকদার। যারা ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে তাদের পক্ষে ইউরোপের রণক্ষেত্র অভিজ্ঞতার আকর। আকাশে উড়তে, জলে ডুবতে, পরিখায় গা ঢাকা দিতে, সাঁজোয়া গাড়ীতে দুড়দাড় করে সব মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে যেতে, কামান দাগতে, মেসিন গান চালাতে, ইত্যাদি ইত্যাদি করতে যাদের প্রচণ্ড কৌতূহল তাদের জন্যে ইউরোপের পন্থা। আর যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে, নড়বে না, টলবে না, ভাগবে না, যারা বুক পেতে দিয়ে গুলি খাবে, দমবে না, হটবে না, ছুটবে না, যারা মার গাল অপমান বন্ধন অনশন সব সহ্য করবে, রাগবে না, কাঁদবে না, নালিশ করবে না, সেই নীতিনিষ্ঠ সেবাকর্মীদের জন্য ভারতের পন্থা।

"তারপর ? আমেরিকায় ক' সপ্তাহ থাকবে, জিনী ? এ দেশে ফিরবে তো ?"

"জানিনে, আমার সাথীর উপর নির্ভর করছে আমার প্ল্যান।"

"বুঝেছি। তবু আশা করি এ দেশেই ফিরবে।"

"ললিতা রায়ের ইচ্ছা জাপানে যেতে, সেখানে কিছু দিন কাটিয়ে চীনদেশে ও তার পর ভারতে।"

"জাপান। চীন।" আণ্ট এলেনর উৎসাহিত হলেন। "আমি সেদিন জাপান সম্বন্ধে একখানা চমৎকার বই পড়ছিলুম, আমারও ইচ্ছা করে জাপান যেতে। আর চীন? চীন যেতে কে না চায়? আমার এক কাকা সারা জীবন মাঞ্চুরিয়ায় ছিলেন, সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন।"

"তা হলে আর ভাবনা কী? তাঁর কাছে পরিচয়লিপি পাব।" উজ্জয়িনী তার নোট বুকে লিখে রাখল।

সুধী ভাবছিল, কিন্তু ওটা কি প্র্যাকটিকল? বাস্তবিক ওর বেশী নজীর নেই। যা আছে তা পুরাণে ইতিহাসে। দেশবাসীর বর্তমান জীবনে ওর উদাহরণ স্বল্প। জেলে যেতে অনেকেই পারবে, সে শিক্ষা তাদের হয়েছে, কিন্তু মার খেতে অগ্রসর ক' জন হবে, তা বলা শক্ত। মানুষ খুন করে ফাঁসি কাঠে ঝোলার দুঃসাহস দুর্লভ নয়, পুলিশের সঙ্গে পিস্তলের লড়াই কয়েক বার ঘটেছে। কিন্তু খালি হাতে মার খাওয়া, বিনা দ্বন্দ্বে প্রাণ দেওয়া, এই শিক্ষার অভাব আছে, এর পরীক্ষা দরকার।

"তা হলে তুমি আর এ দেশে ফিরবে না, চীন থেকে ভারতে রওনা হবে?" আণ্ট এলেনর দুঃখিত হলেন।

"কী জানি, এখনো স্থির করা হয়নি।" উজ্জয়িনীর মনের কোণে তখনো একটুখানি আশা ছিল যে আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এলে যদি বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

"ভারত। ভারত কি কোনো দিন দেখব না? কী বল, জিনী? আমাকে তোমাদের দেশ দেখাবে?"

"নিশ্চয়। আপনি কবে আসবেন, বলুন।" উজ্জয়িনী আহ্লাদিত হল। "আমার আমন্ত্রণ রইল, আপনি গ্রহণ করলে হয়।"

আণ্ট এলেনর কী যেন ভাবলেন। তারপর সুধীর দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার মুখে কথা নেই যে? ডাচ আর্ট তোমার কেমন লাগল?"

"তা কি দু'কথায় ব্যক্ত করা যায়। তা ছাড়া আমি তো আর্টের জহুরী নই, আণ্ট। তবে আনাড়ি হিসাবে এই মন্তব্য করতে পারি যে ওলন্দাজদের রসবোধ আছে। যত রাজ্যের ফলমূলের ছবি এঁকেছে। দেখলে জিবে জল আসে। হায়, সেসব ফল শুধু ছবিতেই।"

"তোমার মতো পেটুক", উজ্জয়িনী অভিমত জানাল, "জন্মে দেখিনি। আমি চলে গেলে তোমার যে কী দশা হবে তাই ভাবি। শেষে কি তোমার পেটুকপনার জন্যে আমার যাওয়া বন্ধ হবে?"

“তুই চলে গেলে আমার কপালে একাদশী।” সুধী সখেদে বলল। “তখন ফলমূল খেয়েই আমায় পেট ভরাতে হবে।”

“আহা! মরে যাই!” উজ্জয়িনী আফশোষ জানাল। “এবার তোমাকে একটি বিয়ে করতে হবে, সুধীদা। আর দেরি করো না, বুঝলে?”

আণ্ট এলেনর বাংলা বোঝেন না, সেই ভরসা। তবু সুধী ইসারায় বলল, চুপ চুপ চুপ।

“হাঁ, ডাচ আর্টের মধ্যে ওরও স্থান আছে।” আণ্ট এলেনর বললেন। “কিন্তু আলো-ছায়ার খেলায় রেমব্রাণ্টের দোসর নেই। তোমার কী মনে হয়?”

সুধী এ বিষয়ে চিন্তা করেনি, করতে প্রস্তুত ছিল না। বলল, “তা বোধ হয় সত্য।”

“আমি কিন্তু”, জিনী কণ্ঠক্ষেপ করল, “ইটালিয়ান আর্টের পক্ষপাতী। আসবার সময় ইটালীর চিত্রশালায় যা দেখেছি তা এর চেয়ে হৃদয়গ্রাহী। এর মধ্যে আমি হৃদয়ের উত্তাপ পাচ্ছিনে, শীতের দেশের কনকনে ঠাণ্ডায় যেন আলো আর ছায়া জমজমাট।”

আন্টি এ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন, তাঁর মুখের ভাব থেকে মালুম হল। আত্মসংবরণ করে বললেন, “থাক, তুলনা করতে হবে না।”

তিনি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। জানতে চাইলেন জিনী দেশে ফিরে কী করবে। হাস-পাতালের নার্স—

উজ্জয়িনী তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, “না, ওসব নয়। আমি চাই য়্যাকশন। আমি চাই আপনার দেশের সাফ্রেজেট মেয়েদের মতো দোর জানালা ভাঙ্‌তে, ঘোড়ার সামনে লাফাতে। আপনিও তো শুনি ঐ আন্দোলনে ছিলেন। জেলে গেছলেন নিশ্চয়?”

আন্টি আশ্চর্য হয়েছিলেন, পরে হেসে বললেন, “পাগলামি!”

৭

আণ্ট এলেনরের স্মৃতি বাইশ তেইশ বছর পেছিয়ে গেল। ইংলণ্ডের মেয়েরা আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নতশির হয়েছিল, আর বইতে না পেরে অবশেষে স্থির করল সংগ্রামশীল হবে। প্রত্যেক সভায় তারা বক্তাকে বাধা দেয়, জিজ্ঞাসা করে মেয়ে-দের জন্যে কী করছেন? সদলবলে মার্চ করে বেড়ায়, পার্লামেণ্টে বহু স্বাক্ষরিত দরখাস্ত দাখিল করে। পিকেটিং শুরু হয়। অনেক মেয়ে কারাবরণ করে। জেলখানায় গিয়ে অনশন ধর্মঘট করে অনেকে। তাদের জন্যে এক মজার আইন হয়, তাকে বলে “ইদুর বেড়াল” আইন। অনশন করলেই ছেড়ে দেয়, তারপর অনশন ছাড়লেই ধরে নিয়ে যায়। দরজা জানালা ভাঙাও মেয়েদের কীর্তির নমুনা।

প্রায় আট বছর কাল এইসব করে একটুও সুফল হল না। ঠিক এই সময়টাতেই স্বদেশী আন্দোলন করে বাংলার লোক বঙ্গভঙ্গ রহিত করায়। কিন্তু জানালা ভঙ্গ করেও ইংলণ্ডের মেয়েরা ভোটের অধিকার পায় না। মেয়েরাও যেমন নাছোড়বান্দা সেকালের লিবারল গবর্ণমেণ্টও তেমনি। নারীবিদ্রোহের পরিণাম কী হতো কে জানে, হয়তো মারামারি চলত। সহসা যুদ্ধ বাধল জার্মানীর সঙ্গে। মেয়েরা দেশের কাজে মন দিল। সেবায় শুশ্রূষায় পুরুষালি পেশায় নানাভাবে যুদ্ধের সাহায্য করে তারা জনমতের সমর্থন পায়। তখন গবর্ণমেণ্ট তাদের পুরস্কারস্বরূপ ভোটের অধিকার দেয়—সবাইকে নয়, ত্রিশের বেশী যাদের বয়স তাদেরকেই। যখন দেখা গেল মেয়েরা একটা আলাদা দল করে পার্লামেণ্টে ঢুকছে না, পুরুষদের দলকেই ভোট দিচ্ছে, তখন জনমত তাদের আরো অনুকূল হয়। মহাযুদ্ধের দশ বছর পরে সাবালিকাদের সবাইকে সেই অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয় যার জন্যে পঞ্চাশ বছর ধরে এত আন্দোলন।

"না, আমি ঘোড়ার সামনে পড়িনি, কিন্তু জেলে গেছি।" আণ্ট এলেনর হাসলেন। "গেছি আর এসেছি, এসেছি আর গেছি, সবশুদ্ধ চার বার। কিন্তু কোনো বার এক সপ্তাহের অধিক নয়।"

"বাঃ। তা হলে তো আপনিও দাগী।" জিনী ফুর্তি করে বলল।

"তুমি কিন্তু ওসব গোলমালের মধ্যে যেও না, জিনী।" তিনি তর্জনী আস্ফালন করলেন। "তোমার জানা উচিত ভোটের অধিকার পেয়ে এ দেশের মেয়েরা স্বর্গ হাতে পায়নি। এখন আমার অনুতাপ হয়, কেন বৃথা উত্তেজিত হয়েছি, কেন এত শক্তি ক্ষয় করেছি।"

"আমি কি ছাই ভোটের জন্যে ওসব করতে যাচ্ছি!" জিনী কেশ দুলিয়ে বলল। "না, আণ্টি! আমার দেশ অনন্তকাল অপেক্ষা করে অধীর হয়েছে যার জন্যে তা আমাদের জন্মগত স্বাধীনতা। আমিও স্বাধীনতার সৈনিক হতে অধীর। নারীবাহিনী গঠন করব আমি, এই আমার স্বপ্ন। প্রমাণ করব আমি, স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধু পুরুষের নয়, নারীরও। স্বাধীনতা আমার মতো শত সহস্র নারীরও।"

উজ্জয়িনী যে এই লাইনে চিন্তা করছে তা এলেনর দূরের কথা, সুধীও টের পায়নি। সুধী অবাক হল।

"জিনী! জিনী!" বলে উঠলেন আণ্ট এলেনর। "তুমি যে কী বলছ তুমি কি তার মানে বোঝ? কে তোমাকে ক্ষেপিয়েছে?"

"কেউ না। খুব বুঝি।" জিনী স্পর্ধাভরে বলল। "আমি আমার রাস্তা বেশ চিনি।"

"শুনছ, সুধী? পাগলীর কথা শুনছ?"

"শুনছি, আণ্টি।" সুধী এইটুকু বলল।

"মাই ডিয়ার গার্ল।" প্রৌঢ়া সস্নেহে বললেন, "তুমি ওসব কিছু করবে না, করতে পাবে না। আমি থাকতে তোমার ওসব করা হবে না। আমি তোমার জন্যে এ দেশে একটা বন্দোবস্ত করব। তুমি আমেরিকা যাচ্ছ, যাও, কিন্তু এ দেশে এসো। আমরা এক সঙ্গে পাহাড় চড়তে বেরব। যথেষ্ট বিপদ আছে ওতে, তোমার তাতেই যথেষ্ট স্যাটিসফ্যাকশন হবে।"

উজ্জয়িনী ঘাড় নাড়ল। "উঁহু। নারীবাহিনীর অগ্রগামিনী হব, সেই আমার কাজ। মেয়েদের সংগঠন দরকার, ওরা হাঁটতেই জানে না। ওদের নিয়ে হাঁটি আগে, পাহাড়ে চড়ব দু'দিন পরে। আপনি দেখবেন মাউণ্ট এভারেস্ট আরোহণ ভারতের মেয়েরাই করবে।"

আণ্ট এলেনরের চক্ষু স্থির। তিনি সুধীর দিকে তাকালেন। সুধী বলল, "নারী-বাহিনীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোদের প্রোগ্রাম আশা করি জানালা ভাঙা নয়।"

"না, জানালা ভাঙা নয়। শিকল ভাঙা। বাধা দিলে হাত পা ভাঙা। বন্দী করলে রীতিমতো দাঙ্গা।"

সুধীরও চক্ষু স্থির। বাপ রে, কী দুরন্ত মেয়ে! একে পোষ মানাবার এত চেষ্টার পর বলে কিনা, রীতিমতো দাঙ্গা! কার কাছে এসব আইডিয়া পায়? দে সরকার?

আণ্ট এলেনর তখনো বিমূঢ়ভাবে অবলোকন করছিলেন। সুধীকে ইশারায় জানালেন, "ওঠা যাক।"

পথে যেতে বললেন, "সুধী, ওর স্বামীর সঙ্গে ওর বোঝাপড়া করাতে হবে। এ কাজ তোমার। বাদলের খোঁজ করতে লেগে যাও। নইলে ও মেয়ে দিন দিন ভায়োলেণ্ট হতে থাকবে।" সুধীকে একান্তে বললেন। জিনী শুনতে পেল না।

সুধীও তাই ভাবছিল। যেমন করে হোক বাদলের সঙ্গে ওর মোকাবিলা দরকার। তারপর যা হয় হবে।

এর দিন দুই পরে হঠাৎ দে সরকারের আবির্ভাব। সুধীর বাসায় গিয়ে সটান হাজির। তখন সুধী মিউজিয়ম থেকে সবে ফিরেছে, একটু পরে উজ্জয়িনীদের ওখানে যাবে।

"চক্রবর্তী," দে সরকার বলে, "কী খাওয়াবে, বল। সুখবর আছে।"

"কী খাবে, বল।" সুধী আসন দেয়।

"খাবার কথা যদি বলি তবে পুঁথি বেড়ে যায়। যে কষ্টে দিন কাটছে আর বলে কী হবে। একটু যত্ন, একটু আদর, এ জীবনে জুটবে না। কেউ একবার সেধে বলবে না যে, এটা খেয়ে দেখ, আমি তোমার জন্যে রেঁধেছি।"

সুধীর টেবলের একধারে আঙুর ছিল। দে সরকার তুলে নিয়ে বলে, "খেতে পারি?"

"নিশ্চয়। আমি সেধে বলছি, এটা খেয়ে দেখ। আমি তোমার জন্যে আরো কিছু বের করছি।"

"আহা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ক্ষিদে যা পেয়েছে, কী বলব। বাদলটা এমন অভদ্র—সে এক পেয়ালা চা অফার করল না।"

বাদল! বাদলের নাম শুনে সুধীর প্রাণে যে উল্লাস তা সুধী সংবরণ করল। সে সরকারকে রুটি মাখন মধু খেতে দিয়ে তার খাওয়া দেখতে বসল। নিজেও একটা আঙুর ছিঁড়ে নিল।

"ও কী! তুমি কিছু খাবে না?"

"এই যে খাচ্ছি। এর বেশী এখন নয়। উজ্জয়িনীর ওখানে হবে।"

"হাঁ। অনেক দিন ওখানে যাইনি, আজ তোমার সঙ্গে যাব। খবরটা শোনাবার মতো। এই খবরটার জন্যে আমি কোথায় না ঘুরেছি, কাকে না ধরেছি। শেষকালে পেলুম কিনা মিসেস গুপ্তর কাছেই, যদিও তিনি নিজেই জানতেন না, এখনো জানেন না।"

"সে কী রকম?"

"আছে রহস্য। সব কি একদিনে প্রকাশ করা ঠিক হবে? বলব ক্রমে ক্রমে। আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে মিসেস গুপ্তর কাছে এমন একটি লোক আনাগোনা করে যে বাদলের সঙ্গে থাকে। এমন একখানা কাগজ মিসেস গুপ্তর ওখানে ফেলে গেছল যাতে বাদলেরও নাম ছিল। কাগজখানা দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব করে, কিন্তু বাদলের ঠিকানা ফাঁস করে না। যেন বাদল বাস করে চন্দ্রলোকে। আমি সেই চন্দ্রলোক আবিষ্কার করেছি।"

সুধী প্রশ্ন করল না, কে সেই লোক, কোথায় সেই চন্দ্রলোক। তবে ঠিকানাটা তার জানতে ইচ্ছা ছিল।

"বাদলের সঙ্গে দেখা করে আজ আমি শান্ত হয়েছি। আজ আমার সুনিদ্রা।"

সুধী মনে মনে বলল, আমারও।

বাস্তবিক বাদলের সন্ধান পেয়ে, তার আনন্দের সীমা ছিল না। সে যে বেঁচে আছে এই অনেক। সে যে লণ্ডনেই আছে এও কম নয়। ঠিকানাটা পেলে কালকেই তার সঙ্গে দেখা হবে, এই নিশ্চয়তা সুধীকে সংযত করেছিল।

"চল, উজ্জয়িনীর কাছে যাই। ও বেচারি শুনে সুখী হবে।" সুধী উঠল।

উজ্জয়িনীকে সুখী করতে দে সরকার উদ্গ্রীব ছিল না, উদ্গ্রীব ছিল তাকে জেসির কথা বলে নির্মোহ করতে। চলল সুধীর সঙ্গে।

উজ্জয়িনীর মা সুজাতা গুপ্ত মেয়ের আমেরিকা যাত্রা সমর্থন করেননি। সেজন্যে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। অবশ্য মনোমালিন্যর সেই যে একমাত্র কারণ তা নয়। সব কথা খুলে বলতে গেলে মহাভারত হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মেয়ের চালচলন মা পছন্দ করতেন না, মায়ের চালচলনও মেয়ের অপছন্দ! মেয়ের মনোমতো ভাব এই যে একজন শোকাকুলা বিধবার পক্ষে যেমন আচরণ শোভা পায় মায়ের আচরণ তেমন নয়। মায়ের আপত্তি এই যে একজন বিবাহিতা তরুণীর পক্ষে এতগুলি যুবকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা নিরাপদ নয়। তবু তো মায়ের হেপাজতে আছে। আমেরিকা গেলে যে কার পাল্লায় পড়বে কে বলতে পারে।

"না, বেবী, তোমার আমেরিকা যাওয়া হতে পারে না।"

"কেন, মা? তোমার এমন কী অসুবিধা হবে?"

"আমার অসুবিধার কথা হচ্ছে না। লোকে কী ভাববে? তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ওসব বোঝো না।"

"লোকে যদি নিজের চরকায় তেল না দেয় তবে আমার কী আসে যায়! কই, আমি তো লোকের জন্য ভাবছিনে।"

"আমার কথা শোন, আমার বয়সের হয়তো দাম নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার দাম তো আছে। আমি হলে তোমার বয়সে আমেরিকা যেতুম না। এখানে তোমার স্বামী থাকে।"

"ননসেন্স। স্বামী থাকেন কি না তার প্রমাণ নেই, যদি থাকেন তো তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কেন তবে আমি এখানে আটকা পড়ব? কেনই বা লোকে আমাকে নজরবন্দী করবে?"

"ছেলেমানুষের ওসব জেনে কাজ নেই। যদিও তুমি ললিতা রায়ের সঙ্গে যাচ্ছো তবু সাফাই দিয়ে মরতে হবে আমাকেই। যার স্বামী থাকে লণ্ডনে সে মেয়ে কেন নিউ ইয়র্ক যায়, হলিউডে তার কী কাজ, তবে কি সে রেনো গেছে ডাইভোর্স কিনতে? ছি ছি, কেলেঙ্কারির একশেষ।"

"যাদের এত ছোট মন তাদের সঙ্গে সংস্রব রাখবে কেন? এমন প্রশ্ন অসভ্যরাই করে।"

"প্রশ্ন করবে না, বলাবলি করবে কানে কানে। সেটা আরো খারাপ। আমাদের বন্ধুবান্ধবরা কী মনে করবেন? লণ্ডনে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? তবে কি আমাকেও এদেশ ছাড়তে হবে?"

"না, মা। তুমি লণ্ডন আলো করে থাক। আমি চললুম। আমাকে লোকনিন্দার

ভয় দেখানো বৃথা। আমি গ্রাহ্য করিনে কে কী ভাবে, কে কী বলে। ছোট লোক ছোট কথা ভাববেই, বলবেই।"

সুজাতা শুধু ঠিক বুঝলেন কাকে ছোট লোক বলে অগ্রাহ্য করা হল। উক্তিটা তাঁর মর্ম-ভেদ করল। তিনি মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন। মনে মনে বললেন, আমেরিকা গেলে আপদ যায়। এখানেই বা কেলেঙ্কারির কী বাকী আছে। স্বামীর সঙ্গে থাকে না কেন এই প্রশ্ন মুখে মুখে ঘুরছে। আমি এর জবাবদিহি করছি, ওর শ্বশুরের নিষেধ। ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে।

উজ্জয়িনী আমেরিকা যাচ্ছে, সংবাদটা আপনি রটেছিল, বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। তার আলাপীরা তাকে আক্ষেপ জানিয়েছিল। আশা করেছিল তার মতি পরিবর্তন হবে। সুধী নীরবে শুনেছিল, শুনে নীরব ছিল। দে সরকার বিশ্বাস করেনি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুধী ও দে সরকার উজ্জয়িনীদের ওখানে গিয়ে দেখল ললিতার সঙ্গে গল্প করছে জিনী। দে সরকার দুজনের উদ্দেশে দুটি সেলাম ঠুকে দারোয়ানের মতো দাঁড়াল। জিনী বলল, "বসুন।"

ললিতা বললেন, "আসুন, আমাদের চক্রান্তে যোগ দিন।"

তাদের কাছে বিস্তর গাইড বুক, ম্যাপ, টাইম টেবল, বিজ্ঞাপনী। কোথায় কোথায় যাবে, কখন পৌঁছাবে, ক'দিন থামবে, কখন রওনা হবে, এই সব মিলিয়ে প্রোগ্রাম তৈরী হচ্ছিল। ছেঁড়া কাগজের স্তূপ থেকে অনুমান হয়, এই প্রোগ্রামটি প্রথম নয়, এর পরিণাম আসন্ন।

"দূর, অত প্ল্যান করে কী হবে? যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে দুই পা যাবে। আমরা আমাদের পদানুসরণ করব।" এই বলে উজ্জয়িনী টান মেরে প্রোগ্রাম কেড়ে নিল ও কুটি কুটি করল।

ললিতা সুধীর দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কি এডিনবরা গেছেন, মিস্টার চক্রবর্তী?"

"না, মিসেস রায়। কিন্তু আমাকে আপনি পর করে দিচ্ছেন কেন? আমি মিস্টার চক্রবর্তী নই, নিতান্তই বাঙালী। আমাকে সুধী বলে ডাকবেন।"

"হাঁ। সুধীদাকে মিস্টার বললে চটে। দেখছেন না কেমন আপাদমস্তক স্বদেশী।" উজ্জয়িনী হেসে বলল। "আর এ ভদ্রলোককে বাবু বললে রাগ করেন। না, মিস্টার দে সরকার?"

দে সরকার এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার উপলক্ষ্য পেয়ে বাগ্‌বিস্তার করল। "আমার নাম কুমার, আমাকে আপনি কুমার বলে ডাকলে সম্মানিত হব। কেউ কেউ ঠাওরায় আমি রাজকুমার। আপনাকে সত্য করে বলছি আমি পৈত্রিক সিংহাসনের ভরসা

রাখিনে। তবে আরেক রকম কুমার আছে, চিরকুমার। আমি তাই।"

"ষাট, ষাট। এখনো আপনার বিয়ের বয়স হয়নি। কোন দুঃখে চিরকুমার হতে যাবেন?" ললিতা আশ্বাস দিলেন।

"ভালো কথা।" দে সরকার আর দেরি করতে পারছিল না। বলে উঠল ললিতার কথা শেষ হতে না হতে, "সুখবর আছে।"

"সুখবর?" উজ্জয়িনী কৌতূহলের সহিত বলল, "কী খবর?"

"বাদল", দে সরকার টিপে টিপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছিপি খুলল, "এই শহরেই আছে।"

উজ্জয়িনীর গালে রক্তিম আভা। সে কৌতূহল দমন করে নয়ন নত করল। ছেঁড়া প্রোগ্রামগুলোর ওপর তার নজর পড়ল।

ললিতা বাদল ও তার খেয়াল সম্বন্ধে যৎসামান্য শুনেছিলেন। সে যে এই শহরেই থাকে অথচ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে না, এতটা জানতেন না। বললেন, "তাই নাকি?"

"হাঁ, দিদি।" ললিতাকে দিদি সম্বোধন দে সরকারের এই প্রথম। "অনেক কষ্টে তাকে আবিষ্কার করেছি। বেশী দিন আগে নয়, আজকেই।"

উজ্জয়িনী ছেঁড়া প্রোগ্রাম জোড়া দেবার প্রয়াসে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিল, দে সরকারের কথা শুনছিল কি না সেই জানে।

"খাসা আছে বাদল। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়? শাস্ত্রে বলে পুরুষস্য ভাগ্যং। যেখানে যায় সেখানে দুটি একটি ভক্ত। চক্রবর্তী, তুমি তো সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী। বল দেখি, ভক্তের স্ত্রীলিঙ্গ কি ভক্তা?"

উজ্জয়িনীর মর্মে যেন সূঁচ বিঁধল।

দে সরকার আরো কী বলতে যাচ্ছিল, সুধী তাকে বাধা দিয়ে বলল, "বাদলের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো, আমি কাল তার ওখানে যাব। বাদল কি খুব ব্যস্ত আছে?"

দে সরকার সুধীর দৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরেছিল সুধীর প্রশ্রয় পাওয়া যাবে না। থতমত খেয়ে বলল, "হাঁ, কী বলছিলে, ব্যস্ত? হাঁ, ব্যস্ত আছে। না, তার মাথা ধরেছিল।"

"মাথা ধরেছিল?"

"তাই শুনলুম। না, তোমার ব্যস্ত হবার মতো নয়! যত রাজ্যের বই পড়ছে আর রিভিউ লিখছে। ইস্তাহার জারি করছে।"

"ইস্তাহার!"

"জান না বুঝি? তোমাকে বলতে ভুলে গেছি বাসাটা কমিউনিস্টদের আড্ডা। সেখানে যত কমিউনিস্ট থাকে তত বোধ করি মস্কোতে নেই। বিরাট ব্যাপার। রৈ রৈ কাণ্ড। বাসায় ঢুকতে না ঢুকতে একজন কমরেড এসে হাতে একখানা পুস্তিকা গুঁজে

দিলেন, দিয়ে ছ' পেনী আদায় করলেন। শিরোনামা, 'কেন আমি কমিউনিস্ট হলুম।' পকেটে আছে ওখানা। আপনি পড়তে চান, দিদি?"

ললিতা কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানতেন যে ওরা বদ্ লোক। বাদল যে ওদের আড্ডায় জুটেছে এর থেকে মনে হয় বাদল গোল্লায় গেছে। ভক্তের স্ত্রীলিঙ্গ যদি সেখানে থাকে তবে তো তার মার্জনা নেই। বেচারি উজ্জয়িনী!

"তারপর তিন জন কমরেড এসে তিনখানি ইস্তাহার ধরিয়ে দিলেন। ভাবলুম এরও দাম আছে! পকেট থেকে পার্স বের করলুম। তাঁরা বললেন, না, না, কিছু দিতে হবে না, যদি আস্থা জন্মায় তবে যেন কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিই। শুনে আশ্বস্ত হলুম।"

উজ্জয়িনী কাগজ ছিঁড়ছিল। কী ভাবছিল সে জানে। সহসা সচেতন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কেউ কিছু খাবেন? সুধীদা, তোমার কী ফরমাস? আর মিস্টার দে সরকার, আপনার?"

৯

ব্যাকরণের কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে দে সরকার যে ক্ষতি করেছিল তাই করেই নিরস্ত হল না। পরে এক সময় কমরেড জেসির নাম করল।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন অভ্যাগত ছিলেন সেই ক'জন, আর কেউ না। ললিতা রায় উজ্জয়িনীর মনের অবস্থা অনুমান করে তাকে রেহাই দিলেন। বিভিন্ন কোম্পানীর সেলিং লিস্ট নিয়ে দে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করলেন। দে সরকার পরামর্শ দিল ফরাসী জাহাজ ধরতে। ফরাসীরা রাঁধে ভালো। আর জাহাজে চড়ার অর্ধেক সুখ তো ভোজনে। আর একটা কথা দে সরকার চেপে গেল। ফরাসীরা পানও করায়, ভালো করেই করায় যদি উপরি পায়।

ললিতার মত কিন্তু অন্য রকম। তিনি চান এমন এক জাহাজ যাতে আমেরিকান সহযাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সব চেয়ে বেশী। যাতে এক হিসাবে আমেরিকা ভ্রমণের ফল হয়।

উজ্জয়িনী প্রায় মৌন থাকল। সুধী ভাবতে লাগল তার সঙ্গে তার স্বামীর বোঝাপড়ার উপায়। এই দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি বোঝাপড়া না হয় তবে উজ্জয়িনী চলে যাবে আমেরিকায়, বাদল পড়ে থাকবে ইংলণ্ডে। পরে এক দিন ভারতবর্ষে ফিরে ইনি যদি সত্যি সত্যি জেলে যান আর উনি যদি ব্যারিস্টার কি সিভিলিয়ান হন তা হলে সেটা হবে ট্র্যাজি-কমেডী।

বোঝাপড়ার উপায় কী? বাদল ঠিক কী চায়? কী হলে সে খুশি হবে? এটা কি তার আন্তরিক অভিপ্রায় যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক থাকবেই না? তেমন সম্পর্ক

কি সে অন্তের সঙ্গে পাতাবে ? কিংবা পাতিয়েছে ? সুধীর ভালো লাগে না ভাবতে যে বাদল কোনো রকম অসামাজিক কাজ করবে বা করছে। তেমন স্বাধীনতা যদি সে দাবি করে, প্রয়োগ করে, তবে উজ্জয়িনী কত দিন ক্ষমা করবে, প্রতীক্ষা করবে ? তার কি আত্মসম্মান নেই, কেমন করে সে তেমন স্বামীকে স্বামীর অধিকার দেবে ? এখন যদি বোঝাপড়া না হয় তবে পরে হবার সম্ভাবনা কম, তত দিনে সন্দেহ আর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে পথরোধ করবে। ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীর যদি পদস্খলন হয় তা হলে তাদের মিলনের আশা চিরপরাহত।

বোঝাপড়া হোক বা না হোক বাদলের সঙ্গে উজ্জয়িনীর দেখা হওয়া দরকার। শেষ দেখা হিসাবেও দরকার আছে।

পরের দিন মিউজিয়মে যাওয়া স্থগিত রেখে সুধী ফিন্‌স্‌বেরী চলল। বাদলকে পেতে সময় লাগল না। তাকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে সুধী উজ্জয়িনীর কথা তুলল। দিন স্থির হল বৃহস্পতিবার।

তারপর সুধী শুধাল, "তোর মাথা ধরা কেমন আছে ?"

"আমার মাথা", বাদল নালিশ করল, "আমাকে অপদস্থ করেছে। তার জন্তে আমি দস্তুরমত লজ্জিত। যখনি কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনি তার একটা না একটা অসুখ। মাথাব্যথা, মাথাধরা, মাথা ভোঁ ভোঁ করা, মাথা ঘুরে পড়া। এসব যার হয় তার কি কোনো দিন প্রথম শ্রেণীর ভাবুক হবার জো আছে ? আমি বলেই লেগে আছি, অন্ত কেউ হলে ইস্তফা দিত।"

"ঘুম কেমন হয় ?"

"যেমন দেখেছিলে। এ জন্মে আমার ঘুমের দুঃখ ঘুচল না। সুধীদা, যদি একটা রাত একটু তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমাতে পারতুম তা হলে আমার মাথার অসুখ অর্ধেক সারত। কিন্তু ঘুমও হবে না, মাথাও সারবে না, বড় বড় সমস্যার সমাধানও হবে না, কেউ জানবেও না যে বাদল সেন নামে একজন প্রবলপ্রতাপ চিন্তাবীর আছে। আমি ব্যর্থ হলুম, সুধীদা !"

"কতই বা তোর বয়স। এই বয়সে বিশ্বের বোঝা মাথায় করতে যাস কেন ?" সুধী তাকে বকল। "যার যা সামর্থ্য তাই যদি সে না পারে তবেই ব্যর্থতার কথা ওঠে। বাদল, মানুষকে তার সামর্থ্যের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। তাতে গ্লানি নেই। বরং সেইখানে বিজ্ঞতা।"

"কী জানি !" বাদল মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল। "আমার কত কী লিখতে, কত কী বলতে সাধ যায় ! আমার করার আছে কত কী। যখন দেখি কিছুই হচ্ছে না, মাথা ধরে রয়েছে, তখন নিজের উপর রাগ হয়। ইচ্ছা করে গলায় দড়ি দিতে।"

"চুপ, চুপ, অমন কথা মুখে আনতে নেই।" সুধী শাসন করে।

"সত্যি বলছি, সুধীদা, যখন দেখি দুনিয়ার দিকে দিকে বেবন্দোবস্ত, কোনো কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, কেউ যে তা নিয়ে মাথা ঘামায় তাও মালুম হচ্ছে না, যে যার খুঁটি আগলাতে ঘাঁটি আগলাতে ব্যস্ত, তখন আমার চোখে জল আসে। কেন আমি এত ক্ষীণকায়, এত দুর্বল, কেন আমার ঘুম হয় না, মাথা ধরে, কেন আমি অকর্মণ্য, অক্ষম, কেন আমি এ দৃশ্য দেখতে বাধ্য হই, যদি প্রতিকার না করতে পারি। জগতের অন্ন ধ্বংস করি কেন, যদি জগতের দুর্গতি ধ্বংস না করতে পারি! না, সুধীদা, আত্মহত্যার পক্ষে যুক্তি আছে।"

বাদল চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে পড়ত, সুধী তাকে ধরে ফেলল। বলল, "তোর অহঙ্কার তোর রিপু। তুই মনে করিস দুনিয়ার কোথাও কোনো মালিক নেই, ওটা একটা বেওয়ারিশ মাল। তোরা জনকয়েক বুদ্ধিমান প্রাণী বিবর্তনের শেষ সোপানে উঠে মানব-জাতির ভাগ্যবিধাতা বনতে চাস। তা সইবে কেন? জগৎ তার নিজের নিয়মে চলবে, তার যিনি চালক তিনি তাকে চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন, অথচ আপন আয়ত্তে রেখে-ছেন। কোথাকার ঢেউ কোথায় দোলা দেয় তা যদি দেখতে পেতিস, বাদল, তবে তোর সেই দৃষ্টি তোকে দৃষ্টিবিভ্রম থেকে রক্ষা করত।"

বাদল শুনল কি না বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠল, "কমিউনিজম? কমিউনিজম আমাদের শেষ আশা। এ স্বপ্ন যে দিন চূর্ণ হবে সেদিন মানুষ হবে স্বপ্নহীন, আশাহীন, ধৈর্যহীন, হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বহীন। ইতিহাসের সেই হচ্ছে শেষ অধ্যায়। তার-পরে লক্ষ লক্ষ দ্বিপদ থাকতে পারে, মানুষ বলে সেন্‌সাসে নাম লেখাতে পারে, কিন্তু তখন সে প্রকৃতির হাতের পুতুল। এতকাল যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ করে এসেছে, স্রষ্টার শূন্য সিংহাসন দাবী করে এসেছে, সেই বিদ্রোহী মানুষ এতকাল পরে পরাভূত হবে। তারপরে যদি কারুর বেঁচে থাকতে মর্জি হয় সে মানুষ নয়, পোষা জানোয়ার।"

এর উত্তরে সুধীর যা বলবার ছিল তা সে হাতে রাখল। বলল, "কমিউনিজম সম্বন্ধে তোর সঙ্গে আমার হিসাবনিকাশ হবে এক দিন, এখন নয়। তুই যেখানে আছিস আরো কয়েক মাস সেখানে থাকলে আপনি বুঝতে পারবি ওর কোনখানে ছিদ্র, কোনখান দিয়ে শনি ঢুকবে।"

"বুঝেছি।" বাদল যেন লাফ দিয়ে উঠল। "তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ, ডিক্‌টেটরশিপ হচ্ছে কমিউনিজমের শনি। সেইজন্যই আমি ফরমূলা আবিষ্কার করেছি, ডেমক্রাটিক কমিউনিজম। এ সম্বন্ধে আমার একখানা ইস্তাহার আছে, সঙ্গে নেই, আজকের ডাকে তোমার ঠিকানায় পোস্ট করব। ডিক্‌টেটরশিপ হচ্ছে ঘরে ও বাইরে কমিউনিজমের শনি।

ঘরে কমিউনিস্ট ডিক্টেটরশিপ, বাইরে ফাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ।" আবিষ্কারকের উৎসাহ নিয়ে বাদল সুধীর দিকে তাকাল।

"দূর, পাগল!" সুধী এক কথায় বাদলের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দিল।

"দূর, পাগল!" বাদল করুণ স্বরে প্রতিধ্বনি করল।

"থাক, আজ তোর সঙ্গে তর্ক করব না। কতকাল পরে তোকে পেয়েছি। আয়, তোর সঙ্গে একটু সাংসারিক গল্প করি। আজকের রোদ্দুরটি বেশ মিষ্টি লাগছে। চল, আমরা হাঁথে গিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে থাকি তর্ক না, গল্প।"

বাদল গল্প ভালোবাসে না, একবার যদি কোনো বিষয়ে তর্ক শুরু হয় তবে তার চরমে যায়, লজিকের যতদূর দৌড়। তাকে তর্কে জিতিয়ে দিলেই তোমার ছুটি। সুধী যদি বলত, "যা বলেছিস সব সত্যি। ডিক্টেটরশিপকেই আমি শনি বলে ইঙ্গিত করেছি।" তা হলে বাদল হাসি মুখে হাঁথে যেত। কিন্তু কী করে অমন কথা সুধী বলবে?

"তোমার কাছে," বাদল মর্মাহত হয়ে বলল, "ডিক্টেটরশিপ হলো ছেলেখেলা? তুমি ডিক্টেটরশিপ সমর্থন কর? সুধীদা, তোমার সঙ্গে তবে আমার কোন সূত্রে মিল হবে, আমি তোমার মুখদর্শন করব কী করে?"

"পাগল, আমি কি ডিক্টেটরশিপ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেছি? ও শব্দের উল্লেখ পর্যন্ত করেছি? ওর যে কী অর্থ তাই ভালো করে বুঝিনি। হতে পারে ওটাও একটা শনি। কিন্তু আসল শনি ওটা নয়। আজ কিন্তু আমি তর্ক করব না।"

"তাই বল।" বাদল খুশি হয়ে বলল, "তুমি এতক্ষণে সুধীদার মতো কথা বলেছ। কিন্তু তোমার আসল শনির পরিচয় পেতে উদ্‌গ্রীব রইলুম। বৃহস্পতিবার তার পরিচয় দিয়ো। তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে হবে। তা নিয়ে একটা ইস্তাহার লিখতে হবে, নইলে তোমার মতো লোক নিজের ভুল বুঝবে কী করে? আমি আর কিছু না পারি দুনিয়ার ভুল শুধরে দিয়ে যাব।"

সে রাত্রের ঘটনার পর উজ্জয়িনী সামলে নিয়েছিল। যাচ্ছে যখন তখন প্রসন্ন মনে যাওয়া ভালো। যে স্বেচ্ছায় যাচ্ছে তার অভিমানের বোঝা কী হবে? সে হালকা হতে চায়। হালকা হয়েছিল।

"আপনাকে bon voyage জানাতে এসেছি।" বাদল বলল তার সহধর্মিণীকে। তামাশা নয়।

"আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" উজ্জয়িনী তাকে অভ্যর্থনা করল।

"শুনলুম আপনি নাকি আমেরিকা যাচ্ছেন? বেশ, বেশ।" বাদল তারিফ করল। "আপনি বোধ হয় জানেন না যে আমার কৈশোরের কল্পলোক ছিল আমেরিকা, যদিও ইংলণ্ডের আমি আদিম অনুরাগী। আমেরিকা! সে যেন কোন নতুন গ্রহ, সেখানে

গিয়ে পৃথিবীর লোক নতুন করে সংসার পাতে, নতুন জীবন আরম্ভ করে। আমেরিকা কাউকে নিরাশ করে না, তখনকার দিনে করত না। ভারতবর্ষের কত ছেলে সেখানে গিয়ে মানুষ হয়ে গেল, যে ছিল অপদার্থ সে হল সব্যসাচী, বাসন মাজা ময়লা সাফ করা থেকে শুরু করে চিনির কারখানার ইঞ্জিনীয়ার বা পলিটিক্সের প্রোফেসার।"

বাদলের স্মৃতি উজ্জীবিত হল। সে কি জানত সে সব কথা তার মনে আছে, একদিন মনে পড়বে? উজ্জয়িনী আমেরিকা যাচ্ছে, তা শুনে অকস্মাৎ স্মরণ হল। তখনকার দিনে বাদলের সাধ ছিল জাহাজের খালাসী হয়ে আমেরিকা যেতে—তার বাবার অনুমতি পাবে না, তাই বাবার সাহায্য না নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। সাধ থাকলে কী হবে, সাধ্য ছিল না। জাহাজের খালাসীদের গায়ে ভীমের বল। বাদল চিরদিন দুবলা। সামুদ্রিক অসুখ, খাটুনি ও মারামারির ভয়ে খালাসীগিরির সাধ মিলিয়ে গেল।

"আমার তেমন উচ্চাভিলাষ নেই।" উজ্জয়িনী বলল, "ললিতা রায় যাচ্ছেন দেখে আমিও যাচ্ছি। নইলে বোধ হয় যেতুম না।"

উক্তির মধ্যে একটু ইঙ্গিত ছিল। বাদলটা ইঙ্গিতের মর্ম বুঝল না, আপন মনে মশগুল ছিল। বলল, "যাচ্ছেন ভালোই করছেন। আমার অন্তরের একটা স্তরে আমেরিকান আইডিয়া এখনো কাজ করছে। আজকের আমেরিকার কর্মকৌশল নয়, কালকের আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তারা শুধু আপনি স্বাধীন হয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তারা পরকে স্বাধীন করতে জীবনপাত করেছে, প্রাণ দিয়েছে। মুক্তিদাতা গ্যারিসন, মুক্তিদাতা লিংকন, এঁদের জন্যে আমিও গৌরব বোধ করি, এঁরা মানবজাতির মুকুট। আমিও ভাবতুম আমি এঁদেরই মতো মুক্তিদাতা হব, পৃথিবীর সকল বন্দী ও বন্দিনীর জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হবে, আমার জীবনের মূলমন্ত্র হবে লিবার্টি।"

উজ্জয়িনী মনে মনে তার স্বামীর জন্যে গৌরব বোধ করছিল, কিন্তু কোথায় যেন কাঁটা খচ খচ করছিল। বোধ হয় কমরেড জেসি।

"লিবার্টি! আমেরিকানদের উপাস্য দেবীর নামও লিবার্টি। জাহাজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার আগে সর্বপ্রথম আপনার চোখে পড়বে লিবার্টি মূর্তি। সেই হচ্ছে আমেরিকার প্রতীক, আমার জীবনেরও। আপনার জীবনের?" বাদল প্রশ্ন করল।

এর উত্তরে উজ্জয়িনীর যা বলবার ছিল তা বলবার মতো নয়। বলতে পারত, লিবার্টি মানে কী? কমরেড জেসি? পুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ও ছাড়া আর কী হতে পারে? নারীও বেশী দিন পেছপা থাকবে না। বাধ্য হয়ে লিবার্টি উপাসনা করবে।

বলল, "একটা কথা আমি বুঝতে পারিনে, হয়তো আমার বুদ্ধির দোষ। অভয় দেন তো বলি।"

"ভয় কাকে? আমাকে? আমি কি রাক্ষস না খোক্কস?"

"তা নয়। কথাটা অপ্রিয়।"

"হোক না, তাতে কী আসে যায়?"

উজ্জয়িনী গম্ভীরভাবে বলল, "লিবার্টি যার জীবনের প্রতীক তার কি কোনো দিন বিয়ে করা উচিত?"

বাদল প্রীত হয়ে বলল, "হুবহু আমার কথা। আমি তো সেই কথাই বলে আসছি।"

"কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি কোথায়?" উজ্জয়িনী অবজ্ঞার স্বরে বলল। "কথা কি কেবল কথার জন্যে? কাজের জন্য নয়?"

বাদল তালি দিয়ে বলল, "সম্পূর্ণ আমার স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট। কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি কোথায়? এই ধরুন না আমার বিয়ে। আমি হাজার বার আপত্তি করেছি। আপনার সঙ্গে বলে আপত্তি করেছি তা নয়। বিয়ে জিনিসটাই আপত্তিকর। বিয়ে করলে আমার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য থাকে না। আমার স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট দুর্বল হয়। আমি তর্ক করলে প্রতিপক্ষ বলতে পারে, নিজের বেলায় কী করেছেন? আমার জীবনচরিতকার আমার জীবনের ঐ একটি ঘটনা নিয়ে মুশকিলে পড়বে। ব্যাখ্যা করতে পারবে কি পারবে না। সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু চাপা দেবার রাস্তা নেই। আমার স্বাক্ষর রয়েছে রেজিস্ট্রি আপিসে।" বাদল বলল বিব্রতভাবে। ভাবী কালের কাছে জবাবদিহির দায়ে বিব্রত।

উজ্জয়িনীর বহু দুঃখে হাসি পায়। এ দিকে এক জনের জীবন মাটি, ওদিকে উনি ভাবছেন ওঁর জীবনচরিতের কথা।

"কিন্তু আপত্তি যদি ছিল তবে তা জানালেন না কেন?" উজ্জয়িনী একটুখানি ঝাঁজের সঙ্গে বলল।

"আহ্!" বাদলের এতক্ষণে হোঁশ হল। "আপনি রাগ করেছেন। তা করবেনই তো। করা স্বাভাবিক। আমি অনেক সময় ভেবেছি আপনার বিদ্রোহ করা উচিত। দেখুন, আমি যে আপনাকে জানতে দিইনি তা নয়। লিখেছিলুম একখানা চিঠি, তাতে খুলে বলেছিলুম আমার মতবাদ।"

"আমি পাইনি সে চিঠি।"

"মনে পড়েছে, আপনি পাননি সে চিঠি, আমাকে বলেছেন ও কথা।"

"কিন্তু একখানা চিঠি লিখলেই কি আপনার দায়িত্ব খণ্ডে যায়? ধরুন যদি সে চিঠি আমি পেয়েই থাকি তা হলে কি আপনার সাত খুন মাফ? আপনি এলেন কেন বিয়ে করতে, কেন ধর্মঘট করলেন না।"

বাদল এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করেনি। ধর্মঘট! অনেক রকম ধর্মঘটের নাম শোনা গেছে,

কিন্তু বিয়ে করবে না বলে ধর্মঘট। তার বাবা যেমন বাঘা হাকিম, হয়তো বেআইনী বলে পুলিশ ডাকতেন। পুলিশের বেটনের গুঁতো খেয়ে বিয়ে করার চেয়ে মানে মানে কর্ম সারা ভালো। বাদল যত দিন বাপের কাছে ছিল ততদিন লক্ষ্মী ছেলে ছিল, সব বিষয়ে প্রাইজ বয়। তার তখনকার পলিসি কোনো মতে একবার বাপের ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাতে পারলে হয়। আগে তো বিলেতে পৌঁছোক, তার পরে বৌকে তালাক দেবে। জীবনের স্লেট থেকে বিয়ের রেখাটা হাত দিয়ে মুছে ফেলবে।

"আমার ধারণা ছিল", বাদল ছেলেমানুষের মতো বলল, "বিয়েটা কিছু নয়, এক রাত্রের মামলা। আপনি ও আমি দু'জনে যদি একমত হই তা হলে যে কোনো দিন বাঁধন খুলতে পারি। আপনাকে বোঝালে বুঝবেন, এ বিশ্বাস তখনো আমার ছিল, এখনো আছে। কিন্তু বোঝাবার সময় পেলুম কবে ? তখন থেকে ব্যাপৃত রয়েছি মানব-ভাগ্যের ভাবনায়।"

এমন মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করবে কে ? যেই করুক উজ্জয়িনী করবে না। সে স্থির করেছে, যাবে। যাবার আগে ঝগড়া করে গায়ের ঝাল ঝেড়ে ফল কী হবে ? ওসব মেয়েলি থিয়েটার তার বিশ্রী লাগে।

"বুঝেছি আপনার বক্তব্য। আপনার ধারণা ছিল বিয়েটা আমার কাছেও কিছু নয়, আমার বিচারেও এক রাত্রের মামলা। এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি মানবভাগ্য নির্ণয় করবেন! মানবের ভাগ্য বলতে হবে! কিন্তু আমার ভাগ্য আমার নিজের হাতে। বাঁধন খুলব কি কাটব কি রাখব তা আমি ভেবে দেখব।"

এমন সময় প্রবেশ করল সুধী।

"এই যে তুই এসেছিস।" বাদলকে বলল। "তোদের দুজনের ভাব হয়ে গেছে, আশা করি।"

"ভাবের অভাব কোনদিন ছিল ?"

"তোদের আলাপ বন্ধ হল কেন ? চলুক না ? আমিও যোগ দিই।"

"বলছিলুম, বিয়ের বাঁধন খুলব জেনেই পরেছি। কাউকে বেঁধে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি মুক্তিদাতা।"

"কিন্তু আমি," উজ্জয়িনী বলল, "মুক্তিদান চাইনে। আমার যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন আমি আপনি মুক্ত হব। আমার কাছে মুক্তি আপাতত মুখ্য নয়। আমি চাই অ্যাকশন, আমি আমার নারীবাহিনী নিয়ে সংগ্রাম করতে চাই। আমার ব্যক্তিগত জীবন কোথায় তলিয়ে গেছে! হয়তো দশ বছর পরে ভেসে উঠবে। হয়তো তার আগে আমার মরণ হবে।" উজ্জয়িনীর চোখে জলের আভাস।

বাদল শুনছিল কি না সন্দেহ। সুধীর দিকে ফিরে বলল, "মনে আছে, সেদিন কী

বলেছিলে ? কমিউনিজমের শনি না রবি ? আমি সেইজন্যে এসেছি।"

সুধী বলল, "চুপ, চুপ। এখানে উজ্জয়িনী আছে। তোর সঙ্গে আমার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে আর একটা মীরাট কন্‌স্পিরেসী কেস রুজু হবে। এ প্রসঙ্গ থাক। যা চলছিল তাই চলুক।"

বাদল বলল, "কী চলছিল ? কী চলবে ? আমি ওর বন্ধু ছিলুম, এখনো আছি, চিরকাল থাকব। বিয়ে করে যেটুকু অন্যায় করেছি সেটুকু আমি যে কোনো দিন প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। একজন ভদ্রলোক এ ছাড়া আর কী করতে পারে ?"

"কিন্তু প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠছে না।" সুধী বলল। "আমরা দশ জনে এই প্রার্থনা করি যে তোদের বিবাহিত জীবন আনন্দময় হোক।"

"আমাদের বিবাহিত জীবন!" বিস্ময় প্রকাশ করল বাদল। "তার মানে কী, সুধীদা! আরামের চাকরি, সরকারী বাংলো, খানসামা বাবুর্চি খিদ্‌মদ্‌গার, নাচ গান টেনিস, শাড়ী আর গাড়ী। এই, না আর কিছু ? লাইফ ইনসিওরেন্স, ছেলের পড়া, মেয়ের বিয়ে, গরিবের সাহায্য, অনাথের চাঁদা। কেমন, এই তো ?"

সুধী নীরব রইল। উজ্জয়িনীও।

"আমার তো প্রবৃত্তি হয় না অমন করে আত্মহত্যা করতে। আত্মহত্যা করতে হয় তো নদী পুকুর আছে।" বাদল উত্তেজিত হয়ে বলল। "বিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়ে বুর্জোয়া হতে হবে আমাকে ? পরিবার প্রতিপালন করে মোক্ষ লাভ করব ? না, সুধীদা, পারিবারিক দায়িত্ব আমার জন্যে নয়, আমি কোনো দিন স্থিতু হতে পারব না। বিয়ে করেছি, অন্যায় করেছি, ক্ষমা চেয়েছি, বিয়ে যাতে নাকচ হয় তেমন প্রস্তাব করেছি। আর কী করতে পারি ?"

উজ্জয়িনী ম্লান মুখে উঠে গেল। সুধীর মুখ ফুটল।

"আমি জানি তোর পক্ষে সংসারী হওয়া শক্ত।" সুধী বলল, "সংসারের তুই জানিস কী যে দায়িত্ব নিবি! দুধ ভাত খেয়ে মানুষ। কিন্তু তুই যখন বুর্জোয়া না হবার কথা বলিস তখন আমার হাসি পায়। দুনিয়ায় বুর্জোয়া যদি থাকে তবে তুই এবং তোর মতো নন্দদুলাল। ওসব বাদ দে।"

বাদল জ্বলে উঠল। "আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। সুধীদা, তুমি কেরেন্‌স্কির মতো কথা বলছ।"

সুধী কেরেন্‌স্কির নাম শোনেনি, তার ইতিহাসের জ্ঞান কাঁচা। বাদল এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, "তুমি কেবল বুর্জোয়া নও, তুমি – তুমি counter revolutionary."

এসব কমিউনিস্ট গালিগালাজ সুধীর জানা ছিল না। এমন কী অপরাধ করেছে যার দরুন তাকে—কী বলে—counter revolutionary সাজতে হবে!

বাদল শাসিয়ে বলল, "তোমরা ভারতের কুলাক, তোমাদের অচিরে লিকুইডেট করতে হবে।"

বোলশেভিক অভিধানের বাছা বাছা বুলির গোলাগুলির চেয়ে আওয়াজ। বুর্জোয়া, কেরেনস্কি, কাউন্টার রেভলিউশনারী, কুলাক। একাধারে এত। এততেও বাদল শান্ত হয় না। আরো বলে, "বুর্জোয়াদের স্বভাব তারা পরকে বুর্জোয়া ভাবে। তুমি যে বুর্জোয়া তার স্পষ্ট প্রমাণ তোমার এই রিফর্মিস্ট মেন্টালিটি।"

এর পরে সুধীর পক্ষে হাস্য সংবরণ দুর্ঘট হল। সে এমন হাসি হাসল যে ও ঘর থেকে উজ্জয়িনীকে ছুটে আসতে হল। তার উদ্বেগ লক্ষ করে সুধী বলল, "কিছু না। বাদলের কাছে শিখছি কেমন ভাষায় বক্তৃতা দিলে সব চেয়ে বেশী হাত তালি পাওয়া যায়। বাদল, ভারতবর্ষের সভামঞ্চে তোর মতো কমিউনিস্টের স্থান আছে, তুই দেশে ফিরে চল। আমরা তোর গালিগালাজ শুনতে ভিড় করব, যদিও তুই আমাদের লিকুইডেট করবি।"

"না, ভারতে আমার স্থান নেই।" বাদল মাথা নাড়ল। "বুড়ো গান্ধী দেশটাকে একশো বছর পেছিয়ে দিয়েছে। ব্ল্যাক ম্যাজিক, হিপনোটিজম, প্রাচ্য দেশের প্রাচীন যাদু। তাই দিয়ে গান্ধী তোমাদের ভেড়া বানিয়েছে।"

"ছিলুম কুলাক, হলুম ভেড়া। এর পরে আর কী কপালে আছে, জানিনে। কিন্তু, বাদল, গান্ধী আর ক'দিন। এর পরে নেতার নাম উঠলে আমরা প্রোপোজ করব, বাদল সেন। তোকে অবশ্য দয়া করে একবার কি দু'বার জেলখানায় গিয়ে মোটা হতে হবে।"

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বলল, "সুধীদা, দরকার কী ওঁকে বিরক্ত করে? ওঁর যা ভালো লাগে উনি তা করবেন, যে দেশ ভালো লাগে সে দেশে থাকবেন। বিয়ের সময় কেউ কি তার ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখতে পারে? ম্যারেজ কি মর্টগেজ?"

বাদল খুশি হয়ে বলল, "ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। ম্যারেজ কি মর্টগেজ?"

সুধী দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "তোদের দু'জনের দেখছি তলে তলে মিল আছে। তোরা আমাকে জব্দ করবার ফন্দী এঁটেছিস। যাঃ তোদের জন্য আমি কিচ্ছু করব না।"

বাদল বলল, "আমরা কমরেড। কী বলেন, মিস গুপ্ত?"

স্বামীর মুখে এই সম্বোধন শুনলে আগে উজ্জয়িনী ব্যথিত হত, এখন সে নিজেই ঠিক করেছে কুমারী নাম ব্যবহার করবে। এ দেশে অনেক বিবাহিতা মেয়ে কুমারী নাম ব্যবহার করেন। বাইরের লোক সেই নামে তাঁদের ডাকে। আধুনিকতার ধ্বজাধারিণী রূপে উজ্জয়িনী এই প্রথা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করবে।

"নিশ্চয়। আমরা এখন থেকে কমরেড।" বলল উজ্জয়িনী। যদিও কমরেড বলতে কমরেড জেসিকে মনে পড়ছিল।

"এবার, স্বধীদা !" বাদল স্বধীকে কোণঠাসা করল। "এবার তোমার কী বলবার আছে ? আমরা তো কমরেড।"

স্বধী গাঢ় স্বরে বলল, "বাদল। তোর সঙ্গে আমার বন্ধুতা যেমন নিবিড় উজ্জয়িনীর সঙ্গেও তেমনি। তোদের বিয়ে দেবার সময় আমার এই কল্পনা ছিল যে আমরা তিনটি বন্ধু একাত্ম হব। আমরা হব এক বৃন্তে তিনটি ফুল, তিনে এক, একে তিন। আমার সেই কল্পনা আজো সতেজ রয়েছে। আমি জানি সকলের পথ এক নয়, জীবন পথের পদে পদে বিচ্ছেদ। একাত্ম হওয়া মানে একত্র হওয়া নয়। একমত হওয়া নয়। তুই কমিউনিস্ট হয়ে রাশিয়া গেলেও আমি তোকে তেমনি ভালোবাসব। তোর কমরেডদের সঙ্গে তোর শুধু মনের সম্পর্ক, আমার সঙ্গে হৃদয়ের, প্রাণের, আত্মার। মানিস কি না, বল ?"

বাদল আবেগের সহিত বলল, "মানি।"

"তাহলে কেন উজ্জয়িনীকে কমরেড করে দূরে সরিয়ে রাখছিস ? তোর স্বধীদা যেমন একজন উজ্জয়িনীও তেমনি একমাত্র হোক। আমি চাইনে যে তার জন্যে তোর জীবন বিফল হয় কিংবা তোর জন্যে তার। এক বন্ধু আমেরিকায় ও অপর বন্ধু ইংলণ্ডে থাকলে এমন কোনো ক্ষতি নেই। আমি যা চাই তার ইংরেজী প্রতিশব্দ, লয়ালটি।"

বাদল ক্ষণকাল চিন্তা করল। "লয়ালটি," বাদল জপ করল, "লয়ালটি"। তারপর উজ্জয়িনীর দিকে চেয়ে বলল, "স্বধীদার কথা কিছু বুঝলেন ? আমি তো আঁধারে।"

"তোদের বিয়ে যে একটা ভুল তা আমি এত দিনে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু তোদের বন্ধুতা যে ভুল নয় সেটা আমার বহু দিনের বিশ্বাস। আমি, তোদের দু'জনকে ভালোবাসি, তাই আমার ভাবতে ভালো লাগে যে তোরাও পরস্পরকে ভালোবাসিস। তেমন ভালোবাসাকেই আমি লয়ালটি বলেছি।"

বাদল বলল, "ভালোবাসা একটা strong word. এক্ষেত্রে হয়তো wrong word."

উজ্জয়িনীর গালের রং বদলাল। সে চোখ নিচু করল।

"আমি তোদের কারুর উপর চাপ দিতে চাইনে, দিলে ভুল করব।" স্বধী বলল। "কিন্তু আমি যেমন তোদের ভালোবাসি তেমন ভালোবাসা কি তোদের পরস্পরের পক্ষে অসম্ভব ?"

বাদল ভাবতে লাগল। স্বধী তাকে ভাববার সময় দিল, উজ্জয়িনীও।

"স্বধীদা," বাদল বলল, "তুমি তো জান, আমি স্বাধীনতার প্রয়োগ না করলেও স্বাধীনতার অধিকার হাতে রাখি। রাশিয়া হয়তো যাব না, তবু যেতে বাধা নেই, একেই বলি স্বাধীনতার অধিকার। কার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক হবে তা অপর পক্ষের উপর অনেকটা নির্ভর করে। অপর-পক্ষ যে কে তা কেমন করে আজ থেকে জানব ? আমার

সেই সম্ভবপর সঙ্গিনীর সঙ্গে আমার আচরণের স্বাধীনতা আমি অগ্রিম ইস্তফা দিতে পারিনে। সুতরাং লয়ালটি বলতে যদি ইস্তফা বোঝায় তবে আমায় মাফ করতে হবে, ভাই সুধীদা ও কমরেড—"

থাক, হয়েছে !" উজ্জয়িনী লজ্জায় ক্রোধে হতাশায় অভিভূত হয়েছিল।

১২

উজ্জয়িনী প্রস্থান করল। তখন সুধী বলল বাদলকে, "এমন ভুল আছে যার সংশোধন নেই। বিবাহ সেই জাতীয় ভুল। ও ভুল করতে আমি যে তোকে প্ররোচনা দিয়েছি এর দরুন অনুশোচনা করি। কিন্তু, বাদল, ভেবে ছাখ, উজ্জয়িনীর কী দোষ!"

"আমি তো বলছিনে যে তাঁর দোষ।" বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল। "আমি বার বার স্বীকার করছি তাঁর প্রতি অন্যায় করেছি। কিন্তু অন্যায় আমি বিনা নোটিসে করিনি। আমি চিঠি লিখে জানিয়েছি বিয়েতে আমার মত নেই, বিয়ে করছি আণ্ডার প্রোটেস্ট, বিয়ের পর বিয়ে ভেঙে দেব। তিনি যদি সে চিঠি না পান তবে কি আমার ত্রুটি ? আমি সরল মনে বিয়ে করেছি, ধরে নিয়েছি যে তিনি সমস্ত জেনেও রাজি হয়েছেন।"

"যা হবার তা হয়েছে, তোকে দোষ দিইনে। কিন্তু ভেবে ছাখ। প্রত্যেক মেয়ের মতো উজ্জয়িনীরও তার স্বামীর কাছে একটা দাবী আছে, সে দাবী সেই বা কেন ছাড়বে ? বিবাহভঙ্গ যে কোনো সমাজে অপ্রীতিকর। আমাদের সমাজে ওর চল নেই। আইনেও বাধে। তার দিক থেকে বিবাহভঙ্গের প্রস্তাব উঠবে না, সে সহ্য করবে তার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোর বোঝা উচিত, কেন সে সহ্য করবে, কী অপরাধ করেছে ? তার দিদিরা সুখী, সেই বা কেন অসুখী হবে।"

"বুঝেছি। কেন তিনি অসুখী হবেন, এই তোমার জিজ্ঞাসা।" বাদল গম্ভীর ভাবে প্রত্যুক্তি করল। "কেন তিনি অসুখী হবেন ? কেন ? কেন ? আমিও জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, কেন এমন হয় ? বিধাতা যদি থাকেন কেন এমন হতে দেন ? এখন এ সমস্যার মীমাংসা করবে কে ?"

সুধী বলল, "বন্ধু হিসাবে তুই ভেবে ছাখ।"

"High tragedy!" বাদল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। "এই সব ঘটে বলেই ভগবান মানতে হয়, উদ্ভাবন করতে হয়। জগতে এমন কত ঘটছে, ভাবতে বসলে পাগল হয়ে যেতে হয়। বন্ধু হিসাবে আমি এই পর্যন্ত করতে পারি, তাঁকে মুক্তি দিতে পারি।"

সুধী বলল, "নারীর মুক্তি বন্ধনে।"

"তা যদি হয়," বাদল ভয়ে ভয়ে বলল, "তিনি আর কাউকে বিয়ে করতে পারেন।"

"চুপ, চুপ। অমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে নেই। ওতে সুখ হয় না, সম্মান যায়।"

"সুধীদা, আমি নাচার।" বাদল কাতর কণ্ঠে বলল। "তিনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পারেন, কিন্তু আমার চোখে উনিও তেমনি কমরেড মার্গারেট যেমন। আমার ব্যবহারে তারতম্য নেই।"

সুধী দুই হাতে মুখ ঢাকল। অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, "তোর অন্যান্য কমরেড যেমন আমি কি তেমনি? আমার সঙ্গে ও তাদের সঙ্গে একই ব্যবহার করবি?"

"না, তোমার কথা আলাদা। তুমি তো আমার কমরেড নও।"

"আমার সম্বন্ধে যদি বিশেষ বন্দোবস্ত হয় তবে উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে কেন নয়? বাধা কোথায়?"

বাদল হঠাৎ উত্তর খুঁজে পেল না। তাই তো, বাধা কোথায়? তারপর বলল, "বাধা কোথাও নয়, বাধার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু বাধা সম্ভবপর। আমি আমার জীবন বন্ধক রাখতে চাইনে। বিশেষ বন্দোবস্ত যদি করি তবে বিনা শর্তে করব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারব না।"

সুধী উৎফুল্ল হয়ে বলল, "তাতেই চলবে।" বাদলকে একবার পথে আনতে পারলে হয়।

"তোদের ওখানে জায়গা হবে উজ্জয়িনীর ও আমার?" সুধী জিজ্ঞাসা করল। "আমরা কমিউনিস্ট নই যদিও।"

"তা যদি বল," বাদল কবুল করল, "আমিও নই।"

"সে কী! আমাকে এত গালাগালি দেবার পর এ কী বলছিস তুই!" সুধী সকৌতুকে হতভম্ব হল।

"মাফ কোরো, সুধীদা। ওদের কাছে গালাগালি খেতে খেতে আমিও ওদের নকল করতে শিখেছি। ওসব আমার নিজস্ব নয়।"

"সে আমি জানি।" সুধী সহৃদয়ভাবে হাসল।

বাদল তার দুঃখের কাহিনী বলল। তাদের ওখানে সকলের এক একটা উপনাম আছে—কেউ লেনিন, কেউ লুনাচারিস্কি, কেউ ভোরোশিলভ, কেউ বুখারিন, কেউ মোলোটভ, কেউ স্টালিন। ট্রটস্কি হতে কেউ রাজি নয়, ওটা গালিগালাজের সামিল। কেরেনস্কি হতেও কেউ রাজি নয়, ওটা ওরা বাদলের ঘাড়ে চাপাতে চায়। বাদল হাজার বার আপত্তি করে, কেউ শোনে না, তাকে বার বার বিরক্ত করে ঐ নামে ডেকে।

"আমিও অসুখী সুধীদা, আমি ভয়ানক অসুখী।" বাদল বলল। "নিজের চোখের সামনে ডিক্‌টেটরশিপের নমুনা যা দেখছি তা গ্লানিকর। কমিউনিজমের সহায় বলে যার প্রতিষ্ঠা সেই এক দিন কমিউনিজমের বৈরী হবে। ডিক্‌টেটরশিপ কমিউনিজমকে গাছে

ঘনিয়েছে, গাছেই ফাঁসি দেবে। তোমার কী মনে হয়?"

ঘুরেফিরে সেই তর্ক এল। সুধীর পরিত্রাণ নেই।

"ডিক্‌টেটরশিপ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অল্প। প্রত্যক্ষ জ্ঞান তো নেইই, পরোক্ষ জ্ঞানও অযথেষ্ট। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি ওর দ্বারা অনেক জঞ্জাল সাফ হয় ও অনেক ঝঞ্ঝাট মেটে। পশ্চাৎপদ দেশের পুঞ্জীভূত আবর্জনার পক্ষে ওর উপযোগিতা আছে। কিন্তু অগ্রসর দেশে ওর ঠাঁই নাই। এ দেশে যদি কেউ রাশিয়ার মাছিমারা নকল করে তবে সে মিছি-মিছি সং সাজে।"

"তোমার কথা সত্য হলে সুখী হতুম, সুধীদা। কিন্তু আমার ভয় হয় অগ্রসর দেশেও ডিক্‌টেটরশিপের মত্ততা সংক্রামিত হচ্ছে! আমার আশঙ্কা জার্মানীতেও ওর ভবিষ্যৎ আছে। ইটালী তো অগ্রসর বলেই জানতুম। পঞ্চাশ বছরের ডেমক্রেসী কোথায় ভেসে গেল, অবাক লাগে।"

"আমার জ্ঞান অল্প, তা বলেছি। পলিটিক্‌সে কখন যে কোন রীতি চালু হয় তা পলিটিক্‌সের পোকারাও আগে থেকে জানে না। যে সব দেশে ডিক্‌টেটরশিপ স্থাপিত হয়েছে সে সব দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ, যে সব দেশে স্থাপিত হবে সে সব দেশের আভ্যন্তরিক দুর্দশার দরুন হবে। তার পরে আপনি অন্তর্হিত হবে। সুতরাং ডিক্‌টেটরশিপকে আমি শনি মনে করিনে। ওটা শনি নয়, রাহু।"

বাদল বলল, "কাকে তবে তুমি শনি মনে কর?"

"কাকে?" সুধী আগের বার উত্তর দেয় নি, এইবার দিল। "মানুষকে অন্নবস্ত্রের জন্যে পরমুখাপেক্ষী করলে সে আত্মবিক্রয় করে, তখন তার নাম হয় ওয়েজ স্লেভ, মজুরি দাস। ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে ওতে মানুষকে ওয়েজ স্লেভ করেছে, মানুষের সাধ্য নেই যে কারখানার চাকরিটি গেলে নিজের মূলধনে একটা কিছু করে। কারখানায় জায়গা না হলে মানুষ চোখে আঁধার দেখে, নিজের দুটো হাত থাকতে সে এমন অসহায় যে পরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বেড়ানো ছাড়া তার গতি নেই, সে যে একটা কাঠের খেলনা বানিয়ে দু'পেনী পাবে তেমন হাতের খেলা নেই। হাত তার বেহাত হয়েছে, বুদ্ধিও একটি খুঁটিতে বাঁধা। কেমন, বেকার শ্রমিকদের সম্বন্ধে ঠিক বলেছি কি না?"

বাদল মানল ওকথা।

"এখন," সুধী খেই ধরল, "কমিউনিজম যা করতে চায় তা মালিকের অদল বদল। সেই কল থাকবে, সেই কারখানা থাকবে, সেই মিস্ত্রি থাকবে, সেই মজুর থাকবে, তফাৎ শুধু এই যে মালিক হবেন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের পিছনে থাকবে কমিউনিস্ট পার্টি। তাতে এই সুবিধা হবে যে কারুর চাকরি যাবে না, কেউ বেকার হবে না, কাউকে পরের দরজায়

ধাক্কা দিয়ে বেড়াতে হবে না, কারখানার পরিচালন ব্যাপারে প্রত্যেকের অভিমত থাকবে, প্রত্যেকে ভাববে সেও তার কারখানার একজন চালক, পদোন্নতির পথ খোলা থাকবে, উঠতে উঠতে কুলি একদিন ইঞ্জিনীয়ার হয়ে উঠবে, ডিরেকটর হয়ে উঠবে। পরিচালনার গুণে পরিশ্রম কমিয়ে দিলেও চলবে, অবকাশ বাড়িয়ে দিলেও চলবে, আর সেই অবকাশ দিয়ে গান বাজনা নাচ ও নাটক করা যাবে। কিন্তু, বাদল, কোনো দিন যদি কেউ রাষ্ট্রের কিংবা পার্টির রোষদৃষ্টিতে পড়ে সেদিন সে টের পাবে, সে সেই ওয়েজ স্লেভ। তার হাত বেহাত, বুদ্ধিও এক ঠাঁই বাঁধা। সে কিছু একটা বানিয়ে এক বেলাও খেতে পাবে না, সে অসহায়, অতি অসহায়।"

"কিন্তু উজ্জয়িনী গেল কোথায় ? সে যে আজ তোকে খাওয়াবে।" এই বলে সুধী তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কোথাও তাকে পেল না। অপ্রস্তুত হয়ে বাদলের দিকে তাকাল।

একলা পাগল

১

সাধারণ নির্বাচনের দিন দুই পরে সুধী যখন বাসায় ফিরল তখন তার বাসার মালিক দুই বোন উইনস্লো তাকে দরদী শ্রোতা পেয়ে অস্থির করে তুলল। তারা লেবার কমিউ-নিস্টের তফাৎ বোঝে না। বলে, দুই সমান। র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড আর জোসেফ স্টালিন দুই অভিন্ন। এবার কি আর রক্ষা আছে ? ইংরেজের দেশে লাল রাজত্ব শুরু হল, বাড়ী ঘর ক্রোক হবে, লেপ কম্বল লুট হবে, বুড়ো বুড়ীর সেই প্রসিদ্ধ খোলসখানাও লাল বর্গীরা কেড়ে নেবে, দুই স্থবির কুমারীর আরো কি কেড়ে নেয় কে জানে। র‍্যামজে সর্দারের বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে পাড়ার লোকের ঘুম নেই। তারা ভাববে খাজনা দেবে কিসে।

কাগজে কাগজে র‍্যামজের নাটকীয় মূর্তি, নাটকীয় উক্তি। ব্রিটেনের কী যেন হতে চলেছে, প্রলয় কি অভিনব সৃষ্টি। গরিবরা আশায় আশায় ঘুরছে, বড়লোকদের মুখে বাঁকা হাসি। বাসে টিউবে রেস্টোরাণ্টে সেই একই প্রসঙ্গ, সেই একই উৎসাহ ও উদ্বেগ। স্নোডন, টমাস, ল্যান্‌সবেরী ইত্যাদি নাম হাটে ঘাটে। "আপনি কি মনে করেন র‍্যামজে এই করবে ?" "আর টমাস সম্বন্ধে কি আপনার ডাউট হয় না ?" "ওয়েজউড বেন লোকটা কে হে ?"

সুধীর ইংরেজ আলাপীরা তাকে স্বেচ্ছায় সহানুভূতি জানান। বলেন, "এবার ভারতের নক্ষত্র মধ্য গগনে। স্বয়ং ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী। ভারতের স্বরাজ তো হয়েই রয়েছে, কেবল পার্লামেণ্টে পেশ করা বাকী।"

সহানুভূতি এত সুলভ নয় যে উপেক্ষা করা উচিত হবে। সুধী ধন্যবাদ দেয়। বলে,

"আপনারা যে ভারতকে ভালোবাসেন এই যথেষ্ট। স্বরাজ না হলেও আমরা আপনাদের দোষ দেব না, আমাদেরই দোষ।"

সুধীর আপন দেশের লোক যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "আসছে, একটা কিছু আসছে, র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতের বন্ধু" তখন সুধী হাস্য সংবরণ করতে অপারগ হয়। বলে, "হাঁ, আসছে, তবে সেটা স্বরাজ কি স্বরাজের প্যারডি তা ভারতের বন্ধুরাই জানেন।"

ব্রিজার্ডের ছেলে জন শুধু সহানুভূতি জানিয়ে নিবৃত্ত হলেন না, সুধীকে নিমন্ত্রণ করলেন ন্যাশনাল লেবার ক্লাবের লাঞ্চনে। লেবার পার্টির বহু যুবক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সুধী গিয়ে জুটল।

সুধীর ডান পাশে যিনি বসেছিলেন যুবক হলেও তাঁর দাড়ি ছিল। তিনি সুধীর কানে কানে বললেন, "Dont you worry. আমরা আপনাদের স্বায়ত্তশাসন দেব। আমরা প্রতিশ্রুত হয়েছি।"

"কেবল আপনারা কেন, আপনাদের দেশের সব ক'টা দল। প্রতিশ্রুতি তো মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুনে আসছি। কিন্তু কবে সেই শুভদিন আসবে?"

"আঃ, মিস্টার চক্রবর্তী, তা কি কেউ পাঁজি দেখে বলতে পারে?"

সুধী আহারে মন দিল।

বাম দিক থেকে ছোট ব্রিজার্ড বললেন, "বাবা খুশি হতে পারেন নি। লিবারলরা যেমন সমারোহ করেছিল তেমনি দারুণ হেরেছে। কিন্তু, চক্রবর্তী, লেবারের কাছে বড রকম কিছু প্রত্যাশা করবেন না। যদিও আমরা মেজরিটি তবু আমাদের মতো দুর্বল দল আর নেই। আমাদের হাতে কাগজ মোটে একখানি। টাকা আমাদের এত কম যে বলতে লজ্জা হয়। আমরা যে জিতেছি এই পরম করুণা, এখন পাঁচটি বছর টিকতে পারলে হয়।"

"কেন? টিকে থাকবেন না কেন? মেজরটি তো পালিয়ে যাবে না।"

"আছে অনেক কথা। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের খুঁটির জোর হচ্ছে ব্যাঙ্কের বন্ধুতা। ব্যাঙ্ক বিমুখ হলে গবর্ণমেণ্টের পদে পদে বাধা। আমরা যে কী করে তাদের মন পাব তা তো বুঝিনে। নির্বাচকদের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেসব পুরণ করা তাদের শরণ সাপেক্ষ, অথচ তাদের স্বার্থের সঙ্গে বেখাপ।"

সুধী বলল, "কথাটা সত্যি। এই দেড় বছর এদেশে বাস করে আমি লক্ষ্য করেছি এদেশের রাজা যেমন রাজা নন, গবর্ণমেণ্টও তেমনি গবর্ণমেণ্ট নয়। নেপথ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কওয়ালা, কলওয়ালা, আমদানি রপ্তানিওয়ালা, বীমার ব্যবসাদার। সেই সব অদৃশ্য শাসকের বেনামদার টোরি হবে কি লেবার হবে এই তো এদেশের রাজনীতি? মাফ

করবেন, যদি রূঢ় শোনায়। আপনারাও আমাদেরই মতো পরাধীন।"

জন প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, "অতটা না হলেও কতকটা তো বটেই। আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনাদের তবু উদ্ধার আছে, আমাদের নেই? আপনারা যদি বিদ্রোহ করেন ওটা হবে স্বাধীনতার যুদ্ধ, আমরা যদি করি ওটা হবে দেশদ্রোহ।"

সুধী বেশ বুঝতে পেরেছিল লেবারের কাছে ভারত কেন, খোদ ইংলণ্ডের গরিব-দুঃখী বিশেষ উপকার পাবে না, পেতে পারে না। ইংলণ্ডের ধনিকদের মুনাফা যাতে বাঁচে সেই হল প্রথম কথা। মুনাফায় টান পড়লে ধনীরা টান মেরে ফেলে দেবে স্নোডনকে, ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে। অথবা ওঁরাই যোগ দেবেন ধনীদের দলে। নিজের দেশে যাদের এত কম ক্ষমতা তারা কিনা ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রতিশ্রুত। ডানদিকের সেই ভদ্রলোক চাল দিয়ে বলছিলেন, "আমরাই এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চালক, এত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে সময় বলা কি সম্ভব? আপনাদের স্বায়ত্তশাসন হবে এক সময়।"

"আমরা তার জন্যে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকিনি।" সুধী বলল, "দেশকে যেদিন হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারব সেইদিন দেশ আমাদের নিজের হবে। বাইরের লোক আমাদের উপর জোর খাটাতে পারবে না, ওদের গায়ের জোরের চেয়ে আমাদের না-এর জোর বেশী হবে।"

ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি জানতেন না যে জগতে না-এর জোর বলে একটা জোর আছে আর ভারতবর্ষে সেই মন্ত্রের সাধনা চলেছে।

"মাই ডিয়ার ফেলো," জন বললেন, "আমাদের না-এর জোর নেই, তা নয়। কিন্তু সে জিনিস প্র্যাকটিকল নয়। যতদিন না আমরা নিজের চোখে দেখব যে ভারতবর্ষে সে জোর জয়ী হয়েছে ততদিন আমরা আমাদের ভোটের জোরের উপর নির্ভর করব, যদিও জানি যে ওতে আমাদের অদৃশ্য শাসকদের কোনো পরিবর্তন হবে না।"

"তা যদি না হয়", সুধী জেরা করল, "তবে ডেমক্রেসীর মূল্য কী? ভোটের জোরে শাসক হয়েও অদৃশ্য শাসকের বেনামদারি!"

"ডেমক্রেসীর ঠাট বজায় রেখে চলতে হবে, যদি ভবিষ্যতে আসল বস্তুটা বিবর্তিত হয়।"

"ডেমক্রেসী মানে ডেমক্রেসীর রীতিরক্ষা?" সুধী জনকে কোণঠাসা করল। তারপর সুধাল, "সোশিয়ালিজমের কী গতি হবে? লেবার পার্টির অন্য নাম তো সোশিয়ালিস্ট পার্টি। অদৃশ্য শাসকরা কি সোশিয়ালিজম সহ্য করবেন?"

"সেই কথাটাই বলতে চেষ্টা করছিলাম। লেবারকে ওরা টিকতে দিলে হয়।

সোশিয়ালিজমের দিকে পা বাড়ালেই ওরা খোঁড়া করে দেবে, সেই ভয়ে ম্যাক্‌ডোনাল্ড হয়তো পা বাড়াবেন না, কেবল হুঙ্কার ছাড়বেন।"

"তা হলে সোশিয়ালিজমের কোনো আশা নেই, কেমন?"

"আশা না থাকলে কী নিয়ে বাঁচতুম? কেনই বা লেবার আন্দোলনে যোগ দিতুম? আমি তো স্বভাবতঃ লিবারল।" জন হাসলেন।

"আপনার আশা আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে সোশিয়ালিজমের কী আশা! যাদের হাতে ধনোৎপাদনের যত কিছু কলকাটি, বণ্টনও যাদের হাতে, যাদের হাতে রাষ্ট্রের উপর চাপ দেবার যত রকম উপায়, তারা থাকতে লেবার পার্টি করবে কী! বার বার মেজরিটি হবে, বার বার আইন পাশ করবে, সেসব আইন কার্যকর করা যাদের কাজ তারা যদি না করে, তখন?"

"না, আমাদের সিভিল সার্ভিসের উপর আমাদের আস্থা আছে।"

"আমারও। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে সোশিয়ালিজম ছেলেখেলা নয়। যাদের ওতে আন্তরিক বিশ্বাস নেই তাদের দ্বারা ওর প্রয়োগ আন্তরিকতাহীন হবে। রাশিয়ানদের সঙ্গে আমার একটুও মতের মিল নেই, কিন্তু ওদের জলন্ত উৎসাহ আর দ্বিধাহীন পদক্ষেপ কি আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে দেখেছেন?"

রিজার্ড নীরব হলেন। ডানদিকের সেই ভদ্রলোক তাঁর ডানদিকের একজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। সুধীর দিকে ফিরে পৃষ্ঠপোষকের মতো বললেন, "হবে, হবে, স্বায়ত্ত-শাসন হবে। ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন।"

সুধী এর উত্তরে বলল, "আমরা তো বিশ্বাস করে আসছি, কিন্তু যারা তাঁকে পার্লা-মেন্টে পাঠিয়েছে তারা বিশ্বাস করলে হয়।"

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, "আপনি বলতে চান ম্যাক্ একটা ময়ূর। হা হা হা হা। বাস্তবিক ওঁর মতো জাঁকালো লোক খুব কম আছে।"

"না, আমি ব্যক্তিগত দোষত্রুটির উল্লেখ করতে চাইনে। কথা হচ্ছে, সোশিয়ালিজম তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত হবে কি হবে না। যে কাজটির জন্যে তাঁকে ভোট দিয়ে পাঠানো হয়েছে সেটি ছাড়া তিনি যদি আর কিছু করেন তবে তাঁকে বিশ্বাস করবে না তাঁর নিজের লোক।"

ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হুঁ"। অনেক কসরত করে মেজরিটি তো মিলল, এখন মেজরিটি নিয়ে করি কী আমরা! এবার বিদায় হলে চিরকালের মতো যাব!"

২

সেদিনকার সেই লাঞ্ছনের পর সুধী পার্লামেণ্টারি স্বরাজ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবল। ত্রিশ বছরের অধিককাল অক্লান্ত পরিশ্রম করে লেবার এত দিনে মেজরিটি পেল। সে যদি মাত্র একটা পার্টি হতো ততো কথা ছিল না, সে একটা মুভমেণ্ট। বহু আদর্শবাদীর স্বপ্ন তার অঙ্গে জড়িত। বহু হৃতসর্বস্বের একমাত্র আশার স্থল সে। যদি দুর্বল হয়, দৃঢ় না হয়, তবে জনসাধারণের হার হল। খনির মালিক খনিক হবে না, থাকবে ধনিক। কলের মালিক শ্রমিক হবে না, থাকবে ধনিক। জমির মালিক কিষাণ হবে না, থাকবে জমিদার। অবশ্য খনিক বা শ্রমিক বা কিষাণ যে সাক্ষাৎ মালিক হতো তা নয়, হতো রাষ্ট্রের মারফৎ। কিন্তু ধনিক কিছুতেই রাষ্ট্রের মালিকানা মানবে না, ক্ষতিপূরণ দাবী করবে, রাষ্ট্র যদি বেশী রকম ট্যাক্স বসাতে যায় ব্যাঙ্কের দ্বারা তুরুপ করবে। ধনীদের হাতেই রয়েছে তাস।

পার্লামেণ্টারি স্বরাজ নিয়ে আমরা কী করব? করতে পারতুম সোশিয়ালিজম। তার পদে পদে বাধা। আর কী করবার আছে? পার্লামেণ্টারি ডেমক্রেসী কি মানববুদ্ধির চরম বিকাশ? নদী যদি এক দিকে যেতে না পায় সে কি সেইখানে দাঁড়িয়ে পায়চারি করে? না, সে আর একদিকে পথ কাটে? আমরা পথ কেটে নেব, থামব না।

"বুঝতে পারছিনে, চক্রবর্তীজী", সহায় সব শুনে বলল, "আপনার মনে কী আছে?"

"সহায়, তুমি তো জান আমরা অনেক দিন যাবৎ স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা দিইনি। তার কারণ পার্লামেণ্টারি স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের কেমন একটা সংশয় ছিল। ওটা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না বলে তো বটেই। তা ছাড়া ওটা একটা উচ্চাঙ্গের খেলা। যাদের অন্য কাজ নেই তাদের ও খেলা শোভা পায়। যারা সমাজকে নতুন করে গড়তে চায়, উৎপাদন বণ্টন সম্বন্ধে একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করতে চায়, তারা যদি ওতে ভোলে তবে সর্বহারাদের অভিসম্পাত বজ্র হয়ে নামে। লেবার পার্টির জয়লাভের পর সেদিনকার সেই লাঞ্ছনে আমার চোখ ফুটেছে।"

"তবে কি," সহায় চঞ্চল হয়ে বলল, "আমাদের সেই সব রাজা রাজড়ার যুগে ফিরে যেতে হবে?"

"না, তা কে বলছে? আমি যা বলতে চাই তা এই যে ডেমক্রেসীর একাধিক রূপ আছে। যেটার নাম পার্লামেণ্টারি সেটার দৌড় তো দেখছি। তা দেখে কী করে তা আমাদের দেশের জন্যে চাইতে পারি?"

মার্সেল কোনো দিন দুষ্টু হবে না, দিন দিন আরো শিষ্ট হচ্ছে। তা লক্ষ করে সুধীর মন উদাস হয়। এই বয়সে দুষ্টু হওয়াই মিষ্টি, শিষ্ট হওয়াটা অনাসৃষ্টি।

"আয়, মার্সেল, আমার কোলে আয়।" সুধী তাকে কোলে টেনে নেয়। বেচারি এত

শান্ত যে একটুও অবাধ্য হয় না।

"আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারিনি, চক্রবর্তীজী। আপনি ধরে নিয়েছেন যে ডেমক্রেসীর লক্ষ্য সোশিয়ালিজম—"

"পার্লামেণ্টারি ডেমক্রেসীর স্বাভাবিক পরিণতি সোশিয়ালিজম, সব ডেমক্রেসীর নয়। আর পার্লামেণ্টারি ডেমক্রেসীরও নয়, যদি মাথার উপর একদল অদৃশ্য শাসক বসে থাকে ও প্রভাব বিস্তার করে।"

"আমি মানতে পারিনে। আমি চাই যে আমাদের দেশেও একাধিক পলিটিকল পার্টি থাকবে ও পালা করে মন্ত্রিত্ব করবে। ইংরেজরা আমাদের সুযোগ দিচ্ছে না, নইলে আমরাও খাসা ডিবেট করতে পারতুম। আপনার মনে আছে আমি কেমন প্রাইম মিনিস্টার সেজেছিলুম?"

সুধী হেসে বলল, "আসল প্রাইম মিনিস্টার হলে দু'মাস টিকতে পারতে না। দেশে গরিবের সুমারি নেই, ওরা এসে ঘেরাও করত, কান মলে দিত।"

সহায়ের মতো ডিবেটার তার কলেজের প্রাইম মিনিস্টার হয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, তার দেশের প্রাইম মিনিস্টার হতে চায়। ইংরেজ বাদী। সুতরাং তাড়াও ইংরেজকে। এই তার পলিটিক্স্।

"আইন অমান্য। বুঝলেন, চক্রবর্তীজী!" সহায় তর্জনী আস্ফালন করল। "আমরা যদি আইন পাশ করতে না পারি তবে আমরা পরের আইন মানব কেন? হাঁ, চক্রবর্তীজী, আমরা চাই পার্লামেণ্টারি স্বরাজ, আইন তৈরি করবার অধিকার। ওসব রাজা রাজড়ার যুগে ফিরে যাওয়া হবে না। ওরা ডিবেট করতে জানত না। ওরা প্রশ্নের উত্তর দিতে জানত না। ওরা বাজেট পেশ করত না।"

মার্সেলকে মাঝে মাঝে এক একটি কথা বলতে বলতে সুধী সহায়ের সাধ শুনছিল। মার্সেল সহায়ের ও সুধীর হিন্দী শুনে হতবাক হয়েছিল।

"না, সহায়, পার্লামেণ্টের মাদকতা কাটিয়ে উঠতে হবে। ও আমাদের বস্তুজ্ঞান নাশ করবে। ওর যে আবশ্যক নেই তা নয়। কিন্তু রেল লাইনের চেয়ে পায়ে হাঁটার রাস্তার আবশ্যকতা বেশী। ডিবেট করার চেয়ে, আইন করার চেয়ে পাঁচ জনে মিলে গ্রামের দশ জনের জীবিকার সংস্থান করা ভালো, শিক্ষার সংস্থান করা ভালো। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের জন্যে আমরা রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হব না, গ্রামে গ্রামে তার আয়োজন করব। আমরা যা চাই তা পঞ্চায়েতী স্বরাজ।"

সহায়ের মনঃপূত হল না। সে বলল, "এটা বিংশ শতাব্দী।"

সুধী বলল, "সেইজন্যেই বলছি। তুমি কি ভাবছ তোমার আইন অমান্যের দরুন কলওয়ালাদের, আমদানী-রপ্তানি-ওয়ালাদের, ব্যাঙ্ক-ওয়ালাদের টনক নড়বে? বরং গ্রামের

লোক গ্রামে থাকলে, শহরে না এলে, শ্রমিকের অভাবে তাদের কারবার মাটি হবে।"

"ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারবার মাটি হবে কার?"

"কলওয়ালার! যদি একজনও গ্রামিক শহরে না আসে। যদি শহরের শ্রমিক গ্রামে ফিরে যায়।"

সহায় ভেবে বলল, "যদি!"

"তা যদি হয় তবে ক্যাপিটালিজম খতম হবে আপনি। তাকে খতম করার জন্যে বিপ্লবের দরকার হবে না, সোসিয়ালিজমেরও দরকার থাকবে না।"

এমন সময় মিটেলহলৎসার এসে সুধীর সম্বর্ধনা করল। "মিস্টার চাক্—চাক্।"

সুধী বলল, "থাক, থাক। জর্মনের মুখে শর্মণের নাম ঠিক উচ্চারণ হয় না।"

"শর্মণ! শর্মণ কী?"

সুধী বলল, "জানেন না বুঝি? গত যুদ্ধের সময় একজন গুলিখোরের কাছে গল্পটা শুনেছিলুম। তিন ভাই ছিল, শর্মণ, বর্মণ, আর জর্মন। দুই ভাই থাকল ভারতে, এক ভাই গেল ইউরোপে। আপ'ন আমার সেই ভাই।"

মিটেলহলৎসার হেসে আকুল হল। তারপর বলল, "কথাটা সত্যি। আমরা আর্য। আপনারাও তাই। এই দেখুন না আমার স্বস্তিকা।"

"কিন্তু আমরা তো ক্যাপিটালিজমকে খতম করতে চাইনে," সহায় বলল, "আমরা চাই ইংরেজ রাজত্ব খতম করতে।" এতক্ষণ সে এই কথাটা ভাবছিল।

"দুটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইংরাজ আমাদের দেশে যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরূপে। সেই কোম্পানীর নির্বাণ ঘটলেও তারই বংশধর বা অংশধরগণ আমাদের অদৃশ্য শাসক। প্রকাশ্য শাসক যেই হোক। কার কাছে আমরা স্বরাজের দাবী করি? ইংরেজের কাছে। কিন্তু ইংরেজেরও শাসক আছে!"

মিটেলহলৎসার অনুধাবন করছিলেন। তিনি কণ্ঠক্ষেপ করলেন। "নিরীহ ভালো-মানুষ হয়ে আপনারা উদ্ধার পাবেন না, আমাদের অনুসরণ করুন। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করছি। একদিন আমাদের এই অজ্ঞাতবাস সমাপন হবে। তখন দেখবেন আমাদের বিক্রম।"

সুধী হেসে বলল, "জর্মনের সঙ্গে শর্মণের তফাৎ আছে। আমরা নিরীহ ভালোমানুষ হয়েই আমাদের পরাক্রম দেখাব।"

"কিন্তু কী আপনার প্ল্যান?"

"ঐ যে বললুম। শহরের শ্রমিক গ্রামে গিয়ে বসবে, গ্রামের বেকার শহরে আসবে না। কলওয়ালাদের কল বন্ধ হবে। ক্যাপিটালিজম খতম হলে ইংরেজ কাকে পাহারা দিতে ভারতে থাকবে? সে অন্য বাজার খুঁজবে!"

"ও যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।" মিটেলহলৎসার যা বললেন তার অর্থ কতকটা এই রূপ। "আপনাদের স্বদেশী কলকারখানারও ক্ষতি হবে, যদি এই হয় আপনাদের জাতীয় নীতি।"

সুধী বলল, "আমাদের দেশীয় বণিকরাও লাভের মাত্রা চড়িয়ে ও মজুর সংখ্যা কমিয়ে ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সেই সঙ্গে করছে দেশের সর্বনাশ। ওরা যায় তো এক নৌকায় যাবে, পরে ওদের জন্যে আর একটা নৌকা খুঁজে পাই কোথায়।" সুধী বক্রোক্তি করল।

সহায় বলল, "না, না, না। আমাদের দেশের এখন সবচেয়ে বেশী দরকার বড় বড় কলকারখানা। নইলে আমরা সভ্য জগতে মুখ দেখাব কী করে? একটা আলপিনও আমাদের দেশে হয় না। মেড ইন ইণ্ডিয়া বলে কোনো জিনিস দেখেছেন?"

মিটেলহলৎসার তাঁর ন্যাড়া মাথা দুলিয়ে সহায়ের সমর্থন করলেন।

৩

সুধী যতক্ষণ থাকে সুজেৎ আড়ালে আবডালে ঘোরে, সামনে বেরয় না। তার অস্তিত্বের আভাস দেয় বাইরে থেকে মার্সেলকে ডেকে বা জ্যাকিকে শাসিয়ে। কেন সে এমন পর্দানশীন হয়েছে কে এর মর্ম জানে?

সুধী ইচ্ছা করে হাঁক দেয়, "ম্যাদমোয়াজেল, আমরা যে হাঁ করে বসে আছি, গলা যে শুকিয়ে গেল।"

তখন সুজেৎ শশব্যস্তে ছুটে আসে। সলাজ হেসে মিনতি জানায়, "এক মুহূর্ত সবুর করুন, আমি আনছি আপনাদের চা।"

সহায় পর্যন্ত আজকাল গ্যালাণ্ট হয়েছে। "ম্যাদমোয়াজেলকে আমি সাহায্য করতে পারি?"

"ধন্যবাদ।" সুজেৎ বিনীতভাবে বলে, "আপনি বরং মিস্টার চক্রবর্তীকে সবুর করতে সাহায্য করুন।"

"আয়, মার্সেল, আমার সঙ্গে আয়।" সুজেৎ মার্সেলকে সুধীর কোল থেকে টেনে নিয়ে যায়। সেই ছলে সুধীর সংস্পর্শে আসে ও ক্ষমাকাতর চোখে তাকায়।

"মিস্টার চাক্ চাক্—" মিটেলহলৎসার কী বলতে চেষ্টা করে।

"আপনি আমায় শর্মণ বলে ডাকতে পারেন।" সুধী অভয় দিল। "অমন করে চাক্ চাক্ করলে লোকে ভাববে আপনি হয়তো একটি কাঠঠোকরা কিংবা আমিই একটি।"

মিটেলহলৎসার রসিকতার ধার ধারে না। বলল, "তাই বেশ। শর্মণ, আপনি

আপনার দেশের জন্যে ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম গ্রহণ করুন, অমন সর্বোরোগহর লাঠ্যৌষধি থাকতে কেন আপনি গ্রামে পালাবার প্ল্যান আঁটছেন ?"

সুধী করুণ হাসে। "তুমি কি বুঝবে, জর্মন, শর্মণের ব্যথা ! অন্ততঃ তিন হাজার বছর ধরে আমাদের দেশের শিল্পীরা সুতো কেটেছে, কাপড় বুনেছে, তৈজস তৈরি করেছে, আসবাব বানিয়েছে, সোনারূপার কাজ করেছে, লোহার হাতিয়ার গড়েছে । তাদের প্রতিভা ও দক্ষতা একটুও শিথিল হয়নি, উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করেছে। কেউ তাদের অন্ন মারতে পারেনি, তৈমুর চেঙ্গিজ মিহিরকুলও তাদের প্রাণে মারেনি। কিন্তু এই দেড়শো বছরের অনাত্মীয় নীতি তাদের অন্ন ও প্রাণ দুই বিপন্ন করেছে, আর কিছু দিন পরে তাদের বংশ উজাড় হবে। থাকবে একরাশ কেরাণী ও কুলি, কুলিমিস্ত্রী ও চাষী। আর থাকবে সহায়ের মেড ইন ইণ্ডিয়া মার্কা ছাঁচে ঢালাই খেলো জিনিস।"

"কিন্তু শর্মণ", মিটেলহলৎসার বোঝাল, "এ কি শুধু আপনার দেশে ঘটেছে, আমার দেশে ঘটেনি, ইংলণ্ডে ঘটেনি ? যন্ত্রপাতির উদ্‌ভাবনের সঙ্গে কারুশিল্পের অন্তর্ধান জড়িয়ে রয়েছে সূর্যোদয়ের সঙ্গে চন্দ্রাস্তের মতো। যা থাকবার নয় তার জন্যে আক্ষেপ করে কী হবে ? যা থাকতে এসেছে তাকে আয়ত্ত করুন। ন্যাশনাল সোসিয়ালিজম তাকে আয়ত্ত করবার বিজ্ঞান।"

সুজেৎ চা এনেছিল। সুধীর জন্যে দুধ। সুধী সুজেৎকেও অনুরোধ করল তার কাছে বসতে। মার্সেল তো বসলই।

"আমিও সেই কথা বলি," সহায় যোগ দিল। "আমাদের দেশ এখনও পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে রয়েছে, ইণ্ডাস্ট্রীয়ালইজেশন জোরসে চালানো দরকার, অন্যান্য দেশের চেয়ে আরো জোরসে। শিল্পী যদি টিকতে না পারে তবে ধরে নিতে হবে তার উদ্বর্তনের মূল্য নেই। তার জন্যে অশ্রুমোচন একটা সেন্টিমেণ্ট। আমরা তাজমহল চাইনে, চাই ইফেল টাওয়ার।"

প্যারিস গিয়ে সহায়ের মনে ধরেছিল ওটা।

"শিল্পী টিকবে কি না জানিনে, কিন্তু ইফেল টাওয়ার যে টিকবে না তা নিশ্চিত জানি। যন্ত্রপাতির দ্বারাই যন্ত্রপাতির ধ্বংস হবে। বোমা আর শেল মিলে তার সত্তা রাখবে না। যার ধ্বংস অনিবার্য তার বিস্তার যদি প্রগতির লক্ষণ হয় তবে তেমন প্রগতি যেন ভারতের না হয়।" সুধী প্রার্থনার স্বরে বলল।

ভারতের শিল্পী কেবল শিল্পী নয়, সে তার ঐতিহ্যের বাহক, তার সংস্কৃতির রাজদূত, তার ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ শতাব্দীর মঙ্গলসূত্র। গ্রামের যে বুড়ী চরকায় সুতো কাটে সে কি শুধু সুতো কাটে ? সে ভারতের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্নভাবে হস্তান্তরিত করে যায়। এসব কথা এত সূক্ষ্ম, এত শুচি যে উচ্চ নিনাদে ডঙ্কা পিটিয়ে ঘোষণা করলে অবমাননা

হয়। যারা ভারতকে ভালোবাসে তারা চরকাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে লাঙলকে। তাদের কাছে ট্র্যাক্টর বা মিল প্রগতির দ্যোতক নয়, ধারাবাহিকতার নাশক।

সুধীর চিত্তে ভারতের ভাবী কার্যক্রম দানা বেঁধে উঠেছিল। সে গ্রামে গিয়ে গ্রাম-সংগঠনে মন দেবে, মনে রাখবে যে ভারতের গ্রাম কেবল গ্রাম নয়, ভারতের পৌর্বাপর্বের প্রতীক। তার মানে এমন নয় যে গ্রামগুলি তার চরকার আড়ৎ হয়ে থাকবে, সেখানে ছোট একটা তেলের ইঞ্জিন ঢুকবে না। গ্রামের সঙ্গে গোঁড়ামির সম্পর্ক দুশ্ছেদ্য নয়। তবে গ্রামের বিশেষত্ব এই হবে যে সেখানে সকলে সকলের জন্যে দায়ী হবে, কাউকে বেকার বসে থাকতে দেবে না, সে ধনী হোক বা গরিব হোক তাকে খাটতেই হবে, সকলের সঙ্গে ছন্দ রেখে চলতেই হবে। গ্রামে যারা থাকে তারা সকলে মিলে একটা সমাজ, একটা কমিউন। তারা হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে মিলে অখণ্ড। একজনের সঙ্কটে আরেক জন সাড়া দেয়, একজনের উৎসবে আরেকজন অংশ নেয়। এমনি করে তারা ভারতকে গতিমান করে। এ গতি দু'দিনের প্রগতি নয়, চিরদিনের পরমা গতি। ভারতের জীবনে দু'চার শতাব্দী কিছু নয়, তার কাছে কাল অন্তহীন। ভারত থাকবেই, তার শিল্পীও থাকবে, থাকবে না কলকারখানার উন্মাদ হট্টগোল, ধনিক শ্রমিকের হুমকি ও হানাহানি।

"গ্রামে পালাবার প্ল্যান।" সুধীর মনে পড়ল মিটেলহলৎসারের উক্তি। "হের মিটেলহলৎসার," সুধী বলল, "ও প্ল্যান আপনাকেও করতে হবে, যদি যুদ্ধ বাধে। আসছে বারের যুদ্ধে শহরকে শহর খালি করে দিতে হবে, কেননা শহরকে শহর বিধ্বস্ত হবে। আধুনিক যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষ মারা নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য যা দিয়ে মানুষ ধন উৎপাদন করে সেই সরঞ্জাম চুরমার করা। শহরেই সেসব সরঞ্জাম একঠাঁই হয়েছে। কলকারখানা, দোকানবাজার, রেল স্টীমার, ব্যাঙ্ক। এগুলি যদি যায় তবে প্রতিযোগিতার মূল উপাদান যায়, প্রতিযোগী মাথা তুলতে পারে না, এর চেয়ে দশ লাখ মানুষ মারা গেলে কম লোকসান।"

মিটেলহলৎসার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, "Hands off Germany! এবার যদি আমার দেশে ফরাসী কি ইংরেজ নাক ঢোকায় আমরা তাদের একটিও শহর আস্ত রাখব না, একটিও গ্রাম আস্ত রাখব না, একটিও বন্দর আস্ত রাখব না, একটিও সুড়ঙ্গ আস্ত রাখব না। দেশ ছেড়ে তাদের দেশান্তরী হতে হবে। আমরা কিসের প্ল্যান আঁটছি আমরাই জানি, কিন্তু আপনার ফরাসী ও ইংরেজ বন্ধুদের বলবেন উপনিবেশে পালাবার প্ল্যান আঁটতে।"

সহায় আতঙ্কিত স্বরে বলল, "আপনারা কি ইংলণ্ডেই থাকবেন, না ভারতেও শুভাগমন করবেন?"

মিটেলহলৎসার হো হো করে হেসে উঠল। "না, আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আমরা যদি আগমন করি তো আপনাদের বন্ধন মোচনের জন্যে। আমাদের মতো অকৃত্রিম মিত্র আপনাদের আর নেই।"

মার্সেলকে নিজের হাতে খাওয়াতে খাওয়াতে সুধী বলল, "আমাদের কেউ শত্রু নয়, সকলেই মিত্র। মানুষের সঙ্গে আমাদের লেশমাত্র শত্রুতা নেই। ইংরেজ হলেও না, জার্মান হলেও না। আমাদের শত্রুতা যন্ত্রপাতির সঙ্গে, ক্যাপিটালের সঙ্গে, mass productionএর সঙ্গে। ওসব জিনিস বিদেশী হলেও শত্রু, স্বদেশী হলেও শত্রু। আমাদের শত্রুতা মেড ইন ইংলণ্ডের সঙ্গে, মেড ইন জাপানের সঙ্গে, মেড ইন ইণ্ডিয়ার সঙ্গেও; আমাদের মিত্র, Made in the Village."

"আপনাদের ব্যাপার," মিটেলহলৎসার ওঠবার উদ্যোগ করলেন, "আপনারাই ভালো বোঝেন। তবে মেড ইন জার্মানীর সঙ্গে কিসের শত্রুতা? আমাদের মতো অকৃত্রিম মিত্র," তিনি পুনরুক্তি করলেন, "আপনাদের আর নেই। আচ্ছা মিস্টার চাক্—শর্মন, আজ তা হলে গুড বাই।"

"বেশ লোক ঐ জার্মান।" সহায় হাঁফ ছাড়ল। "তবে ওরা যে ভারতের মিত্র তা আমি বিশ্বাস করিনে।"

"কেন! মিত্র নয় কেন? সকলেই আমাদের মিত্র। আমাদের জাতীয় নীতি বসুধৈব কুটুম্বকম্। আমাদের ফরেন পলিসি হবে, কেউ আমাদের পর নয়, সকলে আপন। কিন্তু কেউ আমাদের শোষণ করতে পাবে না, নিজের দেশের কলওয়ালা, ব্যাঙ্কওয়ালা, আমদানি-রপ্তানিওয়ালারাও সে দিক থেকে পর।"

সহায় বলল, "জমিদার আর মহাজন? তাদের বেলায় কী পলিসি?"

"জমিদার আর মহাজন?" সুধী সকৌতুকে বলল। "আমি যে দুইই। যদিও নামে।"

"আমিও জমিদারের কোঠায় পড়ি। যদিও নামে।" সহায় সাবধানে বলল।

"আমাদের বেলায় আমাদের পলিসি," সুধী হেসে বলল, "আত্মরক্ষা। থাক, সহায়, ও কথা অন্য দিন হবে। এখন সুজেৎকে ধন্যবাদ দেওয়া যাক আমাদের পিত্তরক্ষার জন্যে। ম্যাদমোয়াজেল, Merci beaucoup."

৪

কয়েকবার উজ্জয়িনীর ওখানে হাজিরা দিয়ে সুধী তার নাগাল পেল না। সে যে কার সঙ্গে বেড়ায়, কোথায় যায়, তা কেউ বলতে পারে না। সে এখনো লণ্ডনে আছে এই পর্যন্ত জানা যায়।

তার মা সুজাতা গুপ্তকে সুধালে তিনি উত্তর দেন, "ও কি আমার মেয়ে! ওর বাপ ওর মাথাটি খেয়েছেন, আমি মরছি জবাব দিয়ে।"

সুধী বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে চিঠি লিখে এনগেজমেণ্ট করল। তাতে ফল হল। উজ্জয়িনী সুধীকে দর্শন দিল।

"তারপর, সুধীদা! আমি সত্যি খুব দুঃখিত, তুমি আমাকে আগে লিখলে না কেন? একখানা স্লিপ লিখে রেখে গেলেও পারতে।"

"তাও রেখে গেছি।"

"ওমা, তাই নাকি! তবে তো শাসন করতে হচ্ছে মেডকে। আচ্ছা, তুমি আমাকে মাফ কোরো। কেমন? আমিই তোমার স্লিপগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।" এই বলে সুধীর হাত ধরে মাফ চাইল। বলল, "একজনের উপর রাগ হয়েছিল, তাঁকে তো জানাতে পারিনি, তোমাকেই জানালুম। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।"

"তা তোর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, আমিও কম রাগ করিনি।" সুধী আশ্বাসনা দিল।

"শুনে নিজের উপর শ্রদ্ধা হল।" খুশি হয়ে বলল উজ্জয়িনী। "কিন্তু এখন আমি রাগ করতেও ঘৃণা করি। আমার অভিমান নেই, ঈর্ষা নেই, বিকার নেই। সুতরাং তিনি তাঁর কমরেডদের নিয়ে রাসলীলা করুন, আমার কাজ করি আমি।"

এই বলে সে তার জাহাজী পোশাক দেখাল। সমুদ্রযাত্রার জন্যে সে ইউরোপীয় পোশাক কিনেছে। সুধী ঈষৎ অপ্রসন্ন হল।

"তোমার পছন্দ হয়নি। কেমন?" উজ্জয়িনী বুঝতে পেরেছিল। "কিন্তু আমার পক্ষে তোমার নজীর আছে। তুমি যদি আধাআধি ইউরোপীয় পোশাক পরতে পার, আমি পারব না কেন? যেহেতু আমি নারী? এখানে একটা ভারতীয় সমাজ আছে বলে আমার ভয়, পথে সে বালাই নেই। নিউইয়র্কে আবার শাড়ী পরা যেতে পারে, কিন্তু সেখানেও পরব না ভেবেছি, ভারতীয়রা যা বলে বলুক।"

নাড়াচাড়া করতে করতে একটা রিভলভার বেরিয়ে পড়ল।

সুধী জানতে চাইল, "এটা কেন?"

"শুনেছি আমেরিকায় গ্যাংস্টার আছে। এটা সঙ্গে থাকলে মনে সাহস থাকবে। কেউ যদি গায়ে হাত দেয় কি অপমান করে তবে টের পাবে আমার টিপ কেমন মর্মভেদী।"

"তা ছাড়া," সে আপনি বলল, "দেশে ফিরে যখন নারীবাহিনী গড়ব তখন প্রত্যেকের হাতে একটা করে এই অস্ত্র দেব। ভারতকে স্বাধীন করতে, ভারতের নারীকে স্বাধীন করতে, এই অস্ত্র অমোঘ।"

"সে কী রে।" সুধী চমকে উঠল। "কে তোকে এসব শিক্ষা দেয়। আমি কি কোনো দিন এমন কথা বলেছি?"

"কেন? আমার কি নিজের বুদ্ধি নেই? বৃন্দাবনে কেমন কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলুম?"

"না। আমাদের অস্ত্র, সহিংস নয়, আমাদের জাতীয় আয়ুধ অহিংসা।"

"রেখে দাও তোমার অহিংসা।" উজ্জয়িনী শ্লেষ মাখিয়ে বলল, "শত্রুর অন্তরের পরিবর্তন যদি চাও তবে অন্তরে একটি গুলি বিদ্ধ করে দাও, ঠিক হৃৎপিণ্ড তাক করে। দেখবে, তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হবে।"

সুধী জিজ্ঞাসা করল, "তোর নারীবাহিনী কি প্রকাশ্যে কাজ করবে, না গোপনে?"

"প্রকাশ্যে ওরা সাঁতার কাটবে, ভলি বল খেলবে, থিয়েটার করবে। গোপনে গুলি চালাবে।"

"সর্বনাশ! এসব তোকে শেখাল কে! এ যে টেররিজম!"

"কেন, আমার কি বিদ্যা এত কম? রুশ দেশের গল্প পড়িনি?"

সুধী চিন্তিত হয়। এত দিন একে এত শিক্ষা দিয়েছি, এত শান্তিবাদীর সঙ্গে আলাপ করিয়েছি, সব ব্যর্থ হল।

"তোমার ভয় নেই, সুধীদা, আমরা যাকে তাকে মারব না, তাতে গুলির বাজে খরচ, গুলির দাম খুলির চেয়ে বেশী। যাদের মরা উচিত তারাই মরবে। তাদের কেউ হয়তো স্ত্রীকে ছেড়ে কমরেড নিয়ে কেলি করছে, কেউ প্রেমিক সেজে সরলা অবলাকে পথে বসিয়েছে, কেউ রীতিমত নারীধর্ষক, কেউ বিধবাকে একাদশীর বিধান দিয়ে নিজে সে বেচারির সম্পত্তি খেয়েছে, কেউ বুড়ো বয়সে শিশু বিয়ে করেছে, কেউ বৌকে বেঁধে ছ্যাঁকা দেয়, ছোট ছেলেকে মারে, এমনি কত রকম শয়তান আছে যাদের মরা উচিত। এ ছাড়া দেশের যত বিশ্বাসঘাতক, শাসক ও শোষক তাদের দমন করতে হবে।"

প্রকাণ্ড লিস্ট। তার জন্যে যদি নারীবাহিনী গঠন করতে হয় তবে বিশ হাজার প্রবলা আবশ্যক। সুধী মৃদু হাসে।

সুধীর হাসি দেখে উজ্জয়িনী চটে। "তোমার লজ্জা করা উচিত, সুধীদা। এসব অত্যাচার চোখে দেখাও অন্যায়, কানে শোনাও অন্যায়। এর যদি প্রতিকার না হয় তবে কিসের অগ্রগতি? মেয়েরা কলেজে পড়লে কি মোটরে চড়লে কিসের বাহাদুরি? আমি অমন মেয়েদের অবজ্ঞা করি, ওরা কৃপার পাত্র। আমার বাহিনীতে আমি কুলি মজুরের মেয়ে নেব, ওরা ঝাঁটা মারতে জানে, হাতের খাড়ু দিয়ে জখম করতে পারে, ঢিল ছোঁড়ে।"

"প্রতিকারের কথা বলছিলি।" সুধী মনে করিয়ে দিল। "টেররিজম দিয়ে প্রতিকার

হয় না। ওতে অন্যায়কারীর স্তরে নেমে যাওয়া হয়। কুকুরে যদি কামড়ায় তবে কুকুরকে কামড়ানো কোনো প্রতিকার নয়।"

"কুকুরকে কামড়ানো না, কুকুরকে চাবকানো, কুকুরকে গুলি করে মারা।" উজ্জয়িনী সংশোধন করল।

"একই স্তরের ব্যাপার। দাঁত দিয়ে কামড়ায়, হাত দিয়ে চাবকায়, হাত দিয়ে গুলি করে।"

উজ্জয়িনী রিভলভারটা বন্ধ করে চাবীর গোছা হাতব্যাগে পুরে বলল, "কত তর্কই করতে জান! এত দিন তোমাকে সহ্য করেছি, আর না। এবার আমি সত্যিকারের স্বাধীন। ললিতাদি আছেন বটে, তিনি তো আমার অন্তরায় নন।"

"অন্তরায় কে? আমি?" সুধী টিপে টিপে হাসল।

"তুমি নও তো কে? কাকে আমি সব চেয়ে বেশি ভয় করি? কার ভয়ে পালাচ্ছি? তুমি আমার বিবেক, আমার ধর্মবুদ্ধি। তুমি না থাকলে আমি এতদিনে নাইট ক্লাবের রাণী হয়ে জেলে যেতুম এই দেশেই। এবার তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি আইন অমান্য করব কিংবা সাহেব খুন করব, করে জেল খাটব কিংবা ফাঁসি যাব। তুমি ততদিনে বিয়ে করে জজ কন্যা ও অর্ধেক জজিয়তি পেয়ে এমন সুখী হবে যে লণ্ডনের এইসব দিন নিঃশেষে ভুলবে। তোমার তখন মনে থাকবে না যে উজ্জয়িনী নামে কেউ ছিল, তোমার জন্যে লুচি ভাজত, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করত। সুধীদা, দশ বছর পরে কি তুমি আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে?"

সুধী বিচলিত হল। ধরা গলায় বলল, "জজ কন্যার কথা বলছিলি, আর কয়েকদিন থেকে গেলে তাঁর বাগ্‌দান দেখে যেতিস।"

"তোমার সঙ্গে তো?"

"না রে।"

উজ্জয়িনী একসঙ্গে হেসে ও কেঁদে বলল, "বেচারা সুধীদা! বেচারা, বেচারা সুধীদা!"

তাদের ভাব হয়ে গেল। উজ্জয়িনী সুধীর কাঁধে মাথা রেখে বলল, "তোমার আমার এই যে মিল একি আকস্মিক না ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত! আমরা দু'জনে কী করে একই দুর্ভাগ্যের অধিকারী হলুম?"

"আমি জানতুম," সুধীর স্মরণ হল তার এক বছর আগের স্বপ্ন, "এমন হবে। সুখ আমার তরে নয়। তোর তরেও নয়। আমরা জন্মদুঃখী। শোন, তোকে আমার সেই স্বপ্নের গল্প বলি।"

শুনে উজ্জয়িনী বলল, "স্বপ্ন কি সত্য হয়?" তারপরে সে নিজেই স্বীকার করল, "না হলে এমন হল কেন?"

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। শেষে উজ্জয়িনী বলল, "আবার যদি আমাদের দেখা হয়, যদি বেঁচে থাকি, তবে—"

"তবে—" সুধী স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল।

"যে যা ভাবে ভাবুক, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।"

"পাগলী!"

"পাগলী বলেই তো অমন কথা বলতে পারছি। অমন কাজ করতেও পারব। যাকে ভয় করি, ভক্তি করি, মনে মনে পূজা করি সে যদি বিমুখ না হয় তবে আমি সুখী না হই, সার্থক হব।"

৫

উজ্জয়িনীকে কিংস ক্রস স্টেশনে স্কটলণ্ডের ট্রেনে তুলে দিতে বহু লোক এসেছিলেন। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা না একটা উপহার ছিল। কেউ এনেছিলেন ফুল, কেউ চকোলেট, কেউ হালকা গোছের চুটকি নভেল। ক্রিস্টিন এনেছিলেন একটি লকেট। আণ্ট এলেনর একটি ডায়েরি, তাতে ছিল মহাপুরুষদের বচন।

উজ্জয়িনী হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার দু'চোখ ছাপিয়ে ঝরনা ঝরে। সে রুদ্ধ কণ্ঠে এই ক'টি কথা আধো আধো ভাবে বলে, "আমি কী করেছি যে আমার জন্যে এত!"

"কী করেছেন!" মোনা ঘোষ ফর ফর করে জবাব দেয়। "কী করেছেন! কথায় কথায় আমাকে ঠোনা মেরে তুলো ধোনা করেছেন। আমার শরীলে আর পদাথ নেই।" প্রভাতবাবুর ভাষায়।

অন্য সময় হলে তার বন্ধুরা অট্টহাসি হাসত। কিন্তু কেউ মুচকি হাসিও হাসল না। তখন মোনা অপ্রস্তুত হয়ে ঘটকের শরণ নিল। "কী বলিস, ভাই ঘটৎকোচ? সত্যি বলেছি কিনা?"

ছিল ঘোটক, হয়েছে ঘটৎকোচ। ঘটকেরও তো একটা মান সম্মান আছে। সে একটি চাঁটি মেরে বলল, "চুপ কর।"

বুলু তার স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল, "যেতে নাহি দিব। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর। বেবী, তোমার মন বদলাও, থেকে যাও আরো কিছু দিন। এখনো সময় আছে, তোমার পোঁটলা পুঁটলির ভার আমি নিচ্ছি।"

"আমিও।" "আমিও।" বলে জনাকয়েক এগিয়ে এল।

উজ্জয়িনী তখনো সেই একই কথা আবৃত্তি করছিল। "আমি কী করেছি! কেন আমার জন্যে এত!"

তার মা সুজাতা গুপ্তা আঙ্কল আর্থারের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তাঁর মতো দুঃখিনী যে ত্রিসংসারে নেই, তাঁর মেয়ে তাঁকে উপেক্ষা করে, একালের মেয়েদের বাতিক হয়েছে আইন অমান্য, গুরুজনের নিষেধ অমান্য, এই তাঁর অভিযোগ। আঙ্কল আর্থার তাঁর ভগিনীর প্রকৃতি অধ্যয়ন করে অভিজ্ঞ হয়েছেন। গ্রীক সাহিত্যেও এর নিদর্শন আছে। তিনি সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হলেন, "শুধু একালের নয়। চির-কালের।"

মিসেস গুপ্ত নিরাশ হলেন। ভারতফের্তা সিভিলিয়ান কি পুলিশম্যান হলে পিঠ চাপড়ে দিতেন। তা বটেই তো, বটেই তো, ভারতের মেয়েদের দুর্মতি হয়েছে, তারাও আইন অমান্য করবার স্পর্ধা রাখে।

"বেবী, তুমি ভেবেছ তুমি আমাদের ছেড়ে পালিয়ে বাঁচবে!" বিভূতি ও তার বুলডগ সেখানে এসে হাজির।

উজ্জয়িনী ড্রামণ্ডকে আদর করল, চুমু খেল। বলল, "বিভূতিদা, সবাই আমাকে সব কিছু দিচ্ছে। তুমি আমাকে এই কুকুরটি দাও।"

"তার চেয়ে বললে পারতে, তোমার জীবিকাটি দাও। আমি যে করে খাচ্ছি সে কার দৌলতে?" বিভূতি তার কুকুর আগলাল।

"যা বলছিলুম," বিভূতি মনে করিয়ে দিল, "তুমি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছ! আমরাও আসছি।"

"আমরাও। আমরাও।" একসঙ্গে বলে উঠল বুলু মোনা ও ঘটংকোচের দল।

"চমৎকার আইডিয়া।" বুলু বলল, "আমরা সদলবলে তোমার সঙ্গে আমেরিকা যাব, তারপর সদলবলে তোমার সঙ্গে লণ্ডনে ফিরব। তোমরা রাজি আছ তো, মীরা মণিকা মোনা?"

মোনা এতক্ষণে প্রশ্রয় পেতে বর্তে গেল। "রাজি বললে কম বলা হয়। আমি বলি আজই। এমন মিষ্টি হাতের ঠোনা কোথায় পাব আমি! বেবী ভাই, প্রতি গাল কাঁদে তব প্রতি ঠোনা তরে।"

সুধী ছিল ললিতা রায়ের কাছে। উজ্জয়িনীর তো এক ঝাঁক বন্ধু ও বান্ধব আছে, এ মহিলাটির কেউ নেই।

"তোমাকে সুধী বলে ডাকবার অনুমতি দিয়েছ, সেই সুবাদে বলি, সুধী, তোমার সঙ্গে পরিচয় আমার মনে থাকবে, তুমি হলে তাদের একজন যারা আমার চির চেনা।"

"দিদি, আমার ভাগ্য এমন যে আমাকে চিনতে দেরী হয় না তাদের যারা দুঃখকে চিনেছে।"

"জানিনে, ভাই, তোমার কী দুঃখ। কিন্তু আশীর্বাদ করি, তুমি যেন চিরসুখী হও।

যেন যা চেয়েছ সব পাও ও পেয়ে না হারাও।"

"না দিদি, অমন করে পর করে দেবেন না। চিরসুখীর চেহারা আলাদা। তাকে দেখে কেউ তাকে আপন বলে চেনে না।"

ললিতা বললেন, "যত দিন ঘরকন্না করছিলুম তত দিন চিনতুম দুটি একটি মানুষকে, তাদের নিয়ে সেই ছিল আমার পৃথিবী, সে পৃথিবী নড়ে না চড়ে না, পুরোপুরি স্থাবর। এখন বুঝেছি ঘরে ঘরে আমার ঘর আছে, দেশে দেশে আমার দেশ আছে, পথে পথে আমার আপনার জন। বুঝেছি পৃথিবী চঞ্চলা, শূন্যের বুক চিরে কোথায় ছুটে চলেছে, কোন দিন কার সঙ্গে সংঘাত ঘটে এক মুহূর্তে চৌচির হয়ে যাবে। পৃথিবী একটা ট্রেন, কে কোন স্টেশনে ওঠে, কে কোন স্টেশনে নামে, কিছুই স্থির নেই। টিকিটের গায়ে স্টেশনের নাম নেই। তা সত্ত্বেও আমরা ভাব আলাপ জমাই, নাম ঠিকানা সুধাই, খাবার ভাগ করে খাই, রাগারাগি করি, যার উপর রাগ করি সে যখন ঝপ করে নেমে চলে যায় তখন হাজার শিকল টানলেও গাড়ী থামে না।"

এই বলে তিনি চোখ মুছলেন।

সুধী বলল, "ঐখানেই মায়া। কেউ কাউকে চিনিনে, তবু নাম দিয়ে আপনার করে নিই, মনে ভাবি চিরকালের মতো বাক্‌সে ভরে রাখলুম। পৃথিবী মায়াবিনী, পদে পদে আমাদের ছলনা করে। ছোট ছেলের মতো আমরা বালু দিয়ে বাড়ী বানাই, ঢেউ আসে, বাড়ী ভেঙে যায়। আজকের মানুষ মর্ত্যের উপর স্বর্গ গড়তে চায়, বোঝে না যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল।" বলতে বলতে সুধীর চোখ সজল হয়ে এল।

সুধী লক্ষ করল, অস্পৃশ্য যেমন দেবতার কাছে যায় না, দূর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে দেবদর্শন করে, তেমনি দে সরকার দেখছে উজ্জয়িনীকে। সকলের থেকে তফাতে তার স্থান, সকলের চেয়ে তন্ময় তার ভাব, সকলের চেয়ে একাগ্র তার দৃষ্টি। সুধীর ভারি ভালো লাগল তাকে। ইচ্ছা হল তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু তাতে তার ধ্যানভঙ্গ হবে। শেষ দর্শনের মহার্ঘ মহিমা থেকে কেন বঞ্চিত করবে তাকে? সময় ছিল না, সুধী গেল উজ্জয়িনীর কাছে বিদায় দিতে ও নিতে।

এখন আর 'সুধীদা' নয়। এখন শুধু 'এই'। উজ্জয়িনী বলল, "এই! তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়, তোমাকে কত খুঁজছি। চিঠি লিখতে একদিনও ভুলো না।" কানে কানে আর কী বলল শোনা গেল না।

উজ্জয়িনী আর সে উজ্জয়িনী নয়। কেউ বলবে না যে সে উড়নচণ্ডী, শ্মশানকালী। কী যেন সে পেয়েছে। সেই পাওয়ার প্রসাদ তাকে প্রশান্ত করেছে, সংযত করেছে, নিরুদ্বেগ করেছে। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচপল তার চাউনি। কেবল অশ্রু বাষ্পে অনুজ্জ্বল।

"আসি তবে। ভুলো না।"

"ভুলব না।"

"মনে রেখো।"

"রাখব।"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা।"

গাড়ী ছেড়ে দিল, দেখতে দেখতে তীরের মতো একলক্ষ্যে ছুটল সেই ট্রেন। এক নিমেষে মিলিয়ে গেল সেই দৃশ্য। বিলীয়মান রেখার প্রতি শেষবার দৃষ্টিক্ষেপ করে সুধী যখন পিছন ফিরল তখন দেখল দে সরকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে গাড়ী চলে গেছে। উজ্জয়িনী নেই। তার সেই নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ মূর্তির কাছে গিয়ে সুধী বলল, "চল।"

দে সরকার মূঢ় ভাবে তাকাল, যেন সুধীর কথা বুঝতে পারছিল না।

"চল, সবাই চলে গেছে, তুমি আর আমি রয়েছি।"

দুই বন্ধু ধীরে ধীরে চলল। সুধী ধরল দে সরকারের হাত। তার পা টলছিল। মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। অমন যে ফিটফাট পোশাক তাতে অসংখ্য খাঁজ। কয়েক দিন প্রেসে দেয়নি, অযত্ন করেছে। চুলে ব্রাশ লাগেনি, দাড়ি ছাঁটতে গিয়ে চিবুক কেটেছে। লোকটা একেবারে মিইয়ে গেছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুধী বলল, "চল, তোমার ওখানেই যাই।"

দে সরকার হাঁ কিংবা না বলল না। যন্ত্রের মতো চলল। তার সেই পরিচিত গ্যারেটে ঢুকে সুধী বলল, "চুপ করে শুয়ে পড়। আমি তোমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরি করে আনছি।"

দে সরকার মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুধীর অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। সুধী লক্ষ করল তার ঘরের অবস্থা তার নিজের মতো অপরিপাটী।

৬

এবারকার নির্বাচনে যেমন লেবার পার্টির জয়জয়কার তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির হায়হায়-কার। একটি প্রার্থীও সফল হয়নি, সালাৎওয়ালাও না। এমন শোচনীয় পরাজয় তাদের ইতিহাসে এই প্রথম।

তারাপদর আস্তানায় ভাঙন ধরল। যারা এতদিন গোঁড়া কমিউনিস্ট ছিল তারা ঝোপ বুঝে কোপ মারল। অনেকেই লেবার দলের পোষক হল। তারা রিয়ালিস্ট, তাদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ এখনকার মতো নেই, লেবার-

সোশিয়ালিজমের সাথে সন্ধি করাই সুবুদ্ধি।

ওসমান হাইদারী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে টেলিগ্রাম করল, "Indian Muslims are solidly behind you."

আত্মাপ্রসাদ ওয়েজউড বেনের সঙ্গে মোলাকাৎ করে বলল, "Working classes of India have confidence in you."

তারাপদ যে কোন তালে ঘুরছিল সেই জানে। দিন দিন তার দলবল কমছিল, সেই অনুপাতে আয়ও। তা সত্ত্বেও তার চালিয়াতির ব্যত্যয় ছিল না। সে এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি।

"কোথাকার পচা পার্লামেণ্ট, তার আবার নির্বাচন!" তারাপদ বলে। "আমরা সরাসরি সোভিয়েট সৃষ্টি করব। কী বল, বাওয়ার্স ?"

"ইতিহাস তাই শিক্ষা দেয়। সোভিয়েট গঠন অবশ্যম্ভাবী।"

বাদল কমিউনিজমের পরাভব দেখে অস্বস্তি বোধ করছিল। ইংলণ্ডের গণতন্ত্র যে কাকে চায় ও কাকে চায় না তার পরীক্ষা তো হল। পরীক্ষায় লেবার সোশিয়ালিজম পাশ, কমিউনিজম ফেল। এর পরে কি বলার মুখ থাকে যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ কমিউনিজম চায় ? ইংলণ্ডের মতো রাশিয়ায় যদি নির্বাচন হত ওদেশের জনসাধারণও সম্ভবত কমিউনিজমকে ভোট দিত না, ভোট দিত ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত সোশিয়ালিজমকে। তা যদি সত্য হয় তবে কমিউনিস্টরা বলপূর্বক রাশিয়ার জনসাধারণের বুকের উপর চেপেছে। সেও এক প্রকার স্বেচ্ছাচার।

জনসাধারণ যাকে চায় না কী করে তা জনসাধারণের ধর্ম হবে ? কী করেই বা তার দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা হবে ? বাহুবল ব্যতীত তার স্যাংশন কী আছে ? ইতিহাস যে তার দিকে যাচ্ছে তার প্রমাণ কই ?

উজ্জয়িনীর প্রস্থানের পর এক দিন সুধী গিয়ে বাদলকে বলল, "তোর এখানে জায়গা হবে ?"

বাদল বলল, "কেন ? তোমার ওখানে জায়গার অভাব নাকি ?"

"তা নয়। যার জন্যে ওখানে গেছলুম সে নেই, সে চলে গেছে। উজ্জয়িনীর কথা বলছি।"

"চলে গেছেন ? দুঃখিত হলুম। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁকে আমার সত্যিকার পরিচয় দিতে, তাঁর গুড উইল লাভ করতে।"

"তোর উপর তার বিরাগ বা অভিমান নেই, তোর সত্যিকার পরিচয় সে জানে, তোকে শ্রদ্ধা করে।"

"আহ্‌!" বাদল আরাম করে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বলল, "আহ্‌! আমাকে বাঁচালে।"

তারপর বলল, "আমার মনে দুশ্চিন্তা ছিল কোন দিন হয়তো আমাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে, খোরপোষের মামলায়।"

"খোরপোষের মামলা করত কে? উজ্জয়িনী? তোর যদি খোরপোষ দরকার হয় ওর কাছে যাস, ওর অগাধ টাকা।"

বাদল চোখ বুজে বলল, "বাঁচালে! বাপের টাকা নিতে হয় এই যথেষ্ট গ্লানি। কাউকে খোরপোষ দিতে হলে বিপদে পড়তুম।"

সুধী বলল, "কেমন? আমি আসব তোর সঙ্গে থাকতে?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। একশোবার। দেখছ না আমার এখানে জায়গার অভাব নেই, মানুষের অভাব? অর্ধেক কমরেড ইস্তফা দিয়েছে। ওরা এখন লেবার পার্টির সাগরেদ।"

"হঠাৎ?"

"কমিউনিস্টদের আশা নেই, সুধীদা। কেন লোকে কমিউনিস্ট হবে? আমি অবাক হয়ে ভাবছি কেন এমন হল? যদি সত্য ছিল তাতে, কেন কেউ তাকে ভোট দিল না, এমন করে নাকাল করল? বেচারা সাকলাৎওয়ালার জন্যে কষ্ট হয়। জয়ের পরে পরাজয় যে দ্বিগুণ পরাজয়।"

"জয় পরাজয় দিয়ে সত্যের পরিমাপ হয় না। জয়পরাজয়ের ঊর্ধ্বে ওর আসন। কমিউ-নিজম যদি সত্য হয় তবে কাল যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য।"

"তবু এটা তো মানবে যে এত বড় একটা দেশের সাবালক ও সাবালিকারা একজন কমিউনিস্টকেও পার্লামেন্টে পাঠায়নি। তার মানে এ দেশের জনসাধারণের কমিউনিজমে আস্থা নেই।"

"তা কেন হবে? এমনও হতে পারে যে কমিউনিজম কী কেউ তা ওদের ঠিকমতো বোঝায়নি, অপরে ভুল বুঝিয়েছে, সে ভুলের সংশোধন হয়নি। এমনও হতে পারে কমিউ-নিস্ট প্রার্থীরাও কমিউনিস্ট তত্ত্ব ঠিকমতো বোঝেননি।"

"হুঁ।" বাদল বলল, "তা হলে তুমি আশা রাখতে বল?"

"যারা খাঁটি কমিউনিস্ট তাদের আমি না বললেও তারা আশা রাখবে, কারণ তারা সত্যের রূপ দেখেছে। কিন্তু তোকে আমি উল্টো কথা বলব, তোর পক্ষে আশা না রাখাই ভালো।"

"কেন, সুধীদা? আমার অপরাধ?"

"কারণ তুই কমিউনিজমের কাছে যা আশা করেছিস তা কেবল দুঃখমোচন নয়। তুই চাস ব্যক্তিস্বাধীনতা, দায়িত্বপূর্ণ শাসন, শান্তি ও শৃঙ্খলা—অধিকন্তু দুঃখমোচন। একা-ধারে চতুর্বর্গ ফল। কমিউনিজম তোকে চতুর্বর্গ দিতে পারে না, দিলে এক বর্গ দেবে।

সুতরাং নিরাশ হতে তুই বাধ্য।"

বাদল আহত স্বরে বলল, "কেন ? আমার ডেমক্রাটিক কমিউনিজম কি অকেজো ফর-মূলা? সোশিয়াল যাও ইণ্ডিভিডুয়াল জাস্টিস—কেন ? এর ছিদ্র কোথায় ?"

সুধী উদাস কণ্ঠে বলল, "বাদল, কোনো ফরমূলায় কাজ হবে না। পশ্চিমের সভ্যতা তোর চোখের সুমুখে ধ্বসে পড়ছে, তোর চোখ থাকলে তুই শিউরে উঠতিস; তোর গা ছম ছম করত। এদের মনীষীদের ধারণাই নেই অবস্থা কতদূর মারাত্মক। এমন দিন আসছে যেদিন চারটি খোরাকের জন্যে মানুষ প্রত্যেকটি পাপ করবে—মানুষকে বিনা বিচারে আটক করবে, বেত মারবে, প্রাণে মারবে, অকথ্য অপমান করবে, মানুষ মার-বার যাবতীয় প্রহরণ নির্মাণ করবে, লেশমাত্র দয়ামায়া রাখবে না, নারীর জন্যেও না, শিশুর জন্যেও না।"

বাদল অবিশ্বাসভরে বলল, "সুধীদা, তা কি কখনো সম্ভব ? তুমি অতিমাত্রায় প্রাচ্য, প্রতীচ্যের সম্বন্ধে তোমার প্রেজুডিস আছে।"

"বাদল, ইউরোপের জন্যে আমার যত দুঃখ হয় স্বদেশের জন্যেও তত নয়। আমাদের গ্রামে গ্রামে অন্ন আছে, আমরা একান্নবর্তী। বস্ত্রের জন্যে যদি কলনির্ভর না হই তবে তো আমরা স্ববশ। আমরা কেন এদের মতো কন্‌স্‌ক্রিপ্ট হয়ে মানুষ মারতে বাধ্য হব, কেন এদের মতো মজুরির খাতিরে মারণাস্ত্র বানাব ?"

"কিন্তু ইংলণ্ডে কোনো দিন কন্‌স্‌ক্রিপশন হবে না।" বাদল সগর্বে বলল। "ইংরেজরা স্বাধীন যোদ্ধা। অস্থিমজ্জায় স্বাধীন।"

সুধী বলল, "বটে ! আমি বলছি, তুই লিখে রাখিস, ইংরেজরা প্রথম ধাক্কায় কন্‌স্‌ক্রিপ্ট হবে।"

"অসম্ভব, সুধীদা। আমি ইংরেজকে চিনিনে, তুমি চেন ? ইংরেজ যদি কন্‌স্‌ক্রিপ্ট হয় তবে যুদ্ধের শেষাশেষি, গোড়াতে নয়।"

"শেষাশেষি হলে কি দাসত্ব নয় ?" সুধী হেসে বলল, "একদিন যদি অস্ত্রদাস হতেই হয় তবে গোড়াতে হলে ক্ষতি কী ?"

"ভারতবাসী কি কন্‌স্‌ক্রিপ্ট হবে না ?"

জলদমন্দ্রস্বরে সুধী বলল, "না।"

"কিসের জোরে ওকথা বলছ তুমি ? কতটুকু তোমাদের গায়ের জোর ?"

"গায়ের জোর হয়তো বেশী নয়, কিন্তু না-এর জোর অসাধারণ।" সুধী সুদৃঢ় ভাবে বলল। "পৃথিবীতে ওই একটি দেশ আছে যার না-এর জোর আছে। একদিন ওই দেশ পৃথিবীর নেতা হবে !"

"ভারতবর্ষ !" বাদল বিস্মিত হল। "নেতা হবে ! দুনিয়ার দীনতম দেশ, এত পশ্চাৎ-

পদ যে বলকান রাজ্যদের হার মানায় !"

"সব সত্যি। কিন্তু যার হৃদয় আছে, দরদ আছে, বিবেক আছে, সুনীতি আছে, সে দেশ নেতৃত্ব করবেই। আর যাদের অগ্রগতি কেবল ধ্বংসাভিমুখ, ধনসম্পদ কেবল ধ্বংসের রসদ, তারা কমিউনিস্ট কি সোশ্যালিস্ট কি ক্যাপিটালিস্ট যাই হোক তাদের স্বর্ণ-লঙ্কা তাদের নিজের বিস্ফোরকে বিধ্বস্ত হবে, যদি তাদের সময় থাকতে সুবুদ্ধি না হয়, অন্তরের পরিবর্তন না হয়।"

"অন্তরের পরিবর্তন !" বাদল ব্যঙ্গ করল। "ঘোড়ার ডিম !"

৭

অশোকার বাগ্‌দান উপলক্ষে তার মা বাবা সুধীকে নিমন্ত্রণ করতে ভোলেননি। মিস্টার জাস্টিস তালুকদার এ বছর এক মাস আগে ছুটি নিয়েছেন, যাতে বাগ্‌দানের মহোৎসব জুন মাসে হয়।

স্নেহময়ের সঙ্গেই অবশ্য। স্নেহময় আর অপেক্ষা করতে পারছে না। জুলাই মাসে বেড়াতে বেরচ্ছে, মোটরে করে তামাম কন্টিনেণ্ট চষবে। তার প্রস্তাব ছিল এক নিঃশ্বাসে বিবাহের। চাকরি নেই, দেরি আছে, কাজেই প্রস্তাবের পনেরো আনা না-মঞ্জুর হয়েছে ; বিয়ে না, মোটরকারে হানিমুন না, পণ যৌতুক না, একধার থেকে না…না…না… । কেবল একটি আনা হাঁ। বাগ্‌দানটা জুন মাসে চুকে যাক।

বাগ্‌দানের নিমন্ত্রণ পাবার আগে সুধীর অজানা ছিল না যে অমন ঘটনা ঘটবে। অশোকা স্বয়ং আভাস দিয়েছিল।

তাদের দু'জনের শেষ দেখা হয়—তার মানে বাগ্‌দানের পূর্বে শেষ দেখা—মিউ-জিয়াম থেকে ফেরবার সময়। যেমন হয়ে থাকে। অশোকাকে সেদিন কাহিল দেখাচ্ছিল।

"মনুমা, তোমাকে আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এই আমার আল্‌টিমেটাম।"

"কী হয়েছে, খুশি ? তোমাকে তো খুব খুশি বোধ হচ্ছে না ?"

"হাসি তামাশা করতে চাও তো সারা জীবন ধরে করবে, যদি আল্‌টিমেটাম গ্রহণ কর।"

"ওসব মিলিটারি পরিভাষা শুনলে পরিহাস করতে সাহস হয় না। সিভিল ভাষায় বল দেখি কী ব্যাপার ?"

অশোকা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "কালকেই তুমি দরখাস্ত করবে যে সামনের সেসনে পি. এইচ. ডি'র জন্যে পড়া শুরু করবে। তা হলে আমি সত্য মিথ্যা মিলিয়ে মাকে বলতে পারব যে আমি একজনকে বিয়ে করতে চাই, সে পি. এইচ. ডি. দিচ্ছে।

দরখাস্ত করবে কি না বল। করবে ? করবে না ? করবে ?"

সুধী ঘাবড়ে গেল। কালকেই দরখাস্ত। কী এমন জরুরি দরকার ? অশোকা যেমন আকুলতা প্রকাশ করছে তার থেকে মনে হয় কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে জানতে চাওয়া বেআদবি হবে।

"করবে ? করবে না ? করবে ?" অশোকা জপ করতে থাকল।

"কত সময় দিয়েছ ? আধ ঘণ্টা ?"

"হাঁ। আধ ঘণ্টা। আমার অন্য এনগেজমেণ্ট আছে।"

সুধী গম্ভীর ভাবে বলল, "খুশি, ভালোবাসার চেয়েও বড় জিনিস আছে। সেও ভালোবাসার সামিল, কেননা সে ভালোবাসাকে আরো বড় করে আরো বড় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, সম্পূর্ণতা দেয়।"

অশোকা অসহিষ্ণুভাবে বলল, "বক্তৃতা শুনতে সারা জীবন রাজি আছি, কিন্তু আজ না। তুমি যে বাক্‌পটু তা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। কিন্তু তুমি যে কর্মকুশল তাই জানতে দাও, মনুয্য।"

সুধী অশোকার এমন রুদ্রমূর্তি দেখেনি, দেখে চোখ ঝলসে যায়। এই আধ ঘণ্টার মধ্যে তার জীবনের এস্পার কি ওস্পার হয়ে যাবে, তারপর হাজার মাথা খুঁড়লেও ওস্পারটা এস্পার হবে না। সুধী অনুভব করল এই তাদের শেষ মিলন। এর পরে এ জন্মটা যাবে, আর কয় জন্ম যায় কে জানে।

"মনুয্য, কাজের ভাষায় কথা বল, কথার ভাষায় না। আজ তুমি দার্শনিক নও, সুধী নও। আজ তুমি বীর চক্রবর্তী।"

কী করবে চক্রবর্তী। করবার কী আছে। তাকে ফিরতে হবেই আগামী সেসনের আগে, দেশ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। না ফিরে উপায় নেই, তার অর্থ ফুরিয়ে আসছে। পি. এইচ. ডি. মানে আরো দু'বছর। অসম্ভব। ডক্টরেট নিয়ে সে করবেই বা কী ! গ্রামে ডাক্তারের অভাব আছে, ডক্টরের প্রয়োজন নেই। তার পরিকল্পিত জীবনযাত্রার সঙ্গে এর সঙ্গতি সামান্য। কলেজের চাকরি তার কাম্য নয়।

"খুশি, তোমাকে আঘাত করলে আমারও আঘাত বাজে, এ কথা বিশ্বাস কর। যদি আঘাত করি তবে নাচার হয়েই করি, বিশ্বাস কর।"

.অশোকা মাথা নেড়ে বলল, "ভূমিকা শুনব না। উপসংহার শুনতে কান পেতেছি। বল কী স্থির করলে ? হাঁ কি না ?"

নারী যখন অবুঝ হয় তখন প্রিয়জনের দিক থেকে ভাবে না। প্রিয়জনকে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু প্রিয়জনের উপর ইচ্ছার প্রয়োগ করতে অধীর হয়। অশোকা মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখতে থাকল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুধী বলল, "খুশি—"

"বল, হাঁ। বল, বল—"

সুধী ক্ষণকাল অন্তরের অন্তরালে গেল। ভাবল, অশোকাকে হারালে জীবনের কী অবশেষ থাকল! দেশের কাজ কি রসসিক্ত হবে? দু'বছর বাদে করলে কী এমন ক্ষতি? ইতিমধ্যে অশোকাও গ্রামে যেতে রাজী হতে পারে। সুধীর পক্ষে এই যে আপোস এর অনুপ্রেরণায় অশোকাও আপোস করবে, গ্রামে যাবে। যাবে না?

ভেবে বলল, "আমার অন্তরের সম্মতি নেই। ক্ষমা কর।"

অশোকার নাসা দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস ছুটতে লাগল। সে সুধীর প্রতি একবার কোপন কটাক্ষ হানল। তারপর সহসা বিদায় নিল।

"থ্যাঙ্ক ইউ।" অত্যন্ত মোলায়েম করে বলল। আরো মৃদুল স্বরে বলল, "গুড বাই।"

মাসখানেক পরে বাগ্‌দানের নিমন্ত্রণ।

মিসেস তালুকদার দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করলেন। "তোমার নাম তো সুধীর চ্যাটার্জি। না?"

"সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।"

"**Oh, my precious memory**! তোমাকে দেখলে আমার মনে পড়ে সুধীরকে, সেইজন্যে নামের গোলমাল হয়।"

মিস্টার জাস্টিস তালুকদার সুধীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বললেন, "ইজ দ্যাট এ গ্যাণ্ডী ক্যাপ?" ওটা কি গান্ধী টুপি?

সুধী একবার চোখ বুলিয়ে নিল, চেনা মুখের তল্লাসে। অশোকাকে দেখতে পেল না, কিন্তু আরো অনেকে ছিল, তাদের মধ্যে বিভূতি নাগ।

স্নেহময় নাক উঁচু করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মনের ভাবটা যেন এই যে, "**I am monarch of all I survey.**" স্নেহময় তার বাগদত্তাকে যে হীরা বসানো আংটিটা উপহার দেবে সেটা হাতে হাতে ফিরছিল।

সেই ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেল সুধী। কত লোকের সঙ্গে খুচরা কথাবার্তা হল, তাদের সংখ্যা অগুনতি। একটা কথা মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে সুধীর কানে এল। সুধী স্তম্ভিত হল।

তারাপদ কুণ্ডু উধাও। সেই সঙ্গে তার ফিল্ম কোম্পানীর তহবিল উধাও। মিসেস গুপ্তর অনেক টাকা সরিয়েছে, আরো অনেক নক্ষত্রযশঃপ্রার্থীরও।

অশোকাকে স্নেহময়ের পাশাপাশি দেখতে সুধীর অভিলাষ ছিল। অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেও অসঙ্কোচে আশীর্বাদ করবে, কল্যাণকামনা জানাবে। আজকের দিনে বেসুর রাগিণী বাজবে না জগতের একটিও প্রাণে। সুধীর

জীবন ব্যর্থ হল কি হল না, সে সব চিন্তা পরে। জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না, জীবনবিধাতা হিসাবী কারিগর, তাঁর বাটালির একটি আঁচড়ও অকারণ নয়, ব্যর্থতার আশঙ্কা অমূলক।

অশোকাকে সাজিয়ে আনল তার সখীরা, সিংহাসনে বসাল। সেই রাজরানীর সম্মুখে নত হয়ে তার আঙুলে হীরা বসানো আংটি পরিয়ে দিল স্নেহময়। অশোকা তাকে ছোট্ট একটি নমস্কার করল।

তারপরে শুরু হল উপহার বর্ষণ। এক এক করে প্রত্যেকে গেলেন তার সামনে, দিলেন যথাসাধ্য উপঢৌকন, নিলেন এক একটি নমস্কার বা করমর্দন। রানীর মতো অশোকা সহজভাবে নিল, সহজভাবে দিল। হাসল না, কথা বলল না, সরমে অশোক ফুলের মতো রঙীন হল না। জলও ছিল না তার চোখে। ঠিক রানীর মতোই তার মুখখানি মুখোস। সে অভিনয় করছে, এত নিখুঁৎ অভিনয় যে অভিনয় বলে সন্দেহ হয় না।

পর্যায়ক্রমে সুধীও তার সম্মুখীন হল। তার হাতে গুঁজে দিল একগাছি নোয়া। মায়ের আশীর্বাদী। কথা ছিল এই নোয়া সে তার বধূকে দেবে। কী হবে রেখে, বিয়ের যখন শেষ আশা নিবেছে! এ জীবনে সুধী বিয়ে করবে না। অশোকার আসন শূন্য থাকবে আমরণ!

অশোকা সহজভাবে নিল। ছোট্ট একটি নমস্কার করল। রানীর মতো।

৮

অশোকার পার্টি থেকে ফিরে সুধী দেখল বাদল তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"কে? বাদল?" সুধী বলল স্মিত বিস্মিত মুখে। "তোর খাওয়া হয়েছে।"

"সুধীদা", বাদল ও প্রশ্ন কানে তুলল না, "তোমার এখানে টেলিফোন নেই, অগত্যা সশরীরে আসতে হল। শুনবে? তারাপদ ফেরার।"

"শুনলুম গুজব। সত্যি?"

"তার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কার যে কত মেরে দিয়েছে এখনো সঠিক বলা যায় না, তবে সবশুদ্ধ হাজার খানেক পাউণ্ড তো এক আমাদের কমরেডদেরই। ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম এক্‌সচেঞ্জের খবর আমার কাছে পাবে না, তার জন্যে তোমাকে কালকের কাগজ পড়তে হবে।"

"তোর নিজের কিছু নেয়নি তো?"

"আমার?" বাদল এতক্ষণ শক্ত ছিল। এইবার ভেঙে পড়ল। "আমার সর্বস্ব নিয়েছে। টাকার জন্যে ভাবিনে, কিন্তু আমার বড় বড় সুটকেসগুলো ওর কাছে গচ্ছিত ছিল। কাপড়চোপড়ের জন্যে ভ্রূক্ষেপ করিনে, কিন্তু আমার এক রাশ দামী ও দুষ্প্রাপ্য

বই ছিল। কত ভাইবোনের চিঠি ছিল, কত কমরেডের চিঠি। আমার ডায়েরি, আমার জার্নাল, আমার নোটবুক। ও হো হো!" বাদল ছোট ছেলের মতো কেঁদে আকুল হল।

"যাক, পাওয়া যাবে একদিন।" সুধী সান্ত্বনা দিল। জানত বাদলের বইয়ের শখ। তার কেতাবের কলেকশন অমূল্য।

"পাওয়া যাবে না," বাদল ছোট ছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে জোর দিল শেষ শব্দ-টার উপর। "ভাবী কাল আমার জীবনের চিহ্ন পাবে না। আমার সাধনার নিদর্শন পাবে না। Posterity আমার নামটা পর্যন্ত জানবে না। আমার স্বাক্ষর চিনবে না। Oh my signature! My signature!" বাদল লুটিয়ে পড়ল।

সুধী তাকে অনেক বোঝাল। সে বুঝল না। তখন সুধী তাকে ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে আকৃষ্ট করল।

"বাদল, তোকে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে, যতদিন আমি এদেশে আছি। তোর ওখানে তো ওরকম ব্যাপার। চলে আয় এখানে। আজকেই থেকে যা না?"

"না, সুধীদা। তোমার সঙ্গে থাকতে কি আমার অসাধ! কিন্তু আমার মন স্থির করে ফেলেছি। আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি বাবার কাছ থেকে এক পয়সা নেব না, নিলে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কোনো দিন ধ্বস্তাধ্বস্তি করব না। বাস্তবকে এড়িয়ে কী হবে? দুঃখমোচনের পন্থা নয় পরের ধনে পরোপকার। আমাকে খোরাকের জন্যে খাটতে হবে।"

সুধী পীড়াপীড়ি করল না।

"আমি পথে পথে দেশলাই বেচব, কাগজ ফিরি করব। যা পাব তা আমার মতো খাইয়ের পক্ষে যথেষ্ট হবে। শোবার জন্যেই ভাবনা। আমি টেমস নদীর এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টে শোব!"

"ও কী বলছিস্!" সুধী চমকে উঠল। "তুই কি উন্মাদ হলি? ধনসম্পদ কার না চুরি যায়। চোরের উপর অভিমান করে—"

"না, না, আমাকে ভুল বুঝো না, ভাই।" বাদল মিনতির স্বরে বলল। "আমাকে যত দিতে পার আলো দাও, আমি যে আলোর কাঙাল। তারাপদ আমার কীই বা চুরি করেছে, তার উপর কেন অভিমান করব? আমার আশা চুরি গেছে, আমি যে একরশ্মি আলো দেখতে পাচ্ছিনে। অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার!"

সুধী বাদলের দুটি হাত ধরল। মনে মনে প্রার্থনা করল, আমাদের অন্তর আলোকিত হোক। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

দুই বন্ধু বসে রইল নীরবে নিঃশব্দে।

"সুধীদা, তোমার সঙ্গে আমার হিসাব নিকাশের কথা ছিল। কত যে কথা ছিল তোমার সঙ্গে আমার। কবে সেসব হবে?"

"সেইজন্যেই তো বলছিলুম আমার সঙ্গে থাকতে।"

"তা যখন হবার নয় তখন আমিই মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। তোমরা আমার কাছ থেকে দেশলাই কিনবে। কেমন?"

সুধী অনেক দুঃখে হাসল।

বাদল আপন মনে বলল, "সুধীদা, আমি declassed হচ্ছি।"

"তার মানে?"

"আমি উপরের তলা থেকে নেমে নিচের তলায় ঠাঁই করে নিচ্ছি। আমি দেখছি এই সমাজ অব্যবস্থাকে পাল্টে দেবার উপায় নেই, একে উল্টে দিতেই হবে। এই বাড়ীটাকে উল্টে দিতে হলে এর নিচের মাটি খুঁড়তে হয়, এর তলায় ডাইনামাইট পুরতে হয়। আমি যদি সকলের চেয়ে নিচু হতে পারি তবে একদিন এই সমাজব্যবস্থাকে উড়িয়ে দিতে পারি।"

সুধী আঁতকে উঠল। আত্মস্থ হয়ে বলল, "সমাজব্যবস্থার চেয়ে মানুষ বড়, যেমন গৃহের চেয়ে গৃহস্থ। সমাজব্যবস্থাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে তাকে বাড়িয়ে তোলা হয়। তার চেয়ে মানুষকেই বল না কেন অন্য কোথাও সরে যেতে?"

"আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম," বাদল খুব তাড়াতাড়ি বলল। "আমি একটা শ্রেণীসংগ্রাম বাধাতে চাইনি, তার জন্যে অন্যান্য শক্তি কাজ করছে। না, সুধীদা, আমি কমিউনিস্ট কি সোশিয়ালিস্ট নই। আমি একা। আমি একক। আমি এমন একটা টেক্‌নিক উদ্‌ভাবন করব যা কেউ এত দিন পারেনি, যা আনকোরা নতুন। কিন্তু তা করতে হলে আমাকে সকলের চেয়ে নিচু হতে হবে, অধমেরও অধম।"

সুধী নিবিষ্টচিত্তে শুনছিল। বাদলের হাতে চাপ দিল। সস্নেহে।

"সবাই ভুলে যাবে যে বাদল বলে কেউ ছিল, কোনো প্রতিভাবান পুরুষ, কোনো প্রতিশ্রুতিমান তরুণ। অপরে নাম করবে, বড়মানুষ হবে, খবরের কাগজের সামনের পৃষ্ঠায় বাসা বাঁধবে—আর আমি তলিয়ে যাব পাতালে, আমি হারিয়ে যাব জনতায়।"

বাদল যেন সেই পাতালের ও সেই জনসাগরের ধ্যান করছিল।

"তারপরে—ধর, বিশ বছর পরে—আমি কথা কইব। কথা কইব দু'চার জনের কাছে। আর আমার সেই কথা হবে এমন কথা যার জন্যে সমস্ত জগৎ, সমস্ত যুগ চেয়ে রয়েছে কান পেতে। এক দিনেই আমার কথা আকাশে আকাশে চারিয়ে যাবে, বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে যাবে। আমি বিশেষ কিছু করব না। একটি বোতাম টিপব।

আর অমনি তোমার সমাজব্যবস্থা সমভূম হয়ে যাবে।"

সুধী শুধু বলতে পারল, "তোর জয় হোক।"

"কিন্তু এখন আমার চোখে আলোর রেখাটিও নেই। আঁধারের পর আঁধার, তার পরে আঁধার, তার পরে আরো আঁধার। এই আঁধার পারাবার পার হব কী করে? বিশ বছর এর গর্ভে গর্ভবাস করব কী করে? ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে। এত দুর্বল আমি, এত ক্ষীণকায়, এত রোগা। বেঁচে থাকব কিনা সেই এক সন্দেহ।"

"ছি অমন কথা বলতে নেই।" সুধী তাকে নিশ্চয়তা দিল, "তুই বাঁচবি। তোকে বাঁচতে হবে।"

"আমিও তাই মনে করি। আমাকে বাঁচতে হবে। কেননা কথা কইবার কথা আর কারুর নয়, আমারই। সুধীদা, আমি কথা কইবার প্রলোভন সম্বরণ করলুম। কেননা আমাকে একদিন কথা কইতে হবে।"

এই বলে বাদল মৌন হল।

সুধী বাদলকে খানিক দূর এগিয়ে দিতে গেল। সবটা পথ যেত, কিন্তু ফেরবার ট্রেন নেই, বারোটার পর টিউব বন্ধ।

চলতে চলতে বাদল বলল, "সুধীদা, আমার সম্বল যা কিছু আছে এক সময় তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব। তুমি বিলিয়ে দিতে পার, ব্যবহার করতে পার। যেমন তোমার খুশি। আমি এই এক পোশাকে বেরিয়ে পড়ব।"

সুধী ব্যথিত হয়ে বলল, "আরো কয়েক দিন যাক না।"

"না, ভাই, তুমি তো জান আমি যা করতে চাই তা করি। না করে আমার শান্তি নেই। বোধ হয় উপায়ও নেই। হয়তো নদীর বাঁধে টিকতে পারব না, হয়তো দেশলাই বেচে পেট ভরবে না। তবু সেই আমার পথ, আমি সেই পথের পথিক। হয়তো আমার হার হবে, তবু আমি হারের খেলা খেলব।"

সুধী বলল, "তোর সঙ্গে তর্ক করে কে কোন দিন জিতেছে? আমি বাধা দেব না। তবে তুই তোর শেষ সম্বল থেকে সঙ্গে রাখিস যা পারিস। বাঁধের ধারে কোনো দোকানে জমা দিলে তারা জোগাবে যখন শীত করবে বা বৃষ্টি পড়বে।"

একটা বাস যাচ্ছিল। বাদল বলল, "তুমি আর কেন আসবে! রাত হয়েছে, শুতে যাও।" লাফ দিয়ে উঠে বলল, "আবার দেখা হবে, সুধীদা।"

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।

১৯৩৮—৪০

অপসরণ

উত্তরভাষণ

১৯২৭-২৯ সালে যখন ইউরোপে ছিলুম তখন একদিন খেয়াল হলো একখানা উপন্যাস লিখতে। তার দ্বারা "নৌকাডুবি"র প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করতে, "ঘরে বাইরে"র পরিণামকে উলটিয়ে দিতে। আমার নায়িকার নাম হবে পুণ্য। সে অসত্যের ঘর করবে না, সত্যের কর ধরবে, সমাজের ভয়ে অসত্যকেই স্বামিত্বের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে সত্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী হবে না। এই ভাবেই আমার প্লটের সূত্রপাত।

তার পরে ইটালীর ফ্লোরেন্স্ দেখতে গিয়ে মনে হলো, নগরীর নামে যদি নারীর নাম হয় তবে ভারতবর্ষে এমন কোন নগরী আছে যা ফ্লোরেন্সের সমতুল্য? নবরত্নের উজ্জয়িনী। তখন পুণ্যের পরিবর্তে উজ্জয়িনী হলো নায়িকার নাম।

বছর দুই কেটে গেল এই পর্যন্ত পৌঁছাতে। দেশে ফিরে এসে আমার পরম শুভা-কাঙ্ক্ষী "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে আরম্ভ করলুম আমার উপন্যাস। অসত্য বলে কোনো মানুষের নাম হয় না, সে নাম অপরিবর্তিত হলো বাদলে। অসত্য না থাকলে সত্যেরও তাৎপর্য থাকে না, সুতরাং সত্যের বদলে পেলুম সুধীকে। কিন্তু সত্য আর অসত্য এ দুটি নাম খারিজ হলেও এই দুটি আইডিয়া মর্মে গাঁথা রইল। জীবনে তো কত কী দেখি, শুনি, পাই ও হারাই, উপভোগ ও অনুভব করি। তাদের সবই কি সত্য? কোনটা অসত্য? যে যার নিজস্ব কষ্টিপাথরে সত্যাসত্যের যাচাই করে। বাদলের কষ্টিপাথর বুদ্ধির, সুধীর নিকষ প্রজ্ঞার। দুজনেই সত্যের সন্ধানী, কিন্তু পথভেদে মতভেদ অনিবার্য।

সত্য আর অসত্য এই দুটি আইডিয়া এমন করে পেয়ে বসল যে কেন আমি উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলুম তাও গেলুম ভুলে। ইউরোপে থাকতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলুম তার কোনো চিহ্ন রইল না। সুধী বাদল হলো পর-স্পরের বন্ধু। বাদলের প্রতি উজ্জয়িনী এতটা আকৃষ্ট হলো যে বাদলের বৌ হওয়া তার পক্ষে অসত্যের ঘর করা বলে প্রতিপন্ন করা দুষ্কর হলো। সত্য, অসত্য ও পুণ্য—এদের তিনজনের যোগাযোগের মধ্যে একটা রূপকের ভাব ছিল, তাও গেল মিলিয়ে। অথচ বই দিন দিন আকারে বাড়তে থাকল, আর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাকে করতে থাকল গুরু-ভার। সত্য এবং অসত্য এ দুটি চিরন্তন শক্তির দ্বন্দ্বের রূপ চোখে পড়ছিল বহির্জগতের বিবিধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন "যার যেথা দেশ"-এর ভূমিকা লিখি। তখন এপিকের উপরেই জোর দিয়েছিলুম। সেটা ভুল। পরে এপিকের দাবী প্রত্যাহার করেছি। "যার যেথা দেশ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত ভূমিকাটি সন্নিবেশ করিনি। তবে সমগ্র গ্রন্থের নাম পরিবর্তন না করলেও চলত। "সত্যাসত্য" এই শিরো-নামটি ইতিমধ্যে এতদূর সুপরিচিত হয়েছে যে তার বদলে "বাদল সুধী উজ্জয়িনী" কায়েম

হবে কিনা সন্দেহ। তাই ভেবে "সত্যাসত্য অথবা বাদল সুধী উজ্জয়িনী" এই আখ্যা প্রচার করছি।

ইচ্ছা ছিল পাঁচ বছরে পাঁচ খণ্ডে এ বই শেষ হবে। পাঁচের জায়গায় ছয় খণ্ড লিখতে হলো, বছর লাগল ছয়ের দু'গুণ বারো। কোনো কোনো পাঠক নাকি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনুযোগ করেছেন যে কাহিনীটি কী ভাবে শেষ করতে হবে লেখক তা ভেবে পাচ্ছেন না বলে দেরি হচ্ছে। এক হিসাবে এ অনুযোগ যথার্থ। খুলে বলতে বাধা নেই যে বরাবর আমার অভিপ্রায় ছিল উজ্জয়িনীকে সুধীর হাতে সঁপে দিতে। "অপসরণ"-এর মাঝপথে আমার সে নির্বন্ধ ত্যাগ করতে হলো। দেখলুম তা যদি হয় তবে প্লটের মুখরক্ষা হবে বটে, গল্পের প্রাণরক্ষা হবে না। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে। আমি তাকে আমার খুশিমতো চালাবার কে? আমি কি ডিকটেটর?

অন্য হিসাবে এ অনুযোগ অযথা। শেষ কী ভাবে করতে হবে তা আমি আট নয় বছর আগে মনে মনে ঠিক করে ফেলি। কিন্তু কাউকে ঘুণাক্ষরেও আভাস দিইনে। এক-মাত্র ব্যতিক্রম আমার স্ত্রী। এখন পর্যন্ত এই সিক্রেট আমি বা আমরা একান্ত সাবধানে রেখেছি। হিটলারের ডিকটেটরশিপ যেদিন আরব্ধ হলো সেদিন বাদল বেঁচে থাকলে সহ্য করতে পারত না, প্রতিকারে অক্ষম বলে মরতে বাধ্য হতো। তা হলে মিছিমিছি তাকে চার বছর বাঁচিয়ে রাখা কেন? ১৯২৯এর শরৎকালেই যে উপন্যাসের বর্ণিত সময় সাঙ্গ হবে তা আমার পূর্বেই স্থির করা ছিল। তখন কিন্তু ডিকটেটরশিপ যে এত বড় একটা আতঙ্ক হয়ে উঠবে এতটা কেউ ভাবেনি, বাদলও না। চার বছর পরে যা ঘটবে তার পূর্বাভাস বোধ হয় সুধী দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তার জন্যে বাদল কেন প্রাণ দেবে? কাজেই আমি বড় সঙ্কটে পড়েছিলুম। বাদলকে অপসরণ করাতে হবে, অথচ কী তার নির্ভরযোগ্য কারণ? পরে বোঝা গেল বাদলের মতো ইনটেলেকট-সর্বস্ব মানুষের পক্ষে নেতিবাদই মরণের হেতু। একে একে যার সব বিশ্বাস গেছে সে কী নিয়ে বাঁচবে!

দেরী যে হয়েছে এর জন্যে আমার দুঃখের সীমা নেই। যেসব পাঠকপাঠিকা এ গল্পের শেষ জেনে যেতে পারলেন না আজকের দিনে আমি তাঁদের স্মরণ করছি সকলের আগে।

এই গ্রন্থের রচনায়, মুদ্রণে, প্রকাশে ও বিচারে অনেকের সাহায্য লাভ করেছি। তাঁদের কাছে ঋণী রইলুম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যদি উৎসাহ না দিতেন তা হলে এ বই লিখতে বসতুম কি না জানিনে। শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার যদি প্রকাশ-ভার না নিতেন তা হলে এর প্রকাশের আশা ছিল না। এঁদের দুজনের কাছে আমি অতীব কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে গোপালবাবুর কাছে। তিনি এর জন্যে যে পরিমাণ অর্থব্যয়

করেছেন তা প্রকাশক মহলে দুর্লভ। গোড়ার দিকে লাভের নিশ্চয়তা ছিল না, বরং ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। তিনি সহায় না হলে আমি হাল ছেড়ে দিতুম।

আর একজনের নাম করবার অনুমতি নেই। কিন্তু তিনি যদি হাতের কাছে না থাকতেন বিদেশী আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটি লাইন লেখা নিরাপদ হতো না। তা ছাড়া প্লটসম্বন্ধেও পদে পদে তাঁর মন্ত্রণা নিয়েছি। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে তার একাংশ তাঁর।

৯ই এপ্রিল ১৯৪২

অন্নদাশঙ্কর রায়

পরিচ্ছেদসূচী

চরিত্রপরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	বাদলের স্ত্রী
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	উজ্জয়িনীর অনুরাগী
রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন	বাদলের পিতা
সুজাতা গুপ্ত	উজ্জয়িনীর মা
অশোকা তালুকদার	সুধীর 'মনের খুশি'
মায়া তালুকদার	অশোকার মা
স্নেহময় রায়চৌধুরী	অশোকার প্রার্থী
মার্সেল	সুধীর 'বোন'
সুজেৎ	মার্সেলের দিদি
সহায়	সুধীর বিহারী বন্ধু
ঝাবওয়ালা	সুধীর পারসী আলাপী
নীলমাধব চন্দ	সুধীর বন্ধু
রোনলড্ ব্রিজার্ড	কোয়েকার শান্তিবাদী
জন ব্রিজার্ড	তাঁর পুত্র, সোশ্যালিস্ট
বেন্‌জামিন টাউনসেণ্ড	বিশিষ্ট শান্তিবাদী
রবার্ট বার্নেট	শান্তিবাদী, আচার্য
মড মার্শল	শান্তিবাদিনী
ম্যাক্স্ আণ্ডারহিল	শান্তিবাদী
স্ট্যানলি ফেয়ারফিল্ড্	ন্যায়নিষ্ঠ লেখক
মুরিয়েল	তাঁর পালিতা কন্যা
তারাপদ কুণ্ডু	প্রসিদ্ধ দলপতি ও বহুরূপী
বাওয়ার্স	কমিউনিস্ট লেখক
ব্রনস্কি	নামকাটা কমিউনিস্ট
অল্‌গা	তাঁর স্ত্রী, ভাস্কর
মার্গারেট বেকেট	অধুনা কমিউনিস্ট
জেনী ওরফে পীচ	পরিচারিকা

—আরো অনেকে—

বাগদান

১

সেদিন তার "মনের খুশি"কে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে অশোকা যখন বাড়ি ফিরল, তখনো তার শরীর রিরি করছিল। চোখের জলকে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছিল সারা পথ, ঘরে পা দিতে না দিতেই চোখের জলের বাঁধ ভাঙল। বালিশে মুখ গুঁজে কী কাঁদন কাঁদল সে। যেন তার সব সুখ ফুরিয়েছে।

বসন্ত তখন শেষ হয়ে আসছে, শেষ নিঃশ্বাসের মতো ফিরছিল সেদিন হাওয়া। দিনেরও তখন শেষ বেলা, আলোর চাউনিতে বিষাদ। অশোকার শোককে সৌন্দর্য দিয়েছিল প্রকৃতি।

তার এত দিনের প্রেম! তার এত দিনের আশা! সে তো মনে মনে ধরে নিয়েছিল যে তারা বিবাহিত। দু'দিন আগে হোক পরে হোক, বিবাহ তাদের প্রজাপতির নির্বন্ধ। প্রতিবন্ধক শুধু এই যে সুধী কিছুতেই সুপাত্র হবে না, সুপাত্রের যোগ্যতা অর্জন করবে না, অশোকার পিতামাতার মনোনয়নযোগ্য হবে না। এই প্রতিবন্ধকই প্রবল হলো। অবুঝ পুরুষ বেছে নিল তার পথকে, বর্জন করল তার নারীকে। এ কী নির্বাচন করে বসল সুধী! কাঁদতে হবে না তাকেও কি সারা জীবন! কেবল কি অশোকাই কেঁদে মরবে! অবোধ শিশু আগুনে হাত দিয়ে নিজেও কাঁদে, মা'কেও কাঁদায়।

সুধী, সুধা, মনের খুশি, মনুয়া!—বিলাপ করতে লাগল অশোকা—তোমার শর্তে কোনো মেয়ে কি রাজী হবে কোনো দিন? মিথ্যে কেন আমায় নিরাশ করলে, নিজেও হলে। তোমায় দিনের পর দিন কত বুঝিয়েছি, কত মিনতি করেছি, পায়ে পায়ে ছায়ার মতো ঘুরেছি, মান অপমান মানিনি। অবুঝ, তোমার কাছে বড় হলো তোমার একার খেয়াল! দু'জনের যা ন্যায্য প্রয়োজন তাকে তুমি উপেক্ষা করলে। কেন জীবনের প্ল্যান জীবনের চেয়ে বড় হবে? কেন জীবনের সহগামিনীর জন্যে জীবনের ধারা বদলাবে না? জগতে অপরিবর্তনীয় কী আছে? কেন তবে পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না একজনের সঙ্গে আরেকজন যোগ দিলে। আমি কি তবে এক নই, শূন্য?

এর উত্তরে তোমার যুক্তি ছিল না একটিও। তুমি বলেছিলে, খুশি, কেমন করে বোঝাব, তোমাকে আমার কত যে দরকার। তা বলে তোমাকে দুঃখের মাঝখানে টানব না। যদিও জানি যে তুমি স্বেচ্ছায় সে জীবন বরণ করলে দুঃখের দহনে আরো সুন্দর হতে।

শোন কথা। আমাকে তুমি দুঃখের মাঝখানে টানবে না, কিন্তু তাতে আমার এমন কী সান্ত্বনা! তুমি তো দুঃখের মাঝখানে যাবে! তোমার দুঃখ বুঝি আমার গায়ে লাগে না! এত পর ভাব কেন আমাকে? পর ভাব না? হাজার বার ভাব। তোমার নিজের

প্ল্যানটি, নিজের ধ্যানটি, নিজের দুঃখগুলি নিয়ে তুমি থাক। আমাকে অংশ দিতে তোমার প্রাণে সয় না! পাছে আমি তার সঙ্গে আমার যা আছে তা যোগ করে অন্য জিনিস করে তুলি। আর বোলো না, তোমার মতো স্বার্থপর আমি জন্মে দেখিনি। সুধী, সুধা, মহুয়া!

আমি বরাবর দেখে আসছি মেয়েরাই সব ছাড়ে, ছেলেরা কিছু ছাড়ে না। আমি তোমার জন্যে সব ছাড়ব আর তুমি আমার জন্যে গ্রাম ছাড়তে পারবে না, দৈন্য ছাড়তে পারবে না। এই তোমার ন্যায়বিচার! তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে, আমাকে ছাড়তে হবে বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, সমাজ সংসার, আরাম বিশ্রাম। তোমার সেই গ্রাম্য ভদ্রাসনের রাঁধুনী হয়ে দু'বেলা দু'শো জনকে খাইয়ে আমার দিন কাটবে, যতদিন না কালাজ্বর কি ম্যালেরিয়ায় ভুগে নির্বাণ ঘটছে।

এর উত্তরে তোমার যুক্তি ছিল না। তুমি নাজেহাল হয়ে বলতে, খুশি, আমাদের সম্পর্ক যেমন আছে তেমনি থাকলেই সুন্দর হয়। আমি কি তুমি কেউ কেন কিছু ছাড়বে? যা ছাড়বার নয় তা কারো জন্যেই ছাড়া উচিত নয়। যার যা আদর্শ তাকে তা রক্ষা করতেই হবে, প্রিয়জনের হাত থেকেও। যা ছাড়া তোমার চলতে পারে তাই ছাড়তে পারো তো ছাড়। আমি ছাড়ছি কি না চেয়ে দেখো না, তুলনা কোরো না।

পুরুষ! তোমার মুখে যুক্তি নেই, যদিও তোমরা যুক্তিশীল বলে কত না জাঁক কর। কেবল মিষ্টি মধুর উক্তি, যা শুনলে লিখে রাখতে ইচ্ছা করে। মনের পাতায় লিখে রেখেছিও। বলেছিলে, আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে তোমার আমার মিলন যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তুমি আমার উপর নির্ভর করে অজানা সাগরে ভাসতে পারবে। পাগল! তুমি নিজে কিসের ওপর নির্ভর করে ভাসবে! সেইজন্যেই তো বলি পি-এইচ. ডি হতে। শুনবে না তো।

বলেছিলুম, দেশে কি জ্ঞানের ছড়াছড়ি যে তোমার কাছে কেউ জ্ঞানের আলোক চায় না, তাঁতের কাপড় চায়! যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কেন নগরকেন্দ্র থেকে জ্ঞান বিকিরণ করবেন না, কেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছন্নছাড়া হবেন, চাষ করবেন, সুতো কাটবেন?

তুমি পরিহাস করেছিলে, আমার তো জ্ঞান ছিল না যে আমি একজন জ্ঞানী। ওটা তোমার স্নেহান্ধ নয়নের আবিষ্কার, ওটা মায়া।

আমি হাসিনি। হাসির কথা নয়। তুমি জানো দেশের লোক শিক্ষাও চায়, শুধু অন্ন চায় তাই নয়। অন্নের ভার অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি কেন শিক্ষার ভার নাও না?

তুমি তর্ক করেছিলে, তার জন্যেও গ্রামে যেতে হয়। কেননা শিক্ষা যাদের দরকার তারা গ্রামে বাস করে।

তারা কেন শহরে আসবে না ?

শহরে এলে তারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু আয়ত্ত করবে। সেটা শিক্ষার উপসর্গ, সেটা কু। তারা কুশিক্ষা পাবে, পাবে কুসংসর্গ।

যাও, তোমার শহর সম্বন্ধে প্রেজুডিস আছে। তুমি বলতে চাও, তুমি লণ্ডনে এসে কুশিক্ষা পাচ্ছ, আমি পাচ্ছি কুশিক্ষা !

হাঁ, খুশি, আমরাও কুশিক্ষা পাচ্ছি। আমরা শিখছি বৃহতের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে। আমরা হচ্ছি বৃহতের সঙ্গে খাপ খেতে অপারগ। বৃহতের প্রতি আমাদের নাড়ীর টান শিথিল হয়ে আসছে। আমরা যেন দুধের সর, যতই মোটা হচ্ছি ততই আলগা হচ্ছি। এর পরিণাম অশুভ। রাশিয়ায় যেমন ওরা সব তুলে ফেলল একদিন ভারতবর্ষেও তুলবে, যদি না আমরা এখন থেকে পাতলা হয়ে দুধের সঙ্গে মিশে যাই।

কী যে বলছ, মনুয়া ! কারা তুলে ফেলবে কাদেরকে ? কেন তুলে ফেলবে ? কী করে ?

থাক, খুশি, বিষয়টা উপাদেয় নয়।

না, তুমি বল।

রাশিয়াতেও তোমার মতো কত লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, তাদের একমাত্র অপরাধ তারা ধনীর মেয়ে। তাই তাদের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ভব্যতা কোনো কাজেই লাগল না। তাদের যে কয়জনা প্রাণে বেঁচেছে তারা এখন কী করে, জান ? এই লণ্ডন শহরেই ডিউকের মেয়ে বোর্ডিং হাউস খুলেছেন, সেখানে তিনিই রাঁধুনী, তিনিই খানসামা। দু'বেলা দু'ডজন লোকের খাওয়াদাওয়া দেখতে হয়। বিশ্বাস হয় না, একদিন এসো আমার সঙ্গে। ডিউকের মেয়ে বলেছি, ভুল বলেছি। প্রিন্সের মেয়ে। এখনো তিনি বলে থাকেন, "Stalin die, I go. Again princess."

আমি খিল খিল করে হেসেছিলুম। তাতে তুমি বলেছিলে, যাক, তোমার পল্লী-ভীতি তার সঙ্গে নগরভীতি যোগ দিলে তুমি কি আর দেশে ফিরতে পা বাড়াবে !

আমি শঙ্কিত হয়ে বলেছিলুম, মনুয়া, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে তুমি মিথ্যে ঝুঁকি নিয়ো না। ওদের শিক্ষা দিয়ে কাজ নেই, ওদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই নিরাপদ। তোমার জমিদারি বিক্রী করে যা ওঠে, তা নিয়ে তুমি এই দেশেই বাস কর।

তুমি বলেছিলে, বিলেত যেমন দিন দিন স্বর্ণলঙ্কায় পরিণত হচ্ছে তার ফলে লুব্ধকদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম এরই উপর পড়বে কি না কে জানে। না, খুশি। আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আগুনের তাপ এড়াব। খাণ্ডবদাহনের দিনে সেই সব চেয়ে নিরাপদ।

তোমার এই কথা শুনে আমি রাগ করেছিলুম। তোমার জন্যে শঙ্কিত হয়েছিলুমও।

মহুয়া, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে খাণ্ডবদাহনের দিনে আমি তোমার সহমৃতা হব। কিন্তু তুমি আমার একটি কথা রাখ। তুমি পি-এইচ. ডি হও।

তুমি অট্টহাস্য করেছিলে। বলেছিলে, সেই যে বুড়ী, জজকে আশীর্বাদ করেছিল দারোগা হতে, এও তেমনি জীবনশিল্পীকে আশীর্বাদ পি-এইচ. ডি হতে।

সে সব কথাবার্তা মনে পড়ছে আজ, রাগও হচ্ছে, ক্ষোভও হচ্ছে। সুধী, সুধা, তুমি কি ভাবছ আমি মরতে ভয় করি, গ্রামকে আমার ভয়? আমার ভয় মা'কে আর বাবাকে।

২

সেদিন কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল অশোকা। তখন কি সে জানত যে সেই দিনই তার "মনের খুশি"কে চিরদিনের মতো হারাবে!

যেমন প্রতিদিন তেমনি সেদিনও সে গুন গুন করে গান সাধতে সাধতে প্রসাধন করল। যথাবিধি মা'কে বলল, "গুড মর্নিং, মামি। ঘুম কেমন হলো?"

মা বললেন, "মর্নিং, ডিয়ার। তোমাকে জানাতে চাই আজ ওবেলা স্নেহময় আসছে। কাল এসে তোমার দেখা পায়নি।"

মা এমনভাবে বললেন, যেন স্নেহময়ের কী একটা জরুরি কাজ আছে। অশোকা সবিস্ময়ে শুধাল, "কেন, মা। কী হয়েছে?"

"হবে আর কী!" মিসেস তালুকদার রাশভারী লোক, ধীরে ধীরে রাশ ছাড়লেন। "ইয়ং ম্যান, মোটরকার পেলে যা হয়ে থাকে। রাতারাতি বিয়ে করে হানিমুনে বেরবে. সারা ইউরোপ বেড়াবে, এই তার আর্জি।"

অশোকা তো অবাক।

মা বললেন, "আগে পড়াশুনা, তার পরে রোজগার, তার পরে বিয়ে। এই তো নিয়ম, এর ব্যতিক্রম কেন হবে তার ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখছিনে। তাই আমি বলেছি, বিয়ে না, হানিমুন না, কন্টিনেন্ট না। তবে বাগ্‌দানের স্বপক্ষে নজীর আছে বটে। স্নেহময় আজ আসছে বাগ্‌দানে তোমার আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে।"

"আজকেই!" অশোকা স্তম্ভিত হলো। চোরের মতো বলল, "কেন, মা? দু'চার দিন দেরি হলে ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি?" তিনি রায় দিলেন, "ক্ষতি হয়তো নেই। কিন্তু ছেলেটিকে দিনের পর দিন ঘোরানোটা কি ভালো? এখন তার নিজের মোটর হয়েছে—"

বাস্তবিক অশোকা "আজ নয়, অন্য একদিন" বলে স্নেহময়কে অনেক বার ঘুরিয়েছে। স্নেহময় সম্বন্ধে তার নীতি হচ্ছে, না গ্রহণ না বর্জন। ধৈর্য বটে স্নেহময়ের। এতকাল

অশোকার মুখ চেয়ে ঝুলে রয়েছে। জানে না যে অশোকার মন অন্যত্র। জানতে চেষ্টাও করেনি, কারণ তার ভূতপূর্ব সচিব তারাপদ ওরফে টর্পেডো তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তার একখানা মনের মতো মোটর নেই বলে সে জজ কন্যার প্রসাদ পাচ্ছে না। থাকত যদি একখানা সিত্রোয়েন ফোর তা হলে অশোকা তো অশোকা, স্বয়ং মেরী পিকফোর্ড তার প্রেমে পড়তেন। তখন থেকে তার এক চিন্তা, এক ধ্যান। কী করে একখানা মনের মতো মোটর কেনা যায়। তাই বছর খানেক ধরে টাকা জমিয়ে পুরোনো পোশাক বেচে, ধার করে স্নেহময় একখানা বেবী অস্টিন কিনেছে। এর জন্যে সে দস্তুরমতো লজ্জিত, কিন্তু বুড়ো বাপটি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন কি ভদ্রলোকের স্টুডিবেকার কেনার সঙ্গতি হবে।

যাক, সে যে একখানা মোটর কিনে ফেলেছে এ হলো, যাকে বলে, **half the battle.** এখন তার মোটর হয়েছে, সে জাতে উঠেছে। বহুজনের বহুদিনের পরিহাসের শোধ তুলবে এবার এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে, হানিমুন করে, ভিয়েনা ভিনিস রিভিয়েরা বেড়িয়ে।

"এখন তার মোটর হয়েছে তো কী হয়েছে, মা?" অশোকা সরল মনে জানতে চাইল।

"কী হয়েছে!" মেয়েটা কি নীরেট, না ন্যাকা। কী হয়েছে তাও খুলে বলতে হবে।

"কিচ্ছু না।" মা ঘটা করে চুপ করলেন।

অশোকা তা দেখে ফিক করে হাসল। কাজটা অতি গর্হিত। সে নিজেই তৎক্ষণাৎ অপরাধীর মতো বলল, "না, মা, হাসির কথা নয়।" অর্থাৎ তুমি অমন হাস্যকর হলে আমি হাসি চেপে রাখতে পারব না।

তা শুনে তার মা আরো হাস্যকর হলেন। যেন চ্যালেঞ্জ করলেন, কত হাসবে হাস। অশোকা কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না, চাপা হাসির উপর যত সাধ্যসাধনা করে কিছুতেই মা'র সাড়া পায় না। তখন চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "বল না, মা, তোমার পায়ে পড়ি।"

"তুমি ছেলেমানুষ।" মেয়ের মিনতি শুনে মা'র যেন একটু কৃপা হলো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তিনি আবার মৌন হলেন।

"ছেলেমানুষ! ওমা! এক কুড়ি বয়স হলো, তবু ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ নয় তো কী! সংসারের তুমি কতটুকু বোঝ! আমার সময় সময় মনে হয় আমি যদি হঠাৎ চোখ বুজি, তোমার বাবা যেমন ভালোমানুষ, তুমিও তেমনি, মুকুলের তো কথাই নেই। কী করে চালাবে তোমরা? সবাই মিলে তোমাদের দু'বেলা ঠকাবে, এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবে।"

তিনি যে নীরব থেকে এই সমস্ত গবেষণা করছিলেন তা ভেবে অশোকার আর এক-দফা হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু একদফা হেসে তো এই ব্যাপার, আবার হাসলে কোনোদিন শোনা হবে না মোটর হয়েছে তো কী হয়েছে।

"ঠিক বলেছ, মা। সংসারের আমি কতটুকু বুঝি। সেইজন্যেই তো জানতে চাইছি, মোটর হয়েছে তো কী হয়েছে।"

"কী হয়েছে?" মিসেস তালুকদার এতক্ষণ পর ভেঙে বললেন, "ইয়ং ম্যান, বৌ নেই, মোটর আছে, দুই আর দুই মিলে কী হয়? এই তোমরা পাটীগণিত পড়েছ?"

অশোকা পাটীগণিত পড়েছে, কিন্তু ওর কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর লেখা নেই। সে হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে না পেরে অন্যমনস্ক হলো।

যার মোটর আছে তার সাথীর অভাব হয় না। কী অপমান!

সুধীর সঙ্গে যখন পরিচয় হয়নি তার আগে স্নেহময়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে অশোকার। তার মত চাওয়া হয়নি, সেও মত জাহির করতে যায়নি। অশোকার মা মনে মনে স্থির করেছিলেন, স্নেহময় যতদিন ছাত্র বিয়ের প্রসঙ্গ ততদিন তোলা হবে না, তবে বাগ্‌দানের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। স্নেহময় তুলেছে কয়েকবার, অশোকা "হাঁ" বললে সুধীকে হারায়, "না" বললে মা রাগ করেন।

সেই স্নেহময়ের এখন মোটর হয়েছে। সে যে আর অপেক্ষা করবে তা তো মনে হয় না। আজকেই তাকে যা হয় বলতে হবে, নইলে সে তার মোটরে করে কাকে নিয়ে বেড়াবে! ভাবতে বিশ্রী লাগে! তার দোষ কী, সে কি প্রায় তিনটি বছর সবুর করেনি?

সুতরাং আজকেই সুধীর সঙ্গে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া চাই। সুধীও এক কথায় বলুক, "হাঁ" কিংবা "না"। সেই অনুসারে অশোকাও মনঃস্থির করবে।

সুধীর উপর অশোকা তিক্ত বিরক্ত হয়ে রয়েছিল। স্নেহময়ের এই আলটিমেটাম—অশোকার বিবেচনায় ওটা আলটিমেটাম—তার মাথা বিগড়ে দিল। স্নেহময়কে যদি সোজা বলে, "কোনো আশা নেই, স্নেহময়দা, আমি অন্যের" তা হলে ও কথা মা'র কানে উঠবেই, স্নেহময় তাঁর কাছে তাই জানিয়ে বিদায় নেবে। তার পরে যদি সুধীও বিমুখ হয়, তবে অশোকার মুখ থাকে কোথায়! মা যে শুধু রাগ করবেন তাই নয়, টের পেলে বিদ্রূপ করবেন। ভিখারী শিবের গলায় মালা দিয়ে কী দশা হয়েছিল সতীর? দক্ষ যজ্ঞে দেহত্যাগ!

এমন পাগলও আছে। বিদ্যের জাহাজ, ইচ্ছা করলে হাসতে হাসতে পি-এইচ. ডি হয়। অথচ হবে না, হলে তার দেশে ফিরতে দেরি হয়, দেরি হলে দেশ রসাতলে যায়। দেশ বলতে কলকাতা বম্বে দিল্লী নয়, নামহীন পল্লীগ্রাম। পঁচিশ বছর বয়স হলে

পড়াশুনা খতম, এই নাকি তার শাস্ত্রে আছে। এমন পাগলের পাগলামি না সারালে দক্ষযজ্ঞ তো বাধবেই। তাতে শিবের কী, যত দুর্ভোগ সতীর।

না, না, শিবেরও। অশোকা সুধীর জন্যেও ব্যথিত হয়। কিন্তু সুধীর শর্তে রাজি হতে পারে না, কোনোমতেই না। ভিখারী শিব এ যুগে অচল। সতী যদি এ যুগে জন্মান তিনিও রাজি হবেন না ভিখারী শিবকে মালা দিতে। বাধ্য হয়ে শিবকে বাঘ-ছাল ছেড়ে ফ্ল্যানেল পরতে হয়, ষাঁড়ের বদলে ট্র্যামে চড়তে হয়। অশোকা তো বলছে না যে সুধী মস্ত বড়লোক হোক, মোটর কিনুক, সার্জ কিংবা টুইড পরুক। তার দাবীকে সে যতদূর সম্ভব নামিয়ে এনেছে। পি-এইচ. ডির নিচে নামা যায় না, স্বয়ং শিবও সে কথা স্বীকার করবেন, যদি এযুগে জন্মান।

অশোকার আলটিমেটাম তবে পি-এইচ. ডি। কঠিন কিছু নয়, সুধী ইচ্ছা করলেই সম্মত হয়, তারপরে যদি সত্যি উপস্থিত হয় তেমন কোনো অসুবিধা অশোকা সাহায্য করবে তার হাত খরচ থেকে। তবে কিনা সুধীকে হতে হবে অশোকার পিতামাতার চোখে সুপাত্র। শিবকেও তাঁরা সম্মান করবেন না ডিগ্রী না দেখলে। তাই শিবকেও হতে হয় ডক্টর শিব।

৩

তারপর বিকালে যখন সুধীর সঙ্গে দেখা হলো, তখন সুধী তার স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাস্যে কুশলপ্রশ্ন করল। সে বেচারা জানত না যে তার জন্যে এদিকে বোমা তৈরি হয়েছে, অচিরাৎ ফেটে চৌচির হবে।

অশোকা এক নিঃশ্বাসে বলল, "ভালো আছি। মনুয়া, তোমাকে আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এই আমার আলটিমেটাম।"

তার নিজেরই বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। এ যেন গায়ে পড়ে বিচ্ছেদ ডেকে আনা। কিন্তু বিচ্ছেদ কেন? সুধী ইচ্ছা করলেই অশোকার দাবী মেনে নিতে পারে। তখন এই দুঃসাহসের পরিণাম সুখময় হবে। তখন দু'জনে মিলে মনের সুখে ভাবী জীবনের ছক আঁকবে। সে প্ল্যান একা সুধীর নয়, অশোকারও।

"কী হয়েছে, খুশি? তোমাকে তো খুব খুশি বোধ হচ্ছে না?" আলটিমেটামের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিল সুধী।

"হাসিতামাশা করতে চাও তো সারা জীবন ধরে করবে।" অশোকার আলটি-মেটামের ঘায় সুধীর টনক নড়ছে না দেখে অশোকা হাতুড়ি পিটল, "যদি আলটিমেটাম গ্রহণ কর।"

"ওসব মিলিটারি পরিভাষা শুনলে পরিহাস করতে সাহস হয় না।" সুধীর হাসি

মিলিয়ে গেল। "সিভিল ভাষায় বল দেখি কী ব্যাপার।"

ব্যাপার যে কী তা অশোকা ভেঙে বলতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কিছু নয়, স্নেহময় আসছে প্রপোজ করতে—যা সে কতবার করেছে। এবারকার নূতনত্ব তার একটি যান জুটেছে। সুধী শুনলে তুমুল রসিকতা করবে। বর এসেছে পাল্কী নিয়ে, অন্য কোনো মেয়ে হলে আহ্লাদে উলুধ্বনি দিত, অথচ "মনের খুশি"র মনে খুশি নেই।

অশোকা খুলে বলল না, চেপে গেল। বলল, "কালকেই তুমি দরখাস্ত করবে যে সামনের সেসনে পি-এইচ. ডির জন্যে পড়া শুরু করবে।" তা হলে সে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে মা'কে বলতে পারবে যে সে একজনকে বিয়ে করতে চায়, তিনি পি-এইচ. ডির জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

নতুন কথা নয়। সুধী অনেক বার শুনেছে। কিন্তু কালকেই কেন? এর মধ্যে এমন কী ঘটল!

কী ঘটেছে জানতে চাওয়া অভদ্রতা হবে। সুধীকে নীরব দেখে তাগিদ দিতে থাকল অশোকা। "করবে? করবে না? করবে?"

সুধী বুঝতে পারল যে অশোকার মনের অবস্থা কোনো কারণে বিক্ষুব্ধ। সম্ভবত মা'র সঙ্গে মনকষাকষি। আজ তাকে কিছু না বললেই ভালো হতো। কিন্তু সে যে আধ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে চায় না। আধ ঘণ্টায় যা বলবার তা অনায়াসে বলা যায়, সুধীর বক্তব্য তো বহু পূর্বে বলা হয়ে রয়েছে। কিন্তু সহজ কথা সহজ সুরে বললেই তো সমস্যা মেটে না। যাকে বলবে তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সুর মেলাতে হয়। তেমন সুরটি আজ কোথায়?

"কত সময় দিয়েছ? আধ ঘণ্টা?"

"হাঁ। আধ ঘণ্টা। আমার অন্য এনগেজমেন্ট আছে।" অশোকা মিথ্যে বলেনি। স্নেহময় আসছে, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যেমন সুধীর সঙ্গে তেমনি স্নেহময়ের সঙ্গে আজকেই একটা এসপার কি ওসপার হয়ে যাওয়া দরকার। যদি সুধী অশোকার শর্তে রাজি হয় তবে স্নেহময়কে মধুরভাবে বিদায় দিতে হবে, তাকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রাখা অন্যায়। আর যদি সুধী নিজের জেদ না ছাড়ে, তবে স্নেহময়কে কথা দিতে হবে, তাকে বার বার ঘোরানো অন্যায়।

সুধী ভাবছিল কী করে অশোকাকে বলা যায়। কী বলবে, তা আজ মুখ্য নয়। কেমন করে বলবে, তাই মুখ্য। অশোকা সুধীর পরম প্রিয়। তার জন্যে সুধী সুখ সম্পদ ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যেখানে আদর্শের প্রশ্ন, সেখানে সুধীর ত্যাগ প্রকারান্তরে অশোকারও ত্যাগ। সুধীর মধ্যে যা সত্যিকার তাকে ত্যাগ করলে সুধীর কী অবশিষ্ট থাকে? সুধীর অবশিষ্ট নিয়ে অশোকা কতখানি হারায়!

তার পর সুধীর জীবন কি সুধী-অশোকার ঘরোয়া সম্পত্তি ? তা কি ভারতবর্ষের মহাজীবনের অঙ্গ নয় ? বিদেশে বসে আপনাকে গড়ে তোলা কত কাল চলবে ? যার জন্যে গড়ে তোলা তার প্রয়োজন কত কাল অপেক্ষা করবে ? ভারতের সম্মুখে দীর্ঘ দুর্দিন। বহু সমস্যায় জর্জরিত সে দেশ পরের বন্ধনে অসহায়। অথচ বন্ধনমোচনের যে উপায় তা পৃথিবীর ইতিহাসে অপরীক্ষিত। কী আছে ভারতের ভাগ্যে, কে জানে !

সুধী বলল, "খুশি, ভালোবাসার চেয়েও বড় জিনিস আছে। সেও ভালোবাসার সামিল, কেননা ভালোবাসাকে আরো বড় করে, আরো বড় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, সম্পূর্ণতা দেয়।"

অন্য সময় হলে অশোকা শুনত এ কথা, বুঝতে না পারলে বুঝে নিত। কিন্তু এখন তার প্রত্যেকটি মিনিট মূল্যবান। সে কি সুধীর বক্তৃতা শুনতে এসেছে ? সে চায় স্পষ্ট জবাব। সে চায় কর্মতৎপরতা।

সে অসহিষ্ণুভাবে বলল, "বক্তৃতা শুনতে সারা জীবন রাজি আছি, কিন্তু আজ না। তুমি যে বাক্‌পটু তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। কিন্তু তুমি যে কর্মকুশল তাই জানতে দাও, মনুয়া।"

তার রুদ্র মূর্তি দেখে সুধীর চোখ গেল ঝলসে। শুধু রুদ্র নয়, সেই সঙ্গে করুণ। পরমুহূর্তেই আবেগভরা আবেদন কানে এলো, "মনুয়া, কাজের ভাষায় কথা বল, কথার ভাষায় না। আজ তুমি দার্শনিক নও, সুধী নও। আজ তুমি বীর চক্রবর্তী।"

সুধীর বীরত্বের প্রতি এই আহ্বান সুধীকে স্পর্শ করল, কিন্তু করবে কী সুধী ? তার যেখানে বীরত্ব সে তার সুধীত্ব। সুধীত্ব বিসর্জন দিয়ে বীরত্বের অবকাশ কই ? তেমন বীরত্বের অন্তিম মূল্য কী ?

"খুশি, তোমাকে আঘাত করলে আমারও আঘাত বাজে। এ কথা বিশ্বাস কর।" সুধী বলল ব্যাকুলভাবে। "যদি আঘাত করি, তবে নাচার হয়েই করি, বিশ্বাস কর।"

অন্য সময় হলে অশোকা বিশ্বাস করত, ভেবে দেখত। কিন্তু আজ কিনা তার দোটানার শেষ। আজ তার এস্‌পার কি ওস্‌পার। তার সময় নেই, ধৈর্য নেই, সহিষ্ণুতা নেই।

"ভূমিকা শুনব না। উপসংহার শুনতে কান পেতেছি। বল, কী স্থির করলে ? হাঁ, কি, না ?" অশোকা জুলুম করল।

অশোকার এ এক অভিনব রূপ। দীর্ঘকাল আবেদন আর নিবেদন করেছে, কোনো ফলোদয় হয়নি। এখন সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। নির্দয় কণ্ঠে বলছে, ভূমিকা শুনব না, উপসংহার শুনতে কান পেতেছি। হাঁ, কি, না ?

অশোকা তার হাতঘড়িটাকে চোখে চোখে রাখল। ওদিকে তার বুকের আলোড়নও প্রচণ্ড। যতই সময় যাচ্ছে ততই আসন্ন হয়ে আসছে চরম মুহূর্ত।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুধী বলল, "খুশি—"

অশোকাও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাধা দিয়ে বলল, "বল, হাঁ। বল, বল—"

সুধীর মুখথেকে জোর করে কেড়ে নিতে চায়, দাঁতের ডাক্তার যেমন করে দাঁত উপড়ে আনে।

সুধী যদি "হাঁ" বলত অশোকা বোধ হয় শূন্যে লাফ দিত, যেমন ছেলেরা লাফ দিয়ে চেঁচায়, "গোল"। হাততালি দিয়ে বলত, "হিপ হিপ হুরে।"

সুধী ক্ষণকাল আত্মস্থ হয়ে বলল, "আমার অন্তরের সম্মতি নেই। মাফ কর।"

এই উত্তর! এত সাধনায়, এত আরাধনায় এই বর!

অশোকার বুকে উত্তাল তরঙ্গ, নাসায় ঘন ঘন শ্বাস। আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। এই সুধী! এই তার বীরত্ব! এই কাপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করত সে! এরই অনুসরণ করেছে সে দিনের পর দিন! ছি ছি! অতি নির্লজ্জ সে নিজে, পুরুষের পশ্চাদ্‌ধাবন করেছে কিসের সম্মোহনে! তাই তার কপালে ছিল এই অপমান, এই প্রত্যাখ্যান।

সহসা বিদায় নিল অশোকা। নেবার সময় বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।" অত্যন্ত মোলায়েম স্বর। অসাধারণ সংযমের প্রয়াস। আপনাকে প্রাণপণে সংবৃত করে আরো মৃদুল স্বরে বলল, "গুড বাই।" যেন কোনো অপরিচিতা বলছে কোনো অপরিচিতকে।

তার পরে হাত বাড়িয়ে দিল। প্রিয়ার মতো প্রিয়ের হাত ধরতে নয়, মহিলার মতো অতিথির করমর্দন করতে।

সব শেষ। কত কালের পরিচয়, আলাপ, সখ্য। কত জল্পনা কল্পনা। অনুরাগ, অনুযোগ, অভিমান। সব শেষ। অশোকার প্রবৃত্তি হলো না পরের হাতে অধিকক্ষণ হাত রাখতে। সে তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিল।

তার পরে যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। কেবল ট্যাক্সিতে চড়বার সময় একবার অপাঙ্গে তাকাল। তখনো সুধী একঠাঁই দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে কী ভাবছে।

৪

অন্তরের সম্মতি নেই।

অশোকা দাঁতে দাঁত চাপল। অন্তর বলে কি আলাদা কেউ আছে? রাবিশ। সোজা ভাষায় বললে হতো, আমার নিজেরই মত নেই।

অশোকা জ্বলতে থাকল স্বকল্পিত প্রত্যাখ্যানের জ্বালায়। ছি ছি। কী অপমান!

কেনই বা সে উপযাচিকা হয়ে এত কাল সুধীর পায়ে পায়ে ঘুরল। মেয়েরা কি কখনো উপযাচিকা হয়? উপযাচক হয় পুরুষে। ছি ছি। পুরুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যান! 'ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।'

জ্বলতে জ্বলতে অশোকার মাথা ধরে গেল। মাথার যন্ত্রণায় সে নিচে নামবার জন্যে তৈরি হতে পারল না, শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। আজকেই স্নেহময়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়ে যাক, যেমন সুধীর সঙ্গে হলো। এই ঝুলে থাকা ও ঝুলিয়ে রাখা আর কত কাল চলবে!

কিন্তু জোর যে নেই। গায়ের সব জোর যেন ফুরিয়েছে। বিছানা থেকে উঠতে কষ্ট হয়। মনের জোর যেটুকু ছিল খরচ হয়েছে রাগে ও কান্নায়। সাহস হয় না স্নেহময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে, চোখাচোখি তাকাতে। ধরা পড়ে যাবার ভয় তো আছেই, হঠাৎ কেঁদে আকুল হলে স্নেহময় মনে করবে কী!

তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে, অশোকা নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যদিও। এখনো কি একটুখানি আশার রেশ নেই? এখনো কি আশা হয় না যে সুধী আজ সারারাত অনুতাপে দগ্ধ হবে, হয়ে কালকেই ফোন করবে? মাত্র আধ ঘণ্টা আলটিমেটাম দেওয়া কি উচিত হয়েছে অশোকার? এত বড় একটা ব্যাপারে—জীবন-মরণের ব্যাপারে—কেউ আধ ঘণ্টায় মনঃস্থির করতে পারে? অশোকা হলে পারত?

স্নেহময়ের মোটরখানার কী জানি কেমন আওয়াজ। কিন্তু যেই কোনো পথচারী-মোটরের ঘর্ঘর অশোকার কানে পৌঁছায় অমনি সে চমকে ওঠে। এই রে। এই সেই সর্বনেশে মোটর, যার জন্যে আমার এ দুর্দশা।

স্নেহময় কিন্তু পায়ে হেঁটে এলো। গাড়িখানাকে রেখে এলো পোয়া মাইল দূরে। মোটর থাকতে সাধ করে পদাতিক হবার কারণ ছিল। নগণ্য বেবী মোটরকার তার নিজেরই না-পছন্দ। মিসেস তালুকদার হয়তো সদর ফটক দিয়ে ঢুকতেই দেবেন না, খিড়কির দিকে ইশারা করবেন। তাঁর কাছে মোটরের বার্তা দেবার সময় স্নেহময় সেটার আকার প্রকার অনুক্ত রেখেছিল। তিনিও জেরা করেননি।

অশোকাকে সংবাদ দেওয়া হলে সে কাতরভাবে বলল, "আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, নেলী। মা'কে বল, আমি উঠতে পারছিনে।"

মা এসে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "হুঁ। একবার ডাক্তার থিওবলড্‌কে রিং আপ করলে কেমন হয়?"

"করতে পারো। কিন্তু মিছিমিছি ওষুধ খেয়ে কী হবে? আমাকে বরং বিশ্রাম করতে দাও।"

মিসেস তালুকদার বিরক্ত হলেন। ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে এনে অপ্রস্তুত করা

তাঁর বিচারে গুরুতর অপরাধ। তিনি যে স্নেহময়কে ডিনারে ডেকেছেন। কথা দিয়েছেন আজকেই অশোকা যা হয় একটা কিছু বলবে।

তিনি য়্যাসপিরিনের উল্লেখ করলেন, কিন্তু অশোকা এমন ভাব দেখাল যেন তার সমস্ত শরীর অবশ। মাথা ব্যথার অবসান হলেই তো অবশ অবস্থার অবসান হবে না। একটা হট ওয়াটার বট্‌ল চাওয়ায় মিসেস তালুকদার একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু ডাক্তার ডাকবেন কি-না ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। ডাক্তার এলে কি তাকে উঠতে দেবে? বরং পূর্ণ বিশ্রামের ফতোয়া দিয়ে তারই ইচ্ছা পূরণ করবে।

তিনি বললেন, "আচ্ছা, এখন এক ঘণ্টা বিশ্রাম করতে পারো। একটু ভালো বোধ করলে নিচে গিয়ে একটুখানি বসবে, তারপর উঠে আসবে। কেমন?"

"আমি খাব না।"

"না, খেতে হবে না। এমনি এক আধ মিনিট গল্প করে আসবে। একটু কুশল-বিনিময়।"

অশোকা অগাড়ভাবে বলল, "তা হলে একখানা স্ট্রেচার জোগাড় কর।"

মিসেস তালুকদার মেয়ের দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর সশব্দে প্রস্থান করলেন। স্নেহময়কে এখন বোঝাবেন কী! আপনিই বুঝতে পারছেন না মেয়ের রঙ্গ। মা'কে এমনভাবে let down করা কি মেয়ের কাজ!

ভাবী শাশুড়ীর মুখভাব নিরীক্ষণ করে স্নেহময়ের মনোভাব যা হলো তা এক কথায়, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়। সে আজ সারা দিন তাসের কেল্লা বানিয়েছে। সীজারের মতো আসবে, দেখবে আর জয় করবে। অশোকা যেই জ্ঞাপন করবে তার সম্মতি, স্নেহময় অমনি তার একটি হাত ধরে একটি আঙুলে পরিয়ে দেবে আজকের কেনা একটি আংটি। বলবে, "এই বা কী! যেদিন বাগ্‌দানের উৎসব হবে, সেদিন পরিয়ে দেব দুনিয়ার সেরা আংটি।" তার পরে ভাবী শাশুড়ীকে প্রণাম করে তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করবে একটি ব্রুচ। অবশ্য পায়ে পরবার জন্যে নয়, কিন্তু যেখানে পরবার জন্যে সেখানে কী স্নেহময় পরিয়ে দিতে সাহস পাবে! বলবে, "এই বা কী! যেদিন বাগ্‌দানের উৎসব হবে সেদিন—"

"ওর ভীষণ মাথা ধরেছে, স্নেহময়! ওকে আজকের মতো একস্‌কিউজ কর তো বিশেষ অনুগৃহীত হব।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" স্নেহময় ভগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল। "আমি কি তাঁর কোনো রকম কাজে লাগতে পারি?"

"থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার মতো মহৎ যুবা," তিনি মাথা নাড়লেন, "খুব বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

স্নেহময় প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলে তিনি বললেন, "আমি কল্পনাও করিনি যে তোমাকে আজ নিরাশ হতে হবে। কী করি বল, মাথা ধরার উপর কি কারো হাত আছে?"

ইতিমধ্যে স্নেহময়েরও প্রায় মাথাধরার দাখিল। সে মাথা দুলিয়ে বলল, "যথার্থ। যথার্থ।"

"তা হলে তুমি এক্স্‌কিউজ করলে। কেমন?"

"সানন্দে।" স্নেহময়ের অন্তরাত্মা বলছিল, অগত্যা।

এক্স্‌কিউজ কথাটা শুনে সে একটু ঘাবড়ে গেছল। কেননা, তারাপদ কুণ্ডু তাকে শিক্ষা দিয়েছিল মেয়েদের কাছে যখন বিবাহের প্রস্তাব করবে তখন যেন ভণিতা করে "এক্স্‌কিউজ মী" বলে। আজকেও অশোকাকে নেপথ্যে ডেকে নিয়ে বলত, "এক্স্‌কিউজ মী, অশোকা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করে জালাতন করতে পারি কি—তুমি কি আমাকে আজীবন সুখী করবে?" সেই এক্স্‌কিউজ অবশেষে অশোকার জননীর মুখে শুনতে হলো। হা হতোঽস্মি!

"তোমার মহত্ত্বের তুলনা," মিসেস তালুকদার জোর দিয়ে বললেন, "দুনিয়ায় দু'দশ হাজারের বেশী নেই। কিন্তু স্নেহময়, তুমি কি দয়া করে আরেক দিন আসবে?"

"দয়া!" স্নেহময় বলতে চাইল দয়া কাকে বলছেন, ও যে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। কিন্তু বলতে বাধল। সে কথাবার্তায় কাঁচা। তার মনের ভাব মুখে যেটুকু ব্যক্ত হয় তাতে শব্দের অভাব।

অশোকার মা স্নেহময়কে আন্তরিক স্নেহ করতেন। স্যার বংশলোচনের বংশধর তথা অংশধর। কিন্তু সেই তার একমাত্র যোগ্যতা নয়। অন্যান্য অভিজাতনন্দনদের মধ্যে ক'জন তার মতন লম্বায় ঠিক ছ' ফুট? তা ছাড়া সে একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা, প্রয়োজন হলে মুষ্টির সহায়তায় নারী উদ্ধার করবে। নারীহরণের দেশে কতো বড় একটা ভরসা। লেখাপড়ায় তেমন উজ্জ্বল নয় বটে, কিন্তু মুরুব্বির জোর থাকলে সরস্বতীর কৃপা-বিহীনরা লক্ষ্মীর বাহন হয়ে থাকে। মিসেস তালুকদার তাই আই সি এস, আই এম এস-দের অন্বেষণ করেননি, স্নেহময়কে হাতের কাছে পেয়ে নিরুদ্‌বেগ হয়েছেন।

তা বলে তাকে অসময়ে কন্যাদান করতে কিছুমাত্র ত্বরা ছিল না তাঁর। আগে তার পড়াশুনা সারা হোক, কোনো নামকরা ফার্মে যোগ দিক সে। ইংলণ্ডে হলেই সোনায় সোহাগা হয়, যেহেতু এই দেশেই তালুকদার সাহেব পেনসন ভোগ করবেন স্থির হয়েছে। স্নেহময় যে এক ঝোঁকে বিয়ে করতে চায় এ যেন ভারতবর্ষের স্বরাজ। মিসেস তালুকদার দান করতে রাজি আছেন, কিন্তু আজ নয়। দেবেন কিস্তিবন্দী ভাবে। আপাতত বাগ্‌দানের কথাবার্তা চলুক, তারপরে এক সময় হয়ে যাক বাগ্‌দান, পরে

অনির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে পরিণয়।

স্বামী কলকাতায়। তিনি একা তাঁর ছুটি সন্তানের শিক্ষার জন্যে লণ্ডনে প্রবাসী। আপদে বিপদে উপকার পাবেন আশা করে তিনি ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় জাতির পরিচিত ও অপরিচিতদের মাসে মাসে পার্টি দেন। সেই সূত্রে সুধী নামে একটি নবাগত যুবককে ডেকেছিলেন, সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন তো জানতেন না, এখনো জানেন না, অশোকার সঙ্গে সুধীর কী সম্পর্ক দাঁড়াবে। জানলে বাধা দিতেন, কেননা স্নেহময়ের সঙ্গে সুধীর তুলনাই হয় না। কী আছে সুধীর? বংশগৌরব, না বিত্তসৌরভ? আছে বিদ্যা, কিন্তু ও বিদ্যায় লক্ষ্মীর অনুগ্রহ নেই, ওতে শুধু সরস্বতীর সন্তোষ।

"তা হলে, স্নেহময়, তুমি এক্স্‌কিউজ করে আজ বাঁচালে। তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানিনে। এখন চল, তোমাকে নিয়ে ডিনারে বসি।"

স্নেহময় বলতে চাইল, ধন্যবাদ কেন, আমি তো আপনার চির বশংবদ। কিন্তু সরস্বতী তার স্বর কেড়ে নিলেন।

৫

সে রাত্রে অশোকা স্নেহময়ের সঙ্গে দেখা করল না। তবু তার মাথার ওপর ঝুলতে থাকল বাগ্‌দানের খড়্গ। সুধীর সাহায্য বিনা রক্ষা নেই। অশোকার কি এতখানি মনের জোর আছে যে সুধীকেও হারাবে, স্নেহময়কেও তাড়াবে? সুধী যদি তার সহায় হতো, তা হলে সে মা'কে চটাবার ঝুঁকি নিত, মা চটলেও বাবা বুঝতেন সে অন্যায় করেনি। কিন্তু সুধীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্নেহময়কে প্রত্যাখ্যান করলে সে মা-বাবার সামনে দাঁড়াবে কোন ভরসায়? কার জোরে?

তার নিজের জোর যেটুকু আছে, সেটুকু একটি পরগাছার। সে স্বাবলম্বী হবার স্পর্ধা রাখে না। বিয়ে তাকে করতেই হবে একদিন না একদিন, একজনকে না একজনকে। সুধীকে না করলে স্নেহময়কে, স্নেহময়কে না করলে অন্য কোনো অপরিচিতকে। ইংরেজীতে বলে, চেনা শয়তানের চেয়ে অচেনা শয়তান ভালো। তা ছাড়া, স্নেহময় তো ঠিক শয়তান নয়। স্নেহময়কে সে পছন্দ করেছিল, প্রশ্রয় দিয়েছিল, সুধীর আবির্ভাবের আগে। সুধীর প্রস্থানের পরে স্নেহময়েরই দাবী অগ্রগণ্য।

না, অশোকার অন্য গতি নেই। যদি জানত যে লেখাপড়া শিখে কোনো রকম মেয়েলি চাকরি করবে তা হলে স্নেহময়কে তার সেই রাক্ষুসে মোটরসহ বিদায় দিত। যে মানুষ নিজের গুণে বিকায় না, সেই আসে মোটরের মুকুট পরে। শুধু তাই নয়। স্নেহময় আবার ভয় দেখান, অশোকাকে না পেলে আর কাউকে মোটরে করে নিয়ে

বেড়াবেন ! আহা, মোটরের কিবা মহিমা। একবার স্নেহময় একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে একটু মিঠে ইয়ার্কি করেছে দেখে অশোকা জিজ্ঞাসা করেছিল, "মেয়েটি কে ?" স্নেহময় বলেছিল, "A flame of mine" অশোকা তা ভোলেনি। আছে স্নেহময়ের ও-স্বভাব। সেইজন্যে স্নেহময়কে বিয়ে করতে তার বিশেষ উৎসাহ নেই। কিন্তু বিয়ে যখন করতেই হবে, আর সুধী যখন বিমুখ, তখন অচেনা শয়তানের চেয়ে চেনা শয়তান ভালো, যদিও স্নেহময় ঠিক শয়তান নয়। অশোকা মনকে বোঝালে যে ফ্লার্ট একটু আধটু সকলেই করে, ফ্লেম এক আধজন সকলেরই আছে।

পরদিন অশোকার মাথাব্যথা গেল, কিন্তু অনিদ্রার দরুন অবসাদ রইল। সে বিছানায় শুয়ে থাকল, চোখ বুজে ঘুমের ভান করল।

তার কান কিন্তু টেলিফোনের পানে। নেলীকে বলে রেখেছিল, যদি চক্রবর্তী নামে কেউ তার খোঁজ করেন তা হলে নিচে থেকে চেঁচানো চলবে না, চুপি চুপি উপরে এসে চাপা গলায় খবর দিতে হবে। নইলে মা টের পাবেন। এই লুকোচুরির দরকার হতো না, যদি সুধী সুপাত্র হতো। অশোকা সুধীর উপর রাগ করে আর সুধীর টেলিফোনের জন্যে কান পাতে।

ব্যর্থ প্রতীক্ষা। টেলিফোন এলো বটে, কিন্তু সুধীর নয়, স্নেহময়ের। সে নাকি অশোকার জন্যে অতীব উদ্‌বিগ্ন, সন্ধ্যায় দেখা করতে উদ্‌গ্রীব। যদি শোনে অশোকা একটু ভালো আছে, তা হলে সে বাগ্‌দানের প্রস্তাব করবেই, আর যদি শোনে অশোকার শরীর তেমন ভালো নয় তা হলেও তার আগমন অনিবার্য। অশোকা কিছুতেই তার সঙ্গে কথা কইতে রাজি নয়, তাকে দর্শন দিতেও প্রস্তুত নয়। মনের ধারা যেদিকে বইছে, সেদিক থেকে সহসা অন্যদিকে ফিরতে পারে না, ফিরতে সময় লাগে। অসময়ে মনকে ফেরাতে গেলে মনের প্রতি অত্যাচার করা হয়, সে অত্যাচার রক্তপাতের মতো ভীষণ। অশোকা নেলীকে দিয়ে বলে পাঠাল, তার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলে তার স্বাস্থ্য সারবে না।

ব্যর্থ প্রতীক্ষা সুধীর জন্যে, সুধীর কণ্ঠস্বরের জন্যে। সুধী কি সত্যি তাকে ভালোবাসে না, এক ফোঁটাও না, এক কণিকাও না, এক পরমাণুও না ? তবে কি সে সুধীর ভালোবাসার পাত্রী নয়, কোনো দিন ছিল না ? যদি তাকে ভালোবাসত সুধী, তবে কি এমন করে উপেক্ষা করত ? এ কি স্বাভাবিক ? মানুষ কখনো পারে এমন পাষাণ হতে ? না হয় বুঝলুম সুধীর একটা পণ আছে, একটা প্ল্যান আছে, যার তুলনায় অশোকা তুচ্ছ। কিন্তু একবার ফোন করতে দোষ কী ? যাকে ভালোবাসত, সে কেমন আছে তা কি জানতে নেই ?

অশোকা ভাবল, সুধী ফোন করতে সংকোচ বোধ করছে, কিন্তু চিঠি লিখবে। চিঠির

আশায় সে রাত দশটা অবধি জাগল, তবু চিঠি এলো না। তখন ধরে নিল পরদিন সকালের ডাকে আসবেই। ভালো ঘুম হলো না, চিঠির চিন্তা তাকে উতলা করল। কী থাকবে চিঠিতে কে জানে! হয়তো সুধী অনুতপ্ত, হয়তো অশোকার শর্তে সম্মত। হবে!

হয়তো শুধু ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখবে। বলবে, আমি নাচার। আমার কাছে তুমি কেন অমন প্রত্যাশা করলে? আমার দেশ আগে, তার পরে তুমি।

অশোকা মনে মনে তর্ক করে। তার অভিমান উদ্বেল হয়, প্লাবিত হয় তার উপাধান। কি নিষ্ঠুর তার মনুষ্যা! যে নারী ওকে ভালোবাসবে সে মরবে। অশোকা যদি না মরে তবু ক'দিন বাঁচবে! ভাবতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে স্নেহময়ের সঙ্গিনী হবে। হলেও সুখ নেই তার কপালে। সুখ যা ছিল, তা সুধী শেষ করে দিয়েছে।

দীর্ঘ সুখহীন জীবনের শঙ্কা তাকে ব্যাকুল করে। ভাবে, সুখহীন যদি হয় তবে দীর্ঘ যেন না হয়। দীর্ঘ যেন না হয়।

সকালেও চিঠি এলো না। অশোকা বালিশে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে সুধীকে অভিশাপ দিল। কী অভিশাপ তা লিখে কাজ নেই। পরক্ষণে বলল, না, না, ছি! আমার অভিশাপ তোমায় স্পর্শ করবে না, প্রিয়তম। তুমি সুখী হবে, তোমার মতো নিষ্পাপ পুরুষ সুখী না হবে কেন? সুখ তো তোমার অঙ্গে, তোমার সঙ্গে। নারী যেমনই হোক না কেন, তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে, কেননা সুখ তো নারীতে নয়, সুখ তোমাতে।

অশোকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। সুখ তার তরে নয়, তার সব সুখ ফুরিয়েছে। বিয়ে করতেই হবে একজনকে, স্নেহময়ের অপরাধ কী! কিন্তু বিয়ে করলেও যা, না করলেও তাই, সুখ তার অদৃষ্টে নেই। একা থাকলেও সুখী হবে না, স্নেহময়ের সাথী হলেও সুখী হবে না, সুখী হওয়া যেন প্রশ্নের অতীত। সুখহীন জীবন কল্পনা করতে শিউরে ওঠে, তেমন জীবন দীর্ঘ হলেও জীবন্ত কবর।

অশোকা হাহুতাশ করে, মা'কে সংবাদ পাঠায় তার বুকে ব্যথা, তিনি ডাক্তারকে ফোন করেন। ডাক্তার বলে, বুকের কাঁপন অস্বাভাবিক দ্রুত। সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর যথা-বিহিত ঔষধসেবন, এ ছাড়া উপায় নেই।

অশোকার মা স্নেহময়ের কথা ভেবে বিরক্ত হন, মেয়ের দশা ভেবে বিরক্তি চাপেন। হঠাৎ কেন এমন হলো কে বলতে পারে? তিনি কার উপর রাগ করবেন বুঝতে না পেরে স্বামীকে দোষ দেন, স্বামী তো বেশ আছেন কলকাতায়, এদিকে দুটি নাবালক নাবালিকা নিয়ে বিদেশে বেসামাল হচ্ছেন তিনি। সেই যে এডিনবরার ভাদুড়ী তাঁর ভাই, তাঁকেই টেলিগ্রাম করবেন কি না চিন্তা করলেন।

তার পরদিনও যখন সুধীর চিঠি পেলো না, তখন অশোকার মাথা মাটিতে মিশিয়ে

গেল। এত নিষ্ঠুর তার মহুয়া। ওকে চিঠি না লিখে উপায় কী! লিখতেই হবে গায়ে পড়ে। সাধতে হবে আবার। অভিমানে বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না যাদের, অশোকা তাদের মতো নয়। অশোকা পারে না অভিমান পুষে রাখতে, হয় হোক মাথা হেঁট। নিজের উপর তার রাগ হয়, কেন এত দুর্বল তার স্বভাব? যে মানুষ সেদিন আলটিমেটাম দিয়ে এলো, সেই মানুষ কী করে আজ কাকুতি মিনতি করবে? লজ্জা নেই কি?

লিখব? লিখব না? লিখব? অশোকা আপনাকে শুধায়। একটি পূরো দিন কাটল এই দোটানায়। তার পরে আর বাগ মানল না তার মন। নির্লজ্জের মতো হাত পাতল সেই দরজায়, যেখানে পেয়েছে প্রত্যাখ্যানের অপমান। ভিখারিণীর কিবা লজ্জা কিবা মান, অশোকা তার দুই গালে দুটি চড় মারল। বলল, ধিক, ধিক আমার অহংকারকে!

মনে মনে গুন গুন করে গাইল, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমার মাথা নত করে দাও হে—

কাগজ কলম নিয়ে অনেক বার খসড়া করার পর এই রকম দাঁড়াল তার চিঠি। "মানছি তুমি পারো মনের ব্যথা মনে চেপে রাখতে, পারো নীরব থাকতে। কিন্তু আমি তা পারিনে। তুমি ভাববে, মেয়েটা কী বেহায়া, সেদিনকার সেই কাণ্ডের পরে আবার চিঠি লেখে যে! মহুয়া, যাকে তুমি খুশি বলে ডাকতে, তার মনে খুশি কোথায়? তুমি তো দার্শনিক, তোমার সুখ তোমার অন্তরে, কেউ তোমাকে অসুখী করতে পারে না। কিন্তু আমি কী করে সুখী হব? আমার সুখের কী ব্যবস্থা করেছ? যদি সত্যি ভালোবাসতে তবে সুখের ব্যবস্থাও করতে। প্রিয়তম, আমি যে তোমার আলোয় আলোকিতা, তোমার আলো না পেলে নির্বাপিতা। তোমার খুশি চির অসুখী হোক এই কি তুমি চাও? চির অসুখীরা ক'দিন বাঁচে?"

চিঠিখানা ডাকবাক্সে পাঠিয়ে অশোকার ইচ্ছা হলো ফিরিয়ে আনে, ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। তার নির্লজ্জতার এত বড় সাক্ষী আর নেই। সুধী পড়ে হাসবে, তুলে রাখবে তার ভাবী বান্ধবীর জন্যে। ছি ছি। কোনদিন কার হাতে পড়বে ও চিঠি, কে কী ভাববে! অশোকা কেঁদে আকুল হলো।

৬

অশোকা যে সুধীর কাছে ঠিক কী আশা করেছিল তা সে নিজেই জানত না। বোধ হয় চেয়েছিল একটুখানি সঙ্গসুখ, তাও পত্রযোগে।

এবার ব্যর্থ হলো না তার প্রতীক্ষা। সুধীর উত্তর ফিরতি ডাকে এলো। সুধী লিখেছিল, "ভালোবেসে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না খুশি। তাই ভালোবাসার কাছে সুখের প্রত্যাশা করতে নেই। ভালোবাসা আপনি একটা সুখ। যে ভালোবাসতে

জানে, সে ভালোবেসেই সুখী। আমাকে তুমি দার্শনিক বলেছ, আমি কি সেইজন্যে সুখী? আমি প্রেমিক, আমি ভালোবাসি প্রকৃতিকে, মানুষকে। আমি ভালোবাসি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, পরিপূর্ণ কল্যাণ। আমার এই সব ভালোবাসা আমাকে সুখ দেয়, নির্জলা সুখ। সুখের জন্যে আমি পরনির্ভর নই। খুশি, তুমিও স্বনির্ভর হও।"

এর পরে লিখেছিল, "মনে রেখো, আমার ধ্যানের থেকে আমি অবিচ্ছিন্ন। আমাকে তুমি বিচ্ছিন্নভাবে চেয়েছিলে, তাই এমন হলো। তোমাকেও আমি নিছক নিজের জন্যে চাইনি, তাই এমন হলো। যা হবার তা তো হয়েছে। এবার দ্বিধাহীন পদে অগ্রসর হও, খুশি। যাকে পিছনে রাখলে, তাকে পিছনে ফেলে যাও।"

পড়তে পড়তে অশোকার চোখ থেকে ধারা ছুটল। নিজের জন্যে ততটা নয়, যাকে পিছনে রাখল তার জন্যে। সেদিন সে কি সুধীর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছে? সুধীকে পিছনে ফেলে একবারও থামে নি।

সম্পূর্ণ বিশ্রামের ছল পুরোনো হয়ে আসছিল, স্নেহময়কে ঠেকানো যায় না। অথচ স্নেহময়কে কথা দেবার পর সুধী চিরকালের মতো পর হয়ে যায়, অশোকা হয় পরের বাগ্‌দত্তা। তখন তো চিঠি লিখতে সাহস হবে না, চিঠি পেতেও ভয় করবে। তেমন চিঠিতে রস থাকবে কী করে?

সব সুখ ফুরিয়েছে, সুখের আশা আর নেই। মনে মনে জপ করে অশোকা। নেই, নেই, বৃথা সময় নষ্ট করে ফল কী? সোজা স্নেহময়কে কথা দিয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। নিষ্ঠুর বাস্তব।

অশোকা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। এমন প্রচণ্ড সংঘাত তার জীবনে ঘটেনি, এমন প্রবল দোটানা। একদিকে স্নেহময় অন্যদিকে সুধী হলে কথা ছিল না। একদিকে জননীর নির্বন্ধ, অন্যদিকে সুধীর ধ্যান। মাঝে মাঝে সুধীর ধ্যান তাকে মুগ্ধ করে, তারা হবে চাষা আর চাষানী, স্বামী সারাদিন মাঠে কাজ করবে, স্ত্রী করবে গোদোহন, দধি মন্থন। স্বামী ধান আনবে, স্ত্রী ধান ভানবে। এমনি কত স্বপ্ন। কিন্তু অশোকার স্বভাবটা প্র্যাকটিক্যাল। যা সম্ভব নয় তার ধ্যানে বিভোর থাকা মুগ্ধতা অর্থাৎ মূঢ়তা। সে সুধীকেই চায়, কিন্তু ধ্যানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চায়। সে স্নেহময়কে চায় না, কিন্তু স্নেহময় যে জীবনপথের পথিক, সে পথ ছাড়া অন্য পথ চায় না। সুধীর ধ্যান ও স্নেহময়ের মোটর, দুটোর মধ্যে যদি একটাকে বেছে নিতে হয় তবে মোটরকেই সে বেছে নেবে। যদিও সেটা রাক্ষুসে, তবু সেটা প্র্যাকটিক্যাল।

সুধীকে অশোকা তার শেষ চিঠি লিখল। আলটিমেটামের সুরে নয়, Swan Songএর সুরে।

"তুমি বেশ বলেছ যে তোমাকে আমি তোমার ধ্যানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে

চেয়েছিলুম, তাই এমন হলো। কিন্তু, প্রেমিক, তোমার অতি সম্ভবপর বধূর প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্র কর্তব্য নেই? তোমার ধ্যানের মহিমা আমি মানি, কিন্তু আমার দুর্বলতা কি তুমি স্বীকার করে নেবে না? তুমি উঠতে চাও হিমালয়ের শৃঙ্গে, কিন্তু আমি যদি সে পরিমাণ শৈত্য সইতে না পারি, তবে কি তুমি আমার খাতিরে সমতল ভূমিতে নামবে না? মনুয়া, তোমাকে একদিন অনুতাপ করতে হবে। তুমি পাবে না এমন মেয়ে, যে তোমার ছায়ার মতো অনুগতা হয়ে প্রতি কথায় সায় দেবে। হয়তো বিয়ের আগে সবতাতেই রাজি হবে, কিন্তু বিয়ের পরে একে একে গররাজি। মনুয়া, তুমি ঠকবে, যদি মেয়েমানুষের মুখের কথা বিশ্বাস কর। তোমার জন্যে আমার সত্যি ভয় হয়, তুমি দেখবে, কোনো মেয়েই তোমাকে ও তোমার ধ্যানকে একত্রে ভালোবাসবে না। কেউ ভালোবাসবে তোমাকে, কেউ তোমার ধ্যানকে। হয়তো তুমি এমন নারী পাবে যে তোমার কল্পনা সম্বন্ধে তোমার চেয়েও উৎসাহী। কিন্তু সে কি তোমার জন্যে তোমাকে ভালোবাসবে? এক সঙ্গে দুই হয় না, সুধা। সুধা, তুমি পাবে না তাকে, যে তোমার মানসী। সংসারে সে নেই, আছে তোমার মনে। প্রিয়তম, এখনো আমি তোমার। আরো দু'এক দিন থাকব, তারপরে থাকতে পারব না। কারণ আমি দুর্বল। আমাকে তুমি সবল করতে যদি আমার কথা রাখতে। আমার হাতের মুঠো শক্ত করতে, যদি—থাক, নাম করব না। বার বার সেই একই উক্তি শুনে তোমার অরুচি ধরেছে। আমাকে আমার এই দুর্বল মুহূর্তে বল দাও, বন্ধু। তোমার ধ্যানলোক থেকে একটুখানি নামো। এই প্রার্থনা কি অত্যধিক প্রার্থনা? একটি নারীর জীবনের অতিশয় সংকটে তার প্রিয় পুরুষের কাছে এইটুকু প্রার্থনা কি সত্যই অত্যধিক?

তুমি কি উত্তর দেবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তা সত্বেও আমি আশা করব যে তুমি আমাকে পরের হাতে সঁপে দেবে না। তাতে মহত্ব নেই, সেটা কাপুরুষতা। যদি তাই করতে তোমার মর্জি হয়, তবে এইখানেই বিদায়, চির বিদায়, ওগো প্রেমিক।"

অশোকা চোখ মুছতে মুছতে এ চিঠি লিখল। লেখা শেষ হ'তে না হ'তে আবার চোখের জলে ভাসল।

তার সুখের ইতি হলো যেই লিখল "ইতি।" তার জীবনের উপর যবনিকা পড়ল যেই স্বাক্ষর করল নাম।

ওদিকে স্নেহময় তাড়া দিচ্ছিল মা'র মারফৎ। অশোকা মা'কে ডেকে বলল, "আমার বিশ্রাম তো প্রায় সারা হয়ে এলো। স্নেহময়দাকে নেমন্তন্ন করছ কবে? পরশু?"

"বেশ। পরশু।" মিসেস তালুকদার মঞ্জুর করলেন।

অশোকা মনটাকে প্রস্তুত করে নিল। যা হবার তা তো হয়ে রয়েছে। যে মালা

সুধীর কণ্ঠে দেবার, সে মালা স্নেহময়ের গলায় দেবে। তৃতীয় পন্থা নেই।

না, নেই। অকারণে দিন ক্ষয় করলে সুধীকেও পাবে না, স্নেহময়কেও হারাবে। স্নেহময় অপেক্ষা করেছে, আর করবে না। এখন তার মোটর হয়েছে, সেই আগুনে কত পতঙ্গ ঝাঁপ দেবে। কিংবা সেই পতঙ্গ কত শিখা সন্ধান করবে। মানুষ দুর্বল, স্নেহময়ও মানুষ। সকলে তো সুধী নয় যে আকাশে বিহার করবে। সাধারণের বিহার ভূতলে। সেখানে কত রকম স্খলন, কত রকম পতন।

যদিও বিশেষ ভরসা নেই, তবু অশোকা আশা করে। কে জানে হয়তো সুধী দুর্বলকে বল দিতে, রক্তহীনকে রক্ত দিতে, আত্মত্যাগ করবে। শিবিরাজা মাংস দিয়েছিলেন, দধীচি প্রাণ দিয়েছিলেন, সুধী কি তার ধ্যান দেবে না? ধ্যানেরও সবটা নয়, অশোকা যা চায় তা ভগ্নাংশ।

সুধীর উত্তর যেদিন এলো অশোকা দৃঢ়চিত্তে চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ রয়েসয়ে পড়ল। এই সম্ভবত শেষ চিঠি। সুতরাং চরম উপভোগ।

"প্রিয়ে, তোমাকে প্রথমেই বলে রাখি, আমি এ জীবনে বিবাহ করব না। একদা স্বপ্ন দেখেছিলুম বৈরাগ্য নিয়েছি, তাই সত্য হলো। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে কত বার মনে হয়েছে, এ কি কখনো সম্ভব যে তুমি আমার সহগামিনী হবে! মন বলেছে, না, যা হবার নয় তার জন্যে নিজেকে সুলভ কোরো না। তবু আমি আশা করেছি—আমিও দুর্বল—জীবনে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তুমিও মিরাক্ল ঘটাবে। সত্যবানের কীই বা ছিল! তবু সাবিত্রী তো তাকেই বরণ করে বনবাসিনী হলো। তার আয়ু নেই জেনেও তার সঙ্গে ভাগ্যযোজনা করল। যে দেশে সাবিত্রী সম্ভব হয়েছে, সেই দেশের কন্যা তুমি, অশোকা। কেন আমি তোমার কাছে ক্ষুদ্র প্রত্যাশা করব? প্রত্যাশাকে ক্ষুদ্র করলে বৃহতের প্রতি অন্যায় করা হয়। রাণীর কাছে কখনো খুদ চাইতে আছে? আমি তাই খুদ চাইনি, রাণী। চেয়েছি মণিহার। যা তুমি পৃথিবীতে কারো জন্যে করতে না, তাই আমার খাতিরে করবে, এই ছিল আমার দুরাশা। আর আমি তো কেবল আমি নই, আমি ও আমার দেশ অভিন্ন। দেশের জন্যে কত মেয়ে কত ত্যাগ করছে, ইউরোপে তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। ভারতে সে দৃষ্টান্ত অধিক নেই বলে ভারতেরও কোনো অধিকার নেই। নারী দুর্বল, পুরুষ দুর্বল বলে দেশও দুর্বল। আশা ছিল, তুমি ও আমি হব আমাদের দেশের সবল নারী ও পুরুষ। ত্যাগবলে সবল। দুরাশা, তবু দুরাশাও শ্রেয়, নিরাশা নিঃশ্রেয়। আমি দুরূহ পথের পথিক, তুমি আমার হাত ধরলে আমার নিঃসঙ্গতা সঙ্গীতে ভরে উঠত।

তা হবার নয়। দুঃখ কী। যেটি যার সত্যিকার সীমা তার শাসন মানতে হয়। তুমি তোমার সীমা বুঝতে পেরেছ, সীমার শাসন মেনেছ। তুমি ভুল করনি। আমিও ঠিক

করেছি। এই পরিণতি এ জন্মে চরম। পরজন্মে তোমার প্রতীক্ষা করব, প্রিয়ে। ইহজন্মে তোমার জন্যে তপস্যা করব।"

৭

সুধীর চিঠি পড়ে অশোকা সরল মনে হাসল। বলল, কথায় তোমার সঙ্গে কে পারবে, মহুয়া? তুমি কথার সওদাগর।

তারপরে ভ্রূকুটি ভরে উচ্চারণ করল, কাপুরুষ! যে নারী পায়ে পড়ে সাধছে তাকে কোলে টেনে নিতে জানে না। কাপুরুষ!

আঃ! কী? এই শেষ। এর পরে যা আসছে তা সুধী অশোকার উপাখ্যান নয়, স্নেহময় ও অশোকার।

নিমন্ত্রণের রাত্রে স্নেহময় বলল, "কত কাল তোমাকে দেখিনি। কেমন আছ, অশোকা?"

"ভালোই আছি, স্নেহময়দা। ধন্যবাদ।"

অন্যান্য কথাবার্তার পর আহারের ফাঁকে স্নেহময় চুপি চুপি বলল, "এক্স্কিউজ মী, অশোকা—"

অশোকা এ গৌরচন্দ্রিকা আগেও শুনেছে। বুঝল, তার মরণমুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। নিয়তিকে এড়িয়ে বেড়াবে কত কাল! সে আজ ক্লান্ত, অপরিসীম ক্লান্ত! ধরা দিয়ে মরতে চায়, না দিলে বাঁচবে না।

"কী বলছিলে, স্নেহময়দা?"

"বলছিলুম, তুমি কি—"

"আমি কি—"

"কষ্ট করে···এই যে, কী বলছিলুম, কষ্ট করে—"

"বল না স্পষ্ট করে?" অশোকা ফিসফিসিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। এই নিয়ে কত বার প্রস্তাব করা হলো, এখনো সংকোচ গেল না স্নেহময়দার। অত্যন্ত অচল অভিনেতা, পদে পদে প্রম্প্‌ট্‌ করতে হয়।

"তুমি কি কষ্ট করে রাজি হবে আমাকে—"

"তোমাকে মার দিতে?"

স্নেহময় সভয়ে বলল, "না, না, তা কি বলেছি?"

"বল না, কী দিতে? তোমার দিকে চাটনীটা পাস করে দিতে?"

"না, ধন্যবাদ। চাট্‌নী খেলে আমার অম্বল হয়।"

বহু পরিশ্রমে স্নেহময় যা ব্যক্ত করল, অশোকা তা ভালো করে না শুনেই কম করে

বলে বসল, "হাঁ, আমি কষ্ট করে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।"

তার পরে রহস্য করে বলল, "কেমন ? তর সইবে তো ? না, আজকেই ?"

এ আরেক অশোকা। স্নেহময় এতোটা ভাবেনি। ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "আজ আমি সাক্ষী কোথায় পাব ? ম্যারেজ রেজিস্ট্রার রাজি হবে কেন ?"

"Come, Come !" অশোকা তার ভাবী স্বামীকে দাম্পত্য কথোপকথনের নমুনা শোনাল। "মা'র কাছে কে বলেছিল এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে কন্টিনেন্টে হানিমুন করতে যেতে ?"

স্নেহময়টা নিতান্ত নীরেট। সে বলল, "সে রকম অভিপ্রায় ছিল বটে। তা বলে আজকেই তো বিয়ে করতে পারিনে। মানে আমি পারি, কিন্তু—"

"Stop it !" অশোকা স্নেহময়কে হতবাক করল। কিন্তু তার স্বর এত উচ্চে উঠল যে তার মা বুঝতে পারলেন ঠিক প্রেমালাপ নয়, অন্য কিছু।

"কী হয়েছে, ডারলিং ?"

"কিছু নয়, মা। স্নেহময়দা প্রপোজ করেছেন, আমি—"

"তুমি কী বলেছ ?" মা ব্যস্ত হয়ে কণ্ঠক্ষেপ করলেন।

"আমি বলেছি, আমি তো রাজি।"

"থ্যাঙ্ক গড।" মিসেস তালুকদার ভগবানের উদ্দেশে ঊর্ধ্বমুখী হলেন। তারপরে মুকুলকে ধরিয়ে দিলেন, "থ্রী চীয়ার্স।"

মুকুল থ্রী চিয়ার্স দিতে ওস্তাদ। তার স্কুলে তো হিপ হিপ হুরে লেগেই আছে।

চীয়ার্স শুনে নেলী ছুটে এল, রাঁধুনীও। কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করে চীয়ার্স জানাল। হৈ চৈ যখন থামল তখন স্নেহময়কে দেখা গেল অশোকার সামনে দাঁড়িয়ে আংটি পরিয়ে দিতে উদ্যত। অশোকা কি সহজে পরতে চায় ! আঙুলগুলোকে এমন করে বাঁকায় যে স্নেহময় দস্তুরমতো বক্সিং করে। যেই আংটিটি পরিয়ে দেয় অমনি টপ করে নীচে পড়ে যায়। কুড়াতে কুড়াতে স্নেহময় হায়রান।

স্নেহময় তার ভাবী শাশুড়ীকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল দেখে সব চেয়ে আশ্চর্য হলেন তিনি স্বয়ং। একটু নত হয়ে দেখলেন, তাঁর পায়ের কাছে রয়েছে একটি ঝক্‌ঝকে সোনার ব্রুচ। "ওহ্‌ হাউ ভেরি নাইস" বলে তিনি সেটি সযত্নে তুলে নিলেন। "থ্যাঙ্ক ইউ, মাই চাইল্ড" বলে তিনি স্নেহময়কে আশীর্বাদ করলেন।

"হে আমার বৎসগণ," তিনি ইংরেজীতে বললেন, "তোমরা আজ আমাকে যেমন সুখী করলে ভগবান তোমাদেরকে তেমনি সুখী করুন।"

স্নেহময় উচ্ছ্বাসভরে কী যেন নিবেদন করতে চাইল, কিন্তু অশোকার মুখভাব নিরীক্ষণ করে নিবৃত্ত হলো।

মিসেস তালুকদার বললেন, "বাকি থাকল পাঁজি দেখে বাগ্‌দানের দিন ফেলা।"

"পাঁজি দেখে?" স্নেহময় চমৎকৃত হলো। পাঁজি দেখে বিয়ের দিন পড়ে তা সে শুনেছে, কিন্তু বাগ্‌দানের দিন? ও হরি! পাঁজিতে যদি সুদিন না থাকে তবে কি ছ'-মাস ধৈর্য ধরতে হবে?

"পাঁজি কেন, ক্যালেণ্ডার—" স্নেহময় অনুযোগ করতে যাচ্ছিল।

তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ভুলে যেয়ো না, আমরা হলুম হিন্দু।"

তা বটে। স্নেহময়রা যদিও ব্রাহ্ম, অশোকারা তা নয়, তারা ক্রিয়াকলাপে হিন্দু। যাকে বলে রিফর্মড হিণ্ডু। স্নেহময়ের তার জন্যে মাথাব্যথা নেই, শ্বশুর শাশুড়ী যখন তার ইষ্টদেবতা, তখন শ্বশুর শাশুড়ীর ইষ্টদেবতার কাছে মাথা নোয়াতে তার কিসের আপত্তি? কিন্তু পাঁজি মানতে গেলে সবুর করতে হয়।

"মুকুল, যাও তো, নিয়ে এস হিন্দু almanac. সাবধান! হিন্দু almanac বলেছি। Old Moore চাইনি।"

পাঁজিতে বাগ্‌দানের কথা ছিল কি না জানিনে, মিসেস তালুকদার উল্লাসভরে বললেন, "এই যে! ১লা আষাঢ় অতি শুভদিন "

তারপর স্নেহময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার দিক থেকে দেখলে একটু দেরি হয়, তা মানি। কিন্তু অশোকার বাবার পক্ষে ওই সুবিধা।"

বেচারা স্নেহময়। তার উপর ফরমাস হলো, সেই রাত্রেই তার ভাবী শাশুড়ীর খরচে তার ভাবী শ্বশুরকে cable করতে, বাগ্‌দানের দিন ১৫ই জুন। –উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

হায়! পাণিপ্রার্থী যুবকের বেদনা কেউ বোঝে না। টেবিলের উপর মদিরা ছিল। মিসেস তালুকদার যদিও পছন্দ করেন না, তবু এই উপলক্ষ্যে পানীয় পরিবেশন করতে হয় বলে করা হয়েছিল। তবে তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর ভয়ে কেউ তা স্পর্শ করবে না। দেখা গেল, স্নেহময় তাঁর উদ্দেশে গ্লাস উঁচিয়ে এক গণ্ডূষে নিঃশেষ করেছে।

অশোকা লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু কী যে খেয়াল চাপল তার, সেও এক চুমুক খেয়ে আজকের দিনটিকে স্মরণীয় করল।

সে রাত্রে অশোকা যখন ঘরে গেল, তখন তার মাথা ঘুরছিল, পা টলছিল। বিছানায় আছাড় খেয়ে বালিশ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, "ওগো, আমি কী করলুম! কী করলুম!"

পশু যেমন ফাঁদে পড়লে করে তেমনি ভাবে ছটফট করতে করতে বলল, "হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!" ব্যাকুল স্বরে বলল, "অন্তর্যামী, আমি তো মনে বলিনি, মুখে বলেছি। ফিরিয়ে নিতে পারিনে?"

তারপর উঠে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিল। বলল, "আমার সুখ? আমার সুখ? আমার সুখ বুঝি ফুরাল?"

তার আবোল-তাবোলের আওয়াজ শুনে তার মা এসে শুধালেন, "কী হয়েছে, মণি? নেশা হয়েছে?"

অশোকা বলল, "না মা! ও কিছু নয়।"

তার মা তাকে নিজের ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, নিজের পাশে শোয়ালেন। সে ক্রমে শান্ত হল, ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমঘোরে একবার শুধু বলল, "কাপুরুষ।"

দেয়ালে ঝুলছিল হর-পার্বতীর পট, অশোকার মা নিত্য পূজা করেন। তিনি হঠাৎ উঠে প্রণাম করলেন সেখানে। বললেন, "এতদিন পরে মেয়ে আমার পরের হাতে পড়ল। বুঝতে পারছ মা'র মনের কষ্ট। কী করে এই অবোধ মেয়ে পরের ঘর করবে, কী করে একে ছেড়ে আমি বাঁচব? আশীর্বাদ কর। আমার অশোকা, আমার স্নেহময় চির সুখী হোক। হর-পার্বতী, তোমাদের কৃপায় হর-পার্বতীর মতো আদর্শ দম্পতি হোক তারা।"

ঝাঁপ

১

না, না, আপনাদের ও ধারণা ভুল। তারাপদ চোর নয়, জোচ্চোর নয়, ধড়িবাজ নয়। তারাপদ হচ্ছে গভীর জলের মাছ। সেই যে তিনটি মাছের গল্প আছে, তাদের মধ্যে যেটির নাম অনাগতবিধাতা সেটির নাম তারাপদ কুণ্ডু।

ভারতবর্ষে যেদিন স্প্র্যাট ও ব্র্যাডলী গ্রেপ্তার হন, ইংলণ্ডে সেদিন তারাপদর চোখে সর্ষে ফুল। তারপর যেদিন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়, সেদিন তারাপদর মনে জুজুর ভয়।

"কমরেড কুণ্ডু, এ কী খবর?" তাকে ঘেরাও করে তার সাগরেদরা।

"কেন, কী হয়েছে?" তারাপদ ঠাণ্ডা মেজাজে পাইপ ধরায়। "কে না জানত যে এমন হবে? আমি তো সেই কবে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছি যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট একদিন জাল গুটিয়ে আনবে, তখন ধরা পড়বে সেই সব মাছ, যারা ডুব দিতে না শিখে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কেমন, ফলল কিনা আমার কথা?"

কোন দিন যে তারাপদ অমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা অবশ্য কারো স্মরণ ছিল না। স্বয়ং তারাপদ কোনো দিন কল্পনাও করেনি যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠতে পারে।

"যাক, এ নিয়ে তোমরা উদ্‌বেগ বোধ কোরো না।" তারাপদ অভয় দেয়। "মামলা তো? আর তো কিছু নয়? সাজা হলে তার উপর আপীল আছে। আপীলে হারলে বড় জোর জেল বা দ্বীপান্তর।"

"সাকো আর ভানজেটির যে প্রাণদণ্ড।" বলে উঠল এক বেরসিক।

"হুঁ। প্রাণদণ্ড অত সোজা নয় ভারতে।" তারাপদ বলতে বলতে তলে তলে শিউরে ওঠে। কে জানে, যদি প্রাণদণ্ডই হয়। "হলেই বা। আমার মনে হয়, আমাদের প্রাণ এতটা মূল্যবান নয় যে আমরা ইতস্তত করব। করবে তোমরা কেউ?"

আত্মাপ্রসাদের আত্মারাম জানেন প্রাণ দিতে তিনি ইতস্তত করবেন কি না। বললেন, "যে কোনো নির্যাতনের জন্যে আমরা প্রস্তুত।"

"মৃত্যুর সঙ্গে," হাইদারী বললেন, "আমার বিয়ের কথা আছে।"

তারাপদ তার অমাত্যদের অসমসাহস দর্শন করে হৃষ্ট হল, কিন্তু সেই মুহূর্তে স্থির করে নিল, ইংলণ্ডে আর বেশি দিন নয়। কী জানি, কোন দিন না রুজু হয় ফিন্সবেরী কন্স্পিরেসী কেস!

নির্বাচনকার্যে তারাপদর উৎসাহ একটুও কমল না, অপরের বিমনাভাব তার তামাশার খোরাক হল। "পুলিশের স্বপ্নে বিভোর থেকো না হে। পুলিশ একদিন শুভাগমন করবেই।...ধন্য তোমার প্রাণ, যার জন্যে তুমি এত চিন্তিত। আমাদেরও তো প্রাণ আছে। কই, প্রাণের চিন্তা তো নেই।"

তারাপদ সকলের পিঠ চাপড়ে দেয়, বগলে হাত গুঁজে দিয়ে জড়িয়ে ধরে। "সাবাস, কমরেড। খুব খাটছ তুমি। এই তো চাই। কমিউনিজম প্রত্যাশা করে প্রত্যেক কমরেড তার কর্তব্য করবে।"

বাদলের সঙ্গে তারাপদর কচিৎ দেখা হয়। এক বাড়িতেই থাকলে কী হবে, নির্বাচনের গোলমালে কে কোথায় ছিটকে পড়ে তার ঠিক থাকে না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তারাপদ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, "খুব নাম কিনলে। কই, কাউকে তো দেখলুম না তোমার মতো রক্ত জল করে দিনরাত খাটতে। সাকলাতওয়ালা জিতবেনই। এবং একমাত্র তোমার জন্যে।"

বাদল অপ্রস্তুত বোধ করে। বাস্তবিক সে এতটা প্রশংসার যোগ্য নয়। তার অনেকটা সময় যায় ব্রনস্কির ফ্ল্যাটে। সেখানে মাদাম ব্রনস্কি তার মূর্তি নির্মাণ করেন আর ব্রনস্কি করেন তার সঙ্গে তর্ক। মূর্তিটা কিছুতেই তার পছন্দ হচ্ছে না। গাল দুটো চোপ্‌সা, মাথার চুল স্বল্প। বেশ, তা না হয় বাস্তবতার খাতিরে সহ্য হয়। কিন্তু বাদলের পরম সম্পদ তার চোখ দু'টি। গোয়েন বলতেন, "বাদল, তোমার চোখে চোখ রেখে আমি কাকে দেখতে পাই, জানো? যীশুকে।" তার সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ মাদাম ব্রনস্কির কল্যাণে না থাকার শামিল। বাদল তাই রোজ একবার গিয়ে চোখের সঙ্গে চোখাচোখি করে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানায়, "হলো না।" মাদামের অসীম ধৈর্য। একটি মূর্তি ভালো হলে দশটির অর্ডার আশা করেন, ভারতীয় ছাত্রেরা নিশ্চয় সকলেই রাজপুত্র।

"আমি," বাদল সসংকোচে বলে, "কীই বা করেছি। তোমার তুলনায় আমার—"

"থাক, থাক, বলতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার সেই প্যাক্ট্ মনে আছে তো? এবার সাকলাতওয়ালা, এর পরের বার বাদল সেন, তার পরের বার তারাপদ কুণ্ডু। অবশ্য ততোদিনে হয়তো পার্লামেণ্ট উঠে যাবে, সোভিয়েট গজাবে। কিন্তু মনে রেখো, কমরেড্। Gentlemen's agreement."

এমনি করে সবাইকে তারাপদ হাতে রাখে। যদি বা আগে কখনো কখনো মেজাজ গরম করেছে, মীরাট মামলার পর থেকে তার মেজাজটি একেবারে বরফ। ডিক্‌টেটার-গিরি ফলাতে আর যার প্রবৃত্তি হোক, তারাপদর প্রবৃত্তি নির্বাচনের ফলাপেক্ষী। সাক-লাতওয়ালার জয় হলে তার ভয় কিছু কমবে, অন্তত কমিউনিস্টদের পক্ষ নিয়ে পার্লা-মেণ্টে প্রশ্ন করবার কেউ থাকবে। সাকলাতওয়ালা যদি হারেন তবে তারাপদর ইংলণ্ডে বাস করা নিরাপদ হবে না। ভারতে ফেরা তো প্রশ্নের অতীত।

তারাপদর মস্ত একটা গুণ, মনের কথা মনে মনে রাখে, কাউকেই জানতে দেয় না। তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু কমসে কম আট জন কি দশ জন। সেই সব অন্তরঙ্গদের সঙ্গে তার কত রঙ্গই হয়, নাইট ক্লাব তো তারাপদ এখনো ছাড়েনি। কিন্তু যা গোপনীয়, তা এক জানে তারাপদ, আর জানেন বিধাতা (যদি থাকেন)। মীরাট মামলার খবর পেয়ে তারাপদ যে প্যারিসের দিকে পা বাড়াবার চেষ্টায় আছে তা সকলের অগোচর।

ফ্রান্সে গিয়ে পসার জমানোর জন্যে মূলধন দরকার। শুধু হাতে সে দেশে গিয়ে করবে কী? তা হলে জোগাড় করতে হয় টাকার। টাকা যা ছিল, তার সবটা খাটছে কারবারে। কারবার গুটিয়ে নেবার উপায় নেই। কারবার থেকে কিছু কিছু তুলে নেওয়া চলতে পারে। তারাপদ প্রথমে সেই ফন্দী আঁটল। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হয় না। কাজেই ঠকাতে বাধ্য হয়। চুরি করতেও। যারা রাজনৈতিক কর্মী, তাদের এসব নৈতিক শুচি-বাই থাকা সংগত নয়, থাকলে কাজ মাটি হয়। দেশের জন্যে ডাকাতি করে তারাপদর পিসেমশাই জেলে গেছলেন, ডাকাতির মাল কুণ্ডু পরিবারের তেজারতির মূলধন হয়েছিল। এও কমিউনিজমের জন্যে।

"আমার কী!" তারাপদ মনকে বোঝায়। "আমি কি টাকা নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছি? যাচ্ছি তো মৃৎ স্বর্গের সন্ধানে। একদা যদি শ্রেণীশূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা আমারই মতো নিষ্কাম কর্মীর নিরবচ্ছিন্ন এক্সপেরিমেণ্টের ফলে। ইংলণ্ডে না হয় তো ফ্রান্সে হবে। সেখানে না হয়, জার্মানীতে। রাশিয়া তো হাতের পাঁচ।"

এ বাসার নিয়ম এই যে ছোট ছোট স্যুটকেস যার যার শোবার ঘরে থাকে, বড় বড় স্যুটকেস ও ট্রাঙ্ক সার্বজনীন গুদাম ঘরে। যেমন জাহাজের নিয়ম। চাবিটি তারাপদর পকেটে। সেটি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেলে তুমি আমি নাচার। তাই তাকে চব্বিশ

ঘণ্টা নোটিস দিয়ে রাখতে হয়, যদি গুদামে ঢুকে বাক্স খুলতে ইচ্ছা যায়।

নির্বাচনের কিছুদিন আগে তারাপদ আবিষ্কার করল যে বেসমেণ্টের গুদামঘরে মেরামতের অবকাশ আছে, মেরামত করলে ওর পরিসর বাড়বে। অমনি হুকুম দিল মালগুলো ওখান থেকে সরিয়ে তার আপিসে পাঠাতে। সকলেই নির্বাচন উপলক্ষ্যে ব্যস্ত, বেশির ভাগ বাইরে ঘুরছে। তারাপদর হুকুমনামা যদিও সকলের ঘরে পৌঁছাল, তবু চোখে পড়ল মাত্র দু' একজনের। তাঁরা আপত্তি জানালেন না। সুতরাং মাল চালান হলো ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম একসচেঞ্জের আপিসে। সেখানে হাজির হবার দিন দুই পরে সাকলাতওয়ালার পরাজয়। তা শুনে তারাপদই সর্বপ্রথম তার করে ব্যথা নিবেদন করল। আর সেই দিনই মালগুলি প্রেরণ করল বিভিন্ন pawn shopএ।

কেবল স্যুটকেস ও ট্রাঙ্ক নয়। কতজনের কতরকম শখের জিনিস ছিল। বাদলের বই, ত্রাকনারের chewing gum, রবসনের ski খেলার সরঞ্জাম, এমনি কত কী। এ সব তো অল্ কমরেড্স্ ফ্রী য়্যাসোসিয়েশনের। ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম একসচেঞ্জের বহু ফিল্ম সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছিল। সেগুলিও চলল প্যারিসে। ছিল কতকগুলি জার্মান ফিল্মও। সব ধার করা। তারাপদ দাম দিয়ে কিনত না, ধারে আনত, ফেরৎ দিত। তার সঙ্গে কী একটা বন্দোবস্ত ছিল, খুঁটিনাটি আমরা জানতুম না। ও ব্যবসা তারাপদর একার, ওতে অন্যান্য কমরেডদের অংশ ছিল না। তবে টাকা তারাপদ সকলের কাছ থেকে নিত। বলত, "লোকসান হলে টাকার আসলটা পাবে। লাভ হলে পাবে টাকার সঙ্গে বোনাস। সুদ কিংবা মুনাফা আশা কোরো না, কারণ কমিউনিজম ওর বিপক্ষে।"

অবশ্য এ কথা বলত কমিউনিস্টদের। মিসেস গুপ্ত ইত্যাদি বুর্জোয়াদের কাছে তার অন্য রূপ। তাঁদের বলত, "টাকায় টাকা লাভ। তা ছাড়া এটা আমাদের নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার। আমরাই অভিনেতা, আমরাই অভিনেত্রী, আমরাই ডিরেক্টর। আপনি কোন পার্ট পছন্দ করেন, বলুন। একবার স্টুডিওটা খোলা হোক, তারপর দেখবেন ওটা আপনারই রাজত্ব।"

২

সেইদিনই বিলাতী মুদ্রাগুলি ফরাসী মুদ্রায় রূপান্তরিত করে ফরাসী ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করে তারাপদ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। এবার শুধু বাকি থাকল পাসপোর্ট ও টিকিট। তারাপদ বাসায় ফিরল।

"কমরেড কুণ্ডু," তারাপদকে ঘিরল তার কমরেডের ঝাঁক, "এ কী অঘটন! সাকলাতওয়ালার তো হারবার কথা নয়।"

তারাপদ অম্লানবদনে উত্তর করল, "চক্রান্ত। ক্যাপিটালিস্টরা সব বেটাই একজোট হয়েছে। জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, সিবিল সার্ভেন্ট, দোকানদার—কত নাম করব, একধার থেকে সব শালাই চক্রান্ত করেছে, যাতে আমাদের ভোটসংখ্যা কম হয়।"

কমরেডরা তো তাজ্জব। এত বড় একটা চক্রান্ত চলছিল সে সংবাদ তাদের কানে যায়নি বলে নিজের নিজের কানের উপর তাদের রাগ ধরছিল, নিজের কান না হলে মলতে রাজি ছিল।

"কমরেডস্, তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য করেছ। সাকলাতওয়ালার পক্ষ থেকে আমিই তোমাদের অজস্র ধন্যবাদ দিই। কিন্তু যাদের উপর ব্যালট বাক্সের ভার তারাই যদি অসাধু হয়, তবে তোমরা করবে কী? আমার হাতে সাক্ষী প্রমাণ আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, কিন্তু জানো তো? পুলিশও ক্যাপিটালিস্ট, আমাকে ধরে নিয়ে হাজতে আটক করবে। নইলে দেখতে, আমি এমন চ্যালেঞ্জ করতুম যে চারিদিকে ঢিঢি পড়ে যেত।"

এই দায়িত্বহীন উক্তি কেউ বিশ্বাস করল না। কেননা ইংলণ্ডের নির্বাচন ব্যবস্থা এমন নিখুঁৎ যে তাতে অসাধুতার অবকাশ নেই। তারাপদও বুঝতে পারল যে চালটা বেচাল হয়েছে। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "কোথাকার পচা পার্লামেণ্ট, তার আবার নির্বাচন! আমি যা বলতে চেয়েছিলুম তা এই যে এখন থেকে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। নির্বাচনের দিকে ফিরেও তাকাব না।"

তারাপদর আস্তানায় ভাঙন ধরল। তারাপদ যেমন সাকলাতওয়ালাকে তার করেছিল, ওসমান হাইদারী তেমনি তার করল প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে। আর আত্মাপ্রসাদ তো কার্ড দিয়ে দেখা করে এলো ভারত-সচিব ওয়েজউড বেন সাহেবের সঙ্গে।

পাসপোর্টের জন্যে যে কয়দিন দেরি হল, সে কয়দিন তারাপদ অর্থকরী বিদ্যায় প্রয়োগ করল। ধার করল চোখ বুজে। একটি যুবক একদিন অক্সফোর্ড স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে, তাকে পাকড়াও করে বলল, "কেমন আছেন, মিঃ বোস? নমস্কার।"

যুবকটি বলল, "আমার নাম তো বোস নয়, আপনি ভুল করেছেন।"

"বোস নয়? তবে তো ভারি ভাবনায় পড়লুম। ঐ যে ব্যাঙ্ক দেখছেন, ওখানে গেছলুম টাকার আশায়। গিয়ে দেখি, ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার মুখে। ওদিকে আমার মোটর রয়েছে পুলিশের পাহারায়। তেল নেই, তেল বিনা অচল। কী করি, বলতে পারেন, সার?"

যুবকটি বিশ্বাস করল। কিন্তু পকেটে তার কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা ছিল, পাঁচ ছয় শিলিং মাত্র।

"দিন না, সার, আমার এই চেকখানা। এ নিয়ে একটা পাউণ্ড দিন, দয়া করে। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের চেক, বিশ্বাস করতে পারেন।"

যুবকটি তা দেখে বোকা বনল। "থাক, আপনার চেক নিয়ে আমার কাজ নেই। আপনি এক পাউণ্ড চান, আমি আপনাকে পাঁচ শিলিং দিতে পারি, ওতে আপনার পেট্রল কেনা হবে।"

তাই নিল তারাপদ। "থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ রায়।"

মিঃ রায় পরে আফসোস করেছিলেন কেন তারাপদর চেক নেননি। নেননি রক্ষা! তারাপদর চেক যারা নিয়েছিল, তাদের অনেকের কাছে পুলিশ গেছল তার ঠিকানার তল্লাসে।

তারাপদর শেষটা এমন হয়েছিল যে সে বন্ধুবান্ধবের ওভারকোট পর্যন্ত ধার করত—ওভারকোট বা রেনকোট। বলা বাহুল্য, সেগুলি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পোশাকের দোকানে বিক্রি করত। যথালাভ।

একদিন স্নেহময়ের ওখানে উপস্থিত হয়ে তারাপদ বলল, "বড় বিপদে পড়ে তোমার দ্বারস্থ হলুম, স্নেহময়। নইলে তোমার সেই punch আমি জীবনে ভুলব না। যাকে বলে ওস্তাদের মার। বাব্‌বা, আমার ঘাড়ের উপর যে মুণ্ডুটা আছে সে কেবল আমি তারাপদ কুণ্ডু বলেই। আর কখনো কাউকে অমন একখানি punch দিয়ো না হে। সে কখন অক্কা পেয়ে তোমায় মক্কা পাঠাবে।"

স্নেহময় খোশ মেজাজে ছিল। অশোকা তাকে কথা দিয়েছে। তারাপদকে অভ্যর্থনা করে বলল, "আমি তো শুধু তোমার টুঁটিটা একটুখানি টিপে ধরেছিলুম। ওকে তো punch করা বলে না।"

"যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি। আমি তোমার মতো বিখ্যাত বক্সার নই, আমি ওকেই বলে থাকি punch. কিন্তু শোন হে। আমার একটু উপকার করতে পারো?"

স্নেহময় বলল, "নিশ্চয়। যদি আকাশের চাঁদ পাড়তে না বল।"

"না, আমাদের মতো গরিব মানুষের ও দুরাশা নেই। চাঁদ পাবে তোমরাই। আপাতত আমাকে একখানা পাসপোর্ট পাইয়ে দাও হে।"

"কেন? কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছ? আমার বাগ্‌দানের আগে তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। তুমি গেলে আমার best man হবে কে?" স্নেহময় কখনো এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে না।

"শুনে খুশি হলুম তোমার বাগ্‌দানের বার্তা, আশা করি দেরি নেই। ততদিন যদি থাকি তো অবশ্য যোগ দেব, আমাকে না ডাকলেও আমি আসবই। কিন্তু ইতিমধ্যে

একটু দয়া কর। সার অতুল তোমাকে চেনেন, মিঃ মল্লিকও তোমার পিতার বন্ধু বলে শুনেছি। ওঁরা যদি এক লাইন লিখে দেন, তা হলে আমার পাসপোর্ট পেতে এত হ্যাঙ্গাম পোহাতে হয় না।"

"কেন ? হয়েছে কী ?"

"হবে আর কী ! আমি যে একজন কমরেড।"

"I see ! আচ্ছা, আমি সার অতুলকে বুঝিয়ে বলব। তোমার যদি বিশেষ তাড়া না থাকে তা হলে একদিন ডিনারে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমার শাশুড়ী—"

"ভাই, তোমার যখন এমন শাশুড়ীভাগ্য, তখন তুমি আজ এখনি আমার উপকার করতে পারো। তুমি ওঁকে, উনি সার্ অতুলকে ও তিনি পাসপোর্ট অফিসারকে টেলিফোন করলে মোট পনেরো মিনিটে কাজ হাসিল হবে। ততক্ষণ আমি বসে বসে তোমার ড্রেসিং গাউনটা পরখ করি। খাঁটি জিনিস হে। কোথায় কিনলে ?"

কাকে দিয়ে কোন্ কাজ সমাধা হয় তারাপদ তা অভ্রান্তরূপে জানত। স্নেহময়ের দৌত্যে সেইদিনই পাসপোর্ট পাওয়া গেল। দক্ষিণাস্বরূপ তারাপদ স্নেহময়ের ড্রেসিং গাউনটি হস্তগত করল। "ওহে, একদিনের জন্যে এটি ধার দিতে পারো ? কালকেই—বুঝলে ?"

স্নেহময়ের তখন দিল্‌খুশ। সে শুধু ভাবছে তার বাগ্‌দানের কথা। বলল, "কাল কেন, যেদিন তোমার সুবিধা।"

তারাপদ যেদিন অদৃশ্য হল তার বহু পূর্বেই তার অস্থাবর সম্পত্তি দেশান্তরিত হয়েছিল। সঙ্গে একখানি অ্যাটাশে কেস নিয়ে সে সহজ ভাবে বাসার বাইরে গেল। কেউ অনুমানও করল না যে লোকটা ফ্রান্সে যাচ্ছে।

রাত্রে ফিরল না। তাও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। পরদিনও কেউ সন্দেহ করত না, কিন্তু পুলিশের লোক এসে খোঁজ করতে শুরু করল।

তারপর কী করে যে রাষ্ট্র হয়ে গেল, একে একে বাড়িওয়ালা, কসাই মুদি দুধওয়ালা ইত্যাদি, যাবতীয় পাওনাদার এসে কলরব বাধাল। তখন কমরেডদেরও মনে পড়ল যে বেসমেন্ট মেরামত হবার নামে বড় বড় সুটকেস ও ট্রাঙ্ক বাসা থেকে অন্যত্র সরানো হয়েছে। যাদের টাকা ছিল তারাপদর কাছে, তারা হিসাব করে দেখল যে প্রায় হাজারখানেক পাউণ্ড একা কমরেডদেরই। হাইদারী, আত্মাপ্রসাদ এরা বাসা ছেড়েছিল বটে, কিন্তু টাকা ফেরৎ নেয়নি, সেই টাকা ফেরার হয়েছে দেখে তাদের টনক নড়ল। কমিউনিস্ট হয়েও তারা টাকার শোকে পুলিশের কাছে হাঁটাহাঁটি অভ্যাস করল।

বাদল অন্যমনস্ক ছিল, জানত না কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। ত্রনক্বিদের ফ্ল্যাটে তার মূর্তি নির্মাণ শেষ হলেও কিসের আকর্ষণে সে পুনঃপুনঃ সেখানে গিয়ে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসত, বুঝ সাধু যে জানো সন্ধান। তার হুঁশ হলো যখন পুলিশের লোক তার ঘরে ঢুকে খানাতল্লাসী করে গেল। পেলো না বিশেষ কিছু। তারাপদর ঠিকানা বাদলের ঘরে থাকবে, তারাপদ এত কাঁচা ছেলে নয়। কিন্তু বাদলের আক্কেল হলো। সে খবর নিয়ে টের পেলো, তার স্যুটকেস ইত্যাদি তারাপদর মতো উধাও। তার টাকা তো গেছেই, খাতা কেতাব চিঠিপত্র সব গায়েব।

৩

বাদল মাথায় হাত দিয়ে বসল। বই চুরি গেলে কেনা যায়, কিন্তু বাদলের কোনো কোনো বই দুর্মূল্য। বই তবু ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়তে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাদল তার চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের খেই খুঁজে পাবে কোথায়, তার নোটগুলি যদি না মেলে? প্রতিদিন যখন যে ভাবনা মনে উদয় হতো, এক এক টুকরো কাগজে টুকে রাখত। কখনো খবরের কাগজের মার্জিনে, কখনো বাসের টিকিটের পিঠে। এছাড়া তার একরাশ খাতাও ছিল, তাদের পাতায় পাতায় কত রকম আইডিয়া। এ সব মালমশলা তারাপদর কাজে লাগবে না, কিন্তু যদি কোনো ভাবুকের হাতে পড়ে, তবে বাদলের আইডিয়াগুলি পরের নামে প্রচারিত হবে। চিন্তা করে মরল বাদল আর নাম করে অমর হলো অন্য কোনো ভাবুক! বাদলের কান্না পায়।

"আমার স্বাক্ষর! আমার স্বাক্ষর!" বাদলের চোখে বাদল নামে। "আমার চিন্তার অঙ্গে আমার স্বাক্ষর রয়েছে, আমার খাতার পাতায় আমার অদৃশ্য স্বাক্ষর! আমার নাম চুরি গেল যে! আমার নাম!"

কিন্তু এ দহনও অসহন নয়। বাদল যদি বেঁচে থাকে তবে আরো কত কী লিখবে। তার মগজ যতদিন আছে, তার কাগজ চুরি গেলেও সর্বনাশ হয়নি। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে তার চিঠিগুলি গিয়ে। ওসব চিঠি সে কাকে দিয়ে আবার লেখাবে! তার অগণ্য ভক্ত তাকে অসংখ্য প্রশ্ন করেছে, সে সব প্রশ্নের সে রাত জেগে জবাব লিখেছে। ভক্তির সঙ্গে প্রীতিও পেয়েছে অশেষ, প্রীতির সঙ্গে প্রশস্তিও। কোনো কোনো চিঠি মনীষীদের লেখা, বাদলের প্রশ্নের উত্তর। যাঁদের অটোগ্রাফও উঁচু দরে বিকায় তাঁদের স্বহস্তের লিপি। হায়, তারাপদ কি এগুলির মর্ম বুঝবে! তারাপদর যেমন বিদ্যা সে ডি. এইচ. লরেন্স ও টি. ই. লরেন্স-এর পার্থক্য জানে না।

চিঠির শোকে বাদল পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগল, মাথার চুল যে ক'টি অবশিষ্ট ছিল সে ক'টি প্রায় নিঃশেষ হতে চলল।

"আমার চিঠি! আমার চিঠি কোথায় পাব! সে সব দিন কি আর ফিরবে, সে সব চিঠি কি কেউ লিখবে!" বাদল যে কেন ওসব চিঠি নিজের কাছে না রেখে গুদামঘরে

পাঠাল এর দরুন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করল।

"Are there two such fools in the world ?" বাদল শুধাল বাওয়ার্সকে।

বাওয়ার্স সব শুনে বললেন, "It seems there are."

তাঁরও যথাসর্বস্ব গেছে। বাদলের যা গেছে তা ব্যক্তিগত, কিন্তু বাওয়ার্সের কাছে অনেক রাজনৈতিক দলিল ছিল, ওসব ইতিহাসের সামিল। গত জেনারেল স্ট্রাইকের সময় বাওয়ার্স ছিলেন ধর্মঘটীদের পক্ষে, তখন তাঁর হাত দিয়ে বহু কাগজপত্র চলাচল করেছিল। বাওয়ার্স কোনোটার নকল, কোনোটার আসল নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। পরে ইতিহাস লিখতেন।

"কিন্তু সেন," বাওয়ার্স বাদলের হা হুতাশ এক নিঃশ্বাসে থামিয়ে দিলেন, "আমি কি জানতে পারি কখন তুমি যাচ্ছ ?"

বাদল যেন আকাশ থেকে পড়ল। "যাচ্ছি ! কেন, যাব কোথায় ?"

"তুমি কি লক্ষ করনি যে একে একে প্রত্যেকেই গেছে কিংবা যাচ্ছে ? এ বাসা কুণ্ডুর নামে ইজারা। ভাড়া বাকি পড়েছে।"

বাদল অবশ্য লক্ষ করেছিল যে সাকলাতওয়ালার পরাজয়ের পর থেকে বিস্তর কমরেড ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তা হলেও বাড়ি ছেড়ে দেবার প্রশ্ন ওঠেনি। বাড়ি ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক, সে সুধীদাকে কথা দিয়েছে যে ইচ্ছা করলে এখানে এসে থাকতে পারে। সে তো এমন কোনো আভাস পায়নি যে তারাপদ অন্তর্ধান করবে।

"আমি যে ভয়ানক অপ্রস্তুত হব, বাওয়ার্স," বাদল বলল, "যদি এ বাসা একেবারে খালি হয়ে যায়। আমি যে একজনকে এখানে এসে থাকতে বলেছি। আমার সেই বন্ধুর কাছে এখন মুখ দেখাব কী করে ?"

"কুণ্ডু আমাদের সকলের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে। লজ্জার বাকী আছে কী ?"

এ বাড়ির আরামের পর এমন আরাম আর জুটবে না তা বাদল অন্তরে অন্তরে জানত। হাজার দোষ থাকুক, তারাপদ মানুষকে আরামে রাখত। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বড় বড় হোটেলেও নেই। অথচ তারাপদর চার্জ মানুষের অসাধ্য নয়। আছে, তারাপদর পক্ষে বলবার আছে। লোকটা জাঁহাবাজ হলেও শক্তিমান। এই তো সাজানো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চালাক দেখি কেউ ? পালাতে সবাই ওস্তাদ। দায়িত্ব নেবার বেলায় একা তারাপদ। সর্দার বটে।

"আচ্ছা, বাওয়ার্স, আমরা কি একটা কমিটি করে এ বাসা চালাতে পারিনে ?"

"না, সেন। দারুণ ঝঞ্ঝাট।"

"আচ্ছা, একটা সোভিয়েট করে ?"

"না, সেন। সোভিয়েট করলেও এত ঝঞ্ঝাট পোষাবে না।"

বাদল উষ্ণ হয়ে বলল, "সোভিয়েট করে একটা বাসা চালাতে পারো না, স্বপ্ন দেখছ একটা রাষ্ট্র চালাবার! বাওয়ার্স, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"আমি লজ্জিত নই। বাসার সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা মন্দ উপমা।"

বাদল রাগান্বিত হয়ে বলল, "কোণঠাসা হলে তোমরা ওকথা বলবেই। কিন্তু তথ্য হচ্ছে এই যে, একা কুণ্ডু যা পারত, একটা সোভিয়েট তা পারে না। স্টালিন যে ডিক্‌টেটর হয়েছে তা শুধু এইজন্যে যে, সোভিয়েট যারা করেছে তারা তোমার আমার মতো অকেজো, অপদার্থ, ভাবপ্রবণ, তার্কিক, কলহপ্রিয়, পলায়নতৎপর।"

বাওয়ার্স মৃদু হেসে বললেন, "হয়েছে না আরো আছে? শেষ কর তোমার ফর্দ।"

"দায়িত্বহীন, দলাদলির দালাল, স্বার্থপর, যে যার খুঁটি আগলাতে ব্যস্ত, কর্তার অভাবে দিশাহারা।"

"বলে যাও, বলে যাও।"

বাদল উত্তেজনার মুখে বলে বসল, "ট্রট্‌স্কির প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

"এইবার ধরা পড়েছ, সেন।" বাওয়ার্স টেবল চাপড়ে হো হো করে হাসলেন। "ত্রনস্কির ওখানে শিক্ষা পাচ্ছ বেশ।"

বাদল ঘেমে উঠল। বাস্তবিক, ত্রনস্কির শিক্ষাই বটে। তবু গম্ভীর ভাবে বলল, "হয়তো আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু এটা তো মানবে যে যারা একটা বাসা চালাতে পারে না, তারা একটা রাষ্ট্রের ভার নিলে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়বে। না ঝঞ্ঝাট কি কেবল বাসায়?"

"পয়েণ্ট তা নয়।" বাওয়ার্সকে তর্কে হারানো দুষ্কর। "পয়েণ্ট হচ্ছে এই যে এ বাসার দেনা দাঁড়িয়েছে অনেক। দেনা শোধ করবে কে? তোমার আমার দু'জনের একটা সোভিয়েট করা সহজ। কিন্তু তুমি আমি কি নিজের পকেট থেকে সমস্ত দেনাটা শোধ করতে পারি? তোমার বন্ধু যদি আসেন তিনিও দেনার জন্যে দায়ী হবেন, অথচ দেনা তো তাঁর জন্যে করা হয়নি। কেন তিনি আসতে চাইবেন, যখন শুনবেন দেনার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাবে?"

বাদল চিন্তিত হলো। তাই তো। দেনাটিও সামান্য নয়।

"তা হলে বুঝতে পারছ, সেন, সোভিয়েট করলে সোভিয়েট এই দেনাটি বহন করে তোমাকে আমাকে ও আমাদের মতো দু'চারজনকে দোহন করতে বাধ্য হবে। দেনা শোধ করার অন্য উপায় নেই। যদি আমরা কলমের এক খোঁচায় সমস্ত দেনাটা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারতুম, যদি পাওনাদারকে দরজা থেকে হাঁকিয়ে দিতে পারতুম, তা হলে আমাদের সোভিয়েট গঠন করা সার্থক হতো, যেমন রাশিয়ায় হয়েছে। সেখানেও পূর্ববর্তী

গভর্ণমেন্টের ঋণ অস্বীকার করা হয়েছে। নইলে সেই ঋণের দায়ে সোভিয়েট ব্যর্থ হতো।"

বাদল বলল, "ঠিক। কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস বর্তমান গভর্ণমেণ্ট যে সব দেনা করেছে, তোমার সোভিয়েট—যদি কোনো দিন এদেশে সোভিয়েট হয়—সে সব দেনা মুছে ফেলবে? সে কি সম্ভব?"

"যদি সম্ভব না হয় তবে সোভিয়েট ব্যর্থ হবে, এই পর্যন্ত লিখে দিতে পারি। যাতে সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।"

"বৃথা চেষ্টা, বাওয়ার্স।" বাদল প্রত্যয়ের সহিত বলল। "পরিষ্কার স্লেট কেউ কোনো দিন পায়নি। তোমাদেরও ঘাড়ে চাপবে পর্বতাকার ঋণ। সে ঋণ শোধ না করলে পাওনাদারের দল তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবে, পরাজিত হলে তোমাদের সঙ্গে অসহযোগ করবে। তোমরা অনশনে মরবে।"

বাওয়ার্স বাদলকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আশা করি আমরা অনশনে মরার আগে অপর পক্ষকে মরণের মুখে পৌঁছে দিয়ে যাব। আমরা আক্রমণ করব, সেন। আক্রমণও আমাদের শাস্ত্রে আছে।"

বাদল ঠিক এই জিনিসটিকে ভয় করত। শ্রেণী সংঘর্ষ! যুদ্ধ বিগ্রহ! এসব যদি অনিবার্য হয়, তবে কি মানবজাতি নির্বংশ হবে না? মানবজাতির নির্বাণ ঘটলে কাকে নিয়ে জগতের বিবর্তন, কাকে নিয়ে প্রগতি, কার জন্যে সভ্যতা, কার জন্যে সংস্কৃতি? ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এদের বিরোধ যে মানবধ্বংসী!

৪

বাদলের উক্তি শুনে বাওয়ার্স বললেন, "এর উত্তরে লেনিন যা বলেছিলেন তাই শেষ কথা! সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি পৃথিবীর বারো আনা মানুষকে মরতে ও মারতে হয়, তা হলেও মাত্র চার আনা মানুষের জন্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

"যদি ষোল আনা মানুষই মরে—"

"তা হলেও জগতের শেষ দু'টি মানুষ সাম্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে পরস্পরকে হত্যা করবে, কিছুতেই বৈষম্যের সঙ্গে সন্ধি করবে না।"

বাদল এসব তত্ত্ব এই নতুন শুনল তা নয়। এ বাসায় এই হচ্ছে ডালভাত। তবে এর সঙ্গে সত্যিকার ডালভাত ছিল বলেই এ সব পেটে সইত।

"তুমি কি তবে বলতে চাও, বাওয়ার্স?" বাদল করুণ স্বরে বলল, "বিরোধ অনিবার্য।"

"অনিবার্য।"

"কী করে এতটা নিশ্চিন্ত হলে ? যদি ক্যাপিটালিস্টরা স্বেচ্ছায় গদি ছেড়ে দেয় ।"

"স্বেচ্ছায় ?" বাওয়ার্স একটি চোখ বন্ধ করে অপর চোখে হাসলেন। "স্বেচ্ছায় যেমন রাশিয়ার জার সিংহাসন ছাড়লেন ? অসম্ভব নয় । তবে তার আগে আমাদেরও ইচ্ছা-প্রয়োগ করতে হবে, নইলে ওদের ঐ স্বেচ্ছাটুকু অনিচ্ছায় পর্যবসিত হবে ।"

"আমার মনে হয়," বাদল গবেষণা করল, "উভয় পক্ষের সম্মানজনক সন্ধি সম্ভব ।"

"তুমি," বাওয়ার্স বললেন, "ফ্রী উইলে আস্থাবান। আর আমি বদ্ধ ডিটারমিনিস্ট। যা হবার তা হবেই, কেউ ঠেকাতেও পারবে না, কেউ এড়াতেও পারবে না। যাদের ঘরে টাকা আছে তারা তা সুদে মুনাফায় খাটাবেই। যাদের মারফৎ খাটাবে তারা তা অন্যত্র খাটাবার পরিসর না পেলে যুদ্ধের সম্ভার নির্মাণে খাটাবে। যুদ্ধের সম্ভার জমতে জমতে যুদ্ধের হেতু জমবে। সহসা একদিন যুদ্ধ বেধে যাবে—শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। যুদ্ধে যে দেশ বিব্রত হবে সে দেশে শ্রেণী সংগ্রাম বাধবে, যেমন গত যুদ্ধের সময় রাশিয়ায়। এবার কেবল একটি দেশে নয়, সব দেশেই, কেননা, বিব্রত হবে সব দেশ।"

বাদল বলল, "এটা তোমার wishful thinking."

বাওয়ার্স বললেন, "এটা বিশুদ্ধ জ্যোতিষ। যেমন চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ। প্রচলিত ব্যবস্থা জনসাধারণের অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শুধু এক আধটি দেশে নয়, সব দেশে। তবু মাতব্বরদের ধারণা আমূল পরিবর্তন না করলেও চলে, জনসাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধে লিপ্ত করে শুদ মুনাফা দুই হাতে লুট করলেও চলে, জনসাধারণকে পরস্পরের দ্বারা উজাড় করিয়ে বেকারসংখ্যা নির্মূল করলেও চলে। সেন, এ ধারণা ইতিহাসে অসিদ্ধ। এ বাসা ভাঙবেই। একে তুমি খাড়া করে রাখতে পারবে না। কমিটি দিয়েও না, সোভিয়েট দিয়েও না। আর একটি যুদ্ধ বাধলেই এর পতন অনিবার্য।"

"কিন্তু যুদ্ধ যে মানবধ্বংসী। তুমি নিজেই তো বললে যে জনসাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লিপ্ত করে উজাড় করানো ভালো নয়।"

"ভালো নয়, কখন বললুম ? ভালো মন্দের প্রশ্ন উঠছে না, সেন। যা ঘটবেই তা ভালো নয় বলে অঘটিত থাকবে না। তুমি কি মনে করেছ ঘটনার স্রোত উল্টো দিকে বইবে, যদি শ্রমিকদের দু'চারটে খুচরো সুবিধা দেওয়া হয় ? তাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিতে পারো, তাদের জমানো টাকা কারবারে খাটিয়ে তাদের মুনাফা জোগাতে পারো, তাদের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতে পারো, সব পারো, কিন্তু একটি জিনিস পারো না। পারো না যুদ্ধ রোধ করতে। আর যুদ্ধ যদি একবার বাধে, তবে সে শুধু আমাদেরই সুবিধা করে দিয়ে যাবে—কমিউনিস্টদেরই সুবিধা।"

বাদল অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, "তোমরা বোঝ কেবল একটি কথা।

তোমাদের সুবিধা। কিসে মানবের দুঃখমোচন হয় সে ভাবনা তোমাদের নেই। হয়তো ছিল গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে নিবেছে। এখন তোমাদের একমাত্র স্বপ্ন কিসে তোমাদের সুবিধা হয়। তোমাদের ইতিহাসের, তোমাদের জ্যোতিষের। কিসে তোমাদের শ্রীহস্তে power আসে। কেমন ?"

বাওয়ার্স আরক্ত হয়ে বললেন, "অমন ভাবে বললে কথাটা ভোঁতা শোনায়। কিন্তু আমি মানছি কথাটা সত্য। আমরা চাই power, কেননা আমরাই ওর সদ্ব্যবহার করতে পারি, অন্য কেউ পারে না।"

বাওয়ার্স ভাবাকুল স্বরে বললেন, "সেন, পৃথিবীতে স্তরে স্তরে তেল, লোহা, কয়লা, কাঠ, ধান, গম, কত রকম ভোগ্য। যে সম্পদ আছে ধরণীতে, তার হিসাব নিয়ে তাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে তার দ্বারা সকলের সব দুঃখ যাবে। কেউ অভুক্ত থাকবে না, কেউ অপরিহিত থাকবে না। সকলের শিক্ষাদীক্ষা চিকিৎসা জুটবে। সকলে গাড়িঘোড়ায় চড়বে, ভালো বাড়িতে থাকবে। সর্ব ধনে ধনী যে ধরণী তার বক্ষে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক কেন সর্বহারা ? কারণ যে ব্যবস্থা এতদিন চলে আসছে, সে ব্যবস্থার কোথাও একটা মারাত্মক ভুল আছে। সে ভুল যারা চোখে দেখতে পায় না তারা অন্ধ। সেই সব অন্ধের দ্বারা নীয়মান হয়ে পৃথিবীর আজ এই দশা। সেই সব অন্ধ একদিন মানবজাতির রথ পরিচালন করে এমন গর্তে পড়বে যে সেখান থেকে আর উদ্ধার নেই। তখন আমাদের যদি শক্তি থাকে, আমরাই ঠেলে তুলব। যে ক'টি মানুষ বেঁচে থাকবে সেই ক'জনকে নিয়ে নবীন ব্যবস্থার পত্তন হবে। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে মানবসংখ্যা আরো কমবে বলে কাতর হব না, অকাতরে কমাব।"

বাদল স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "তোমার মতো বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আমার নেই। আমি যা বলি তা ভোঁতা।"

"কিন্তু আমি যা বললুম তা কি সত্য বলে মনে হয় না ?"

"অর্ধ সত্য। কেননা মানবের প্রতি ওদের যেমন দরদ নেই, তোমাদেরও নেই দরদ। ওরা যেমন ওদের ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে মানুষকে পাঠাবে মরতে ও মারতে, তোমরাও তেমনি তোমাদের ব্যবস্থাকে বাধাহীন করার জন্যে মানুষকে পাঠাবে মারতে ও মরতে। মানুষের জন্যে ব্যবস্থা, না ব্যবস্থার জন্যে মানুষ ?"

"মানুষের জন্যেই ব্যবস্থা, কিন্তু তেমন ব্যবস্থাকে বাধামুক্ত করাও আবশ্যক।"

"বাধা," বাদল বলল, "বাধা কি একটি ? পরিশেষে টট্‌স্কি।"

"হাঁ, প্রয়োজন হলে তাঁকেও সরাতে হয়।"

"ঐ করেই উৎসন্ন যাবে রাশিয়া। আর তোমাদের যদি মানুষের প্রতি দরদ না জন্মায় তবে তোমরাও।"

বাওয়ার্স উঠতে যাচ্ছিলেন, বাদল তাঁকে আরো খানিকক্ষণ বসাল। "এ বাসা যদি ছাড়তে হয়, কোথায় যাব জানিনে। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে!"

"আমারও সেই ভাবনা। কিন্তু দেখা হবে মাঝে মাঝে। যদিও আমাদের মিল তত নয় অমিল যত, তবু বাক্যালাপের দ্বারা মনটা পরিষ্কার হয়।" বাওয়ার্স বাদলকে আর একটা সিগরেট নিতে বললেন। সে নিল না।

বাদল দুই হাতে দুই গাল চেপে কী যেন ভাবছিল। বলল, "সোশ্যালিজম, কমিউ-নিজম, আধুনিক যুগের যাবতীয় ইজম, প্রত্যেকের যাচাই হবে একই নিকষে। সে নিকষের নাম দুঃখমোচন। তুমি ধরে নিয়েছ যে দুঃখ প্রধানত অন্নবস্ত্রের দুঃখ। পৃথিবী যখন অন্নপূর্ণা, তখন কেন অন্নাভাব? এই প্রশ্ন থেকে তোমার মতবাদ শুরু। আমার কিন্তু তা নয়। আমার কাছে দুঃখ প্রধানত অপচয়ের দুঃখ। মানুষ যখন এত বুদ্ধিমান, এত হৃদয়বান তখন দিকে দিকে কেন এত অপচয়? প্রাণের অপচয়, আয়ুর অপচয়, যৌবনের অপচয়? ধনের অপচয় তো বটেই, যারা নির্ধন তারাও অপচয় করছে তাদের সামর্থ্য ও সময়। কী করে বাঁচতে হয় তাই আমরা জানিনে, কী করে মরতে ও মারতে হয় তাই এতকাল শিখেছি। তুমি ইতিহাসের দোহাই দিচ্ছ? ইতিহাস আমাদের কি এই শিক্ষা দেয় না যে মারামারি কাড়াকাড়ি করে কারো মঙ্গল হয়নি? ওটা অপচয়?"

"আমি তোমার সঙ্গে একমত।" বাদলকে স্তম্ভিত করে দিলেন বাওয়ার্স। "কিন্তু মাই ডিয়ার চ্যাপ, এই প্রচলিত ব্যবস্থা রসাতলে চলেছে। একে তলিয়ে যেতে দাও, বুদ্ধিমান। এর স্থলে অভিষিক্ত হবে নবীন ব্যবস্থা নূতন শৃঙ্খলা। তাকে রক্ষা কর, হৃদয়বান।"

বাদল দুই হাতে দুই বাহু পিষতে পিষতে বলল, "ভগবান আছেন কি না জানিনে। কিন্তু আমি তো আছি। এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, বাওয়ার্স, দুঃখমোচনের কষ্টিপাথরে যা সোনার দাগ রেখে যাবে না, তাকে আমি কোনোমতেই স্বীকার করব না, সর্বতোভাবে বাধা দেব। না ক্যাপিটালিজম, না কমিউনিজম, কোনোটাই ইতিহাসের লিখন নয়। যুদ্ধ যাতে না বাধে সেই হবে আমার একান্ত প্রয়াস, কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্তে এমন কিছু আমি উদ্‌ভাবন করব, যার দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হবে, সমাজের হবে আমূল পরিবর্তন। কী করে তা সম্ভব, তা আমি জানিনে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমি যুদ্ধেরই ফল চাই আর বিনা বিপ্লবে কমিউনিজমের।"

"প্রলাপ।" বলে বাওয়ার্স গা তুললেন।

যুদ্ধের নাম শুনলে বাদল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানব সে, মানবের প্রতি তার দায়িত্ব আছে, সে তো দায়িত্বহীন হতে পারে না। যে আগুনে পাড়াপড়শী সকলেরই ঘর পুড়বে, পুড়ে মরবে শিশু ও নারী, সে আগুন যারা লাগাবে তারা যদি হয় নরপিশাচ, তবে সে আগুন লাগলে যাদের সুবিধা তারাও নরাধম। যার অন্তরে লেশমাত্র মানবিকতা আছে সে বলবে, চাইনে সুবিধা। চাই শান্তি

অথচ শান্তি বলতে পচা পুকুরের বদ্ধ জল ও পুঞ্জীভূত পাঁক নয়। শান্তি হবে বেগবান স্রোত, মুক্ত ধারা। শান্তির মধ্যে যুদ্ধের ভাব থাকবে, থাকবে শৌর্য, থাকবে সাহস, থাকবে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। বাদল অহিংসবাদী নয়, প্রয়োজন হলে হত্যা করতেও সে পরাঙ্মুখ হবে না। কিন্তু আধুনিক যুগের মারণাস্ত্রগুলি দিন দিন যেমন উন্নত হচ্ছে, সে উন্নতি যুদ্ধকে দিন দিন এগিয়ে আনছে, কেননা অস্ত্রপরীক্ষার অন্য কোনো পন্থা নেই। বাদলের বন্ধু কলিন্স এরোপ্লেনের পাইলট হতে চায়, কারণ সে পরীক্ষা করতে চায় এরোপ্লেনগুলো যুদ্ধকালে কার্যকর হবে কি না। ক্রমে একদিন সেই কলিন্স কেবলমাত্র পাইলট হয়ে তুষ্ট থাকবে না, বোমারু হতে চাইবে। পরীক্ষা করতে চাইবে বোমাগুলো যুদ্ধকালে কার্যকর হবে কি না। এইভাবে পরীক্ষা করতে করতে পরম পরীক্ষার পিপাসা জাগবে। রক্তপাতের পিপাসা। তখন "প্রয়োজন হলে হত্যা করব" এ নীতি কোথায় উবে যাবে। এর বদলে উদয় হবে "জয়ের জন্যে হত্যা করব" এই নীতি। এমনি করে মানুষ মানুষকে উজাড় করবে। মুখে আওড়াবে, "জয়ের জন্যে"। যেই জিতুক না কেন, কোটি কোটি মানুষ মরবে, মরণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। জয়ের নেশা যেমন দুটো ষাঁড়কে পেয়ে বসলে দুটোকেই সাবাড় করে, তেমনি দুটো দেশকেও, দু'দল দেশকেও। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সমগ্র পৃথিবীকেও। না, বাদল অহিংসবাদী নয়, কিন্তু মাত্রাবাদী। হিংসা যদি মাত্রা না মানে, প্রয়োজনের সীমানা না মানে, তবে যে ভীষণ অপচয় হয় তা মানবদেহের রক্তাপচয়ের মতো প্রাণঘাতী। শরীরের নখ কাটা, চুল ছাঁটা মাঝে মাঝে প্রয়োজন। চিকিৎসকের নির্দেশে অস্ত্রোপচারও কদাচ কখনো প্রয়োজন। কিন্তু নেশার ঘোরে নিজের কণ্ঠচ্ছেদ বা বক্ষভেদ যে আত্মহত্যা।

আপাতত যুদ্ধের উপর রাগ করে বাদল বই খাতা চিঠির শোক ভুলল। চলল ব্রনস্কির ওখানে। ব্রনস্কি ছিলেন না। ছিলেন তাঁর তরুণী ভার্যা। তিনিই প্রথম বাদলকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন।

"অল্‌গা," বাদল বলল ক্লান্ত স্বরে, "আমি যে প্রায় গৃহহারা।"

বাদলের মুখে বিবরণ শুনে অল্‌গা বললেন, "বাদল, তুমি তো জানো, একটি জায়গা আছে, যেখানে তুমি সব সময় স্বাগত।"

বাদল বলল, "জানি। রাশি রাশি ধন্যবাদ। কিন্তু আমার যে কী গভীর তৃষা।"

তৃষার কথায় মাদাম ঠাওরালেন বাদলের তেষ্টা পাচ্ছে। তিনি বললেন, "চা, না শীতল পানীয়?"

বাদল তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "দিতে মর্জি হয় তো দিতে পারো শীতল চা। কিন্তু তাতে আমার তৃষা যাবে না। এ আমার কিসের তৃষা বলব? জনতার সঙ্গে এক হয়ে যাবার তৃষা। আমার স্বাক্ষর গেছে, গৃহ নেই। এখন আমি চাই নামহীন গৃহহীন অচিহ্নিত জীবন, জনপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত। বোঝাতে পারছিনে, অল্‌গা। বোঝার মতো চেপে রয়েছে বুকে নতুন একটা ভাব, নিঃশ্বাস ফেলছে বুকে নতুন একটা অভাব।"

এই বলে বাদল অন্যমনস্ক হল। অল্‌গাও উঠে গেলেন।

বাদল ভাবতে থাকল, ও বাসা থেকে যেখানেই যাক টাকা লাগবে। টাকার জন্যে বাবাকে লিখতে রুচি হয় না, কোন অধিকারে নেবে ওঁর টাকা। যদি উনি শুনতে পান বাদল কোথায় ঘুরছে, কী করছে, তা হলে আপনাআপনি টাকা বন্ধ করবেন। অথচ বাদলের উপার্জন এক কপর্দক নয়। লিখে যদি বা কিছু পেত, খাতা চুরি যাবার পর সে আশাও নেই। বাদল তা হলে করবে কী? কার কাছে হাত পাতবে? কোন্ অধিকারে? একটা চাকরি—না, চাকরি করতে আগ্রহ নেই, যদি না সে চাকরি হয় স্বাধীনতার নামান্তর। চিন্তার স্বাধীনতাকে, বাক্যের স্বাধীনতাকে বাদল স্বাধীনতা বলে।

"ধন্যবাদ, অল্‌গা। তোমার সঙ্গে আর কবে দেখা হবে, জানিনে। তোমার সেই স্মৃতি নিয়ে যে কী করব, কোথায় রাখব, সেও এক সমস্যা। কেননা," বাদল তার নিজের মনে যা অস্পষ্ট ছিল তাকে যুগপৎ স্পষ্ট করল ও ব্যক্ত করল, "আমি হয়তো জিপ্‌সীর মতো পথে পথে বেড়াব।"

অল্‌গা বিশ্বাস করলেন না, মিষ্টি হাসলেন। বাদলকে এতদিন সামনে বসিয়ে অধ্যয়ন করছেন, তার মধ্যে যে একজন জিপ্‌সী আছে তা কী করে বিশ্বাস করবেন? বাদল চা চেয়েছিল, কিন্তু একবার মুখে ছুঁইয়ে আর মুখে দিল না।

"তুমি যদি অন্য কোথাও স্থান না পাও," তিনি পুনরুক্তি করলেন, "তবে একটি জায়গা আছে সেখানে তুমি সব সময় স্বাগত।"

"কিন্তু আমি যে রিক্ত, আমি যে কপর্দকহীন।"

এ কথাও তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "সত্যি?" তাঁর ভ্রূভঙ্গিটি বাদলের ভালো লাগল।

"সত্যি।" বাদলও তাঁর অনুকরণ করল।

"তা হলেও আমার নিমন্ত্রণ রইল।" তার পর হেসে বললেন, "তুমি কি জানো না যে আমরাও নিঃস্ব?"

বাদল জানত। সেইজন্তেই তো যুতির অর্ডার দিয়েছিল।

ব্রনস্কি এসে পড়লেন। এই গ্রীষ্মকালেও তাঁর পায়ের জুতোর উপর স্প্যাট্‌স্‌। দস্তানা একটি পকেটে, একটি হাতে। পরিপাটী সম্ভ্রান্ত পোশাক, চোখে সোনার চশমা। চুলগুলি কাঁচাপাকা, কিন্তু যত্ন করে কাটা।

"আহ্‌ !", হাত বাড়িয়ে দিলেন বাদলের দিকে, "সুখী হলুম তোমাকে দেখে। কতক্ষণ এসেছ?"

"কী জানি !" বাদলের খেয়াল ছিল না, সে যেন অন্যমনস্ক।

"বেশিক্ষণ না।" মাদাম উত্তর দিলেন।

"কমরেড ব্রনস্কি", বাদল যেন এতক্ষণ তর্কের সুযোগ অন্বেষণ করছিল, "আপনি যে ডিটারমিনিস্ট তা অবশ্য জানা আছে আমার। তবু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি মনে করেন যুদ্ধ অনিবার্য?"

"অন্য রূপ মনে করে এমন কি কেউ আছে?"

"কেন, আমি। আমি তো মনে করি অনিবার্য যারা বলে তাদের কিছু না কিছু স্বার্থ বা সুবিধা আছে।"

"অন্যের উপর দোষারোপ করে কী হবে? যা অনিবার্য তা অবশ্যম্ভাবী। কবে হবে সেই একমাত্র জিজ্ঞাস্য।"

বাদল গরম হয়ে বলল, "জ্যোতিষে লেখা নেই?"

ব্রনস্কি স্ত্রীকে পানীয় আনতে বলে বাদলের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি আমার কথা শুনতে চাও, না তোমার কথা শোনাতে চাও? আমি বলছি, শোন। যুদ্ধ বাধবেই, তবে কার সঙ্গে কার তা আমি আন্দাজে বলতে পারব না।"

"আর বিপ্লব?"

"বিপ্লবও বাধবে। কিন্তু ওর পরিণাম সম্বন্ধে আমি সংশয়ী। তুমি তো জানো, আমার মতে জনগণ যতদিন না দৃঢ়সংকল্প হয় ততদিন বিপ্লব একটা চোরাবালি। ওতে কমিউনিজম ভিত্তিভূমি পায় না, পায় তার কবর। রাশিয়ায় যা ঘটছে তা কমিউনিজমের অন্ত্যেষ্টি। জনগণ দৃঢ়চেতা নয়, বোঝে না, যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। বিপ্লব বাধলে অন্যান্য দেশেও স্টালিনের মতো কুচক্রীর খপ্‌পরে ক্ষমতা যাবে, জনগণ যে অক্ষম সেই অক্ষম।"

রাজা চার্লসের মুণ্ডুর মতো স্টালিনের নাম যেমন করে হোক উঠবেই। বাদল বলল, "তা হলে আপনার মতে বিপ্লবও অনিবার্য, কিন্তু কমিউনিজম অবশ্যম্ভাবী নয়।"

ব্রনস্কি তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন, "কমিউনিজমও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আগে যেমন আমার ধারণা ছিল বিপ্লব হলেই কমিউনিজম হবে, এখন আমার সে ধারণা নেই। কমিউনিজম হবে, যেদিন জনগণ দৃঢ়পণ হবে। সেদিন যে কত দিন পরে তা আমি বলতে

পারব না। শুধু বলতে পারি যে, আসবে সেদিন আসবে।"

"কিন্তু", বাদল বলল, "কমিউনিজমের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই, আমার বিবাদ শ্রেণীসংঘর্ষের সঙ্গে। পার্লামেন্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে যদি কোনো দল কমিউনিজম প্রবর্তন করে, তবে আমি আদৌ দুঃখিত হব না। কেননা পরবর্তী নির্বাচনে ও দলটিকে হারিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।"

ত্রনস্কি বললেন, "হায়, বাদল, সেইখানেই তো ফ্যাসাদ। আমি স্টালিনকে বললুম, আমাকে যদি গুলি করতে চাও, কর। এই আমি খুলে দিচ্ছি বুক।" এই বলে তিনি সত্যি সত্যি কোট খুললেন। বাদল ত্রস্ত হয়ে ভাবল, তাই তো। গুলি করবেন নাকি নিজেকে? তা নয়। ত্রনস্কি বললেন, "অসহ্য গরম। আমি যদি কোট খুলি, তোমার আপত্তি আছে, বাদল? তোমার, অল্‌গা?"

"এই আমি খুলে দিচ্ছি বুক। কিন্তু স্বীকার কর যে আমি জনগণের শত্রু নই। মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমার মরণ ব্যর্থ কোরো না। আমি তোমার প্রতিপক্ষ, যেমন সব দেশেই থাকে অপোজিশন। শুনল স্টালিন ও কথা?"

৬

বাদল স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। তার ইচ্ছা করছিল জিপ্‌সীর মতো টো টো করে বেড়াতে। জিপ্‌সীর মতো বেপরোয়া, জিপ্‌সীর মতো চালচুলোহীন। কোথায় খাবে, কোথায় শোবে সে ভাবনা বাদলের নয়, বাদলের চিন্তা মানবনিয়তি।

"চললুম, কমরেড ত্রনস্কি। চললুম, অল্‌গা।"

"সে কী, এর মধ্যে?" ত্রনস্কি তখনো তাঁর আখ্যায়িকা জমিয়ে তোলেননি। তারপরে কী হলো তাই বলতে যাচ্ছেন। বাদলকে উঠতে দেখে সচকিত হলেন।

"আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে।" বাদল তার সংকল্প ব্যক্ত করল। "যাই, তার উদ্‌যোগ করিগে।"

"ঝাঁপ!" ত্রনস্কি বিস্মিত হলেন।

"হাঁ, কমরেড। আমাকে তলিয়ে যেতে হবে। তবে যদি এ সমস্যার তল পাই।"

"ঝাঁপ! সমস্যা!" ত্রনস্কি আরো বিস্মিত হলেন। "এসব কী, বন্ধু সেন!" ভাবলেন, ছোকরা হয়তো কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। তাঁর ঘরণীর সঙ্গে নয় তো?

"যুদ্ধ না করে যুদ্ধের ফল, বিপ্লব না করে বিপ্লবের ফল, কী করে লাভ করা যায় এই আমার সমস্যা।" বাদল তাঁকে আশ্বস্ত করল। "যদি সমাধান পাই, তবে দুঃখ না দিয়ে দুঃখমোচন করা চলবে। নতুবা দুঃখমোচন করতে গিয়ে দুঃখবর্ধন করা হবে, যেমন রাশিয়ায়।"

রাশিয়ার উল্লেখে ক্রনস্কি উল্লসিত হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন যে স্টালিন বিদ্যমান থাকতে রাশিয়ার দুঃখের পরিসীমা থাকবে না, কিন্তু বাদল তাঁকে বলবার সুযোগ দিল না।

"চললুম, অল্‌গা। তোমার নিমন্ত্রণ মনে থাকবে।" এই বলে বাদল দু'জনকে গুডবাই জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

এখন মার্গারেটকে খুঁজে পায় কোথায়? মার্গারেট আগেই ঝাঁপ দিয়েছে। "ঝাঁপ" শব্দটি তাঁরই! বাদলের কাছে তার একখানা পুরাতন চিঠি ছিল, চুরি যাবার মতো চিঠি নয়, বাদল তা থেকে একটা ঠিকানা উদ্ধার করে সেখানে ও সেখান থেকে অন্য কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে শেষকালে নাগাল পেল মেয়ের। সেটা একটা রুটির দোকান, মার্গারেট সেখানে রুটি বেক করছিল।

"ও কে, বাদল নাকি? সুখী হলুম দেখে।" এই বলে মার্গারেট তাকে দোকানের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

"মার্গারেট, তোমার কি আজ সময় হবে?" বাদল বলল কানে কানে। "কথা ছিল।"

বাদল 'বান' খেতে ভালোবাসে। অনুরোধ অগ্রাহ্য করল না। এত ঘুরে তার ক্ষিদেও পেয়েছিল।

বাদলের সমস্যা শুনে মার্গারেট বলল, "কিন্তু জিপ্‌সী কেন? ইচ্ছা করলে শ্রমিক হতে পারো।"

"শ্রমিক! উহুঁ।" বাদল মাথা নাড়ল। "শ্রমিকেরা ঠাওরাবে তাদের রুটি কেড়ে নিচ্ছি।"

"জিপ্‌সীরাও তা ঠাওরাবে। যার রুটির দরকার সে যদি খেটে খায়, তবে তো সে সত্যি কেড়ে নিচ্ছে না।"

"জিপ্‌সী হলে," বাদল পাশ কাটিয়ে বলল, "আহারনিদ্রার জন্যে ভাবতে হয় না। শ্রমিকের সে ভাবনা আছে।"

"জিপ্‌সীদের সম্বন্ধে তোমার ও ধারণা রোমান্টিক।" মার্গারেট হাসল। "ভাবনা যেমন শ্রমিকের তেমনি জিপ্‌সীর।"

"কিন্তু আহারনিদ্রার জন্যেই যদি ভাবতে হলো তবে অন্য ভাবনা ভাবব কখন? আমার যে একেবারেই সময় নেই বাজে ভাবনা ভাবতে। অথচ ওদিকে টাকার ঘরে শূন্য।" বাদল সব খুলে বলল।

মার্গারেট নিজের উদাহরণ দিয়ে বলল, "আমার আহারনিদ্রার দায় তাদের উপরে, যাদের জন্যে আমি খাটি। তুমি যদি আত্মকেন্দ্রিক না হও, তোমার আহারনিদ্রার ভার অন্য অনেকে নেবে। তারা হয়তো সম্পূর্ণ অচেনা লোক, প্রতিদিন নতুন।"

"তোমার কি তাই অভিজ্ঞতা?"

"হাঁ, বাদল। আমি নিজের জন্যে এক মিনিটও ভাবতে রাজি নই। আমার সমস্ত সময় যায় পরের জন্যে খাটতে। কেউ না কেউ খেতে বলে, খাই। শুতে দেয়, শুই। দেখলে তো আজ রুটি বেক করছিলুম, কাল কয়লা বয়ে বেড়াব। যেদিন যেখানে ডাক পড়ে সেদিন সেখানে গিয়ে জুটি।"

"পরকেন্দ্রিক হতে আমার স্বভাবের বাধা।" বাদল বলল। "নইলে পরের জন্যে খাটতে কি আমার অনিচ্ছা?"

ওরা চলতে চলতে টেমস নদীর ধারে এসে পড়ল।

বাদল সহর্ষে বলে উঠল, "পেয়েছি। পেয়েছি।"

"পেয়েছ? কী পেয়েছ, শুনি!"

"রাত্রে নদীর বাঁধে শোব। একটা ভাবনা তো মিটল। বাকি থাকল আর একটা।"

মার্গারেট উৎসাহ দিল না। "ওটা একটা অ্যাডভেঞ্চার, বাদল। ওতে তোমার সমস্যার সমাধান হবে না।"

বাদল তর্ক করল : কত লোক নদীর ধারে শোয়। সে কি তাদের তুলনায় ভীতু? না, তার শরীর অপটু?

"তা নয়। তোমার সমস্যা তো গোড়ায় এই যে তুমি জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাও?"

"আমার সমস্যার সমাধানের জন্যে জনগণের সঙ্গে যেটুকু এক হওয়া একান্ত আবশ্যক সেটুকু এক হতে আমি উৎসুক ও ইচ্ছুক, তার অধিক নয়।"

"আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাদল।" মার্গারেট ব্যথিত হলো। "অমন করে তুমি যুদ্ধের ফল পাবে না, বিপ্লবের তো নয়ই। মাঝখান থেকে জনগণের সঙ্গে এক হওয়ার যে বিশুদ্ধ আনন্দ তাও মিলবে না।"

বাদল স্বীকার করল না, তর্ক শুরু করল। মার্গারেট তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি যদি একটা অ্যাডভেঞ্চার চাও তো নিরাশ হবে না। নদীর বাঁধে রাত কাটানো তোমার জীবনে এই প্রথম হলেও অপরের জীবনে তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কোথায়? আর তোমার মনেও তো জনগণের প্রতি অহেতুক প্রীতি নেই, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে তোমার স্বভাবে বাধে।"

. বাদল তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কত রকম যুক্তি আবিষ্কার করেছিল এই কয়েক মিনিটে। কিন্তু মার্গারেটের মুখ দেখে মনে হলো, সে কোনো যুক্তি শুনবে না। আসলে বাদল পরের বাড়ি শুতে প্রস্তুত নয়, কেউ শুতে ডাকলে সে শোবে না, তার লজ্জা করবে। তাই নদীর বাঁধ ছাড়া তার গতি নেই।

"অ্যাডভেঞ্চার বলে সব জিনিস যদি উড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে করবার কিছু থাকে

না।" বাদল অনুযোগ করল।

"সব জিনিস নয়। যাতে পরের পরিতৃপ্তি, তাতে নিজেকে নিয়োগ করলে দেখবে, নিজেরও তৃপ্তি আছে। র‍্যাডভেঞ্চারের তৃপ্তি কেবল নিজের।"

"মার্গারেট," বাদল প্রশ্ন করল, "তুমি কি কমিউনিজম ছেড়ে দিলে?"

"কে বলল্? না," মার্গারেট প্রতিবাদ করল, "আমি আমার মতবাদে অটল আছি। জগতে যতকাল শোষণ থাকবে ততকাল কমিউনিজমের প্রয়োজন থাকবে, শোষণ নিবারণের অন্য কোনো পন্থা নেই। কিন্তু দিনরাত লোকদের উসকানি দিয়ে বেড়ালে ফল হয় উল্টো, লোকের মন ক্রমে বিমুখ হয়, লোকে ভাবে, এরা শুধু ঐ একটি বিদ্যা জানে।"

"এবার নির্বাচনে কমিউনিস্টদের একজনও জিতল না, তার কারণ বোধহয়," বাদল কী বলতে যাচ্ছিল, মার্গারেট কেড়ে নিয়ে বলল, 'এই যে আমাদের উপর লোকের আস্থা জন্মায়নি। লেবার পার্টির কর্মীরা অনেকদিন ধরে অনেক কষ্ট সয়েছে, ত্যাগ করেছে, সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, সাধারণ তাদের চেনে ও বিশ্বাস করে। আমরাও যদি চরিত্রের দ্বারা হৃদয় জয় করি, তবে মতবাদের দ্বারা রাজ্য জয় করব। চরিত্রকে উপহাস করে আমরা ভুল করেছি। আমরা ভুল ভেবেছি যে শক্তি আসে কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ সংগ্রাম থেকে।"

এসব শুনে বাদল বলল, "তোমার পার্টি কি তোমার সঙ্গে একমত?"

মার্গারেট সখেদে বলল, "না। বিশুদ্ধ রাজনীতি ওদের মাথা খেয়েছে। ওরা বোঝে না যে লেবার পার্টির জয়ের পিছনে বিশুদ্ধ রাজনীতি নয়, খানিকটে ধর্মনীতি রয়েছে। রাশিয়াতেও যারা কমিউনিজম পত্তন করেছিল, তারা ধর্ম না মানলেও যা মানত, তার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল, দিতে উদ্যত ছিল, ত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, ভোগে বিতৃষ্ণ ছিল।"

বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। মার্গারেটকে নাড়া দিয়ে বলল, "দেখছ ও কে? ওই তোমাদের কালকের বাদল। আমি দেশলাই ফেরি করব।"

"আর একটা র‍্যাডভেঞ্চার!" মার্গারেট যেন ঠাণ্ডা জল ঢালল।

"নদীর বাঁধে শোওয়া, দেশলাই বেচে খাওয়া, এই করলেই আমি শ্রেণীচ্যুত হব। তা হলে আমি টের পাব কোথায় জুতো চিমটি কাটছে। তারপর আমি আবিষ্কার করব আমার কলকাটি, যা দিয়ে ঘটাব রুধিরহীন বিপ্লব।"

৭

যাবার সময় মার্গারেট বলল, "কাল এসো, তোমাকে দেশলাইওয়ালার বেশে সাজাব। এই পোশাক পরে তো কেউ দেশলাই বেচে না।"

তা শুনে বাদলের চেতনা হলো। তাই তো। মোটা কাপড়ের পচা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কোট প্যান্টলুন, টাই, কলারহীন গেরো দেওয়া গলাবন্ধ, তালি পড়া জুতো। ইশ! গা ঘিন ঘিন করে।

কিন্তু উপায় নেই। সেই যে বলে, উট গিলতে আগুয়ান, মশা গিলতে পেছপাও। তেমনি দেশলাই বেচতে উদ্যত, দেশলাইওয়ালার বেশ পরতে বিমুখ। অমন করলে চলবে কেন?

"আচ্ছা, কাল আসব, মার্গারেট।" বাদল নিরুপায়ভাবে বলল।

তারপরে সুধীদা।

সুধীদার ওখানে গিয়ে দেখল সুধীদা নেই, শুনল কোথায় বেরিয়েছে, ফিরতে রাত হবে না। তখন বসল সুধীদার ঘরে, স্বভাবের দোষে বই ঘাঁটল, কিন্তু মন লাগছিল না কিছুতেই।

জুন মাস। রাত আটটা বাজলেও দিনের আলো ঝকমক করছে, কে বলবে যে এটা দিন নয়, রাত। কিন্তু সে তো বাইরে। বাদলের অন্তরে কিন্তু অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।

কী দরকার, বাপু! তুমি এসেছিলে বিলেতে পড়াশুনা করতে, পাশ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে। তা না করে তুমি রইলে মানবনিয়তির বোঝা বইতে, দুঃখমোচনের দুঃখ সইতে। এবার তুমি তলিয়ে যেতে চাও জনসাগরে, সেখান থেকে উঠে আসবে কোন মুক্তা নিয়ে কে জানে! তোমার চারদিকে সাগরজল—নিচে উপরে, এ পাশে ও পাশে। হে ডুবুরি, তোমার সাহস আছে তো?

বাদল একটু পায়চারি করল। তারপর সুধীর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করল। তারপর আবার পায়চারি। তারপর চেয়ারে বসে গম্ভীরভাবে ভবিষ্যতের ধ্যান করতে লাগল।

"কে? বাদল? তোর খাওয়া হয়েছে?"

বাদল চমকে উঠে চেয়ে দেখল সুধীদা। বলল, "তোমার এখানে টেলিফোন নেই, অগত্যা সশরীরে আসতে হলো। শুনবে? তারাপদ ফেরার।"

সুধীও শুনেছিল অশোকার বাগ্‌দানের বৈঠকে। বাদল বিবরণ দিল।

তার নিজের কিছু নিয়েছে কি না বলতে গিয়ে বাদল ভেঙে পড়ল। ছোট ছেলের মতো আকুল হলো কেঁদে।

"ভাবী কাল আমার জীবনের চিহ্ন পাবে না। আমার সাধনার নিদর্শন পাবে না। Posterity আমার নাম পর্যন্ত জানবে না। আমার স্বাক্ষর চিনবে না। Oh, my signature! My signature!" বাদল লুটিয়ে পড়ল।

তার পরে সুধী তাকে অনুরোধ করল সঙ্গে থাকতে, সুধীর ওখানে। বাদল খুলে

বলল। পথে পথে দেশলাই বেচবে, কাগজ ফেরি করবে। শোবে টেমস নদীর বাঁধে।

"তুই কি উন্মাদ হলি ?" সুধী বলল। "চোরের উপর অভিমান করে—"

"না, না, আমাকে ভুল বুঝো না, ভাই।" বাদল বুঝিয়ে বলল যে তারাপদ তার কী-ই বা চুরি করেছে, কেন অভিমান করবে।

বলল, "আমার আশা চুরি গেছে, আমি যে এক রশ্মি আলো দেখতে পাচ্ছিনে। অন্ধকার। চারিদিকে অন্ধকার।"

সুধী বাদলের দু'টি হাত ধরল। দুই বন্ধু বসে রইল নীরবে।

বাদলের মনে পড়ল, "সুধীদা, তোমার সঙ্গে আমার হিসাবনিকাশের কথা ছিল। কত যে কথা ছিল তোমার সঙ্গে আমার। কবে সে সব হবে ?"

সুধী বলল, "সেইজন্যেই তো বলছিলুম আমার সঙ্গে থাকতে।"

বাদল বলল, সে নিজেই আসবে দেশলাই বেচতে, সুধীদাকে।

তার পরে তাদের দু'জনের কথাবার্তা হলো সমাজব্যবস্থাকে ঘিরে। বাদল বলল, সে একটা শ্রেণীসংগ্রাম বাধাতে চায় না, তার জন্যে অন্যান্য শক্তি কাজ করছে। সে এমন একটা টেক্‌নিক উদ্ভাবন করবে যা কেউ এত দিন পারেনি, যা মৌলিক। কিন্তু তা করতে হলে তাকে সকলের চেয়ে নিচু হতে হবে, অধমেরও অধম।

সুধী বাদলের হাতে চাপ দিল সস্নেহে।

"সবাই ভুলে যাবে যে বাদল বলে কেউ ছিল।" বাদল আরো কত কী বলল। "তার পরে—ধর, বিশ বছর পরে—আমি কথা কইব। কথা কইব দু'চার জনের কাছে। আর আমার সেই কথা হবে এমন কথা, যার জন্যে সমস্ত জগৎ, সমস্ত যুগ চেয়ে রয়েছে কান পেতে। এক দিনেই আমার কথা আকাশে আকাশে চারিয়ে যাবে, বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে যাবে। আমি বিশেষ কিছু করব না। একটি বোতাম টিপব, আর অমনি তোমার সমাজব্যবস্থা সমভূম হয়ে যাবে।"

"কিন্তু এখন," বাদল বলে চলল, "এখন আমার চোখে আলোর রেখাটিও নেই। আঁধারের পর আঁধার, তার পরে আঁধার, তার পরে আরো আঁধার। এই আঁধার পারাবার পার হব কী করে ? বিশ বছর এর গর্ভে গর্ভবাস করব কী করে ?" বাদল চোখে দেখতে পাচ্ছিল না দিনের আলো আছে কি গেছে। আকাশে তখনো আলোর আভাস ছিল।

কথা রইল, বাদলের সম্বল যা কিছু আছে তা সে সুধীকে পাঠাবে, সুধী বিলিয়ে দেবে, ব্যবহার করবে, যেমন খুশি।

সুধীদার ওখান থেকে বাসায় ফিরে বাদল দেখল, পীচ তার জন্যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। সকলে শুতে গেছে, তারও ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু বাদলকে না খাইয়ে সে নড়বে না।

"আমার খাবার টেবলে ঢাকা দিয়ে রেখে গেলে পারতে, কমরেড জেনী। মিথ্যে কেন রাত জাগলে ?"

"আপনার যেমন ভোলা মন। খেতে ভুলে যেতেন।" পীচ হাসল। "হয়তো দেখতেই পেতেন না যে খাবার ঢাকা রয়েছে।"

আর একবার অমন ঘটেছিল বটে। বাদল সেবার অপ্রস্তুত হয়েছিল জেনীর কাছে। তাই এবার জেনী রাত জাগছে।

"তোমার ঋণ জন্মে ভুলব না।" বাদল আবেগের সঙ্গে বলল। শুধু এই নয়, জেনী তার কত সেবা করেছে ছোট বোনের মতো।

"ও কী বলছেন ? আপনি তো কোথাও চলে যাচ্ছেন না।"

"চলে যাচ্ছিনে কী রকম ? কালকেই তো যাবার কথা।"

"কালকেই !" পীচ বিশ্বাস করল না। কিন্তু কাঁদতে বসল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাদল তা প্রথমটা লক্ষ করল না। তার এমন ক্ষিদে পেয়েছিল যে এক গ্রাসে একটি কোর্স নিঃশেষ কবল।

"ও কী ! তুমি কাঁদছ যে !' বাদল সহসা লক্ষ করল। "তোমার চাকরি থাকবে না বলে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? বাস্তবিক, এ বাসা উঠে যাবার দাখিল। তোমাকে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিতে হবে, জেনী। তা তুমি পাবেও।" বাদল তাকে অভয় দিল।

তা সত্বেও তার অশ্রু থামল না, বরং আরো অঝোর ঝরল।

মেয়েদের রীতিনীতি বাদলের অবোধ্য। সে আশ্বাস না দিয়ে বলল, "কাজ খুঁজে নিতে একটু অসুবিধে হবে বৈকি। তবে বেশি দিন বসে থাকতেও হবে না। আমরা সবাই তোমাকে এক একখানা সুপারিশপত্র দিয়ে যাব। তা হলে তোমার আর ভয় নাই। কেমন ?"

তাতেও থামে না বর্ষণ।

তখন বাদল বলে, "বুঝেছি। প্রথম মাসটা হয়তো তোমাকে ধার করতে হবে। ভাবনার কথা বৈকি। আচ্ছা, আমরা সবাই তোমাকে কিছু কিছু বকশিষ দিয়ে যাব। আমার —ভালো কথা, আমার যা কিছু সম্বল আছে তুমিই কেন নাও না, জেনী ? এই সুট ছাড়া আর কিছুই আমি সঙ্গে নিচ্ছিনে।"

পীচ অবাক হলো। কিন্তু তা সত্বেও তার চোখের জল বাগ মানল না। এ দিকে বাদলেরও কিছুতেই খেয়াল হলো না যে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া মমতা জন্মায়। মানুষ মানুষকে যেতে দিতে চায় না, তাই কাঁদে।

বাদলের ঘুম পাচ্ছিল। বলল, "রাত হয়েছে। যাও, ঘুমিয়ে পড়।" পীচ কিন্তু সরল না, যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কী করে ? ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিতে পারে না, অথচ পীচ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শুতে যেতেও সংস্কারে বাধে। বাদল কী ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, গিয়ে বাইরে পায়চারি করল। সকলের ঘর বন্ধ, কোথাও আলো নেই, একমাত্র তারই ঘর ছাড়া।

যখন ঘরে ফিরল তখনো পীচ তেমনি দাঁড়িয়ে, তবে ঘরের মাঝখানে নয়, জানালায় ঝুঁকে। তার চোখ বোধ হয় তারার দিকে।

বাদল তার কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রাখল। বলল, "জেসী, রাত হয়েছে। যাও, ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে এসো, তোমার জন্যে কী করতে পারি দেখব।"

জেসী শুনল কি না বোঝা গেল না। তার হাত অসাড়, তার ভঙ্গিও। তার অশ্রু থেমেছে, রয়েছে একটা থমথমে ভাব।

"জেসী, কাল তোমাকে সব জিনিস দিয়ে যাব। যা আমার আছে।"

এতক্ষণে তার মুখ ফুটল। "আমি চাইনে।"

"তবে তুমি কী চাও ? তোমার জন্যে কী করতে পারি ?"

"কিছু না।" এই বলে সে আবার চুপ করল।

৮

বাদলকে অবশেষে সংকোচ বিসর্জন দিয়ে বলতেই হলো যে তার ঘুম পেয়েছে, জেসী যদি দয়া করে যায় তো সে বাধিত হয়।

জেসী দয়া করল। তখন বাদল শোবার কাপড় পরে আলো নিবিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিল। ভাবল, আহ্, কী আরাম ! কিন্তু কাল কোথায় থাকবে বিছানা বালিশ, কাল ঘুম হবে কী করে ?

আর একটু হলেই সে ঘুমিয়ে পড়ত। অসাধারণ ক্লান্ত। কিন্তু তার মনে হলো, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাদল ইতস্তত করল, বিছানা থেকে উঠতে তার শক্তি ছিল না, ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। তবু উঠতেই হলো, পরকে যদি কাঁদতে দেয় তবে দুঃখমোচন করবে কার !

যা ভেবেছিল তাই ! জেসী।

"কী হয়েছে, জেসী। তুমি ঘুমোতে যাওনি ?"

জেসী উত্তর দিল না। তখন বাদল তাকে বারংবার প্রশ্ন করে এইমাত্র উদ্ধার করল যে তার দিদি ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে, যে ঘরে তারা দু'জনে শোয় সে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। দিদিকে জাগাতে সাহস হয় না, ডাকাডাকি করলে বাড়িসুদ্ধ সবাই জাগবে।

কী আপদ ! বাদল কী করবে এত রাত্রে জেসীর জন্যে ? বাড়ির সবাইকে জাগানো ঠিক হবে না। বাইরে সারা রাত জাগিয়ে রাখাও অন্যায়।

"আচ্ছা, বসবার ঘরে তো ঘুমাতে পারো। বালিশের দরকার থাকলে আমি দিতে পারি।"

"না, আমার একলা ভয় করবে।"

বাদল ভাবল, জেসীকে তার ঘরটা ছেড়ে দিয়ে সে নিজেই বসবার ঘরে গিয়ে শোবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই একই উত্তর। আমার একলা ভয় করবে।

অগত্যা বাদল জেসীকে তার ঘরে স্থান দিল। হাতের কাছে যা পেলো, সুটকেস, য়্যাটাশে কেস, বড় বড় বই, সব একত্র করে মেজেতে একটা মঞ্চ গড়ল। তার উপর বিছানা পেতে নিজেই সেখানে শুয়ে পড়ল। জেসী কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল। বাদলের খাট দখল করবে জেসীর এমন স্পর্ধা ছিল না।

তখন বাদল বাধ্য হয়ে নিজের খাটে শুলো, জেসীকে বলল মেজের বিছানায় শুতে। সে তা করল কি না দেখবার আগে বাদল ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের দিকে বাইরের আলো লেগে তার ঘুম পাতলা হয়ে এল। সে অনুভব করল, কে যেন তার পাশে শুয়ে তার গলাটি জড়িয়ে ধরেছে। ক্রমে তার জ্ঞান হলো জেসীর ঘুমন্ত মুখখানি তার মুখের কত কাছে। ভোরের আলোয় কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। যেমন সরল, তেমনি মধুর, তেমনি পরনির্ভর।

বাদলের তখন ভাববার সাধ্য ছিল না, ঘুমের ঘোরে তার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়। তবু সে চেষ্টা করল চিন্তা করতে। তার বেশ আরাম লাগছিল সেইভাবে ঘুমোতে। কিন্তু অন্তরে একটা অস্বস্তির ভাবও ছিল। সে বিবাহিত পুরুষ, সেইজন্যে কী ? না, সেজন্যে নয়। সে মুক্ত পুরুষ, বিবাহ তাকে বাঁধেনি। কেন তবে অস্বস্তি ?

পাছে জেসীর ঘুম নষ্ট হয় সেই ভয়ে বাদল নড়চড় করতে পারছিল না। ওদিকে আলো পড়ছিল তার চোখের উপর, তাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। অস্বস্তি কি সেইজন্যে ?

ষোল সতের বছর বয়সের এই নির্মল মেয়েটি একটি হাতে বাদলের গলাটি জড়িয়ে বিনা কথায় কী বলতে চায় ? "যেতে নাহি দিব।" বলতে চায়, "যাও দেখি, যাবে কেমন করে ?"

এক মুহূর্তে বাদলের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। জেসী বাদলকে যেতে দেবে না, বেঁধে রাখবে। তাই তার কাঁদন। কাঁদন দিয়ে সে বাঁধন রচনা করবে, যাবার বেলায় বাধা দেবে। তাই তার কাঁদন।

এই হৃদয়দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিতে নেই। বাদল ধীরে ধীরে জেসীর হাতখানি সরিয়ে

সোজা হয়ে উঠে বসল। জেনীরও ঘুম ভেঙে গেল। সে হঠাৎ উঠে বসে অপ্রতিভ হয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন বাদল দু'তিন বার হাই তুলে ভাবল আর একটু শোয়া যাক। শুতে শুতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, এবার চোখে বালিশ চেপে। কয়েক ঘণ্টা বাদে তার দরজায় কে টোকা দিচ্ছে শুনে তার ঘুম ছুটে গেল। সে চোখ না চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "Come in."

"কী? তুই এখনো বিছানায় পড়ে!" সুধী বলল ঘরে ঢুকে। "প্রায় ন'টা বাজে তা জানিস?"

"তাই নাকি?" বাদল লাফ দিয়ে উঠে বসল। "ন'টা বাজে!"

"বলে বেড়াস তোর নাকি দারুণ অনিদ্রারোগ। কই, আমি তো কোনো দিনও লক্ষ করলুম না যে তুই সকালবেলা জেগে আছিস!"

"কী করে লক্ষ করবে? আমার অনিদ্রা তো রাত্রে। জানো, সুধীদা, কাল রাত্রে আমি কখন ঘুমিয়েছি? দেড়টায়।"

কখন এক সময় জেনী এসে বাদলের মাথার কাছে একটা টি-পয়তে চা ইত্যাদি রেখে গেছল। আর তুলে দিয়েছিল মেজের বিছানা! বাদল মনে মনে ধন্যবাদ জানাল, শুধু চায়ের জন্যে নয়, বিছানা তোলার জন্যেও। নইলে সুধীদা শুধালে কী কৈফিয়ৎ দিত?

চা খেতে খেতে বাদল বলল, "তুমি কিছু খাবে না, সুধীদা?"

"আমি খেয়ে বেরিয়েছি। থাক।"

মাদাম ব্রনস্কি বাদলের যে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন সেটা সুধী এই প্রথম দর্শন করল। "কার মূর্তি? তোর?"

বাদল সগর্বে বলল, "কেমন হয়েছে? রোদাঁর ভাবুক মূর্তির চেয়ে খারাপ?"

সুধী হেসে বলল, "কতকটা সেই রকম দেখতে। তুই কী সমস্তক্ষণ ওই ভাবে বসেছিলি?"

বাদল লজ্জিত হয়ে বলল, "তা কেন? আমি কি জানতুম যে উনি আমার মূর্তি গঠনের জন্যে নক্সা এঁকে নিচ্ছেন? আমি আপন মনে বসে বসে কী যেন চিন্তা করছিলুম। আমার ধারণাই ছিল না যে আমাকে রোদাঁর ভাবুকের মতো দেখতে।"

সুধী হাসি চেপে বলল, "মাদাম বোধ হয় রোদাঁর শিষ্যা।"

ইঙ্গিতটা বাদলের মর্মভেদ করল না। সে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, "এ মূর্তি গঠন করতে অধিক সময় লাগেনি, এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগেছে! ঐ যে চোখ দু'টি দেখছ, ওর জন্যে মাদামকে আমি রোজ একবার সিটিং দিয়েছি। বল দেখি, কেমন হয়েছে?"

"ভালোই।" সুধী বলল, "মাদামের চোখ আছে।"

"এখন এ মূর্তি নিয়ে আমি করি কী ? কাকে দিই ?" বাদল ভাবুকের মতো ভাবতে বসল। "তুমি কি এর দায়িত্ব নিতে পারবে, সুধীদা ?"

"রাখতে বলিস, রাখব। দায়িত্ব কিসের ?"

"দায়িত্ব কিসের ! বল কী, সুধীদা ! আমার সর্বস্ব গেছে, ভাবীকালের জন্যে একমাত্র নিদর্শন আছে এই মূর্তি। যদি হারিয়ে যায় কি ভেঙে যায় তবে—" বাদল শিউরে উঠল।

"তবে আরো মূর্তি গড়া হবে, ছবি আঁকা হবে। ভাবনা কী, বাদল ! তুই এমন ভেঙে পড়ছিস কেন ? তারাপদ কী নিয়েছে তোর ? কোন দুঃখে তুই নদীর বাঁধে যাচ্ছিস ?'

বাদল ততক্ষণে খাওয়া শেষ করেছিল। পায়চারি শুরু করল। "তোমাকে তো বলেছি, তারাপদর জন্যে আমি নদীর বাঁধে যাচ্ছিনে। যাচ্ছি আমার ক্রমবিকাশের অনুসরণে। আমার মন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখানকার সঙ্গে নদীর বাঁধের সংযোগ আছে। তবে একথা ঠিক যে একদিন আগেও অতটা আমার জানা ছিল না। তারাপদ আমাকে আত্ম আবিষ্কারের উপলক্ষ দিয়ে গেছে, তাই আমি তাকে ক্ষমা করেছি।"

"তুই পায়চারি রাখ। পোশাক পরে নে। তোর একটা সামাজিক কর্তব্য আছে, সেটা করে নে। তার পরে যেতে হয় নদীর বাঁধে যাবি।" সুধী তাড়া দিল।

"মানে কী, সুধীদা ?" বাদল বিস্মিত হলো।

"তোর শাশুড়ীরও সর্বস্ব না হোক অনেক ধন গেছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার।"

"বল কী, সুধীদা !" বাদল আকাশ থেকে পড়ল। "তারাপদ তাঁকেও—"

"হাঁ, তাঁকেও ঠকিয়েছে। তোর বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর বিশ্বাস লাভ করেছে, তাই তোর একবার যাওয়া উচিত।"

"একবার কেন, একশো বার।" বাদল অবিলম্বে প্রস্তুত হলো। "একশো বার কেন, এক হাজার বার। আমার নাম করে একজন নিরীহ ভদ্রমহিলাকে বঞ্চনা করা কি আমি ক্ষমা করতে পারি ?"

দুই বন্ধু বাইরে যাচ্ছে এমন সময় জেনীর সঙ্গে দেখা। বাদল বলল, "জেনী, ভয় নেই, আমি এ বেলা যাচ্ছিনে, ওবেলা যাব।"

মেয়েটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তা সুধীর নজর এড়াল না। সুধী শুধাল, "ওটি কে, বাদল ?"

"আমাদের কমরেড জেনী। বড় মিষ্টি মেয়ে। আমাকে যেতে দেবে না বলে পাহারা দিচ্ছে, দেখলে তো ?"

৯

যেতে যেতে সুধী বলল, "বাদল, আমি বোধ হয় বেশি দিন লণ্ডনে থাকব না, গ্রামে যাব। যে ক'দিন আছি তোর সঙ্গে থাকতে চাই, কিন্তু নদীর বাঁধে থাকতে পারব না।"

"কেন, সুধীদা? ভয় কিসের?" বাদল পাদ্রীর মতো ভজাল, "নদীর বাঁধের মতো অমন ঠাঁই পাবে কোথায়? খোলা আকাশ, খোলা বাতাস। মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পারে, তার জন্যে এত ভয়।"

"না, বাদল।" সুধী হাসল। "তুই দেখছি না শুয়েই শোবার সুখ উপভোগ করেছিস। আমি কিন্তু এসব বিষয়ে সংশয়বাদী।"

"তুমি", বাদল মহা বিরক্ত হয়ে বলল, "কিছুই দেখবে না, কিছুই শিখবে না, কেবল মিউজিয়াম আর ঘর! তোমার মতো মানুষকে আমরা বলে থাকি এস্‌কেপিস্ট। তোমরা বাস কর গজদন্তের গম্বুজে। তুমি তো বেহালাও বাজাও।"

"বেহালা নয়, বাঁশি।"

"একই কথা।" বাদল উষ্ণ হয়ে উঠল। "পৃথিবীর সম্মুখে ঘোর সংকট। যুদ্ধ কি বিপ্লব, কী যে ঘটবে তার ঠিক নেই। তুমি কিনা ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো," বাদলের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতা "সারা দিন বাজাইলে বাঁশি!"

"বহুকাল বাজাইনি, বাদল। ইচ্ছা করে সারা রাত বাজাতে।"

সুধী গায়ে পেতে নিল বাদলের অভিযোগ।

"না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।" বাদল হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল। "তুমি এস্‌কেপিস্ট। তোমার পলাতক মনোবৃত্তি কী করে দূর হবে জানিনে। সারা রাত বাঁশি বাজানো যে সমস্যার মুখোমুখি হতে অস্বীকার তা কি বুঝবে যে তোমাকে বোঝাব! তোমার মতো অবুঝ লোক হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে যে এটা সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।"

সুধী শান্ত ভাবে বলল, "বিশ্বাসঘাতকতা কিসের?"

বাদল সর্বজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, "তুমি তা হলে Julien Bendaর বইখানা পড়নি। তোমরা বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সমাজের এ দশা হতো না। তোমরা সারাদিন বাঁশি বাজিয়েছ, খোঁজ রাখনি কী করে একদল চালাক লোক পরিশ্রমীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ফলার করেছে। তোমাদেরকে দিয়েছে কাঁঠালের ছিবড়ে, তাই খেয়ে তোমাদের এমন নেশা জমেছে যে তোমরা সারা দিন বাঁশি বাজিয়েছ, আর ভেবেছ এ ব্যবস্থা চিরকাল চলবে।"

"এসব তো জানতুম না বাদল।" সুধী স্বীকার করল। "তুই আয়, আমার সঙ্গে থাক, আমাকে বুঝিয়ে দে কবে কেমন করে কার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

বাদল রাজি হল না। বলল, "তোমার সঙ্গে থাকতে কি আমার অসাধ। কিন্তু আমার পূর্বজীবনকে আমি পশ্চাতে ফেলে এসেছি। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে অনিশ্চিতের অভিমুখে, অন্ধকারের গর্ভে। আমাকে আবিষ্কার করতে হবে কলকাটি। আমি এমনি করে একটি বোতাম টিপব," বাদল অভিনয় করে দেখাল, "আর সমভূম হয়ে যাবে তোমাদের এই অপরূপ সমাজব্যবস্থা। এই বর্ণচোরা শোষণব্যবস্থা।"

বাদল বোধ হয় চোখে বোতাম দেখছিল, সুধী তার হাত ধরে টেনে না সরালে মোটরের সামনে পড়ত।

"তোর জন্যে আমার ভয় হয়, বাদল। তুই যে কোন দিন দেশলাই ফেরি করতে করতে মোটর চাপা পড়বি কে জানে!"

"তা হলে তো বেঁচে যাই, সুধীদা। অহোরাত্র একটা না একটা চিন্তা নিয়ে আছি, আর সব চিন্তার গোড়ায় সেই একই চিন্তা—দুঃখমোচন। আচ্ছা, বল দেখি, আমার কেন এত মাথাব্যথা। তোমার তো কই কোনো দুর্ভাবনা নেই?"

সুধী হেসে বলল, "আমি যে বিশ্বাসঘাতক।"

"না, না, পরিহাসের কথা নয়, সুধীদা। এই যে তুমি বিলেতে আছ, তোমার খরচ আসছে জমিদারির প্রজাদের কাছ থেকে কিংবা জীবনবীমার কোম্পানির কাছ থেকে। কোম্পানি ও টাকা লাভের ব্যবসায় খাটিয়েছিল, ও টাকা শোষণের টাকা। তুমি তোমার এই খরচের কী হিসাব দিচ্ছ, শুনি? দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করছ। তাতে কার কী প্রাপ্তি? প্রজারাই বা কী পাচ্ছে, শোষিতদের পাওনা কী ভাবে মিটছে? আমি তো এইজন্যে বাড়ি থেকে টাকা নেব না স্থির করেছি। বাবার টাকা যে গভর্নমেণ্ট দিচ্ছে, সে তো শোষণের উপর সুপ্রতিষ্ঠ।"

"এ সব তত্ত্ব আরো ভালো করে শুনতে চাই বলে তোকে আবার ডাকছি, বাদল, তুই আয়, আমার সঙ্গে কিছু দিন থেকে আমাকে বুঝিয়ে দে এ সব। তোর সঙ্গে অনেক তর্ক আছে।"

বাদল বলল, "না। আজকেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে।"

"ঝাঁপ!" সুধী চমকে উঠল।

"হাঁ। জনসাগরে তলিয়ে গিয়ে এই সমস্যার তল খুঁজব—এই শোষণ সমস্যার ও এর রুধিরহীন সমাধানের।"

"বাদল, তোকে নিরুৎসাহ করব না। কিন্তু দিন কয়েক আমার সঙ্গে বাস করে তার পরে ঝাঁপ দিতে দোষ কী?"

"সুধীদা, আমি কৃতসংকল্প।"

সুধী যে বাদলকে সকাল বেলা পাকড়াও করেছিল তা শুধু তার শাশুড়ীর প্রতি

সামাজিক কর্তব্যের অনুরোধে নয়। তাকে নদীর বাঁধ থেকে নিবৃত্ত করে নিজের কাছে কিছু দিন রাখার অভিপ্রায় প্রবল হয়েছিল। সুধী গত রাত্রে ভাববার অবসর পায়নি, অশোকা তার মন জুড়েছিল। আজ ভোরে উঠে ভেবে দেখল, বাদল যদি সত্যি সত্যি দেশলাই বেচে, তবে তার বাবা শুনতে পেলে সুধী সম্বন্ধে কী মনে করবেন।

কিন্তু বাদলের উপর জোর খাটে না, তাকে বকলে সে রাগ করে দেশলাই কেন, জুতোর ফিতে বেচবে। নদীর বাঁধে কেন, গাছতলায় শোবে। পরে তা নিয়ে থানা পুলিশ করতে হবে।

"বেশ, তুই যা করতে চাস তা কর। কিন্তু ভুলে যাসনে, এ দেশে ভবঘুরেদের জন্যে আইন আছে।"

"আইন!" বাদল আঁতকে উঠল। "তা হলে তো মাটি করেছে!" বাদল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ঠিক জানো?"

"তুই আইনের ছাত্র। ঠিক জানার কথা তো তোরই। আমি যে গজদন্তের গম্বুজে থাকি!"

বাদল বিচলিত হয়ে বলল, "মার্গারেট তো কাল আমাকে সতর্ক করেনি। আইন! তুমি বলতে চাও, ভবঘুরে বলে সন্দেহ করে আমাকে জেলে পুরবে?"

"সম্ভব। সেই জন্তেই তো বলি, আয়, আমার কাছে থাক, আইনের খবর নে। তার পরেও নদী থাকবে, নদীর বাঁধ থাকবে, তারা পলাতক হবে না।"

বাদল ধরা দিল না। বলল, "অত আটঘাট বেঁধে ঝাঁপ দেওয়া কি ঝাঁপ! ঝাঁপ দিতে হয় চোখ বুজে। যদি জেলে নিয়ে যায় তো যাব। দেখব মানুষ মানুষকে কত কষ্ট দেয়।"

বাদলের শাশুড়ী মিসেস গুপ্ত তখন জিনিসপত্র লরীতে বোঝাই করতে দিয়ে জন কয়েক বান্ধব বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। সুধী বাদলকে দেখে কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। "এই যে তোমরাও এসে পড়েছ। কোথায় শুনলে যে আমি স্বাস্থ্যের জন্তে সুইট্‌জারলণ্ডে যাচ্ছি? আর একটু দেরি হলে দেখা হতো না।"

সুধীর ইচ্ছা ছিল সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু তিনি যে স্বাস্থ্যের জন্তে যাচ্ছেন এই সংবাদের পর সহানুভূতির কথা তুলে তাঁকে বিব্রত করা উচিত নয়। বাদল কিন্তু ফস করে বলে বসল, "আমি যে কী ভয়ানক লজ্জিত—"

তিনি ঠাওরালেন, বাদল লজ্জিত উজ্জয়িনীর প্রতি কর্তব্য করেনি বলে। বললেন, "সুখী হলুম, বাদল, তোমার সুমতি দেখে। এখনো বেবী এ দেশ ছাড়েনি। তাকে চিঠি লেখো, সে হয়তো তোমার কাছে আসবে।"

এই বলে তিনি মুখ ফেরালেন। তাঁর অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ ফেনিয়ে

উঠল। শুধু আলাপ নয়, ফেনিয়ে উঠল আরো একটি দ্রব্য। না, দ্রব্য নয়, দ্রব।

তাঁরাও সহানুভূতি জানাতে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের নিরস্ত করে বলছিলেন, "ও কিছু নয়। আর্টের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। আর্টের নামে কেউ কিছু চাইলেই অমনি দিয়ে ফেলি, ফিরে পাবার আশা রাখিনে।"

কিন্তু তাঁর মুখে গভীর নিরাশার দাগ ছিল। তাঁর চোখের চাউনি যেমন সজল, তাঁর ঠোঁটের কাঁপুনিও তেমনি স্নায়বিক। সুধী উচ্চবাচ্য করল না। বাদল আর একবার কী বলতে চেষ্টা করছিল, সুধী তার গা টিপল।

অভ্যাগতরা বিদায় নিলে তিনি সুধীর দিকে ফিরে বললেন, "তার পর, সুধী? তোমার ভারী অদ্ভুত লাগছে, না? দেখ, আমার স্বাস্থ্য সত্যিই এদেশে টিকছে না। রাজার দেশ বলেই আছি, নইলে কোন কালে চলে যেতুম। সুইট্জারলণ্ডের মতো দেশ আর হয় না। ওখানকার হাওয়ায় দু'দিনেই বেঁচে উঠব। বাদল, তুমি অবশ্য ইংলণ্ডের পক্ষে ওকালতী করবে। কিন্তু এদেশ অসহ্য। তোমরাও পারো তো এসো সুইট্জারলণ্ডে। বেবীকে লিখে আনাও না, বাদল? তোমারই তো স্ত্রী। আচ্ছা, এখন তা হলে গুড বাই। স্টেশনে আসতে চাও? Oh, how kind of you!" বলে তিনি কেঁদে ফেললেন।

প্রত্যাবর্তন

১

উজ্জয়িনী যাবার সময় সুধীকে অনুরোধ করেছিল, "চিঠি লিখতে একদিনও ভুলো না।...মনে রেখো।"

সুধীও ঠিক প্রতিদিন না হলেও প্রায়ই চিঠি লেখে। না লিখলে উজ্জয়িনী টেলিগ্রাম করে, জানতে চায় অসুখ করেছে কি না। বেচারিকে অযথা খরচ করিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে একখানা পোস্টকার্ডের পিঠে দু'চার ছত্র লিখে রোজ ডাকে দেওয়া কঠিন নয়। সুধী কিন্তু রোজ সেটুকুও পারে না, নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

তা ছাড়া তার চিঠি লেখার ধরন এই যে সে মামুলি চিঠি লেখে না। দু' লাইন হোক, চার লাইন হোক, যাই লিখুক ভালো করে ভেবে ও গুছিয়ে লেখে। তাই তার চিঠির সংখ্যা কম। উজ্জয়িনীর খাতিরে সে যেমন তেমন করে দু' চার ছত্র লিখে দায় সারতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে গাফিলি হয়।

"শুধু লিখলে চলবে না। রীতিমতো বড় চিঠি লিখতে হবে। বুঝলে?" উজ্জয়িনী শাসন করে। "আমি যত বড় চিঠি লিখি, তুমিও তত বড় চিঠি লিখবে। মনে রেখো।"

সর্বনাশ। উজ্জয়িনীর এক একটা চিঠি যে এক একখানা পুঁথি। কোথায় কী

দেখেছে, কার সঙ্গে কী নিয়ে আলাপ হয়েছে, এসব তো থাকেই আর থাকে সুপ্রচুর উচ্ছ্বাস। এতদিন পরে সে জীবনকে উপভোগ করতে শিখেছে, তার কোনো ক্ষোভ নেই, আক্ষেপ শুধু এই যে সুধীদা তার মতো সুখী নয়। হতভাগ্য সুধীদা! তার প্রিয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা সত্ত্বেও সে কেন যে লণ্ডনে পড়ে আছে! ক্ষতি কী যদি আমেরিকা যাত্রা করে, আমেরিকার পথে ভারত?

"সুধীদা ভাই, তোমার জন্যে আমার মন সব সময় খারাপ। যখনি কিছু উপভোগ করি তখনি মনে হয়, আহা! সুধীদা তো উপভোগ করছে না। এমন দৃশ্য একা উপভোগ করা অন্যায়। সুধীদা, তোমার জন্যে দৃশ্যপট পাঠাতে পারি, দৃশ্য পাঠাতে পারিনে। কাজেই তোমাকে আমি বার বার বলি, তুমি চলে এসো, যোগ দাও আমাদের সঙ্গে।"

এর উত্তরে সুধী লেখে, "আমার জন্যে মন খারাপ করিসনে। আমি প্লেটো পড়ছি। সেও এক অপূর্ব উপভোগ।"

"আচ্ছা," উজ্জয়িনী লেখে, "এখন তো অশোকার উপদ্রব নেই, আমারও উৎপাত নেই। তোমার হাতে রাশি রাশি সময়। কেন তবে তোমার মনের ছবি কলম দিয়ে আঁকো না? আমার কত কাজ। তবু আমি রোজ রাত্রে শোবার আগে তোমাকে দশ বারো পৃষ্ঠা লিখি। তুমি যে আমার ঘুমের অংশ নিচ্ছ তার বিনিময়ে কী দিচ্ছ, বল তো?"

এর উত্তরে সুধী—"বাঃ, তোর উৎপাত নেই কী রকম! তোর চিঠি পড়তে যে আমার পুরো আধ ঘণ্টা লাগে। আর তুই কি জানিসনে যে আমি স্বল্পভাষী?"

উজ্জয়িনী—"আহ, সুধীদা! তুমি স্বল্পভাষী বলে কি এতদূর স্বল্পভাষী! অশোকার বেলায় কি এমনি স্বল্পবাক্ ছিলে? জানি গো জানি। তুমি এক একজনের কাছে এক এক রকম। না, ওসব শুনব না। বোবাকে কথা কওয়াব। যদি লম্বা চিঠি না পাই তবে—থাক, আজ আর বললুম না। আমার মাথায় অনেক দুষ্ট বুদ্ধি আছে। যথাকালে টের পাবে।"

এর পরে সুধী কিছুদিন পোস্ট কার্ডের বদলে খামে ভরা চিঠি লিখেছিল। তাতে লণ্ডনের হালচাল জানিয়েছিল। ফলে উজ্জয়িনী প্রসন্ন হয়েছিল। লিখেছিল, "তুমি পারো সবই, কিন্তু তার জন্যে শাসন দরকার। যাক, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো সকলের খবর দিয়ো। কে কেমন আছে—ক্রিস্টিন, সোনিয়া, বুলুদা। বুলুদা বোধ হয় আমার উপর অভিমান করেছে, আমি চিঠি লিখিনি বলে। কিন্তু আমিও তোমারই মতো স্বল্পবাক্। যা কিছু বলবার তা একজনকে বলতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরের জন্যে থাকলে তো বলব! ভালো কথা, মা'র চিঠি পাচ্ছিনে কেন? অসুখ করেনি আশা করি।"

ঠিক এই সময় তারাপদ ফেরার হয়। তারপর উজ্জয়িনীর মা সুইট্জারলণ্ড চলে যান।

যদিও বাদল সম্বন্ধে উজ্জয়িনী লেশমাত্র অনুসন্ধিৎসু নয়, তবু তারাপদর অন্তর্ধানের পরে বাদলও ঝম্পদান করে। এসব খবর দস্তরমতো জবর। সুধী বেশ ফলাও করে লিখল। তার আশঙ্কা ছিল, উজ্জয়িনী হয়তো ভাববে সুধী যথেষ্ট চেষ্টা করেনি, করলে কি বাদল অমন করে নদীর বাঁধে শুতো, দেশলাই বেচে খেত?

"চেষ্টা করলে বাদলকে আমি নিরস্ত করতে পারতুম।" সুধী সাফাই দিল। "কিন্তু সেটা হতো নেহাৎ গায়ের জোর। পরে সে এই বলে অভিযোগ করত যে আমার জন্যে তার জীবন ব্যর্থ হলো। আমি কি তার জীবনের ব্যর্থতার দায়িত্ব নিতে পারি! আমি লণ্ডনে যে কয়দিন পারি থাকব, তার খোঁজ খবর রাখব, যদি তার অসুখ করে তখন গ্রেপ্তার করে আনব। অথবা যদি সে নিজেই গ্রেপ্তার হয় তবে তার জামিন দাঁড়াব। আপাতত এই আমার পরিকল্পনা। তুই নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ কর, বাদলের ভার আমার উপর ছেড়ে দে। আর যদি তোর ইচ্ছা করে স্বামীর ভার নিতে, তবে চলে আয়, আমেরিকা যাসনে। মোট কথা, তুই স্বাধীন, যেমন বাদল স্বাধীন।"

এর উত্তরে উজ্জয়িনী—"আমার স্বামী কাকে বলছ? তিনি ও সম্পর্ক স্বীকার করেন না, আমিও স্বীকার করতে নারাজ। তিনি ও আমি পরস্পরের কমরেড হতে পারতুম, কিন্তু সেদিন তাঁর মুখে যা শুনলুম, তার পরে তাতেও আমার অরুচি। না, আমি তাঁর ভার নিতে পারব না, সুধীদা। সত্যি বলতে কী, আমি তাঁকে এড়াতেই চাই। আমার জীবন আমার একার। এ জীবন আমি যাকে খুশি উপহার দেব। তুমি শুনে অবাক হবে যে আমি তাঁর পদস্খলন প্রার্থনা করি। তা হলে আমি সেই অজুহাতে ডিভোর্স আদায় করে নেব। না, আমি যাব না লণ্ডনে। যা করবার তা তুমিই কোরো, তিনি তোমারই বন্ধু। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি।"

চিঠি পড়ে সুধী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কী পরিবর্তন! এই উজ্জয়িনী একদিন কত ভালোবাসত বাদলকে। কী ঈর্ষান্বিতা ছিল সে! সেই কিনা লিখেছে, "আমি তাঁর পদস্খলন প্রার্থনা করি। তা হলে আমি সেই অজুহাতে ডিভোর্স আদায় করে নেব।" হা ভগবান!

সুধী রাগ করে উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল। তার টেলিগ্রামের জবাবে জানাল, শরীর ভালো আছে।

উজ্জয়িনী সুধীর কে? বাদলের স্ত্রী বলেই তার সঙ্গে সুধীর পরিচয় ও সম্পর্ক। সে যদি বাদলের স্ত্রী না হয়, ডিভোর্সের কথা তোলে, তবে তার সঙ্গে সুধীর পরিচয় বা সম্পর্ক নেই, সে সুধীর কেউ নয়।

যা শুনে সুধীর অবাক হবার কথা, তা শুনে সে যে শুধু অবাক হলো তাই নয়, মর্মাহত হলো। তার জীবনে সে এই প্রথম শুনল যে স্ত্রী স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করছে।

তার সংস্কারে ভীষণ ঘা লাগল। অন্য কোনো মেয়ে হলে সে উপেক্ষা করত। কিন্তু এ যে উজ্জয়িনী।

ছি ছি! কী করে এ কথা উদয় হলো উজ্জয়িনীর মনে! কই, কোনো নভেলে কী নাটকে তো এ কথার উল্লেখ নেই। থাকলে সুধী এতটা আঘাত পেতো না, ভাবত উজ্জয়িনী কোনোখানে ওকথা পড়েছে বা শুনেছে, সেইজন্যে নিজের বেলায় প্রয়োগ করছে। ওটা যে উজ্জয়িনীর মৌলিক উক্তি নয়, এ বিষয়ে সুধী নিশ্চিত হতে পারছিল না, হলে আশ্বস্ত হতো।

সুধী রাগ করল, দুঃখও পেল। এতদিন সে উজ্জয়িনীর পক্ষে ছিল, কেননা ধর্ম ছিল উজ্জয়িনীর পক্ষে। এখন এই উক্তির পর উজ্জয়িনী সুধীর সহানুভূতি হারালো, কেননা ধর্মের সমর্থন হারালো। যে মেয়ে নিজের স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করতে পারে, সে মেয়ে যতই সহানুভূতির যোগ্য হোক না কেন, এই উক্তির পর সহানুভূতি পেতে পারে না। না, না, সুধীকে কঠোর হতে হবে। সে ক্ষমা করবে না। অর্থাৎ ক্ষমা করবে যদি উজ্জয়িনী অনুতপ্ত হয়, যদি ঘাট মানে।

সুধী দুঃখ পেলো। যে মেয়ের কপাল খারাপ সে কেন স্বাধীন হয়েও সন্তুষ্ট হয় না, উপভোগ করেও তৃপ্ত হয় না, দেশভ্রমণ করেও ক্ষান্ত হয় না? সে যদি নারীবাহিনী গড়ে বন্দুক চালাত, তা হলেও সুধী এমন দুঃখ পেত না। কিন্তু সে মেয়ে চায় জীবনটা যাকে খুশি উপহার দিতে। এবং এমন স্বার্থপর সে মেয়ে যে নিজের ডিভোর্সের জন্যে স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করে। তার কি নৈতিক বোধ একেবারেই নেই? পদস্খলন কি এতই সুলভ? কেন বাদল পতিত হবে? সে কি তেমন ছেলে? মুখে বলে কত রকম লম্বা চওড়া কথা। কিন্তু বাদল মনে প্রাণে দায়িত্ববান। সে কখনো অমন কিছু করবে না।

উজ্জয়িনীও না। ওটুকু শ্রদ্ধা উজ্জয়িনীর প্রতি সুধীর আছে। তা যদি না থাকত, সুধী তাকে মুক্তকণ্ঠে উপভোগ করতে বলত না। সুধী চায় যে উজ্জয়িনী জীবনকে উপভোগ করুক, সুখী হোক, কিন্তু নীতির নিয়ম মেনে, সমাজের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রেখে। তাই তার প্রার্থনার নমুনা শুনে হঠাৎ যেন একটা চোট পেল। এর মধ্যে নীতিবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ কোথায়?

২

একবার কল্পনা করুন সুধীর বিস্ময়। সেদিন মিউজিয়াম থেকে বাসায় ফিরে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছে, এমন সময় বড় বুড়ী গন্ধ বিস্তার করে কোথা থেকে ছুটে এসে নিষ্ঠীবন বর্ষণ করতে করতে যা বলল তার মর্ম এই যে একজন ভদ্রমহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন—বসবার ঘরে।

ভদ্র মহিলা ! সুধী বিমূঢ়ভাবে বলল, "আমার জন্যে !"

"ভারতীয় ভদ্রমহিলা আর কার জন্যে অপেক্ষা করবেন ? তাঁর সঙ্গে বিস্তর লটবহর আছে। বোধ হয় সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন।"

ভারতবর্ষ থেকে ! সুধী মহাচিন্তিত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে বসবার ঘরে গেল।

"এ কী ! তুই ? উজ্জয়িনী !"

"হাঁ, সুধীদা। আমিই। কেন, আমার তার পাওনি ?"

"না। কোন ঠিকানায় করেছিলি ?"

"মিউজিয়ামের।"

"সেখানে হাজার লোক। যাক, তোর চা খাওয়া হয়েছে ?"

"দিচ্ছে কে, বল ? তখন থেকে চুপটি করে বসে আছি। ওদের ধারণা আমি ইংরেজী ভালো জানিনে। তোমার বুড়ী খানিকটে অঙ্গভঙ্গি করে গেল। আমিও অঙ্গভঙ্গি করে তার জবাব দিলুম।" এই বলে হাসতে চেষ্টা করল।

"আচ্ছা, তা হলে আমি চা তৈরি করে আনি।"

"তুমি তৈরি করবে চা ! থাক, থাক, তোমার হাত পুড়িয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে চল কোনো রেস্টুরাণ্টে যাই।"

উজ্জয়িনীর লটবহর সেই ঘরেই ছিল। সুধী লক্ষ করে বলল, "হুঁ"।" তার মুখ শুকিয়ে গেল চিন্তায়।

তা অনুমান করে উজ্জয়িনী বলল, "কী করি, বল। মা থাকলে তাঁর কাছেই যেতুম। তোমার এখানে কোনো ঘর খালি নেই ?"

"আমি যতদূর জানি, খালি নেই। খালি থাকলেও তোকে এ বাসায় থাকতে বলতুম না।"

সুধী মিউজিয়াম থেকে বাসায় ফিরে নিজের হাতে দুধ গরম করে খায়। তার সঙ্গে ফল ও রুটি। এই তার রাতের খাবার। এর পরে সে কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসে। এবং স্নান করে ঘুমাতে যায়।

সেদিন উজ্জয়িনীকে তার খোরাকের ভাগ দিয়ে তার পরে ট্যাক্সি ডেকে তার জিনিস সমেত পাড়ার একটি হোটেলে চলল। রেসিডেনসিয়াল হোটেল। সুধীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওখানকার এক পার্শী দম্পতির। তাঁরা বহুদিন থেকে সেখানে বসবাস করছেন।

ঝাবওয়ালা বললেন, "ঘর খালি আছে বৈকি। আপনারা বসুন, আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি।"

উজ্জয়িনী কূল পেল। মিসেস ঝাবওয়ালা তার মায়ের বয়সী। তিনি বললেন, "শুনে

দুঃখিত হলুম যে তোমার মা লণ্ডনে নেই। তিনি যতদিন না ফিরছেন তুমি এইখানেই থেকো, আর মা'কে লিখো সকাল সকাল ফিরতে।"

সুধী বলল, "কেমন, ঘর পছন্দ হয়েছে?"

"মন্দ নয়। তোমার বাসায় হলে আরো পছন্দ হতো। তবু ভালো যে দূর বেশি নয়। আধ মাইল। না?"

"হুঁ।" সুধীর তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

"সুধীদা", উজ্জয়িনী আবদার ধরল, তুমিও এখানে উঠে এস।"

"আমি?" সুধী থতমত খেয়ে বলল, "কেন, আমার আসার কী দরকার? এই তো ঝাবওয়ালারা রয়েছেন। তা ছাড়া আমি বোধ হয় শীগগিরই লণ্ডনের বাইরে একটি গ্রামে যাচ্ছি। অনর্থক বাসা বদল করে কী হবে?"

"গ্রামে যাচ্ছ?" উজ্জয়িনী উল্লসিত হয়ে বলল, "আমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে?"

সুধী সহসা গম্ভীর হলো। উত্তর দিল না।

"তুমি বোধ হয় ভাবছ", উজ্জয়িনী উপযাচিকা হয়ে কথাটা পাড়ল, "আমেরিকায় না গিয়ে আমি লণ্ডনে ফিরলুম কেন, ফিরলুম যদি তবে আবার গ্রামে যেতে চাইছি কেন?"

সুধী শুধাল, "ললিতাদি কোথায়?"

"তিনি কাল আমেরিকা রওনা হয়েছেন।"

"একলাটি গেলেন?"

"তোমার ভয় নেই। জাহাজে আরো অনেক ভারতীয় আছেন। এমন কি, একজন চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল—আমার নয়, তাঁর চেনা। মাদ্রাজী।"

সুধী উজ্জয়িনীকে জিজ্ঞাসা করল না কেন ফিরে এল সে। ধরে নিল সে অনুতপ্ত হয়ে স্বামার ভার নিতে ফিরেছে। অভিমানিনী হয়তো ও কথা মুখ ফুটে কবুল করবে না, অন্য কৈফিয়ৎ দেবে।

"আজ তা হলে উঠি। এখন তোর বিশ্রাম দরকার। কিন্তু শোবার আগে সাপার খেতে ভুলিসনে।"

"ও কী! এরি মধ্যে উঠলে? বস, তোমার সঙ্গে কতকাল দেখা হয়নি।"

"কাল সন্ধ্যাবেলা আসব। আজ তুই বিশ্রাম কর।"

"কা—ল স—ন্ধ্যা বে—লা। আমি যদি কাল সকালবেলা তোমার ওখানে বেড়াতে আসি তোমার কাজের ক্ষতি হবে?"

"সকালে সময় কখন? প্রাতর্ভ্রমণের পর স্নানাহার করতে করতে মিউজিয়ামের বেলা হয়ে যায়।"

"যদি একসঙ্গে মিউজিয়ামে যাই ?"

"বেশ তো। তোর যদি অসুবিধা না হয় আমার আপত্তি নেই।"

সুধী উঠল। তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে উজ্জয়িনী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আমার উপর রাগ করেছ ?"

"কিসে বুঝলি ?"

"তোমার কথাগুলি তেমন মিষ্টি নয়, একটু ঝাঁঝালো। তা ছাড়া তুমি চিঠি লেখোনি এই সাত আট দিন।"

উজ্জয়িনীর প্রত্যাবর্তনে সুধীর মনটা নির্মল হয়েছিল। আহা! বেচারির উপর রাগ করা উচিত হয়নি। সে যা লিখেছিল তা ঝোঁকের মাথায় লিখেছিল। কী করবে, মরীয়া হয়ে উঠেছে বাদলের ব্যবহারে। তাই অমন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে যে আমেরিকা যাত্রার প্রলোভন সংবরণ করেছে এ বড় সামান্য ত্যাগ নয়। তার জন্যে কতটুকু ত্যাগ করেছে বাদল ?

সুধী সেই ত্যাগশীলার প্রতি সম্ভ্রমে নতশির হলো। বলল, "রাগ করেছিলুম। কিন্তু এখন রাগ নেই।"

উজ্জয়িনী ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরাল। সেই অবস্থায় হেসে বলল, "ওহ্! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আচ্ছা, যাও। কাল একসঙ্গে মিউজিয়ামে যাব।"

তারপর পিছু ডেকে বলল, "রাগ এখনো আছে, তা তোমার চলন দেখে বুঝেছি। কিন্তু আমি কেয়ার করিনে। বুঝলে ?"

এই বলে সে চোখ মুছল ও চকিতে অদৃশ্য হলো।

জুলাই মাসের রাত। তখনো সূর্যের আলো রয়েছে। সুধী সোজা বাসায় না গিয়ে কেনসিংটন উদ্যানে কিছুকাল বায়ুসেবন করল।

এ এক নূতন সমস্যা। লণ্ডনে উজ্জয়িনীর মা নেই। বাদলও কোথায় ঘোরে, কোথায় খায়, কোথায় শোয় ঠিক নেই। উজ্জয়িনীর নিঃসঙ্গ জীবন সহনীয় হবে কী করে ? কার সঙ্গে ? স্বামীর ভার নিতে বলা কাগজে কলমে বেশ শোনায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ওর অর্থ কী ? ও মেয়ে কি বাদলের অনুসরণে পথে পথে বিচরণ করবে, নদীর বাঁধে মাথা রাখবে ?

সুধী নিজের উপর রাগ করল। কেন লিখেছিল স্বামীর ভার নিতে! এখন যদি সে বলে, "স্বামীর ভার নিতে চাই, কিন্তু কোথায় স্বামী ? কে দিচ্ছে তাঁর ভার ?" তখন কী উত্তর দেবে সুধী ? কে নেবে সে মেয়ের দায়িত্ব ? ললিতা রায় তো আমেরিকা চললেন, মিসেস গুপ্ত গেলেন সুইট্জারলণ্ড। আর একটিও আত্মীয়া নেই, অভিভাবিকা নেই লণ্ডনে। এক যদি মিসেস ঝাবওয়ালা একটু দেখাশোনা করেন। কিন্তু তাঁকে সে মানবে কি না সন্দেহ।

উজ্জয়িনীর যেমন জ্বর ছাড়ল সুধীর তেমনি জ্বর এলো। কী ভয়ঙ্কর দায়িত্ব যে তার ঘাড়ে এসে পড়ল! কী কুক্ষণে সে মুরুব্বিগিরি ফলিয়ে লিখেছিল স্বামীর ভার নিতে! উজ্জয়িনীর যদি ভালোমন্দ কিছু হয় তবে জবাবদিহি করতে হবে তাকেই, কারণ সে-ই তো উজ্জয়িনীর আমেরিকা যাত্রায় বাধা দিয়েছে ওকথা লিখে। এখন কে কার ভার নিচ্ছে!

সুধীর সে রাত্রে ভালো ঘুম হলো না। সে স্থির করল, মিসেস গুপ্তকে তার করবে। তিনি যদি রাজি হন তবে উজ্জয়িনীকে সুইটজারলণ্ডে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তিনি যদি সাড়া না দেন? কিংবা রাজি না হন?

৩

সুধী যা আশঙ্কা করেছিল তাই হলো। মিসেস গুপ্ত সুধীর টেলিগ্রামের উত্তরে টেলিগ্রাম করলেন, "ওকে ওর স্বামীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও।"

এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কঠিন নয়, কারণ বাদল মাঝে মাঝে সুধীর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তখন তার স্ত্রীকে তার হাতে গছিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাদলও ওকে সাথে নেবে না, উজ্জয়িনীও বাদলের সাথী হবে না। যদি হয় তবে ভিখারী ও ভিখারিণী মিলে নদীর বাঁধে সংসার পাতবে। সে এক দৃশ্য!

অগত্যা সুধী আণ্ট এলেনরের শরণাপন্ন হলো। তিনি শুনে বললেন, "তুমি তো জানো, এই সময়টা লণ্ডনে থাকিনে, কারাভানে চড়ে বেরিয়ে পড়ি। জিনীকে আমার ভালো লাগে, দলে টানতে ইচ্ছাও করে, কিন্তু নাবালিকার যিনি অভিভাবক বা অভিভাবিকা তাঁর অনুমতি চাই। তা ছাড়া জিনীর নিজের আগ্রহ আছে তো?"

সুধী উজ্জয়িনীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "তুমি যদি যাও তো আমিও যাই। একা ওদের সঙ্গে বনিবনা হবে না।"

তখন সুধী ব্রিজার্ডদের বাড়ী গেল। বৃদ্ধ বললেন, "জিনী যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে আসে তো আমরা বিশেষ আনন্দিত হই। কিন্তু জানো তো? তোমার যেখানে নিমন্ত্রণ আমাদেরও সেইখানে। জিনী কি গ্রামে যেতে রাজি হবে?"

জিনীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "তুমি যদি যাও তো আমিও যাই। নতুবা—"

সুধী ভেবে দেখল যে এ ছাড়া অন্য কোনো কার্যকর উপায় নেই। হোটেলের চেয়ে ব্রিজার্ডদের বাড়ী নিরাপদ। বাদলকে যদি অভিভাবক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে সে অতি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দেবে। এখন কথা হচ্ছে, জিনী স্বয়ং সম্মত কি না?

"আমাকে কোথায় গিয়ে থাকতে বলছ, সুধীদা? ব্রিজার্ডদের বাড়ী? কিন্তু সে যে বহুদূর।" উজ্জয়িনী বলল।

"বহু দূর ? কোলখান থেকে বহু দূর ?"

"তোমার বাসা থেকে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে তোর এমন কী কাজ ?" সুধীর স্বরে বিস্ময়।

উজ্জয়িনী কী বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁট কাঁপল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, "এই বিদেশে আমার আর কে আছে যে তার সঙ্গে দুটো কথা কইব ! ব্রিজার্ডরা চমৎকার লোক, আমি সত্যি ভালোবাসি ওঁদের বাড়ী যেতে। কিন্তু দিনের পর দিন ওঁদের ওখানে থাকলে কি আমি হাঁপিয়ে উঠব না, যদি না তোমার সঙ্গে দিনান্তে একবারটি দেখা হয়, ভাই সুধীদা ?"

সুধী মনে মনে স্বীকার করল যে দিনান্তে একবার দেখা হওয়ার পক্ষে আর্লস কোর্ট থেকে স্ট্রেথাম বহুদূর বটে। সুধীর অত সময় নেই। সে সপ্তাহে একবার দেখা করতে পারে, তার বেশী পারে না।

"কিন্তু হোটেল যে তোর মতো বালিকার পক্ষে নিরাপদ নয়। তুই ওখানে থাকলে যে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনে।"

এর উত্তর উজ্জয়িনীর জিবের ডগায় ছিল। "বেশ তো। হোটেলে থাকতে বলেছে কে ? আমি কি বলেছি যে আমি হোটেলে থাকব ? আমি চাই তোমার বাসায় একখানা ঘর। দু'খানা হলে একখানায় শুই, একখানায় বসি ও লেখাপড়া করি।"

সুধী বলল, "আমার বাসায় ঘর নেই। থাকলেও তোর অসুবিধা হতো। বুড়ীরা তোকে জ্বালাতন করত সময়ে অসময়ে মাখামাখি করে।"

"তা হলে," উজ্জয়িনী বলল, "তুমিও কেন ব্রিজার্ডদের ওখানে চল না ? আশা করি বুড়ীরা তোমাকে যাদু করেনি।"

"ব্রিজার্ডদের বাড়ী যে মিউজিয়াম থেকে অনেকটা দূরে। তা ছাড়া অমন অনুরোধ করলে ওঁদের ভদ্রতার সুযোগ নেওয়া হয়।"

"তা হলে," উজ্জয়িনী প্রস্তাব করল, "অন্য কোনো বাসা দেখ, যেখানে তোমার ও আমার দু'জনের জায়গা হবে, যেখানকার ল্যাণ্ডলেডীরা মাখামাখি করবে না।"

সুধীর নিঃশ্বাস পড়ল না। বলে কী এ মেয়ে ! সুধী ও উজ্জয়িনী অভিভাবকহীন ভাবে এক বাড়ীতে থাকলে কী মনে করবে সকলে !

সুধীকে নীরব দেখে উজ্জয়িনীই বলল, "চেষ্টা করিলে কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর ? তোমার যদি সময় না থাকে আমার সময় আছে, আমি কাল থেকে বাসার খোঁজ করব।"

"না।" সুধী শুধু বলল।

"না ? কেন, জানতে পারি ?"

"বালিকা হলেও তোর যথেষ্ট বুদ্ধি হয়েছে। তোর বোঝা উচিত, দেশটা যদিও বিলেত, তবু মাথার উপরে সমাজ রয়েছে, লোকনিন্দা আছে। তোর শ্বশুর যখন শুনবেন তখন কী মনে করবেন ?"

"সত্যি আমি বুঝতে পারছিনে, ভাই," উজ্জয়িনী আশ্চর্যান্বিত হলো, "কেন কেউ নিন্দা করবে। আমার শ্বশুর কাকে বলছ তুমি, আর তাঁর মনে করা না করায় কী আসে যায় !"

"তুই যেভাবে মানুষ হয়েছিস, তোর পক্ষে কোন কাজের কী পরিণাম তা উপলব্ধি করা শক্ত। কিন্তু আমি তো বুঝি। আমার কর্তব্য তোকে বোঝানো।" এই বলে সুধী বিশদ করল, "সমাজের চোখে তুই বিবাহিতা মেয়ে, আমি তোর নিঃসম্পর্কীয় আলাপী। আমার যা কিছু অধিকার তা তোর স্বামীর অধিকারের অংশ। সেই অধিকার যদি তুই অস্বীকার করিস তবে আমার অধিকারও অন্তর্হিত হয়। তেমন অবস্থায় একত্র থাকা অনধিকারচর্চা। আর যদি তোর স্বামীর অধিকার তুই স্বীকার করিস তা হলে তোর শ্বশুরের অধিকারও স্বীকার করতে হয়। তিনি কিছুতেই আমাদের একত্র থাকা অনুমোদন করবেন না। যে দিক থেকেই দেখিস না কেন তোর প্রস্তাবটা অপরিণামদর্শী।"

উজ্জয়িনী চিন্তা করল।

"তা ছাড়া", সুধী বলল, "অপবাদও বিবেচনার বিষয়। এখানকার ভারতীয় সমাজটি ক্ষুদ্র নয়। আমাদের দেশবাসীরা যখন শুনবেন যে আমরা এক বাসায় বাস করি তখন কি অত তলিয়ে দেখবেন ? যা মনে করা অনুচিত তাই মনে করবেন কি না, তুই নিজে বল।"

উজ্জয়িনী জ্বলে উঠল। "কলঙ্ক কি আমার নামে এই প্রথম রটবে, যদি রটে ! কে না জানে আমার পূর্ব ইতিহাস ! তবে, হ্যাঁ, তোমার যদি কলঙ্ক রটে তবে সেটা হবে অন্যায়, অশিষ্ট ও অসহনীয়। তোমার শুভ্র নামে কালিমা লাগলে আমি আত্মহত্যা করব, সুধীদা।"

সুধী মুগ্ধ হলো। তার পরে ধীরে ধীরে বলল, "তবে তুই কাল ব্লিজার্ডদের ওখানে যাচ্ছিস। কেমন ?"

"অত দূর আমি যাব না," উজ্জয়িনীর কণ্ঠে রোদনের আভাস। "দূরে যাব বলে আমেরিকা গেলুম না, সুইট্জারলণ্ড যাচ্ছিনে। স্ট্রেথাম যাব !"

সুধী এমন সঙ্কটে পড়েনি। কী উপায়, ভেবে পাচ্ছিল না।

"আমি যাব না।" উজ্জয়িনী তার শেষ কথা শুনিয়ে দিল। তখনকার মতো ও-প্রসঙ্গ স্থগিত রইল।

এর পরে যখন বাদলের সঙ্গে দেখা হলো, সেই দেশলাই বিক্রেতাকে সুধী বলল,

"ওহে ম্যাচ মেকার, যার সঙ্গে তোমার ম্যাচ হয়েছে তিনি হঠাৎ লণ্ডনে ফিরেছেন, তাঁর আমেরিকা যাওয়া হলো না।"

"কার কথা বলছ, সুধীদা ?"

"উজ্জয়িনীর কথা। ওর জন্যে কী করা যায়, বলতে পারিস ?"

সমস্ত শুনে বাদল বলল, "তুমিও যেমন! এক সঙ্গে বাসা করলে দোষ কী ? বাস করলেই বা দোষ কী ?"

সুধী হতভম্ব হলো স্বামীর উক্তি শুনে।

"নদীর বাঁধে," বাদল বর্ণনা করল, "কত রকম লোক কাছাকাছি শোয়, খবর রাখ ? তাদের সবাই কিন্তু স্বামী স্ত্রী নয়।"

সুধী বলল, "তারা যে সর্বহারা। তারা তো সামাজিক মানুষ নয়।"

"সমাজ!" বাদল ফুৎকার করল। "সমাজ একটা বুজরুকি।"

"ও কথা শোভা পায় কেবল তোর মতো অবধূতের মুখে।"

"তা হলে তোমার শৌখীন সমস্যা নিয়ে তুমি বিভোর থাক। বুর্জোয়া ভাবুকদের ও ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা নেই। ড্রইং রুম ট্র্যাজেডী, ড্রইং রুম কমেডী—বুর্জোয়াদের ঐ পর্যন্ত দৌড়।"

সুধী বাদলের কাছে বক্তৃতা শুনতে চায়নি। চেয়েছিল পরামর্শ। এবং প্রকারান্তরে অনুমতি। বাদলের সঙ্গে তার অন্যান্য কথা ছিল। বলল, "বুর্জোয়াদের ভাবনা বুর্জোয়াদের ভাবতে দে।"

"আচ্ছা, এক কাজ কর, সুধীদা। ফ্ল্যাট নাও আমার নামে। আর সেই ফ্ল্যাটে তোমরা দু'জনে থাক।" বাদল বলল অকপটে।

৪

সুধী বাদলের শাশুড়ীকে চিঠি লিখল যে বাদল বেদুইনের মতো ঘুরে বেড়ায়, তার রাতের ঠিকানা নদীর বাঁধ। উজ্জয়িনীকে ওর জিম্মা দেওয়া যায় না। ওকে আপনি স্বয়ং এসে সুইট্জারলণ্ডে নিয়ে যান।

তাঁর উত্তর এল কার্লসবাড থেকে। তিনি সুইটজারলণ্ড থেকে চেকোস্লোভাকিয়ায় চলে গেছেন, লিখেছেন, এখানে আমি চিকিৎসাধীন আছি। উৎস জলে স্নান করছি। আমি তো ওকে আনতে যেতে পারিনে। তুমি যদি ওকে এখানে রেখে যেতে পার আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

উজ্জয়িনীকে চিঠিখানা পড়তে দিয়ে সুধী বলল, "চল, তোকে কার্লসবাডে দিয়ে আসি।"

সে বলল, "না। তা হবে না।"

"কী হবে না?"

"তুমি যদি কথা দাও যে তুমিও কার্লসবাডে থাকবে তবেই আমি যাব। নয়ত যাব না।"

"বাঃ।" সুধী বলল, "তুই চেয়েছিলি বিদেশে দুটো কথা কইবার মানুষ। তোর মা কি সেই মানুষ নন?"

"হাসালে। মা'র সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ তা কি তুমি জানো না? জন্মের পর থেকেই তিনি আমাকে পর ভেবে এসেছেন। আমার বন্ধু আমার বাবা, আর শত্রু আমার মা।"

সুধী কিছু কিছু জানত। তবে উজ্জয়িনীর ওটা অতিরঞ্জিত অভিযোগ।

"তবে আমি তাঁকে কী লিখব? তোর কার্লসবাড না যাবার কারণটা তবে কী?"

"লিখো, তোমার হাতে সময় নেই এখন। মাস তিন চার পরে যখন দেশে ফিরবে, তখন আমাকে কার্লসবাড নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে দেশে।" বলতে বলতে উজ্জয়িনী রঙীন হয়ে উঠল।

সুধী বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার হাতে সময় আছে কি না তুই কী করে জানলি? তুই কি আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা লেখাবি? ছি!"

"তবে তুমি যুধিষ্ঠিরের মতো সত্য কথাই লিখো। আমি কেয়ার করিনে মা'কে। বিয়ের পর মা'র সঙ্গে মেয়ের কী সম্পর্ক!"

প্রত্যাবর্তনের পর উজ্জয়িনীর চেহারা যা হয়েছে তা দেখবার মতো। সুধী অবাক হয়ে ভাবে, এই কি সেই লক্ষ্মী মেয়েটি? এ মেয়ে যেমন স্বাধীন, তেমনি সপ্রতিভ, তেমনি দুরন্ত। তা সত্ত্বেও আছে এর কোনোখানে একটি অনির্দেশ্য মহিমা। উজ্জয়িনী নিজেকে সুলভ করে না, সে ইন্দ্রাণী।

"এবার আমি পাহাড়ে উঠেছি, হ্রদে সাঁতার কেটেছি, বাচ খেলেছি," উজ্জয়িনী তার ভ্রমণকাহিনী বলে। "এবার আমি মাছ ধরেছি, ছবি এঁকেছি। স্কাই দ্বীপে প্রায় সত্তর জাতের বুনো ফুল তুলেছি। এবার আমি বাঁচতে শিখেছি, সুধীদা।"

রোজ সকালবেলা ঠিক সাড়ে আটটায় সুধীর ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। সুধী জিজ্ঞাসা করে, "কে?"

"আমি উজ্জয়িনী।" এই বলে সে ঠেলে প্রবেশ করে, অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। "এখনো তোমার ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি? হায়, সুধীদা!"

সে বসে বসে সুধীকে খাওয়ায়। বলে, "তুমি মধু ভালোবাসো। না? সেইজন্যে তোমার ব্যবহার অত মধুর। আর আমি কী ভালোবাসি, শুনবে? গরম গরম সসেজ। সেই জন্যে আমি এমন বেপরোয়া।"

সুধীর ল্যাণ্ডলেডীদের তো সে পোকামাকড়ের মতো হেনস্তা করে। বলে, "আমি ইংরেজী ভালো বুঝিনে।" অঙ্গভঙ্গী করে ওদের ভাগায়।

মিউজিয়ামে যেই একটা বাজে, উজ্জয়িনী এসে সুধীর ধ্যানভঙ্গ করে। "আমার ক্ষিদে পেয়েছে, তোমার পায়নি ? চল, খেয়ে আসি!"

আগে আধ ঘণ্টায় সুধীর লাঞ্চ সারা হতো। ইদানীং উজ্জয়িনীর খাতিরে তার এক ঘণ্টা খরচ হয়। উজ্জয়িনী তাকে জোর করে খাওয়ায়। বলে, "যারা চায়ের সময় খায় না, তাদের লাঞ্চ একটু ভারী হওয়া উচিত। তোমার ঐ হরলিকসের কর্ম নয়। পুডিং তোমায় খেতেই হবে। দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটা নিরামিষ পুডিং নির্বাচন করি।"

হোটেলেই উজ্জয়িনীর স্থিতি হলো। সুধী অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। তবে তার আশা আছে, গ্রাম থেকে ফিরলে একটা উপায় মিলবে।

মার্সেলকে দেখতে সুধী রবিবারে যায়। উজ্জয়িনীও। মার্সেলের সঙ্গে তার বনে বেশ। আগেকার দিনে সুধী সাজত মার্সেলের ঘোড়া। সম্প্রতি উজ্জয়িনী সে ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছে।

"তোমার সুজেৎটি কিন্তু মিটমিটে শয়তান।" সুধীকে বলে।

"কেন, বল তো ?"

"তুমি টের পাও না, ও তোমার দিকে চুরি করে তাকায়।"

"তাতে কী ?"

"তাতে কী!" উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়। "ও কেন তোমার দিকে চুরি করে অত বার তাকাবে! ওর কি অধিকার আছে পরপুরুষকে লুকিয়ে দেখবার! ওর কি নিজের 'বয়' নেই ?"

সুধী জানত সুজেতের একটি 'বয়' আছে। ওটা একটা প্রথা, সমাজের অনুমোদিত।

"যাক, তুই সুজেতের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিসনে। ওর মনটি বড় কোমল। কেঁদে মূর্ছা যাবে।"

উজ্জয়িনী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "তোমার বান্ধবীর সঙ্গে আমি রূঢ় ব্যবহার কবে করেছি, সুধীদা ? মিটমিটে শয়তান বলেছি, তাও ওর অসাক্ষাতে। ভুল করেছি, লজ্জাবতী লতা বললে ঠিক হতো।"

"ঠিক তাই। সুজেৎ বড় লাজুক মেয়ে। বড় মুখচোরা।"

"তুমি যেমন ভাবে বলছ," উজ্জয়িনীর কণ্ঠস্বরে শ্লেষ, "তুমি ওকে ভালোবাসো।"

"ভালোবাসি বৈকি। সেইজন্যেই তো তোকে বলি, ওকে ভুল বুঝিসনে।"

"ওমা, কতজনের সঙ্গে তোমার প্রেম, সুধীদা। আমি তো জানতুম অশোকাই একমাত্র।"

সুধী গম্ভীর হলো। কিছু বলল না। উজ্জয়িনীও তার গাম্ভীর্য লক্ষ করে নীরব হলো।

একদিন ব্লিজার্ডের ওখানে বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গ উঠলে উজ্জয়িনী বলল, "দূর! সেদিন যে ঘটা করে বিদায় নিয়ে আমেরিকা রওনা হলুম, স্মৃতি উপহার নিলুম। ফিরে এসেছি দেখে ওঁরা কি টিপে টিপে হাসবেন না? আমার মাথা কাটা যাবে যে।"

"তা বটে।"

"এখন বুঝলে তো, কেন ওঁদের বাড়ী থাকতে রাজি হইনি?"

"বুঝেছি!" সুধী হাসল। "মেয়েদের মন দার্শনিকেরও দুর্বোধ্য। কিন্তু গ্রামে যদি যাস, ওঁদের সঙ্গে দেখা হবেই, কেননা, শান্তিবাদীদের বৈঠকে ওঁরাও উপস্থিত থাকবেন।"

"ওহ্। শান্তিবাদীদের বৈঠক বুঝি! তাই বল।" উজ্জয়িনী গালে হাত রেখে বুড়ীর মতো বললো, "সত্যি কি শান্তি হবে জগতে?"

"জগদীশ জানেন। খুব সম্ভব হবে না, তবু যাঁরা তাঁর রুদ্র রূপ অবলোকন করেছে, তারা তাঁর শান্ত রূপ ধ্যান করবে।"

"আমি ভাবছি, তোমাদের বৈঠকে আমাকে মানাবে কী করে? আমি যে ধ্বংস-বাদী।"

সুধীর মনে পড়ল উজ্জয়িনীর রিভলবার।

"তোর কি এখনো ঐ বিশ্বাস আছে?" সুধী সুধাল।

"নিশ্চয়। আমি কি একদিনও সুখী হয়েছি, না হতে পারি? যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি ততক্ষণ ভুলে থাকি, আবার যখন একা বোধ করি তখন রুখে উঠি।"

"কিন্তু আমার ধারণা ছিল," সুধী সস্নেহে বলল, "তোর ও রোগ সেরে গেছে।"

"আমারও ধারণা ছিল," উজ্জয়িনী সুমিষ্ট স্বরে বলল, "যাতে ও রোগ সেরেছিল তা সত্য। কিন্তু তুমিই বল, তা কি সত্য।"

"বুঝতে পারছিনে," সুধী মাথা নাড়ল, "তোর মনে কী আছে?"

"বলতে পারব না," উজ্জয়িনী রঙ্গ করে মাথা নাড়ল, "আমার মনে কী আছে। তুমি তো মনস্তত্ত্ব জানো। তুমি বুঝে নিয়ো।"

সুধী ভাবতে বসল। উজ্জয়িনী উঠে বলল, "যাই, আমার লজ্জা করছে। আমি তো তোমার সুজেতের মতো লজ্জাশীলা নই, তবে কেন আমার পালাতে ইচ্ছা করছে?"

সুধীর চোখের সুমুখ থেকে হঠাৎ একটা পর্দা সরে গেল। তার স্মরণ হলো উজ্জয়িনীর আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে সে তার বিচিত্র স্বপ্নের বিবরণ বলেছিল।

এক বছর আগে অশোকার সঙ্গে প্রথম আলাপের রাত্রে সুধী স্বপ্ন দেখেছিল—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, মাথার চুল কটা হয়ে জটায় পরিণত হতে চলেছে, উজ্জয়িনী কৌতূহলী জনতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আপন মনে গান করছে। তার মুখে হাসি, চোখে জল। জনতাকে দুই হাতে ঠেলে সুধী এগিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "উজ্জয়িনী, তুমি আমাকে তোমার বৈরাগ্য দান কর।" উজ্জয়িনী সুধীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মৌন থাকল। তারপরে বলল, "সুধীদা, তোমার সম্ভবপর পত্নীকে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই।" সুধী বলল, "বৈরাগ্য বহনের যোগ্যতা একমাত্র আমারি আছে, কারণ এই দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীর আমার মতো অনুরাগী আর নেই। উজ্জয়িনী, তোমার বৈরাগ্য আমাকে দান কর।" উজ্জয়িনী জানতে চাইল, "বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?" সুধী বলল, "আমি দেব তোমাকে কল্যাণী হবার দীক্ষা।" উজ্জয়িনী সুধীকে তার বৈরাগ্য দান করল। সুধীর কণ্ঠে এলো গান, হাতে এলো একতারা, গাত্রে এলো বহির্বাস।

এই স্বপ্নের বিবরণ শুনে উজ্জয়িনী যে কী ভেবেছিল কে জানে? বলেছিল, "আবার যদি আমাদের দেখা হয়, যদি বেঁচে থাকি, তবে যে যা ভাবে ভাবুক, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।"

সেদিন সুধী তাকে পাগল মনে করেছিল, কিন্তু সে সুধীকে শুনিয়ে দিয়েছিল, "পাগলী বলেই অমন কথা বলতে পারছি, অমন কাজ করতেও পারব। যাকে ভয় করি, ভক্তি করি, মনে মনে পূজা করি, সে যদি বিমুখ না হয়, তবে আমি সুখী না হই, সার্থক হব।"

সুধী বুঝতে পারল, উজ্জয়িনীর আচরণের মূলে রয়েছে সেই স্বপ্ন। স্বপ্নটাকে সে যে ভাবে নিয়েছে, সে ভাবে নেওয়া ভুল। স্বপ্নের উজ্জয়িনীর সঙ্গে স্বপ্নের সুধী প্রেম বিনিময় করেনি, বৈরাগ্য বিনিময় করেছে। অনুরাগ ও বৈরাগ্য এক বস্তু নয়। কিন্তু উজ্জয়িনী সেইরূপ কিছু অনুমান করেছে।

"শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

"কী কথা, সুধীদা?"

"তোর প্রত্যাবর্তনের পর থেকে আমি কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিলুম, কোথায় কী যেন বেসুরো বাজছিল। কাল যখন তুই উঠে পালিয়ে গেলি আমার মনে খটকা বাধল। তখন আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে তুই আমার স্বপ্নের অর্থ ভুল বুঝে তোর

নিজের জীবনে অনর্থ ডেকে এনেছিস।"

"কে ভুল বুঝেছে, সুধীদা ? তুমি, না আমি ?"

সুধী তার দৃপ্ত ভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে বলল, "তুই—"

"ও স্বপ্নের ঐ একটি অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ নেই। তবে তুমি যদি পিছু হটতে চাও আমার অমত নেই।"

"আমার স্বপ্ন। আমি যেমন ব্যাখ্যা করি তেমন ব্যাখ্যাই সংগত।"

"স্বপ্নেই তোমার অধিকার, ব্যাখ্যায় নয়।"

"বাঃ। আমার স্বপ্ন। আমি বুঝিনে, তুই বুঝিস ?"

"তুমি স্বপ্ন দেখেছ বলে তার মানেও বুঝেছ, এ কী অদ্ভুত দাবী! না, সুধীদা, তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি ঠিকই বুঝেছি।"

সুধী হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "তবে তুই কী বুঝেছিস, বল।"

"বুঝেছি—থাক, আমার লজ্জা করে।"

"তবে আমি যা বলি শোন।"

"না, তাও শুনব না।"

সুধী উত্ত্যক্ত হয়ে বলল, "বেশ, আমার মনে আর অস্বস্তি নেই। আমি আমার স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করি তাই সত্য।"

"মিথ্যা।" উজ্জয়িনী অম্লানবদনে বলল।

সুধী আহারে মনোনিবেশ করল। উজ্জয়িনী সুধীর রুটিতে মধু মাখাতে মাখাতে আড়চোখে তাকাতে থাকল। দুষ্টু হাসি হাসতে থাকলও। সুধীর খাওয়া শেষ হলে তার কানে কানে বলল, "এই!"

সুধী বলল, "কী ?"

"মুখে মানুষ সত্যি কথা বলে না, স্বপ্নে বলে। স্বপ্নে যা বলেছ, জাগ্রতে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা কোরো না, করলে আমি মানব না। আমি বলব, তোমার সামাজিক মন খোঁচা দিচ্ছে, তাই অমন ব্যাখ্যা।"

সুধী মিনতি করে বলল, "লক্ষ্মীটি, আমার কথা আগে শোন। তারপরে তোর যা খুশি মনে কর।"

"এবার তোমার গলায় ঠিক সুরটি বাজছে, কিন্তু তোমায় বেশি বকতে দিতে ভরসা হয় না, তা হলে তোমার স্বরভঙ্গ হবে।" উজ্জয়িনী শর্তাধীন অনুমতি দিল।

তখন সুধী গুছিয়ে বলল যে স্বপ্নের সুধী স্বপ্নের উজ্জয়িনীর সঙ্গে যা বিনিময় করেছিল তা বৈরাগ্য বিনিময়, যদি কেউ ভাবে সেটা অনুরাগ বিনিময় তবে ভুল ভাবে।

উজ্জয়িনী তা শুনে হেসে ঢলে পড়ল। ভাগ্যে ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কিন্তু

কাঁচের জানালা তো খোলা।

"তোমার স্বপ্নের বিবরণ আমার স্পষ্ট মনে আছে, সুধীদা। স্বপ্নের সুধী বলেছিল, আমাকে তোমার বৈরাগ্য দান কর। ঠিক কি না?"

"ঠিক।"

"স্বপ্নের উজ্জয়িনী জিজ্ঞাসা করেছিল, বিনিময়ে তুমি আমায় কী দেবে?"

"ঠিক।"

"উত্তরে স্বপ্নের সুধী বলেছিল, তোমাকে দেব অনুরাগের দীক্ষা।"

"না, না, কল্যাণী হবার দীক্ষা।"

উজ্জয়িনী সুধীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল, "ওটুক্ তোমার বানানো। স্বপ্নের উপর হস্তক্ষেপ করা তোমার মতো সুধীজনের পক্ষে অশোভন।"

"সত্যি। কল্যাণী হবার দীক্ষা।"

"মিথ্যা। অনুরাগিণী হবার দীক্ষা।"

"তোর স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য নয়, তুই তো মাত্র একটিবার শুনেছিস?"

"আর তুমি? তুমি তো মাত্র একটিবার স্বপ্ন দেখেছ।"

এ তর্কের মীমাংসা নেই। সুধী ক্ষান্তি দিল।

পথে চলতে চলতে উজ্জয়িনী বলল, "আচ্ছা, তোমার অত মন খারাপ করার কারণ তো দেখিনি। আমি তো বলছিনে যে তুমিও অনুরাগের দীক্ষা নিয়েছ। তুমি বৈরাগী। আমি অনুরাগিণী। এই আমাদের স্বপ্নের চুক্তি।"

সুধী বলল, "তা নয়, তা নয়।"

"উত্তম। তা স্বপ্নের চুক্তি নয়। কিন্তু বাস্তবের চুক্তি। আপত্তি আছে?"

এর পরে সুধী অসহযোগ করল। কথা কইল না।

দিন দুই পরে আবার ওকথা উঠল। উজ্জয়িনী বলল, "নিজের উপর তোমার অধিকার খাটে, কিন্তু আমার উপর তোমার কিসের অধিকার?"

"কিছুমাত্র না।"

"তা যদি হয়, তবে আমি যাকে খুশি ভালোবাসব। তোমার তাতে কী?"

"ব্যক্তি হিসাবে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে নীতির দিক থেকে বিচার করবার আছে। তা ছাড়া বন্ধু হিসাবে তোকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"বন্ধু হিসাবে!" উজ্জয়িনী হাসল। "তুমি তো আমার বন্ধু নও। আর একজনের বন্ধু। তাঁর অধিকার আমি অস্বীকার করি, সুতরাং তোমার বন্ধুতাও।"

সুধী বেকায়দায় পড়ল, সহসা মুখের মতো জবাব খুঁজে পেলো না।

"আর সামাজিক মানুষের বিচারকার্যেরও স্থানকাল আছে। জগতের যত বিবাহিত মেয়ে স্বামী ব্যতীত অপরের অনুরাগিণী হয়েছে তুমি কি তাদের সকলের বিচারক নাকি ?"

"কিন্তু তা বলে যা আমার প্রত্যক্ষগোচর তার দোষগুণ বিচার করব না ?"

উজ্জয়িনী বলল, "করতে চাও কর। আমি তো জানি যে আমি যা করছি তা পাপ নয়—সত্যিকার ভালোবাসা কখনো পাপ হতে পারে না। আমি প্রতিদানও চাইনে, প্রত্যাখ্যানও গায়ে মাখিনে। এই নেশা যত দিন থাকবে, তত দিন আমি ছায়ার মতো অনুগতা হব, যেদিন ফুরোবে, সেদিন—আত্মহত্যা।"

৬

একদিন উজ্জয়িনীর সাক্ষাতে বাদলকে সুধী বলেছিল, "তোর সঙ্গে আমার বন্ধুতা যেমন নিবিড় উজ্জয়িনীর সঙ্গেও তেমনি। তোদের বিয়ে দেবার সময় আমার এই কল্পনা ছিল যে আমরা তিনটি বন্ধু একাত্ম হব। আমরা হব এক বৃন্তে তিনটি ফুল, তিনে এক, একে তিন। আমার সেই কল্পনা আজো সতেজ রয়েছে।"

উজ্জয়িনী সুধীকে স্মরণ করাল সেদিনকার সেই উক্তি। বলল, "কই, সেদিন তো তুমি আমাকে বাদলের স্ত্রী হিসাবে দেখনি ? স্বতন্ত্র বন্ধু হিসাবেই দেখেছ। আমরা তিনজনে এক বৃন্তে তিনটি ফুল। তিনে এক, একে তিন। কেমন, বলেছিলে কি না এ কথা ?"

"বলেছিলুম।"

"যখন বলেছিলে তখন অবশ্য এমন আভাস দাওনি যে বাদল যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত সেও তোমার সঙ্গে একাত্ম হতো। আমি যত দূর বুঝি, আমাকেই তুমি সেই সৌভাগ্য দিয়েছ, অন্য কোনো মেয়ে তোমার বন্ধুপত্নী হলে তাকে তা দিতে না। কেমন, দিতে ?"

"না।"

"তা হলে, নীতিবিদ্। তোমার মুখে কত রকম উল্টোপাল্টা কথা শুনতে হবে ! একদিন বলবে, আমি তোমার সঙ্গে একাত্ম। আর একদিন বললে, আমি তোমার কেউ নই, আমার স্বামী তোমার বন্ধু বলেই আমার সঙ্গে তোমার যা কিছু সম্পর্ক। আবার বলছ কিনা আমার বন্ধু হিসাবে তোমার কর্তব্য আমাকে সাবধান করে দেওয়া। কোন্‌টা সত্য ?"

সুধী উজ্জয়িনীর স্মরণশক্তির দাপটে নাজেহাল হয়ে বলল, "সব ক'টাই সত্য। বাদল এবং তুই দু'জনেই আমার প্রিয়, তোদের মতো প্রিয় আমার কেউ নেই, অশোকাও না,

মার্সেলও না। তোদের দু'জনের সঙ্গে আমি একাত্ম, তার সঙ্গেও, তোর সঙ্গেও। তুই তার স্ত্রী বলেও বটে, স্ত্রী না হলেও বটে। যে দিন তোর নাম প্রথম শুনি, সেদিন নাম শুনেই চিনতে পারি যে তুই আমাদের একজন।" বলতে বলতে সুধীর স্বর গভীর হলো।

উজ্জয়িনী নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। বলল, "তবে?"

"তবে কী? কেন তুই ভুলে যাচ্ছিস যে বাদলকে বাদ দিলে আমাদের ত্রয়ী ভেঙে যায়, আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি? বাদল না থাকলে আমাদের বৃন্তে তুইও থাকিসনে, আমিও থাকিনে। তিনজনেই বৃন্তচ্যুত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ি।"

উজ্জয়িনী বলল, "তা হলে স্বপ্নে কেন বাদল ছিল না?"

"পরোক্ষে ছিল! ঐ যে আমি তোকে কল্যাণী হবার দীক্ষা দিলুম তার মানে গৃহিণী হবার দীক্ষা! কার গৃহিণী? বৈরাগীর নয় নিশ্চয়ই। বাদলের।"

উজ্জয়িনী হেসে উঠল। "ও দিকে বাদলও যে বৈরাগী হয়ে উঠল। একবার দেখতে যেতে হচ্ছে নদীর বাঁধে। কিন্তু ঘরকন্না করতে নয়। আমি ওর গৃহিণী হতে নারাজ।"

ইতিমধ্যে সে বাদল সম্বন্ধে "তিনি" ছেড়ে "সে" বলতে অভ্যস্ত হয়েছিল। "বাদল-বাবু" কিংবা "মিস্টার" সেন ছেড়ে "বাদল" বলত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা তারা বাদলকে দেখতে নদীর বাঁধে যাবে স্থির হলো।

"তা বলে তুমি মনে কোরো না যে ওর বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ আছে। ওর যদি কোনো কমরেড থাকে তবে আমি একটুও দুঃখিত হব না, বরং প্রীত হব। এই কয়েক সপ্তাহে আমি আত্মস্থ হয়েছি, সুধীদা।"

"আত্মস্থ হওয়া ভালো," সুধী মন্তব্য করল, "কিন্তু পরের পদস্খলন প্রার্থনা করা ভালো নয়। ওটা নীচতা।"

উজ্জয়িনী যেন মার খেয়ে চমকে উঠল। ফ্যাকাশে মুখ দুই হাতে ঢেকে বলল, "আমি অমন প্রার্থনা করিনি কোনো দিন। কেন করব, যা হয়ে রয়েছে তাই যথেষ্ট নয় কি?"

"কিছুই হয়নি। মিথ্যা খবর।" সুধী প্রত্যয়ের সহিত বলল। "বাদলকে আমি চিনিনে? সে খাঁটি সোনা।"

"আমি বিশ্বাস করিনে।" উজ্জয়িনী উদাস কণ্ঠে বলল।

"আমি বিশ্বাস করি।"

"তোমার কথা হয়তো সত্য। কিন্তু কী আসে যায়? আমি তো ওকে দোষ দিচ্ছিনে। আমার প্রয়োজন ডিভোর্স, সে জন্যে যেটুকু প্রমাণ করা আবশ্যক, সেটুকুর বেশি জানতেও চাইনে।"

সুধী উষ্ণ হয়ে বলল, "কার প্রয়োজন ডিভোর্স ? তোর ? কেন ?"

"প্রয়োজন হলেও হতে পারে একদিন, এখন নয় ।"

"ডিভোর্স প্রয়োজন হয় তাদের, যারা পুনরায় বিবাহ করতে চায় । তোর কি তেমন ইচ্ছা আছে ?"

"কেন থাকবে না সুধীদা ? আপাতত নেই । কিন্তু জীবন দীর্ঘ ।"

"যদি দ্বিতীয় জনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয় তা হলে কি আবার ডিভোর্স ঘটবে ?"

"কে জানে ! অত চুল চেরা তর্ক করে ফল কী ! যা হবার তা হবে । আমি তো তোমার মতো জীবনশিল্পী নই যে জীবনটাকে ছাঁচে ঢালাই করব ।"

সুধী বলল, "ছাঁচে ঢালাই করা আমারও অভিপ্রায় নয় । কিন্তু আমার নিজের একটি ডিজাইন আছে । আমি চাই বাগানের মতো সাজানো জীবন । যাকে বলে ড্রিফ্‌ট্—স্রোতে গা ভাসানো—তা আমার নয় ।"

"আমি কিন্তু তাই পছন্দ করি । জীবন একটা স্রোতই বটে । আর স্রোতে গা ভাসানোর মতো আরামও নেই ।"

সুধীর সংস্কার বিদ্রোহী । কিন্তু উজ্জয়িনী কি সহজ মেয়ে !

"আমাকে মাফ কর, ভাই সুধীদা । আমি জানি তোমার মনে লাগে, কিন্তু কী করব ! আমি তোমার মানসী নারী নই । আমি মানবী । বাদলকে একদা আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি, কার্পণ্য করিনি । সে ভালোবাসা আজ নেই, এ কি আমার অপরাধ ! এখন যাকে ভালোবাসি তাকে কোনো দিন ভালোবাসতে চাইনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই আমার প্রিয় । এ কি আমার অপরাধ ! আমার এইটুকু জীবনে আমি অনেক আঘাত পেয়েছি, যাতে নতুন আঘাত না পেতে হয় সেইজন্যে আমি প্রতিদানের প্রত্যাশাও ছেড়েছি । আছে কেবল একটি দুর্বলতা—একটুখানি সঙ্গতৃষা । দেশে ফিরলে সঙ্গ পাব না জানি । সেইজন্যে এখনই যা পাই নিতে চাই । এ কি আমার অপরাধ !"

বাস্তবিক মেয়েটি অসামান্য দুঃখিনী । বাপ নেই, মা না থাকার শামিল । স্বামী পরিত্যাগ করেছে । কে আছে তার, কার কাছে দাঁড়াবে ! সুধী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "আমি তোর কীই বা করতে পারি ! তোর জীবন যদি হয় স্রোত, তবে আমি স্রোতের কুটো । আমাকে আঁকড়ে ধরে তুই নিজেও ডুববি, আমাকেও ডোবাবি । তোর কিছুমাত্র তৃপ্তি হবে না, অথচ আমার মুখ দেখানো দায় হবে ।"

উজ্জয়িনী বলল, "যা বলেছ সব সত্যি । আমিও ভাবি যে তোমার সুনাম নষ্ট হলে আমারি মনে কষ্ট হবে সব চেয়ে বেশি । আমরা যে একাত্ম ।"

সুধী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল । বাদল হলে বলত, বুর্জোয়া সমস্যা ; ড্রইং রুম ট্র্যাজেডী । মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে ওর বাস্তবতা নেই । ফিউডাল যুগের জের । কিন্তু সুধীর কাছে এটা

সত্যিকার ট্রাজেডী। কোনো যুগেই এর কোনো সমাধান নেই।

"আঙ্কল আর্থার ও আণ্ট এলেনরকে দেখেছিস। ভাই বোন। একজনের বিয়ে হলো না বলে অপর জন বিয়ে করেননি।"

"শুনেছি।"

"আমরাও তাঁদেরি মতো চিরজীবন কাটাব। তবে একসঙ্গে নয়।"

"কিন্তু একসঙ্গে না থাকতে পেলে ওঁরা কি ওভাবে জীবন কাটাতে পারতেন!"

"আমাদের সাধনা আরো কঠিন, উজ্জয়িনী।"

উজ্জয়িনী চিন্তা করে বলল, "চিরজীবনের বিলি ব্যবস্থা এখন থেকে না করাই ভালো। আপাতত যে ক'মাস পারি এক সঙ্গে থাকব। তার পরে যা হবার তা হবে। দেশে ফিরে গিয়ে যদি দেখি যে আন্দোলন হচ্ছে, তবে ঝাঁপিয়ে পড়ব। হয়তো জেল, হয়তো মৃত্যু। যদি বেঁচে থাকি, যদি জেল থেকে মুক্তি পাই, তখন হয়তো দেখব যে দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে, তোমার সঙ্গে আমার থাকা দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছে না"।

"পাগলী!" সুধী করুণ হাসল।

"পাগলরাই সমাজকে ঘা দিয়ে সিধে করে, কাজেই পাগল বলে অনুকম্পা কোরো না। একদিন তোমার সমাজ আমাকে মেনে নেবেই নেবে।"

৭

উজ্জয়িনীর প্রত্যাবর্তনের খবর ঢাকা রইল না, তার পরিচিত পরিচিতাদের কানে উঠল। বুলুর দল ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের বন্ধে লণ্ডনের বাইরে ছিটকে পড়েছিল। অর্থাভাবে দে সরকার ছিল লণ্ডনে ম্রিয়মাণ ভাবে। খবরটা শুনে তার ধড়ে প্রাণ এলো।

কিন্তু সে সুধীকে বেশ একটু ভয় করত। সুধীর কাছে ধরা পড়ার সাহস তার ছিল না। সে সন্ধান নিয়ে দেখল যে সুধী সারাদিন পাহারা দেয়, সন্ধ্যাবেলাও সুধী আসে উজ্জয়িনীর হোটেলে। সুধীকে এড়িয়ে উজ্জয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে, হয় সকাল আটটার আগে, নয় সন্ধ্যা সাড়ে আটটার পরে হোটেলে হাজির হতে হয়।

দে সরকার একদিন সন্ধ্যাবেলা উজ্জয়িনীর হোটেলের রাস্তায় গা ঢাকা দিল। যখন দেখল সুধী চলে যাচ্ছে, তখন হোটেলে ঢুকে কার্ড পাঠাল উজ্জয়িনীর উদ্দেশে।

"ওহ্! আপনি! মিস্টার দে সরকার! আসুন, আসুন।" উজ্জয়িনী হাসি মুখে অভ্যর্থনা করল। "আপনার কি বিশেষ আপত্তি আছে আমার সঙ্গে সাপার খেতে?"

দে সরকারের বিশেষ আপত্তি কেন, আদৌ আপত্তি ছিল না। তবু লোক-দেখানো "থাক, আমি কেন, আমার কি এত সৌভাগ্য" ইত্যাদি উক্তি উচ্চারিত হলো তার মুখে।

"সুধীদা এইমাত্র গেলেন। যদি দু'মিনিট আগে আসতেন তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। কত খুশি হতেন।" উজ্জয়িনী বলল।

কে খুশি হতেন—সুধীদা, না, দে সরকার? বোধ হয় দুজনেই। দে সরকার মুচকি হাসল।

"হাঁ, খুশি হবার কথাই বটে। কিন্তু আমার দস্তুর জানেন তো? সব সময় লেট। ঐ দু'মিনিটের জন্যে আমি কত বার গাড়ি ফেল করেছি।"

"তারপর? আপনি আটলান্টিকের ওপার থেকে ফিরলেন। কী আনলেন আমাদের জন্যে?" দে সরকার জমিয়ে বসল।

উজ্জয়িনী তাকে ঝাবওয়ালাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দে সরকার মিশুক লোক। কাকে কী বলতে হয় জানে। "আপনারা তো মালাবার হিলের ঝাবওয়ালা, সেই প্রসিদ্ধ ক্রোড়পতি—"

তাঁরা অবশ্য প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু আপ্যায়িত হলেনও। দে সরকার যখন তার হাতীর দাঁতের সিগারেট কেস খুলে ধরল, তখন ঝাবওয়ালার মনে পড়ল, "আপনারা কি স্যার এন. এন. সরকারের—"

"না, না, তাঁরা হলেন শুধু সরকার। আর আমরা দে সরকার। ফরাসীতে যাকে বলে, দ্য সারকার। চন্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেন্ট আছে, নিশ্চয় জানেন। আমরা সেই ফরাসী আমলের জমিদার।"

ঝাবওয়ালা দম্পতি দে সরকারকে ধরে নিয়ে তাঁদের ঘরে বসালেন, উজ্জয়িনীকেও। পার্শীদের পানপ্রিয়তা সুবিদিত। দে সরকার বহু কাল পরে একটু শেরী আস্বাদন করল। উজ্জয়িনী কিন্তু পানীয় স্পর্শ করল না। পাছে সুধী টের পায়। ইতিমধ্যে সে আমিষ বাদ দিতে আরম্ভ করেছিল সুধীর অনুসরণে।

"আমেরিকার ছোঁয়াচ লেগে আপনিও দেখছি বর্জনশীল হলেন।" দে সরকার টিপ্পনী কাটল। "ওখানে কি সত্যি কেউ পান করে না?"

"আমি তো আমেরিকা যাইনি। স্কটলণ্ডে, স্কাই দ্বীপে ও লেক ডিস্ট্রিক্ট বেড়িয়ে ফিরলুম।"

"আই সী।" দে সরকার মাথা দুলিয়ে বলল, "এখন বুঝেছি। মিসেস গুপ্তর সেই অর্থনাশের পরে আমেরিকা যাওয়া প্রশ্নের বাইরে। আপনি শুনে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে, আমারও ইচ্ছা ছিল আমেরিকা যেতে। কিন্তু শুধু যেতে আসতে যত খরচ লাগে, সেই খরচে ইউরোপ ঘুরে আসা যায়। আমি ইউরোপ না দেখে কোথাও নড়ছিনে। চলুন না, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক পরিক্রমা করি।"

উজ্জয়িনীর রুচিও ছিল, রসদও ছিল। কিন্তু সুধীদা যদি না যায় তবে তারও যাওয়া

হবে না। বলল, "অনেক ঘুরে শ্রান্ত এখন প্রাণ। কিছুদিন বিশ্রাম করি আগে।"

এর পরে দে সরকার অন্য প্রসঙ্গ তুলল। "আপনি কি রাত্রে কোথাও বেরোন না? থিয়েটারে? সিনেমায়?"

উজ্জয়িনীর স্পৃহা ছিল, কিন্তু সুধীদার সময় হয় না। অন্যের সঙ্গে সে যাবে না। বলল, "আমি ক্লান্ত, মিস্টার দে সরকার। শান্তির জন্যে কিছুদিন গ্রামে বাস করব ভাবছি। শহর আমার সহ্য হচ্ছে না।"

দে সরকার ঠেকে শিখেছিল যে বেশি বলতে নেই, হাতে রেখে বলতে হয়। তার সম্বর্ধনা পুরাতন হবার পূর্বেই সে বিদায় নিল। বলল, "আবার একদিন আসব। আজ উঠি।"

ঝাবওয়ালারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সে সময় সুধী থাকে। সম্মুখ সমরে দে সরকারের অনভিরুচি। সে বলল, "ডিনারের চেয়ে সাপার ভালো। ওসব ফর্মালিটি আমি ভালোবাসিনে। সেই দুপ্লে'র আমল থেকে আমাদের বাড়ির কেউ ডিনার জ্যাকেট পরে না। দেশেও আমরা রাত দশটায় খাই।"

এই বলে সে ফরাসীতে শুভরাত্রি জানাল।

পরদিন উজ্জয়িনী জিজ্ঞাসা করল সুধীকে, "আচ্ছা, দে সরকার কি ফরাসী আমলের নাম?"

"কিসে ও কথা উঠল?" সুধী বিস্মিত হলো।

উজ্জয়িনী গত রাত্রের ঘটনা বলল। তা শুনে সুধী কোনো উত্তর দিল না। দে সরকারের হাত থেকে উজ্জয়িনীকে রক্ষা করা কর্তব্য, কিন্তু এবার ওটার অপব্যাখ্যা হতে পারে। নিন্দুকরা বলতে পারে, যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। দে সরকার সন্ধানী লোক, সেই হয়তো অমন অপবাদ রটাবে। সুধী নিঃশব্দে শুনল ও শুনে নিঃশব্দ থাকল।

যেদিন সাপারের নিমন্ত্রণ, সেদিন কথায় কথায় উজ্জয়িনী বলল, "তুমি যেয়ো না, একটু সবুর কর। আজ দে সরকার আসবেন।"

"দে সরকার!" সুধী জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাল।

"ঝাবওয়ালাদের নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা তোমাকে ডাকেন না, কিন্তু দে সরকারকে ডাকতে ব্যগ্র। তা তোমাকে যখন ডাকেননি তুমি থেকো না, কিন্তু দে সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চাও তো পাঁচ মিনিট দাঁড়াও।"

সুধী অপেক্ষা করল। দে সরকারের সঙ্গে তার কথা ছিল।

"হ্যালো, হ্যালো, এ যে সাক্ষাৎ চক্রবর্তী।" দে সরকার সুধীর হাতে ঝাঁকানি দিল।

"কেমন আছো? ভালো তো?" সুধী কুশল প্রশ্ন করল।

এদিক ওদিক দু'চারটে কথার পর সুধী বলল, "আমার দেরী হয়ে গেছে, আমি আসি। তুমিও আমার সঙ্গে খানিক দূর এস, কথা আছে।"

দে সরকার বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে চলল।

সুধী বলল, "ওকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, রাত জাগাবে না, পান করতে বলবে না। এই তিন শর্তে তুমি ওর সঙ্গে যত খুশি মিশতে পার, দে সরকার। কিন্তু এর একটি শর্ত লঙ্ঘন করলে ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো ব্যবহার পাবে, আমার কাছেও।"

দে সরকার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "আমাকে তুমি বাঁচালে, চক্রবর্তী। আমি শুধু চোখের চাতক। দেখব আর চলে যাব। তুমি আমার পুরাকাহিনী শুনেছ, আমাকে বিশ্বাস করবে না, জানি। তবু বলি আমার কোনো হীন অভিসন্ধি নেই।"

সুধী তার হাতে চাপ দিয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করব, যতদিন না তুমি বিশ্বাসভঙ্গ কর।"

"বিশ্বাসভঙ্গ!" দে সরকার উত্তেজিত স্বরে বলল, "অসম্ভব, ভাই চক্রবর্তী। আমি মিথ্যা বলতে পারি, চাল দিতে পারি, কিন্তু জীবনে কারো কোনো অনিষ্ট করিনি। যা করেছি তা অপরের অভীষ্ট ছিল।"

সুধী বলল, "যাও, ওঁরা তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। তুমি ওকে কী চোখে দেখেছ তা আমি জানি। কিন্তু ভাই, তোমার স্বভাবে যে অসংযম আছে তাও তো আমার অজানা নয়। ভরসা করি, তোমার অন্তরের সুরাসুরের দ্বন্দ্বে দেবতারই জয় হবে। আর যদি দানব জয়ী হয়, তবে মনে রেখো—আমার হাতেই শেষ তাস।"

দে সরকার বলল, "শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতবে। আমার আশা নেই।"

৮

এর পরে একদিন দে সরকার উজ্জয়িনীর হাতে একখণ্ড বাঁধানো পত্রিকা দিয়ে বলল, "বাংলা বই পড়তে চেয়েছিলেন, লণ্ডনে কার কাছে হাত পাতি? আমার কাছে ছিল আমারই প্রাচীন কীর্তি, দুষ্কীর্তিও বলতে পারি। কনীনিকা এর নাম।"

উজ্জয়িনী নাড়াচাড়া করে বলল, "বাঃ। আপনার লেখা দেখছি যে। আপনি যে বাংলায় লেখেন তা তো জানতুম না!"

"লিখি না। লিখতুম।" দে সরকার খিন্ন স্বরে বলল, "সেই যে আছে, 'Creatures that once were men', আমি তেমনি একদা ছিলুম লেখক, এখন অপদার্থ।"

"না, না, অপদার্থ কেন হবেন? আপনি যেমন তাস খেলেন ক'জন তেমন পারে? আপনার মতো নাচতে জানে ক'জন? আচ্ছা, আমি পড়ে দেখব। ধন্যবাদ।"

দে সরকার জীবনে এতবড় প্রশংসা পায়নি। দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করল।

সে তার পত্রিকার কথা ভুলেই গেছল, উজ্জয়িনী কয়েক দিন পরে মনে করিয়ে দিল। "আপনার লেখা আর আছে, মিস্টার দে সরকার ? আপনার লেখার প্রত্যেকটি লাইন যেন আমারই মনের কথা। অথচ যখন লিখেছিলেন, তখন তো আমাকে চিনতেন না, তখন আমার মনের কথাও অন্য রকম ছিল।"

দে সরকার অভিভূত হয়ে শুনছিল। আরো অভিভূত হলো যখন শুনল, "আশ্চর্য ! আপনি কি যাদুকর।"

দে সরকার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তার পর বলল, "আমার লেখনী ধারণ সার্থক। তখন কি জানতুম যে একদিন এই পুরস্কার আমার ভাগ্যে জুটবে। জানলে কি আমি আরো লিখতুম না। আপনার জন্তে আরো কোথায় পাব—কোথায় পাব!" বলতে বলতে তার নয়নে হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

"সত্যি। আপনার এমন ক্ষমতা থাকতে কেন আপনি লেখা বন্ধ করে দিলেন ? কেন তাস খেলে সময় নষ্ট করেন ? আমি হলে দিনরাত লিখতুম, নিজেকে চাবুক মেরে লেখাতুম। কিন্তু আমার তো সে ক্ষমতা নেই। কোন ক্ষমতাই বা আছে! আমি হলুম সত্যিকার অপদার্থ।"

"ও কী বলছেন!" দে সরকার গদ গদ ভাবে বলল, "আপনি অপদার্থ। আপনি—আপনি—" কী বলতে কী বলে বসল বাচাল, শুনে উজ্জয়িনীর কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠল। দে সরকার আবৃত্তি করল—

> "ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস
> দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পূরাতে হইবে আশ।
> অতি অসহন বহ্নিদহন মর্ম মাঝারে করি যে বহন
> কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস।
> পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী
> কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।...
> তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী লজ্জা নাহিকো তায়
> তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়!..."

দে সরকারের আবৃত্তি বনমর্মরের মতো কখনো অস্ফুট কখনো অনুচ্চ হয়ে জুলাই মাসের সেই বিলম্বিত গোধূলি লগ্নে উজ্জয়িনীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করতে থাকল।

> "আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে ফুল মোরে ঘিরি বসে
> কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্বশরীরে পশে।

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া

যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।"

এইখানে দে সরকার একটু বিশ্রাম নিল। উজ্জয়িনীর দিকে এতক্ষণ তাকায়নি, চোখ মেলে দেখল, তার চোখ ছল ছল করছে।

উজ্জয়িনী আবেগপূর্ণ স্বরে অতি কষ্টে বলল, "শেষ?"

দে সরকার ঘাড় নাড়ল। আবৃত্তি করে চলল বিহ্বলভাবে। তারও চেতনা ছিল না যে এটা হোটেল এবং পার্শ্ববর্তী ঝাবওয়ালা দম্পতি বাংলা বোঝেন না।

যখন সমাপ্ত হলো, ঝাবওয়ালা প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। "এখন ইংরাজীতে ওর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন আমাদের। ও কি আপনার লেখা?"

দে সরকার আবেশের ঘোরে বলল, "টেগোরের।" বুঝিয়ে দিতে কিছুমাত্র উদ্যোগ দেখাল না, চোখ বুজে বসে রইল। তার ভয় করছিল, পাছে উজ্জয়িনীর সঙ্গে চোখা-চোখি হয়, পাছে উজ্জয়িনীর দৃষ্টি তিরস্কার করে।

সে রাত্রে উজ্জয়িনী কিংবা দে সরকার কারো ঘুম হলো না। পরদিন দে সরকার হাজিরা দিল না।

"সুধীদা," উজ্জয়িনী জেদ ধরল, "চল, গ্রামে যাই। আমার মন লাগছে না এখানে।"

"যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁরা প্রস্তুত না হলে যাই কী করে? কনফারেন্সের দেরি আছে।"

"গ্রামে কি হোটেল কিংবা বোর্ডিং হাউস নেই, যেখানে গিয়ে উঠতে পারি? পরের অতিথি হবার অপেক্ষায় এই চমৎকার দিনগুলি লণ্ডনের মতো একটা ধোঁয়াটে শহরে অপচয় করতে থাকব আমরা?"

সুধী বিবেচনা করতে সময় নিল।

দে সরকার চিঠি লিখে জানতে চাইল, উজ্জয়িনী রাগ করেছে কিনা। সে কি আসতে পারে দেখা করতে?

উজ্জয়িনী লিখল, রাগ করা দূরে থাক, বাংলা কবিতার মনোজ্ঞ আবৃত্তি শুনে সে মুগ্ধ হয়েছে। আরো আবৃত্তির প্রত্যাশা রাখে।

এবার দে সরকার আবৃত্তি করল ইংরেজী থেকে। শেলীর কবিতা।

"O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being.

Thou from whose unseen presence………"

পরিচিত কবিতা। ঝাবওয়ালা সমস্তক্ষণ হাত তুলে ও নামিয়ে, দুলিয়ে ও ছড়িয়ে মূকাভিনয় করলেন। পরিশেষে বলে উঠলেন, "কী সুন্দর আপনার উচ্চারণ ও মাত্রাজ্ঞান!"

মিসেস ঝাবওয়ালার অনুরোধসত্ত্বেও দে সরকার সে দিন আর আবৃত্তি করল না। তার বিদায় নেবার পর উজ্জয়িনীর শ্রবণে ধ্বনিত হতে থাকল—

"Oh ! lift me as a wave, a leaf, a cloud !

I fall upon the thorns of life ! I bleed !

A heavy weight of hours has chained and bowed

One too like thee : tameless, and swift, and proud."

উজ্জয়িনী সুধীকে দিক করল, "চল, গ্রামে যাই। আর পারছিনে।"

সুধী বলল, "আমরা ওখানে কনফারেন্সের দিন কয়েক আগে যাবার অনুমতি পেয়েছি, এই বার ধীরে ধীরে রওনা হওয়া যাবে।"

"তবে আর দেরি কেন ? চল—"

"বাদলের সঙ্গে আমার হিসাবনিকাশ চলছে যে। পারি তো তাকেও সঙ্গে নেব।"

"এত লোককে সঙ্গে নিচ্ছ," উজ্জয়িনী ঢোক গিলে বলল, "শেষ কালে স্থানাভাব হবে না তো ?"

"এত লোক কোথায় ! বাদল যদি রাজি হয় তো বাদল। আর সহায়েরও বিশেষ অভিলাষ—"

"আবার সহায় ! আপনি জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।"

অতঃপর দে সরকার আবৃত্তি করল হুইটম্যান থেকে—

"As I lay with my head in your lap, Camerado,

The confession that I made I resume..."

সেদিন ঝাবওয়ালারা ছিলেন না, দে সরকার গলা ছাড়ল—

"I know my words are weapons, full of danger, full of death ;

For confront peace, security, and all the settled laws, to unsettle them ;"

ক্রমে তার স্বর ডানা মেলল, উড়ে চলল—

"And the threat of what is called hell is little or nothing to me ;

And the lure of what is called heaven is little or nothing to me ;

Dear Camerado ! I confess I have urged you onward with me, and still urge you, without the least idea what is our destination, or whether we shall be victorious, or utterly quelled and defeated."

উজ্জয়িনী তন্ময় হয়ে শুনছিল। বলল, "এইটুকু কবিতা ?"

"কবিতাটি ছোট, কিন্তু ওর অনুরণন দীর্ঘস্থায়ী।" বলল দে সরকার।

দু'জনে নিস্পন্দভাবে বসে রইল। উজ্জয়িনী সুধাল, "Camerado মানে তো কমরেড ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা আরো নিবিড়।"

৯

উজ্জয়িনী বলল, "পরের কবিতা কত আবৃত্তি করবেন ! নিজের কবিতা শোনান।"

দে সরকার বলল, "নতুন কবিতা তো আর লিখিনি সেই থেকে।"

"তবে লিখুন।"

"এত কালের অনভ্যাস। লিখতে ভরসা হয় না। যদি একটু নিরালা পাই তো কবিতা নয়, উপন্যাস লিখব।"

"উপন্যাস ?" উজ্জয়িনী উৎসুক হয়ে বলল, "তা হলে তো আরো চমৎকার হয়। নিরালা যদি কোথাও না পান আমাদের সঙ্গে চলুন গ্রামে। সেখানে আপনাকে একটা ঘরে পূরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করব আর নিজের কাছে চাবী রাখব। কেমন, তা হলে লিখবেন ?"

"আপনারা যদি দয়া করে সঙ্গে নেন," দে সরকার সহর্ষে বলল, "আমাকে একটা গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেবেন কিংবা নৌকায় বসিয়ে দিয়ে হাল সরিয়ে দেবেন। তা হলে আমি নিরুপায় হয়ে লিখব। কিন্তু আমার উপন্যাস তো একদিনে বা একসপ্তাহে সারা হবে না, ও যে বিরাট ! তিন চার খণ্ডের কম নয়।"

"ওমা ! তাই নাকি !" উজ্জয়িনী তটস্থ হলো। "আমরা যে অক্টোবরে দেশে ফিরছি। তার আগে আপনার বই শেষ না হলে আমরা কি আপনাকে বন্দী করে দেশে নিয়ে যাব ? আর সেখানে পৌঁছাবামাত্র যদি আমরাও বন্দী হই—"

"আপনারা বন্দী !" দে সরকার বাধা দিল।

"জানেন না ?" উজ্জয়িনী খুলে বলল, "আইন অমান্য করে আমরা জেলে যেতে পারি। আমি তো নিশ্চয়ই ! সুধীদা এখনো মনঃস্থির করতে পারছে না, জেলে যাবে না গঠনের কাজ করবে।"

দে সরকার এত জানত না। বলল, "আমি ইউরোপ ছাড়তে ইচ্ছুক নই। এখানকার জীবন হচ্ছে বেগবতী বন্যা, আর ওখানকার জীবন প্রবাহহীন পল্বল। দেশে যদি আপনারা একটা আবর্ত আনতে পারেন, প্লাবন আনতে পারেন, তবেই আমি আসব !"

চোখ বুজে বলল, "কিন্তু আমি যদি পারি তো আপনাকে দেশে ফিরতেই দেব না।"

উজ্জয়িনী সুধীকে তাগাদা দিল। "কবে যাব, সুধীদা ? কোন জন্মে ? এমনি করে

কি সোনার নিদাঘ ঋতু কাটায়। দেখছ না, তোমার মিউজিয়াম অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। কেউ গ্রামে, কেউ সমুদ্র সৈকতে, কেউ পাহাড়ে, কেউ জাহাজে, কেউ কন্টিনেন্টে বেড়াতে বেরিয়েছে।"

সুধী বলল, "আর দেরি নেই, ভাই। দিন চার পাঁচ কোনো মতে ধৈর্য ধর।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তুমি যদি চার পাঁচ দিন না বলে চার পাঁচ মাস বলতে তা হলেও আমি ধৈর্য ধরতুম! কিন্তু তোমার মতো শান্তিবাদীকে শাস্তি দিতুম না। বুঝলে?"

সুধী অন্যমনস্কভাবে হাসল। শান্তিবাদীদের জন্যে সে তার বক্তব্য তৈরি করছিল।

"কিন্তু, সুধীদা, শঙ্করকে ডাকছ যখন তখন আর একজনকেও ডাক।"

"কাকে?"

"মিস্টার দে সরকারকে। উনি উপন্যাস লিখবেন, শহরে নিরিবিলি পাচ্ছেন না, গ্রামে হয়তো পাবেন।"

"কে? দে সরকার?" সুধী হো হো করে হাসল।

"হাসছ কেন? বল না?"

"দে সরকার যদি গ্রামে যায় তবে মরিস্ নাচ নাচবে। ও কি এক দণ্ড চুপ করে বসে বই লেখবার পাত্র? তুই ওকে চিনিসনি।"

"না, না, ওঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাহিত্যে ওঁর মতিগতি ফিরেছে। কী মনোরম আবৃত্তি করেন যদি শুনতে?"

"ওকে চিনতে সময় লাগবে। ওর যেমন গুণের সীমা নেই তেমনি দোষের স্বল্পতা নেই। যারা চন্দ্রকলা দেখে তারা প্রথম কয়েক তিথিতে কলঙ্ক দেখতে পায় না, ক্রমে ক্রমে পায়।"

এ কথা শুনে উজ্জয়িনী রুষ্ট হলো। বলল, "কলঙ্ক কি আমারও নেই? তোমার মতো নিষ্কলঙ্ক ক'জন? আমি তো মনে করি কলঙ্ক একটা qualification."

সুধী টিপে টিপে হাসছিল, তা লক্ষ করে উজ্জয়িনী গায়ে পেতে নিল। তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "কে কাকে ঠিক চিনতে পারে জগতে! আমার তো ধারণা মেয়েরা মেয়েদের, পুরুষরা পুরুষদের চিনতে অপারগ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচ্ছন্ন সংস্কার তাদের অন্ধ করে দেয়।"

এর ভিতরে সুধীর প্রতি একটি শ্লেষ ছিল। সুধী আর উচ্চবাচ্য করল না।

দে সরকারকে উজ্জয়িনী দ্বিতীয়বার বলতেই সে উদ্বাহু হয়ে ব্যগ্রতা প্রকাশ করল।

"লোটা কম্বল যা আছে গরিবের তাই নিয়ে বনবাসী।" দে সরকার বলল। "আপনার কাছে লুকিয়ে কী হবে," এই যে পোশাকটি দিনের পর দিন দেখছেন এটাই আমার

বাঘছাল। টাকা থাকলে কি আমেরিকা যেতুম না? নিদেন পক্ষে স্কটলণ্ড? ধনের ঘরেও শনি। সেদিন যদি নরওয়ে সুইডেনের প্রস্তাবে আপনি সায় দিতেন আমাকে হয়তো চুরি ডাকাতি করতে হতো। যাক, এ তো তবু গ্রাম, কম খরচে চলবে। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিই, আমার চালচলন দূর থেকে যেমন, নিকট থেকে তেমন নয়। কাছাকাছি থাকলে.ধরা যখন পড়বই তখন আগে থেকে জানিয়ে রাখা নিরাপদ।"

উজ্জয়িনী ফরাসী আমলের জমিদারবংশীয়ের স্বীকারোক্তি শুনে কৌতুক বোধ করল। বলল, "আপনি সেখানে গিয়ে ছুরি কাঁটা চুরি করবেন না, বড় লোকের পকেট মারবেন না, মুচলেকা লিখে দিতে রাজি আছেন? তা হলে আমি আপনার জামিন দাঁড়াতে রাজি আছি।"

দে সরকার কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আপনি যদি জামিন দাঁড়ান তবে আমি সারা জীবন নিষ্পাপ থাকব এমন মুচলেকাও লিখে দিতে পারি। তবে আমি যে একজন পুরোনো দাগী এ কথা আপনার জানা দরকার। বলব আপনাকে একে একে সবই। তার পরে একদিন সরে পড়ব, যদি দেখি আমি আপনার বিশ্বাসের অভাজন।"

বলেই সেদিন সরে পড়ল।

গ্রামে যেতে উজ্জয়িনীর যতটা আগ্রহ সুধীর তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। কিন্তু সুধী দেরি করছিল প্রকৃতপক্ষে বাদলের জন্যে। বাদলকে একা ফেলে সে কী করে লণ্ডন ছাড়ত? বাদলও যাতে তার সঙ্গী হয় সেজন্যে তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। বাদল সঙ্গে থাকলে উজ্জয়িনীর দরুন সুধীকে কেউ নিন্দা করত না।

কিন্তু এত তদ্বিরেও ভবী ভুলল না। বাদল স্পষ্ট বলে দিল, "তোমাদের বুর্জোয়া শান্তিবাদে আমার আস্থা নেই। আমিও যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু আমার বিরোধিতা তোমাদের মতো সঙ্কীর্ণ নয়, ব্যাপক। আমি চাই শোষণের অবসান, তা যদি হয় তবে শান্তি আপনি আসবে। শোষণের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, আকাশ থেকে টুপ করে শান্তি নামবে, 'এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি' যাঁদের নীতি আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিনে। কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আমি শান্তির বিরোধিতা করব না, যদি কেউ শান্তির ব্যাঘাত করে, তারই বিরোধিতা করব।"

এই উক্তির পিছনে যে মানসিক বিশৃঙ্খলা রয়েছে সুধী ইচ্ছা করলে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তার তো বাদলকে ভজাবার উদ্দেশ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল বাদলকে সাথী করবার। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় সুধী আর বিলম্ব করল না, গ্রামে যাবার দিন ফেলল।

এতকাল ঝুলে থাকার পর এই সুখবরটা শুনে উজ্জয়িনী এত খুশি হলো যে সেদিন সুধীকে আটক রাখল। দে সরকার আসতেই দু'জনের দুই হাত ধরে বলল, "তোমাদের

দু'জনের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে, না ?"

সুধী ও দে সরকার উভয়েই নীরব। উজ্জয়িনী বলল, "আজ থেকে তোমাদের মিতালি। চল তোমরা দু'জনেই আমার সহচর হয়ে—একজন আমার দেবতা, একজন আমার ভক্ত।"

দেবতা ও ভক্ত উভয়েই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। উজ্জয়িনীর তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তাদের দু'জনকে দুটি পুতুলের মতো পাশাপাশি বসিয়ে স্বয়ং তাদের সম্মুখে বসল শিশু উজ্জয়িনীর মতো। তাদের তর্জনী দিয়ে শাসন করে বলল, "লক্ষ্মী ছেলের মতো খেলা করবে। কেউ কারো দোষ ধরবে না। ঝগড়া বাধলে আমাকে জানাবে। কেমন ? মনে থাকবে ?"

১০

অশোকার বাগ্‌দানের সময় থেকে সুধী কেমন একটা অবসাদ বোধ করছিল। প্রকৃতির কোলে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো আরোগ্য নেই, প্রকৃতি তার রসায়ন দিয়ে দেহমন নবীন করতে জানে। সেই জন্যে সুধী স্থির করেছিল যে গ্রামে গিয়ে পাঁচ ছয় সপ্তাহ থাকবে। তার শান্তিবাদী বন্ধুরাও গ্রামে যাচ্ছে, তাঁরা হয়তো অতদিন থাকবেন না। শান্তিবাদের যা হবার হোক, শান্তি পেলেই সুধী সন্তুষ্ট।

মাঝখান থেকে উজ্জয়িনীর আকস্মিক আক্রমণ। সেও চায় যেতে। তাকে নিয়ে সুধীর দুর্নাম তো রটবেই, কিন্তু তার নিজের কলঙ্কের সীমা থাকবে না। একবার সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, বৃন্দাবনে ধরা পড়ল। আরো এক পোঁচ কালি মেখে দেশে ফিরলে দেশের লোক ছি ছি করবে।

কাজেই সুধী ভারী মুশকিলে পড়েছিল। তার ভরসা ছিল বাদল শেষ পর্যন্ত গ্রামে যেতে রাজি হবে, কিন্তু বাদল তো নারাজ হলোই, কোনখান থেকে দে সরকার এসে জুটল। যদি পেছিয়ে যাবার পথ থাকত সুধী গ্রামে যাওয়া বন্ধ করত। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপিত হয়েছে ভারতের পক্ষে ভাষণের ভার সুধীর উপর।

যেদিন গ্রামে যাবার কথা তার আগের দিন তিনজনেই গেল বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বাদল বলল, "কাজ কি ভাই আমাকে টেনে ? আমি কথা কইতে অপারগ, কেননা একদিন আমাকে কথা কইতে হবে। আমি কথা শুনতে অনিচ্ছুক, কেননা এত-দিন আমি ও ছাড়া আর কী করেছি ? কোথাও যেতে আমার রুচি নেই, কেননা যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি দুঃখ। আমাকে একা থাকতে দাও তোমরা।"

বাদল তাদের ঠিকানা লিখে নিল। দরকার হলে খবর দেবে। তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু উপায় নেই।

তারা তিনজনে নদীর বাঁধ থেকে ফিরে হোটেলে পা দিচ্ছে, এমন সময় পোর্টার বলল, "টেলিগ্রাম, ম্যাডাম।" তারখানা তাড়াতাড়ি খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উজ্জয়িনী ওখানা সুধীর হাতে দিল। সুধী পড়ল—

"Come with Sudhi or Kumar.

Mother."

উজ্জয়িনী উতলা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মানে কী, সুধীদা? তুমি কি মনে কর মা'র কোনো অসুখ—"

সুধী নীরব থাকল। অসুখ করলে সে কথা উল্লেখ করতে আর যেই হোক মিসেস গুপ্ত ইতস্ততঃ করতেন না। অসুখ নয়, অন্য কোনো ব্যাপার।

দে সরকার তারখানা চেয়ে নিয়ে পড়তে না পড়তেই চমকে উঠল। পাংশু মুখে বলল, "হোয়াট! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! চক্রবর্তী, তুমি কী বল?"

তা শুনে উজ্জয়িনী ভয় পেয়ে গেল। বলল, "ও সুধীদা!"

সুধী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "না, অসুখ নয়। তবে তোমরা তো পোঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে রয়েছ। কেবল গন্তব্যের পরিবর্তন হলো।"

উজ্জয়িনী শক্ পেয়ে সুধাল, "সে কী! তুমি যাবে না, সুধীদা?"

"আমি গেলে দিন দু'তিনের বেশি থাকতে পারব না, আমার যে ভারতের পক্ষে ভাষণের নিমন্ত্রণ।"

"আমিও কি দিন দু'চারের বেশি থাকব ভাবছ? যেখানে তুমি সেখানে আমি।"

সুধী স্নিগ্ধস্বরে বলল, "না, লক্ষ্মী। তোর মা কিংবা শ্বশুর কিংবা স্বামী যেখানে তুই সেখানে।"

উজ্জয়িনী তর্ক করতে যাচ্ছিল, "কিন্তু বিয়ের পরে মায়ের সঙ্গে মেয়ের এমন কী—"

সুধী বাধা দিয়ে বলল, "তোর মা তোকে ডেকেছেন, হয়তো বিশেষ বিপন্ন হয়েই ডেকেছেন, তুই যা। তোর সঙ্গে যাক দে সরকার।"

উজ্জয়িনীর চোখ দিয়ে জল উথলে পড়ল। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে উঠে গেল, কিন্তু সুধীকে ও দে সরকারকে ইশারা করে গেল বসে থাকতে। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুখ ধুয়ে যখন নামল তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ভৈরবী।

ইতিমধ্যে দে সরকার বলেছিল সুধীকে, "এ কী মহাসঙ্কট!"

"কেন হে! তুমি তো কার্লসবাডের রাস্তা চেন, তোমার পাসপোর্টও রয়েছে। তোমার পক্ষে তো সহজ।"

"না, না, তা নয়।" দে সরকার হিমসিম খেয়ে বলল, "তুমি থাকতে আমি কোন সুবাদে—কোন অধিকারে—ওঁকে নিয়ে যাব?"

"আমার যে উপায় নেই। তুমি আছ কী করতে যদি তোমার বন্ধুপত্নীকে তার জননীর অনুরোধে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যেতে না পারলে ?"

"আমাকে," দে সরকার সুধীর কাছে সরে এসে বলল, "ভুল বুঝো না, ভাই চক্রবর্তী।"

"না, তোমাকে ভুল বুঝব না, ভাই দে সরকার। তুমি তো নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছ না। যাচ্ছ টেলিগ্রামের নির্দেশে।"

"সুধীদা!" দে সরকার সেণ্টিমেণ্টাল সুরে ডাকল।

"কুমার!"

"তুমিই তো সেদিন বলেছিলে ওঁকে কোথাও না নিয়ে যেতে!"

"কিন্তু এক্ষেত্রে যে উপরওয়ালার আদেশ।"

"তবু সন্দেহ তো তুমি করবে।"

"হাঁ, সন্দেহ আমি করব। এবং বিশ্বাসও করব যে তুমি এই অপূর্ব প্রলোভন জয় করবে। এই তোমার জীবনে উজ্জয়িনী সম্পর্কে প্রথম দায়িত্ব। তোমার নিজের হাত থেকে এবার তুমি তাকে রক্ষা করতে সম্মানবদ্ধ।"

দে সরকার ক্ষিপ্রভাবে বলল, "তবে তুমি আমার হাতে ওঁকে দিলে ?"

সুধী উদাসকণ্ঠে বলল, "আমি দেবার কে! বিধাতা দিলেন। আমি যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম তাতে আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। তিনি আমার বাঁধন খুলে দিচ্ছেন। অশোকা গেছে, উজ্জয়িনী যাচ্ছে, এর পরে মার্সল।"

এমন সময় উজ্জয়িনী এসে সুধীর পাশে বসল, "আমি জানি তুমি তোমার কর্তব্য ফেলে আমার সঙ্গে যাবে না। তবু আমি ভাবতে পারছিনে যে যার জন্যে আমার আমেরিকা যাওয়া হলো না তাকে রেখে আমার কার্লসবাড যাওয়া হবে! মিস্টার দে সরকার, আপনি আমার নাম করে একখানা তার করে দিন মা'কে। জিজ্ঞাসা করুন কী হয়েছে। অসুখ না অন্য কিছু।"

দে সরকার বলল, "আ-আ-আমিও তাই ভাবছিলুম।" তার মুখখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

তা লক্ষ করে সুধী বলল, "তার করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মা যখন যেতে বলেছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।"

"আ-আ-আমিও তাই ভাবছিলুম।" বলল দে সরকার।

উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়ে নিজেই একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম জোগাড় করে লিখতে বসল। কাটাকুটির পর এই রকম দাঁড়াল—

"Sudhi attending Peace Conference. I attending. Kumar attending.

How are you ?"

সুধী হেসে বলল, "পীস কনফারেন্স নয়, প্যাসিফিস্ট কনফারেন্স। কিন্তু লক্ষ্মী, তোকে যেতেই হবে কার্লসবাড। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে লণ্ডন থেকে কেউ বা কারা তোর মায়ের কাছে কিছু লিখেছেন।"

"অসহ্য অসহ্য।" উজ্জয়িনী খসড়াখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ল। "আমি কার কী করেছি যে কেউ অমন যা তা লিখে জ্বালাবে! রিভলবার দিয়ে শূট করতুম যদি জানতুম কে বা কারা—"এই পর্যন্ত বলে কেঁদে ফেলল।

ওদিকে দে সরকার একটু একটু কাঁপছিল। তার কাঁপুনির বিশেষ কোনো কারণ না থাকায় সুধীর মনে সন্দেহ হলো, হয়তো সেই কিছু লিখেছে। কিন্তু অপরাধ নিল না। ঠিকই হয়েছে যে উজ্জয়িনী তার মায়ের কাছে যাচ্ছে। সেইখানেই তার যথার্থ স্থান। সুধীর সঙ্গে গ্রামে নয়।

"সমাজে বাস করতে হলে," সুধী সান্ত্বনাচ্ছলে বলল, "সমালোচনার অধিকার মানতে হয়। কতলোক কত দুর্নাম রটান, তাদের সবাইকে গুলি করতে গেলে গুলির দর বেড়ে যায়। আমরা যদি নিষ্পাপ হই তবে সেই হবে আমাদের মোক্ষম গুলি। সীতা সেকালের অযোধ্যার লোককে চিরকালের মতো গাধার টুপি পরিয়ে দিয়ে গেছেন। যদি তাদের গুলি করতেন তা হলে কিন্তু তারাই জিতে যেত।"

উজ্জয়িনী অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে দে সরকারের সাক্ষাতেই সুধীকে বলল, "তোমার অনুমান যদি সত্য হয় মা আমাকে তোমার কাছে ফিরতে দেবেন না, তুমি যখন দেশে ফিরবে তখন আমাকে আটকে রাখবেন। তবে কি আমি কোনো দিন তোমার সঙ্গে থাকতে পাব না—এই শেষ?"

সুধী কোমল স্বরে বলল, "আপাতত এই শেষ। এই ভালো, উজ্জয়িনী, লক্ষ্মী। আমাকে এক মনে আমার কাজ করে যেতে দে। আমার কাজ যতদিন না তোরও কাজ হয় তত দিন আমাদের বিচ্ছেদ শ্রেয়। কর্তব্য পথে যেদিন আমরা একত্র হব সেদিন দেখবি শেষ নেই, সে মিলন অশেষ।"

১১

পরদিন সুধীর যাওয়া হলো না। উজ্জয়িনীর পাসপোর্ট ও Visa, দে সরকারের Visa সংগ্রহ করতে দিনান্ত হলো। প্রাণান্ত হতে পারত, কিন্তু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। উজ্জয়িনী যে অফিসারের সম্মুখে উদয় হয় তিনিই শশব্যস্ত হয়ে বলেন, "খুব বেশি দেরি হবে না। আমরা আমাদের উপরকার আদেশ প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছি।"

দিনান্তে দে সরকারকে বাজার সরকার নিযুক্ত করে উজ্জয়িনী বলল, "সুধীদা, চল

শেষবার লণ্ডন দেখি।"

দু'জনে একখানা বাস-এর ছাতে উঠে বসল। নিরুদ্দেশ যাত্রা। দু'জনেই অনেকক্ষণ অসাড় ভাবে বসে রইল, কথা কইল না।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল উজ্জয়িনী। "সুধীদা, আমার তো মনে হয় না যে মা অচিরে ফিরবেন। তাঁর কিছু টাকা গেছে, কিন্তু কিছু আছেও। সেটুকু খরচ হতে এখনো পাঁচ বছর লাগবে, তার আগে তিনি ইউরোপ থেকে নড়বেন বলে মনে হয় না।"

সুধী বলল, "দেখা যাবে।"

"আমি যদি তাঁর সঙ্গে থাকি তবে আমারও," উজ্জয়িনী বিশদ করল, "দেশে ফিরতে আরো পাঁচ বছর।"

"দেশ," সুধী সস্নেহে বলল, "তোর অভাব নিত্য বোধ করবে। কিন্তু অপেক্ষা করবেও। তুই যদি ক্লিনিকের বিদ্যা আয়ত্ত করিস তবে পাঁচ বছরও দীর্ঘকাল নয়।"

"কিন্তু ওতে আমার মন লাগে না যে!"

"কারণ জগতের ব্যথা তোর বুকে বাজেনি। নিজের বেদনা তোকে বিহ্বল করেছে।"

কিছুক্ষণ পরে উজ্জয়িনী বলল, "জগতের সেবা যে করবে তারও সুখ শান্তি চাই। তার ক্ষুধা যদি না মেটে তবে কেমন করে সে অন্নপূর্ণা হবে!"

"যথার্থ। কিন্তু ক্ষুধা মেটে অন্নে নয়, অমৃতে। অন্নের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়, অমৃতের জন্যে আপনার অন্তর মন্থন করতে হয়। তোর কি অমৃত নেই যে তুই অন্যের জন্যে হাবাতের মতো বেড়াবি?"

উজ্জয়িনী ফিসফিস করে সুধীর কানে কানে বলল, "এই! এ বাস-এ আর একজন ভারতীয় আছেন। বোধ হয় বাঙালী।"

সুধী পিছন ফিরে তাকাল, আরে এ যে নীলমাধব চন্দ। সুধী বলল, "নীলমাধবের সঙ্গে তোর পরিচয় নেই? দুঃখের জীবন!"

"সঙ্গে তো একটি দুঃখিনী দেখছি।" উজ্জয়িনী নিচু স্বরে বলল। "তোমরা ভারতীয় ছাত্রেরা এ দেশে এসে এদের কন্যাদায়ের দুঃখ সইতে পার না।"

সুধী শুনেছিল নীলমাধব বাগ্‌দত্ত হয়েছে একটি জার্মান ইহুদী মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি উচ্চাঙ্গের বেহালা বাজায়। নীলমাধব তাকে দেশে নিয়ে যেতে পারে না, সেখানে বিদেশিনীর বেহালা বুঝবে কে? আর মেয়েটিও আর্ট সম্বন্ধে সীরিয়াস। নীলমাধব ইতিমধ্যে কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়েছে, বোধ হয় সারা জীবন বিদেশেই কাটাবে। কষ্টে চালায়। চির প্রবাসীর যে নিরুপায় দুঃখ সেই দুঃখ তার। অথচ সে তার দেশকেও কম ভালোবাসে না। বহুকাল অন্তরীণ ছিল, এখনো তেমনি স্বদেশী।

এসব শুনে উজ্জয়িনী চাপা গলায় বলল, "ইণ্টারন্যাশনাল ট্র্যাজেডী! কী বল,

শান্তিবাদী? তোমার শান্তিবাদ এর কী মীমাংসা করবে?"

"মীমাংসা সম্ভব নয় বলেই তো আমি বলি, বিদেশে এসে কেউ যেন প্রেমে পড়ে না, বিয়ে করে না।"

"আর তুমি নিজেই সুজেতের—"

"ছি! যা তা বলিস নে।"

"কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি ও তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। তেমন ভালোবাসা যদি আমি বাসতে পারতুম তবে আজ এইখানেই প্রাণ দিতুম, কখনো কার্লসবাড যেতুম না।"

কোন কথা থেকে কোন কথা এসে পড়ল। সুধী নীলমাধবকে সঙ্কেতে অভিবাদন জানাল। নীলমাধব প্রত্যাভিবাদন করল।

উজ্জয়িনী চুপি চুপি বলল, "আমাকে তুমি নির্বাসন দিচ্ছ, জানি। বনে নয়, তা হলে তো বাঁচতুম। ইউরোপের ভোগবিলাসের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে পদে পদে প্রলোভন, একটু অসতর্ক হলেই পদস্খলন। যদি কোনো দিন আমাকে দেখতে পাও তবে সেদিন কোন পাপীয়সীকে দেখবে! কোন পতিতাকে!"

সুধী ক্ষণকাল হতবাক্ হলো। তারপরে ভাষা ফিরে পেলো।

"ইউরোপের মেয়েরা তো ভোগবিলাসের বাইরে নয়। তবে তারাও কি তোর ধারণায় তাই?"

"না, না। আমি কি তাই মনে করে বলেছি?" অপ্রতিভ হলো উজ্জয়িনী। "রোগের আবহাওয়ায় বহুকাল বাস করলে যেমন এক প্রকার প্রতিরোধশক্তি জন্মায় ভোগের আবহাওয়ায়ও তেমনি। বুঝলে, সুধীদা, ইউরোপের মেয়েরা immune."

সুধী বলল, "কতকটা সত্যি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের রক্ষা করে ওদের ধর্ম, ওদের নারীত্বের আদর্শ। ওদের ঐতিহ্য ওদের বাঁচায়।"

"হতে পারে। কিন্তু আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলুম তা কি তুমি বুঝলে!" সে অভিমানে মুখ ফেরাল।

সুধীও চেয়ে দেখল নীলমাধব যেখানে বসেছে সেখানে কোনো আসন খালি কি না। নীলমাধবের সঙ্গে তার কথা ছিল। আসন খালি দেখে সুধী বলল, "আমাকে এক মিনিট ছুটি দিতে পারিস?" উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না।

নীলমাধব তার ফিয়ঁাসীর সঙ্গে সুধীর আলাপ করিয়ে দিল। দু'চার কথার পর বলল, "আপনি কি লণ্ডনে আপাতত কিছুদিন থাকবেন? না অন্য কোথাও যাবার কল্পনা আছে?"

"লণ্ডনেই থাকব। এঁর কয়েকটা রিসাইটাল আছে।"

"ওহ্‌! তা হলে তো বঞ্চিত হব। কিন্তু শুনুন, নীলমাধবদা, আপনি আমার বন্ধু বাদলকে একটু দেখবেন? বেশি দিন না, পাঁচ ছয় সপ্তাহ। হপ্তায় একবার দেখলেই চলবে।"

"বেশ। তার ঠিকানাটা—"

"তার ঠিকানা যদি শোনেন নিজের শ্রবণকে অবিশ্বাস করবেন। টেমস নদীর বাঁধ।"

"তার মানে লণ্ডন থেকে অক্‌স্‌ফোর্ড? না টিলবেরী?"

"অত দূর নয়। লণ্ডনের সীমানাই ওর ঠিকানা। তবে ওকে পাবেন সচরাচর চেয়ারিং ক্রসের নিকটে।"

সুধী ফিরলে উজ্জয়িনী বলল, "সুধীদা, আর ভালো লাগছে না। চল নেমে যাই।"

এবার ট্যাক্‌সি। উজ্জয়িনীর ভ্রূক্ষেপ নেই, মিটারে কত উঠেছে উঠুক। সে সুধীর গা ঘেঁসে বসল ও বলল, "তোমার কাছে যতদিন থাকি আমার শারীরিক চেতনা থাকে না। আমি যেন অশরীরী আত্মা। দূরে গেলেই টের পাই আমার শরীর আছে, শরীরের ওজন আছে, আর আছে অতি সূক্ষ্ম ক্ষুধা। সুধীদা, তুমি যে অমৃতের কথা বলছিলে তা মিথ্যে নয়, আমিও মানি যে অমৃত যদি মেলে তবে অন্নের জন্যে ঘুরতে হয় না। কিন্তু সে অমৃত আমার অন্তরে নেই। আছে আর একজনের স্পর্শে।"

সুধী তাকে বাধা দিল না, সেও সুধীর একটি হাত তুলে নিয়ে একটি বার মুখে ছোঁয়াল।

তারপর কেউ কথা কইল না, সুধীও না, উজ্জয়িনীও না। সুধী অন্যমনস্ক ছিল, যখন তাকাল তখন লক্ষ করল উজ্জয়িনীর চোখে মুখে অশ্রুর জোয়ার। সে যেন চেষ্টা করছে কিছু বলতে, কিন্তু বলতে বাধছে। তাই অসহায় ভাবে কাঁদছে।

সুধীর সহসা মনে হলো, কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী, কে কার বন্ধু, কে কার ভাই! সামাজিক সম্পর্কই কি সব! সেই সম্পর্কই কি রিয়াল! আমরা যে চির পুরাতন চির নবীন আত্মা। আমাদের সকলের সঙ্গেই সকলের আত্মীয়তা, সকলের সখ্য, সকলের প্রেম। পরস্পরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে স্নেহ ভালোবাসা পাচ্ছি। সমাজ আছে, সমাজের কানুন আছে, কিন্তু সেই একমাত্র রিয়ালিটি নয়, চরম রিয়ালিটি নয়। সবার উপরে মানুষ সত্য। তা যদি না হতো তবে রাধাকৃষ্ণের অসামাজিক প্রেম যুগ যুগ ধরে ভারতের হৃদয় অধিকার করত না।

সুধী বলল, "আমি কিচ্ছু মনে করিনি, কোনো অপরাধ নিইনি। তোর শুভ্র অন্তঃকরণের নির্মল উপহার গ্রহণ করেছি, ধন্য হয়েছি। এমনি শুভ্র যেন চিরকাল থাকিস, এমনি নির্মাল্য যেন সঞ্চয় করে রাখিস। ধর্ম যদি তোকে রক্ষা না করে তবে প্রেম যেন তা করে। কিন্তু ভুলিসনে যে আমি বৈরাগী—প্রতিদানে অক্ষম।"

১২

স্বধী সেদিন রাত জেগে মিসেস গুপ্তকে চিঠি লিখল। চিঠির সারবস্তু এই—

যে সব ছেলে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে আসে তাদের অধিকাংশই ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে ফেরে, সম্ভব হলে চাকরি নিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন দু'চারজনও দেখা যায় যারা ইউরোপের কাছে অসম্ভবের মন্ত্র নেয়, তাদের পণ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। হরদয়াল, কৃষ্ণবর্মা, সাবরকার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়—এঁদের গুরুজন নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন যে এঁরাও হবেন সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টার, প্রোফেসার। কিন্তু এঁদের কেউ বা হলেন বন্দী, কেউ বা নির্বাসিত। এঁদের কারো কারো স্ত্রী রয়েছেন স্বদেশে, হরদয়ালের তো একটি মেয়ে আছে শুনতে পাই, বেচারি নাকি শৈশব অবধি বাপকে দেখেনি।

বাদলের লক্ষ্য যদিও ভিন্ন তবু সেও এঁদেরই মতো মন্ত্রচালিত। সেও বোধ হয় দেশে ফিরবে না, এ দেশেও অর্থ উপার্জন করবে না। এর দরুন আফসোস করতে পারি, কিন্তু দোষ ধরতে পারি নে। তার জীবনের দায়িত্ব মুখ্যতঃ তারই। কাজেই জীবন-যাপনের স্বাধীনতাও স্বায়ত্ত তার। আমরা বড় জোর অনুযোগ করতে পারি, আবেদন করতে পারি, পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু চাপ দিতে পারিনে।

এমন মানুষের সঙ্গে উজ্জয়িনীর বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা বিতর্ক করা বৃথা। আমার এক এক সময় মনে হয়, ঠিকই হয়েছে, বিয়ে দিতে হলে বাদলের যোগ্য উজ্জয়িনীই আর উজ্জয়িনীর যোগ্য বাদলই। ভুল যদি হয়ে থাকে তবে মনোনয়নে নয়, পরিণয়ে। অর্থাৎ অসময়ে বিয়ে দিয়ে এই বিপত্তি। সবুর করলে হয়তো বিয়েই হতো না, কিন্তু বিভ্রাট বাধত না।

যা হোক, এখন এ বন্ধন অচ্ছেদ্য। উজ্জয়িনী ছেদনের কথা ভাবছে, কিন্তু ওতে সুখ নেই। আমি যতদূর বুঝি উজ্জয়িনীর কর্তব্য তার বাল্যের আদর্শে প্রত্যাবর্তন। সিস্টার নিবেদিতা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ইডিথ ক্যাভেল, এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর আত্মনিবেদনই তার বাল্যের আদর্শ। তার পিতা সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে উইল করে গেছেন। পিতার আশীর্বাদ তাকে সার্থক করবে যদি সে উপযুক্ত শিক্ষার পরে সেবাকার্যে ব্রতী হয়।

সেই যে ক্লিনিকের কথা ছিল, যা নিয়ে আপনিও উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তি স্থাপনের সময় এসেছে। ভিত্তি হচ্ছে উজ্জয়িনীর শিক্ষানবীশী। কোথাও যদি তাকে শিক্ষার্থীরূপে নেয় তবে সেইখানেই সে থাকবে, যতদিন না তার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। আর আপনি থাকবেন তার অদূরে, যদি সঙ্গে না থাকতে পারেন। এ ছাড়া তো আমি কোনো সমাধান দেখিনে। আমার অনধিকারচর্চা ক্ষমা করবেন, মা। আমি কোথাকার

কে। তবু আপনাদের সঙ্গে ভাগ্যসূত্রে গাঁথা। আপনাদের মঙ্গল আমার দিবারাত্রের প্রার্থনা।

আমি যেতে পারছিনে, দে সরকার যাচ্ছে। দেশে ফেরবার সময় দেখা করে যাব যদি ততদিন ওখানে থাকেন। আশা করি আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে। আমার প্রণাম।—

পরদিন স্টেশনে যাবার আগে চিঠিখানা সুধী উজ্জয়িনীর জিম্মা দিল। উজ্জয়িনী বলল, "পড়তে পারি ?"

সুধী বলল "স্বচ্ছন্দে।"

চিঠিখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে উজ্জয়িনী ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, "এই কথা! আমি ভাবছিলুম কি জানি কোনো রহস্য ফাঁস করে দিয়েছ। কিন্তু সুধীদা, আমি কি শূদ্রাণী যে সেবা করেই আমার সদ্‌গতি ? অশোকা হলে তার বেলায় কি তুমি ওই ব্যবস্থা দিতে ?"

সুধী স্তম্ভিত হলো এ অভিযোগ শুনে।

"রাগ করলে ?" উজ্জয়িনী সুধীর আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "না, আমি সেবিকা হব না। আমার বাল্যের আদর্শ আমার নিজের ভিতর থেকে পাওয়া নয়, বাবার কাছে পাওয়া। তিনি যাঁদের ভক্তি করতেন আমিও তাঁদের ভক্তি করতে শিখেছিলুম। এতদিনে আমি তাঁর প্রভাব কাটাতে পেরেছি। এখন আমি তাঁর আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে ভ্রম করব না। পৈত্রিক ধনের জন্যেও না। আত্ম আবিষ্কার অতি কঠিন কাজ। আমি আপাতত তাই করব। স্বতঃস্ফূর্তিই আমার জীবনের আলো। সেই আলোয় যখন যা দেখতে পাই তাই আমার কর্তব্য। তুমি আমাকে কর্তব্য বাতলাবার দাবি কোরো না। কী হবে শুনি ? ব্যর্থ হবে আমার জীবন ? তার বেশি তো না ? হোক না ব্যর্থ ? ব্যর্থতারও কুহক নেই কি ?"

যে মানুষ যাবার মুখে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে সুধীর মতি হলো না। সে জানতে চাইল, "দে সরকার কোথায় ?"

"তিনি মালের সঙ্গে রওনা হয়ে গেছেন।" উজ্জয়িনী হেসে বলল, "শুনবে, সুধীদা ? আমার ধারণা ছিল তিনি বোহেমিয়ান। কিন্তু ঘরকন্না করাই তাঁর স্বভাব। রাঁধতে বাড়তে বাজার করতে জিনিসপত্র বাঁধতে তাঁর মতো ক'জন আছে ? যে মেয়ে তাঁকে বিয়ে করবে সে মেয়ের ভারী মজা—কর্তাই হবেন গিন্নী।"

সুধী বলল, "তোরা যে দেশে যাচ্ছিস তাকেও বলে বোহেমিয়া। কিন্তু সেখানকার লোক বোহেমিয়ান নয়।"

উজ্জয়িনীর সঙ্গে সুধী লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে গেল। হল্যাণ্ড ও জার্মানী দিয়ে

কার্লসবাড যাবার প্রোগ্রাম হয়েছে।

"লিভারপুল থেকে আমেরিকা নয়, লিভারপুল ষ্ট্রীট থেকে চেকোস্লোভাকিয়া।" উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "যেমন আমের বদলে আমড়া।"

দে সরকার বারবার ঘড়ি দেখছিল। যদিও সময় ছিল দেদার তবু তার ভাবখানা যেন—যাঃ গাড়ী তো ছেড়ে দিল, সহযাত্রিণী কোথায়!

এমন সময় উজ্জয়িনীকে দেখতে পেয়ে সে লুফে নিতে লাফ দিল। সুধী বলল, "সম্বর'! সম্বর'! তোমার লঙ্কা ডিঙানোর এখনো অনেক দেরি। কিন্তু তোমার হাতে ঐ গন্ধমাদনটি কিসের?"

বোকা মেয়ে কোটটাকে বন্ধ করে গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান দে সরকার সেটিকে উদ্ধার করে কাগজে মুড়ে বগলে ধরেছে। একটু পরে ট্রেন থেকে নেমে জাহাজে চড়তে হবে। তখন এই দারুণ গরমের দিনেও দিব্যি শীত করবে। কোটের খোঁজ পড়বেই।

সুধী বলল, "হাঁ, গিন্নীপনাই এর স্বভাব।"

উজ্জয়িনী ফিক করে হাসল। দে সরকার বুঝতে পারল না কেন ও মন্তব্য। অপ্রস্তুত হলো। তা দেখে উজ্জয়িনীর দয়া হলো। সে কোটটি গায়ে দিয়ে বেচারাকে অব্যাহতি দিল।

সুধী কিছু ফুল কিনে এনে উজ্জয়িনীকে দিল। বলল, "এবার তোকে বিদায় দিতে লণ্ডনের লোক ভিড় করেনি। আমিই তোকে সর্বসাধারণের পক্ষে বিদায় উপহার দিচ্ছি।"

উজ্জয়িনী বলল, "সর্বসাধারণকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সুধী বলল, "চিঠিখানা মা'কে দিতে ভুলিসনে। আর তাঁকে বুঝিয়ে বলিস কেন আমার যাওয়া হল না।"

"তিনি," উজ্জয়িনী তামাশা করল, "তোমাকে না দেখে হাহাকার করবেন। আমি বুঝিয়ে বলব পথে হারিয়ে যায় নি, আছে যেখানে ছিল সেখানে।"

দে সরকার কী সব খাবার কিনে আনল। কৈফিয়ৎ দিল, "পুলম্যান আছে বটে, কিন্তু আমরা পুলম্যানে বসে খাব না।"

"কেন পুলম্যানে বসে খাব না?" উজ্জয়িনী তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল। "পুলম্যানের সৃষ্টি হয়েছে কী জন্যে যদি আমরা সেখানে বসে না খাই? আপনি কি মনে করেছেন পুলম্যান থাকতে আমি নিজের কামরায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে খাব? এসব বিষয়ে আমি আমেরিকান।"

সুধী উজ্জয়িনীর মেজাজ জানত। সে কখনও টাকা বাঁচাবে না, যত পারে ওড়াবে।

কিন্তু দে সরকার হলো অন্ত দশজন মধ্যবিত্ত যাত্রীর মতো হিসাবী, অকারণে পুলম্যানে বসে পকেট খালি করতে তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। তাই সে নিজের খরচে দু'জনের উপযোগী পুষ্টিকর ও রুচিকর আহার্য কিনেছিল।

"না, আপনি সত্যিকার বোহেমিয়ান নন।" উজ্জয়িনী মাথা নাড়ল। "আপনি বেশ গোছালো গিন্নী। চলুন, পুলম্যানেই ওঠা যাক।"

সুধী দে সরকারকে একান্তে ডেকে নিয়ে উপদেশ দিল, "ওহে, ললিতা রায় ওকে সামলাতে পারলেন না, ও মেয়ে উড়নচণ্ডী। পুলম্যান আছে, একথা উল্লেখ করতে গেলে কেন ? ওকে বড় হোটেল, বড় দোকান ইত্যাদির ধার দিয়ে যেতে দিয়ো না। ও সব যাতে ও ভুলে থাকে তাই হবে তোমার কর্মকৌশল। কিন্তু একবার যদি ওর মনে পড়ে যায় তবে বাধা দিয়ো না। বরং উড়তে দিয়ো। তাতে ঝুঁকি কম।"

মৌনব্রত

১

বাদল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যতদিন না নিজের বাণী আবিষ্কার করেছে, নিজের কণ্ঠস্বর অর্জন করেছে, ততদিন নীরব থাকবে। প্রাণধারণের পক্ষে যে কয়টি প্রশ্ন একান্ত আবশ্যক, ভদ্রতার খাতিরে যে কয়টি উত্তর একান্ত প্রয়োজন, সেই কয়টি শব্দ কোনো মতে উচ্চারণ করবে। যেমন "দেশলাই, সার ?... ধন্যবাদ সার।" কিংবা "রুটিমাখন প্লীজ।...ধন্যবাদ মিস।" কিংবা "হ্যাঁ, দিনটি চমৎকার।"

যার কণ্ঠস্বর নেই তার তূণে তর্কশর থেকে কী লাভ ? তর্ক করতে করতে বাদলের তর্কে অরুচি ধরেছিল। তার নিজের বিচারে তার তর্ক স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কেউ কি এ কথা মেনে নেয় ? মানুষের সঙ্গে তর্ক করে কিছু শেখাও যায় না, কিছু শেখানোও যায় না, কেবল কষ্ট হয় মনের ভিতরটায়। দুনিয়াতে কষ্টের কমতি কোথায় যে ইচ্ছা করে কষ্ট বাড়াতে হবে ? যে পরের দুঃখমোচন করবে তার নিজের দুঃখ বাড়ানো উচিত নয়। বাদল তর্কের বিরুদ্ধে সতর্ক হলো।

তর্ক নয়, তর্ক মাঝারিদের জন্যে। বাদল মাঝারি নয়, অদ্বিতীয়। সে যে কথা বলবে সে কথা হবে লাখ কথার এক কথা। লক্ষ লোকের কথা ফেলে তারই কথা শুনবে বিশ্বজন। সে যখন সেনাপতির মতো আদেশ করবে, "চল" তখন যে যেখানে আছে সৈনিকের মতো চলবে। যখন নির্দেশ দেবে, "থাম," তখন যে যেখানে এগিয়েছে সেইখানে থামবে। বেশি নয়, দুটি একটি কথা। সেই কথা এমন কথা যে তার জন্যে সমগ্র জগৎ উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

কোথায় পাবে সেই কথা, বাদল ভাবে। বিদ্যা নয় যে পুঁথি ঘাঁটলেই পাওয়া

যাবে। বুদ্ধি নয় যে বুদ্ধিমানের সঙ্গে মিশলেই মিলবে। বল নয় যে ব্যায়াম করলেই লভ্য হবে। কায়িক কণ্ঠস্বর নয় যে অনুশীলন করলেই আয়ত্ত হবে। বাদল যে কণ্ঠস্বর চায়, যে বাণী চায়, তা বোবা মানুষেরও থাকতে পারে। অর্কেস্ট্রার পরিচালক কথা কন না, ইশারা করেন। অমনি বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে গর্জে ওঠে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটে আকাশের তটে আছাড় খায়, কাঁদতে কাঁদতে পিছু হটে, সাগরের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাদলকেও কথা কইতে হবে না, যদি ইশারায় কাজ চলে। কিন্তু সেই ইশারা হবে এমন ইশারা যে জনপারাবার উদ্বেল হবে, অথচ রক্তের ফেনায় ফেনিল হবে না। বিনা যুদ্ধে যুদ্ধের ফল, বিনা বিপ্লবে বিপ্লবের ফল, এই হচ্ছে বাদলের ধ্যান।

বাদল যে কণ্ঠস্বর চায় তা বিত্তের সঙ্গে বেখাপ। বিত্তবানের উক্তি যুক্তিপূর্ণ হলেও বিত্তহীনদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তার পিছনে তেমন জোর নেই যেমন জোর বিত্তহীনের উক্তির পিছনে। মানুষ প্রথমেই সন্ধান করে যে কথা বলছে সে কেমন লোক, স্বার্থপর কি নিঃস্বার্থ, নিঃস্বার্থ হলে প্রমাণ কী, জীবনে প্রমাণ আছে না শুধু বক্তৃতায়, জীবনের প্রতিকর্মে প্রমাণ আছে, না দুটি কর্মে। বিত্তহীনদের ভোলানো কিংবা মাতানো কঠিন নয়, কিন্তু তাদের প্রেরণা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা, অর্কেস্ট্রার মতো পরিচালিত করা বিষম কঠিন। তাদের incite করা এক কথা, inspire করা আরেক কথা।

তা ছাড়া বিত্তবানের উক্তি কি বিত্তবানদেরই চিত্ত জয় করবে? তারা বলবে, তুমি নিজেও তো গোদোহন করছ, অন্তত দুগ্ধ পান করছ। তোমার জিহ্বাগ্রে শোষণের বিরুদ্ধে নালিশ, কিন্তু ঠোঁটের কোণে শোষণলব্ধ ক্ষীর। ক্যাপিট্যালিস্টদের মুচকি হাসি কল্পনা করলেই বাদল লজ্জায় সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হয়। সে নিজে তাদের চেয়ে কোনো অংশে ভালো যে তার কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বজ্রের মতো ধ্বনিত হবে? তার কণ্ঠস্বর বজ্রের মতো শোনাবে তখনি, যখন সে দুধের পাত্র ঘৃণার সঙ্গে ঠেলে তাদের শ্রেণী থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। যদি ক্ষীরের লালসায় গোদোহনে লিপ্ত থাকে তবে তার দশা হবে তার কমিউনিস্ট কমরেডদের মতো। ওদের কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি ক্লীব। কেউ কানে তোলে না ওদের উক্তি, বিশ্বাস করে না ওদের যুক্তি, একটা ভিখারীও ওদের পক্ষে ভোট দেয় না, একটা ধর্মঘটও সফল হয় না ওদের দ্বারা। এর কারণ কমরেডরাও দুগ্ধপায়ী।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে বাস করে বাদল যেমন তাদের দুর্বলতা হৃদয়ঙ্গম করেছিল তেমনি নিজের দুর্বলতাও। সেইজন্যে ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারও তার ছিল না। যেমন ওরা তেমনি সে অস্থিমজ্জায় স্বাচ্ছন্দ্যবাদী। স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম ছেড়ে ওরা

বেশি দিন বাঁচে না, সে নিজেও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। যুদ্ধের মাদকতায়, বিপ্লবের উন্মাদনায় সাময়িকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেওয়া দুঃসাধ্য নয় কিন্তু কোনো রকম নেশা না করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আরামহীন জীবনযাপন মধ্যবিত্তদের সাধ্যাতীত। সত্বর একটা যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব না বাধলে ওরা মিইয়ে যাবে, ওদের কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি ধরা পড়লে শ্রমিকরা শুধু যে ওদের অবিশ্বাস করবে তাই নয়, উপহাস করবে। বাদল ওদের সঙ্গে থেকে হাস্যাস্পদ হতে চায় না। হাসিকে তার যত ভয় ফাঁসিকে তত নয়। তার কথা শুনে কেউ হাসছে কল্পনা করলে তার ইচ্ছা করে মাটিতে মিশিয়ে যেতে।

সে স্থির করেছিল ক্যাপিটালিজমের কোনো ধার ধারবে না, স্বাচ্ছন্দ্য যদিও তার অতীব প্রয়োজন তবু স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করবে। যতদিন শরীরে সইবে ততদিন অধমেরও অধম হবে, শরীর বিমুখ হলে সেও শরীরের প্রতি বিমুখ হবে। মরতে হয় মরবে, কিন্তু এমন করে বেঁচে থাকা যে মরে থাকা। অসহ্য এই অক্ষমতা, এই ক্লৈব্য। অন্যায় যে করে সে তো অপরাধী, অন্যায় যে দেখে সেও অপরাধীর সহকারী। শোষণ যারা করে তারা তো দোষীই, শোষণের প্রতিকারে যারা অক্ষম তারাও দোষের ভাগী।

একথা মনে হলেই বাদলের মাথা বন বন করে, স্নায়ু টন টন করে। কেমন একটা অহেতুক উদ্‌বেগ তাকে ভারাক্রান্ত করে। যেন এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ না করলে পর মুহূর্তে সৃষ্টি রসাতলে যাবে, মানবজাতি নির্বাপিত হবে। বুঝতে পারে না সে, এটা কি তার নিজের মনের বিকার, না সমাজের বিকারের প্রতিফল ? Tension কি তার অন্তরে, না বাইরে ? তার একার জীবনে, না ইউরোপের জীবনে ? বন বন করে তার মাথা ঘুরছে, না পৃথিবী ঘুরছে ?

এসব উপসর্গ নতুন নয়। অনিদ্রা তার পুরাতন রোগ। অনিদ্রার সঙ্গে মানবনিয়তির জিজ্ঞাসা যোগ দিলে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। এমনি অতিষ্ঠ হয়ে একদা সে গোয়েনের আশ্রমে গেল, সেখানে দেখল দুঃখমোচনের আন্তরিক প্রয়াস। বেশ তৃপ্তি পাচ্ছিল সে সেখানে, কিন্তু জানতে পেলো দুঃখমোচনের খরচ জোগায় গোলাবারুদের টাকা। দুঃখমোচন করে হবে কী, যদি যুদ্ধবিগ্রহের জালে জড়িয়ে পড়া হয়, যদি আরো দুঃখের ফাঁদে পা দেওয়া হয় ? ইংলণ্ডের বা ইউরোপের বর্তমান দুঃখ কি গত মহাযুদ্ধের প্রতিফল নয় ? হতে পারে মহাযুদ্ধ নিজেই পুঁজিবাদের প্রতিফল। কিন্তু দুঃখমোচনের কোনো অর্থ হয় না যদি দুঃখের দিকেই জগতের গতি হয়।

ভস্মে ঘি ঢালবে না বলে বাদল গোয়েনের আশ্রম ত্যাগ করল। উপলব্ধি করল যে ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই, ক্যাপিটালিজম সব অনর্থের মূল। বাস করতে গেল কমিউনিস্টদের সঙ্গে। তার প্রত্যয় হলো ব্যবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব নয়, কিন্তু পরিবর্তিত

ব্যবস্থায় দুঃখের নিবৃত্তি নেই, দুঃখেরও পরিবর্তন। ভাত কাপড় পেলেই যাদের দুঃখ যায় তাদের হয়তো যথালাভ, কিন্তু যেখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সেখানে কর্তার পতনে ব্যবস্থারও পতন। সোভিয়েট ব্যবস্থা ডিক্টেটর সাপেক্ষ হয়ে নিজের কবর নিজের হাতে খুঁড়ছে। তাছাড়া যেখানে মতভেদের যথোচিত পরিসর নেই, অপোজিশন নেই, সেখানে কর্তার ভুল ঘটলে শোধরানোর কী উপায়? যে ভুলের সংশোধন নেই, তার শাস্তি নেই কি? ইতিহাস কি সহ্য করবে চিরকাল?

কিন্তু এসব কারণেও বাদল কমিউনিস্টদের নাম ধরত না, যা হোক একটা কিছু পরীক্ষা তো চলছে। কিন্তু ঐ যে ওদের আশা যুদ্ধ বাধবে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক বিপ্লব বাধবে, ওটাকে বাদল "আশা" বলে না, "আশঙ্কা" বলে। ঐখানেই ওদের সঙ্গে বাদলের ভাষার বিরোধ। ওরা যাকে ভালো বলে বাদল তাকে মন্দ বলে। উটের পিঠে শেষ কুটো কমিউনিস্টদের দুঃখমোচনের পদ্ধতি। ও পদ্ধতি বাদলের নয়। মাথা কেটে মাথাব্যথা সারানো তার মতে কুচিকিৎসা। ওটা কি একটা উপাদেয় পরিবর্তন? ক্যাপিটালিজমে যুদ্ধ নিহিত বলে সে ক্যাপিটালিজমের বিপক্ষে, কমিউনিজমেও যদি যুদ্ধ নিহিত তবে কেন কমিউনিজমের পক্ষ নেবে?

২

অথচ বাদল শান্তিবাদীও নয়। শান্তিবাদীরা নির্বিবাদী। তারা যে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যে মনের শান্তি বিপন্ন করবে এতটুকু প্রত্যাশাও তাদের কাছে নেই। প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব তাদের কারো মুখে শোনা যায় না, যা শোনা যায় তা লীগ অব নেশনস, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক পুলিশ। তাদের ধারণা সব দেশের সৈন্যদল যদি ভেঙে দেওয়া যায় তা হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে না, শান্তিপূর্ণভাবে লীগ অফ নেশনসের দ্বারা পারস্পরিক বিরোধ ভঞ্জন হবে। যদি কোনো রাষ্ট্র লীগের সিদ্ধান্ত না মেনে নেয় তবে আন্তর্জাতিক পুলিশ গিয়ে গোলমাল থামাবে।

বাদলও এর সমর্থক, কিন্তু আগে তার যেমন উৎসাহযুক্ত সমর্থন ছিল এখন তেমন নেই। কারণ ইতিমধ্যে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে যতদিন সুদ ও মুনাফা মূলধনীদের ভোজ্য হবে ততদিন ধনিক শ্রমিকের সম্বন্ধ যেন খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ। অবশ্য ইংলণ্ডের মতো কোনো কোনো দেশে শ্রমিকদেরও হাতে দু'পয়সা জমে, তারাও তাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কে রাখে ও বাণিজ্যে খাটায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটের উপর বলা যেতে পারে যে মালিক ও মজুর যেন খাদ্য খাদক। এই দুর্নীতিকর সম্বন্ধ যতদিন না পরিবর্তিত হচ্ছে ততদিন জগতে সত্যিকার শান্তি সম্ভব নয়। পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে শান্তিস্থাপন হয়তো শান্তিবাদীদের মতে মানবকল্যাণ, কিন্তু বাদলের মতে মানবের অপমান। যাদের ন্যায়সঙ্গত

প্রাপ্য অপরে ফাঁকি দিয়ে ভোগ করছে তাদের প্রতি সুবিচার কিসে হয় সেই সর্বপ্রথম প্রশ্ন। আগে সে প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপরে লীগ অফ নেশনস্ কর, আন্তর্জাতিক বিবাদ মেটাও।

আগে ঘোড়া, তারপরে গাড়ী, এই তো নিয়ম। কিন্তু শান্তিবাদীরা ঘোড়ার সামনে গাড়ী রাখবে, গাড়ী যদি না চলে তবে গাড়ীর গলদের কথা ভেবে মাথা খারাপ করবে। যেন আরো গোটা কয়েক চাকা জুড়ে দিলে গাড়ীটা গড় গড় করে গড়িয়ে চলবে। ওদিকে ঘোড়াদুটোর একটা আরেকটাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার বেলায় শান্তিবাদীদের বিধান—চাবুক। চাবুকটা অবশ্য শ্রমিক বেচারারই ঘাড়ে পড়বে, কেননা সে কেন চুপ করে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে না, কেন লাথি মারছে। লাথি মারা যে হাঙ্গামা। কিন্তু কামড় দেওয়া? সে কাজ অলক্ষ্যে চলে, তাই হাঙ্গামা বলে গণ্য নয়। যার যা পাওনা সে তার চেয়ে কম পাচ্ছে, তার ভরছে না, এই প্রবঞ্চনা যে হাঙ্গামার চেয়েও ক্ষতিকারক, হাঙ্গামার চেয়েও দুর্নীতিকর, এ জ্ঞান যাদের আছে তারা শান্তিবাদে সান্ত্বনা পায় না। যাদের নেই তারা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে শান্তির বেহালা বাজায়। ভাবে লীগ অফ নেশনস্ যখন হয়েছে তখন যুদ্ধবিগ্রহের অর্ধেক আশঙ্কা গেছে, এখন কেবল নিরস্ত্রীকরণটা হয়ে গেলেই চিরস্থায়ী শান্তি। শ্রেণী সংগ্রাম? বাধলেও জমবে না। নিরস্ত্রদের শায়েস্তা করতে পুলিশ থাকবে যে!

যাহোক শান্তিবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারও বাদলের ছিল না। তাদের অনেকে গত যুদ্ধে জেল খেটেছে, অনেকে যুদ্ধ করে ঠেকে শিখেছে। বাদল কী করেছে যে তার কণ্ঠস্বরে নৈতিক অধিকার ধ্বনিত হবে? যার নৈতিক অধিকার নেই সে কোন অধিকারে শান্তিবাদীদের দোষ ধরবে?

সে যুদ্ধবাদী নয়, কেননা যুদ্ধের দ্বারা দুঃখমোচন হতে পারে না অথচ সে শান্তিবাদীও নয়, কেননা বিশ্বশান্তির দ্বারা শ্রেণীসংগ্রাম নিবারণ করা যায় না। তাহলে সে কোন মতবাদী?

বাদল ভাবে। সমর ও শান্তি ছাড়া তৃতীয় কোনো বিকল্প আছে কি? এমন কোনো বিকল্প যার অনুসরণে পাবে যুদ্ধ না করে যুদ্ধের ফল, বিপ্লব না করে বিপ্লবের ফল? এমন কোনো বিকল্প যার সাফল্য নির্ভর করে না দলগঠনের উপর, সঙ্ঘবদ্ধতার উপর? এমন কোনো বিকল্প যা বাদলের একার সাধ্যাতীত নয়, যা বাদলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গ্রথিত,

ঝুলন্ত হ্যামকে শুয়ে দোল খায়, সুধী সাহায্য করে। মাঝে মাঝে তারা বনস্থলীতে গিয়ে বনভোজন করে, গাছের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে পাখীদের ঘরকন্না দেখে, আকাশের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে যায়। মরি মরি কী ঘননীল আকাশ! যেন বনস্থলীর সঙ্গে নভস্থলের রূপের প্রতিযোগিতা চলেছে।

কী জানি কী ভেবে বাদল বলে ওঠে, "Treacherous!"

সুধী তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকায়।

"তোমাকে বলিনি, সুধীদা। বলেছি তোমার প্রকৃতি ঠাকুরাণীকে। চারিদিকে এত সৌন্দর্য, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের আড়ালে রয়েছে মৃত্যুবাণ। পৃথিবী যদি বিধ্বস্ত হয়ে যায়, মানুষ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তা হলেও আকাশ এমনি গাঢ়নীল থাকবে, প্রকৃতি এমনি নীলকজ্জলা।" বাদল দম নিয়ে বলল, "এরা যে আমাদের প্রতি শুধু উদাসীন তাই নয়, এরা আমাদের শত্রু, এরা আমাদের মারে।"

সুধী ছিল সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট। প্রজাপতি যেমন ফুলের মধুপানে নিবিষ্ট সুধী তেমনি প্রকৃতির মাধুরী পানে। বাদলের দিকে কান ছিল, কিন্তু মন ছিল না।

"বুঝলে, সুধীদা।" বাদল তার ধ্যান ভঙ্গ করল। "আমি যখন চিত্রের কিংবা সঙ্গীতের সৌন্দর্য উপভোগকরি তখন নিষ্কণ্টকভাবে করি। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাকে উপভোগ মুহূর্তেও সচেতন রাখে যে এর অন্তরালে বিষাক্ত কণ্টক।"

"বাদল," সুধী যেন নেশার ঘোরে বলল, "ভুলে যেতে চেষ্টা কর ও কথা। কত বড় রহস্যের সাক্ষী আজ আমরা। মেঘ নেই, কুয়াসা নেই, সুন্দরী তার অবগুণ্ঠন খুলেছে। প্রকৃতির চোখে চোখ রেখে আমরা যে আজ দেখতে পাচ্ছি তার অনন্ত অতৃপ্তি। সে মারে, কিন্তু বাঁচাবে বলেই মারে, নইলে খেলার সাথী পাবে কোথায়? দর্শক হবে কে? আমরাই তার চিরকালের রসিক সুজন!"

৯

সুধী বাদলের হিসাবনিকাশ বাকি ছিল। দিনের পর দিন চলল তাদের উপলব্ধি বিনিময়। কখনো খেতে খেতে, কখনো বেড়াতে বেড়াতে, কখনো শুয়ে শুয়ে, কখনো বনস্থলীতে বসে।

পরিশেষে বাদল বলল, "আমার ভয় হয় আমিও একজন ডিক্‌টেটর হয়ে উঠছি। জগতের আদি ডিক্‌টেটর যেমন আদেশ করেছিলেন, "Let there be light' আর অমনি 'there was light,' তেমনি আমিও বোতাম টিপে ইশারা করব, 'বর্তমান ব্যবস্থা ধ্বংস হোক' আর অমনি ধ্বসে পড়বে তার কংক্রীটের দেয়াল, ইস্পাতের ছাদ। তার পরে আবার বোতাম টিপে ইঙ্গিত করব, 'নূতন ব্যবস্থার পত্তন হোক' আর অমনি গড়ে

উঠবে—" বাদল কথা খুঁজে পেলো না, বলল, "কিসের দেয়াল, কিসের ছাদ ?"

সুধী বলল, "বাক্যের দেয়াল, স্বপ্নের ছাদ।"

"না, ঠাট্টা নয়, সুধীদা। সত্যি আমি একজন ডিক্‌টেটর হয়ে উঠছি। যাদের আমি উৎখাত করতে চাই, যাদের বাড়া শত্রু আমার নেই, শেষ কালে আমিই কিনা তাদেরই একজন হতে বসেছি। উঃ!"

"ও রকম হয়।" সুধী বলল গম্ভীরভাবে। "পশুর সঙ্গে লড়তে লড়তে মানুষ পশু হয়ে যায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এক নেশনের চরিত্র অপর নেশনে অর্শায়। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তবে নিজের মনোনীত অস্ত্রে। তা না হলে জয়ের সম্ভাবনা থাক বা না থাক, আত্মাকে হারানোর আশঙ্কা থাকে।"

"আমার ভয় হয়," বাদল কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমিও হারিয়ে ফেলছি আপনাকে। আমি আজকাল যুক্তি করিনে, তর্ক করিনে, বোতাম টিপি। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কারণ কী? কেন তুমি পাকা ইমারৎ চুরমার করবে? আমি বলব, আমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছাই যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ। একে একে আর সমস্ত স্বতঃসিদ্ধে আমি আস্থা হারিয়েছি। বাকি আছে আমার ইচ্ছা। আমার মনে হয় ইউরোপের মনীষাও ক্রমে ক্রমে যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করে ইচ্ছামার্গে পদক্ষেপ করছে। ডিক্‌টেটরশিপের বীজাণু এখন আকাশে বাতাসে। মনের সদর দরজায় পাহারা থাকলেও খিড়কি তো খোলা, সেই ছিদ্র দিয়ে শনি প্রবেশ করছে। আমার বা ইউরোপের উপায় নেই, সুধীদা। ডিক্‌টেটরকে উৎখাত করতে হলে ডিক্‌টেটরই হতে হবে।"

"যার বাইরে দ্বন্দ্ব ভিতরেও দ্বন্দ্ব সে কি কখনো জয়ী হতে পারে? জয়ের জন্য তাকে তার ভিতরের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। ইউরোপের মনীষীরা যদি জয়ের অন্য উপায় না দেখে ডিক্‌টেটরদের সঙ্গে তাল রেখে ডিক্‌টেটরবাদী হন তবে আমি আশ্চর্য হব না, বাদল। কিন্তু দুঃখিত হব, কেননা অন্য উপায় বাস্তবিকই আছে।"

"শুনি কী উপায়?"

"বাহুবলের একমাত্র প্রতিষেধ বাহুবল নয়, তা যদি হতো তবে প্রকৃতি মানুষকে নখী দন্তী বা শৃঙ্গী না করে জীবন সংগ্রামে কোন ভরসায় পাঠাত? নিরস্ত্র মানুষও সশস্ত্র মানুষকে পরাস্ত করতে পারে, যদি আত্মিক বলে বলীয়ান হতে শেখে ও অন্য কোনো বলের প্রয়োগ না করে।"

বাদল চিন্তা করল। বলল, "বিশ্বাস করতে পারিনে, সুধীদা। জোর করে বিশ্বাস করা যায় না। আত্মিক বলে আমার আস্থা নেই। অথচ বাহুবলেরও আমি মাত্রা মানি। আমার বাইরে দ্বন্দ্ব, ভিতরে দ্বন্দ্ব, আমি ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে পড়ছি, নিজেই জানিনে। আমার মনে হয় ইউরোপের মনীষাও আমারই মতো ভাসমান। মার্কসিস্টদের

তবু একটা চার্ট আছে, আমাদের তাও নেই। আমরা drift করছি অচিহ্নিত সাগরে।"

"তোর মধ্যে এই প্রথম দ্বিধা দেখছি, বাদল।" সুধী মন্তব্য করল।

"আমার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, সুধীদা। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু মানবে ছিল। মানবজাতি সহসা বিলুপ্ত হবে না, লক্ষ লক্ষ বছর বাঁচবে, ক্রমে ক্রমে প্রগতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবে, সেই শিখরের নাম স্বর্গ—এই ছিল আমার নিশ্চিত প্রত্যয়, এই ছিল আমার একান্ত নির্ভর। 'ছিল' বললুম, 'আছে' বলতে পারলুম না, বললে মিথ্যা বলা হত। এখন অবশিষ্ট যা আছে তা আমার ইচ্ছা। ইচ্ছাও একটা প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু বিশ্বাসের জোর না থাকলে ইচ্ছার জোরও ড্রাইভার না থাকা ইঞ্জিনের মতো অকর্মণ্য।"

"তবে তোর প্রথম কর্তব্য হবে বিশ্বাসের অন্বেষণ।" সুধী পরামর্শ দিল। "যদি বিশ্বাস ফিরে পাস কিংবা নতুন বিশ্বাস খুঁজে পাস তা হলে তোর অসুখ আপনি সারবে।"

"আমিও সেই কথা বলি।"

"চেষ্টা করেছিস বিশ্বাস ফিরে পেতে?"

"যথেষ্ট।" বাদল হতাশভাবে বলল, "ও বিশ্বাস ফিরবে না, সুধীদা।"

বাদল বলতে লাগল, "যদি স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হয় তবে তা হবে আমাদের গায়ের জোরে —বিশ্বাসের জোরে নয়। হবে, এতটা বিশ্বাস নেই। হতেই হবে, এই অদম্য ইচ্ছায় যদি হয়। 'It will happen'—বলতে ভরসা পাইনে। 'It must happen'—বলতে বাধ্য হই।"

"হুঁ।" সুধী অন্যমনস্ক ছিল।

"পুরোনো বিশ্বাসের তো ফেরবার লক্ষণ নেই। নতুন বিশ্বাস যদি খুঁজে পাই!" বাদল বলল। "কিন্তু নতুন বিশ্বাসের সঙ্গে যদি ইচ্ছার সামঞ্জস্য না হয় তা হলে কি আমার অসুখ সারবে? কী জানি!"

"সে প্রশ্ন পরে। আপাতত তুই কোনো নতুন বিশ্বাসের অন্বেষণ কর।" সুধী বিধান দিল। "ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, মানবে বিশ্বাস গেছে। আত্মায় বিশ্বাস—কেমন, কখনো ভেবেছিস তার কথা?"

"ভেবেছি। কিন্তু সেখানেও কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। আত্মা না হয় আছে, কিন্তু অমরত্ব?" বাদল সংশয়ের স্বরে সুধাল।

"আত্মা থাকলে অমরত্বও থাকে। যেমন ফল থাকলে ফলের বীজ। অথবা বীজ থাকলে ফলের অবশ্যম্ভাবিতা।"

"সব বীজ থেকেই কি ফল হয়?" বাদল জেরা করল। "বলতে পারো, সাধারণত হয়। কিন্তু হবেই হবে, বলতে পারো কি?"

"অবস্থা অনুকূল হলে সব বীজ থেকেই ফল হয়। হতেই হবে।"

"তা হলে," বাদল তর্ক করল, "অবস্থার উপর নির্ভর করছে ফল হওয়া না হওয়া। অমরত্ব তা হলে অবস্থাসাপেক্ষ। মরণের পরে আমি থাকতেও পারি, নাও পারি। জন্মাতেও পারি, নাও পারি। একদম নিবে যেতে পারি, নাও পারি। এ সব কি আমি ভাবিনি, ভাই সুধীদা? কত ভেবেছি। ভেবে কোনো কূল কিনারা পাইনি। যে দিন ভালো খাই, ভালো ঘুম হয়, ভালো হজম হয়, শরীরটা ভালো লাগে সেদিন মনে হয় আমি বাঁচব, মরে গেলেও বাঁচব। যেদিন তার উল্টো সেদিন মনে হয় আমি বেশি দিন বাঁচব না, মরলে আমার চিতার আগুনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আলোকেরও নির্বাণ।"

সুধী শুধু বলল, "কী করি? তুই তো ইনটেলেকটের জবানবন্দী ছাড়া আর কোনো প্রমাণ স্বীকার করিসনে। ইনটেলেকটের পাল্লার বাইরে যেসব সত্য রয়েছে তারা তোর বিচারে অসিদ্ধ। একটু আধটু ইনটুইশনের চর্চা কর, বাদল।"

"তাও কি করিনি?" বাদল স্মরণ করল ও করাল। "গোয়েনের ওখানে তবে কী করেছি? সেন্ট ফ্রান্‌সিস্ হলেও অনুভূতি কি ইনটুইশন লব্ধ ছিল না?"

সুধী নীরবে মানল।

"কিন্তু," বাদল জবাবদিহি করল, "ইনটুইশনের দ্বারা যা পেয়েছি তাকে ইনটেলেক-টের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি, করে সন্তুষ্ট হইনি। সেইজন্যে চর্চা ছেড়ে দিয়েছি, সুধীদা।" জুড়ল, "নইলে ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো প্রেজুডিস নেই।"

"ইনটেলেকট দিয়ে কি সব কিছু যাচাই করা যায়?" এই বলে সুধী আবৃত্তি করল—

"কমলবনে কে আসিল সোনার জহুরী
নিকষে পরখে কমল আ মরি আ মরি!"

বাদল মুগ্ধ হয়ে বলল, "চমৎকার। কিন্তু, ভাই, সোনার জহুরীর যে ওই একটি-মাত্র নিকষ। কমলের জন্যে সে আর একটা নিকষ পাবে কোথায়! আমার সবে ধন নীলমণি আমার ইনটেলেকটের কষ্টিপাথর।"

সুধী বলল, "তা হলে তুই কোনো দিন এই বিশ্বব্যাপারের মর্মভেদ করতে পারবিনে। রিয়ালিটি তোর জ্ঞানবুদ্ধির অতীত হয়ে রইবে। তোকে দিয়ে হবে বড় জোর সমাজের ও রাষ্ট্রের ওলটপালট—"

বাদল খপ করে কথা কেড়ে নিল। বলল, "তাই হোক, সুধীদা। তাই হোক। তা হলেই আমি কৃতার্থ হব, আমার তার বেশি কাম্য নেই। তবে, হাঁ—আমি যা চাই তা ঠিক ওলটপালট নয়, আমি চাই বিনা ওলটপালটে ওলটপালটের ফল।"

সুধী হাসল। "ইনটেলেকটকে তুই শানিয়ে তুলেছিস, দেখছি। যদি বিশুদ্ধ মননের

কোনো পুরস্কার থাকে তবে সে পুরস্কার তুই পাবি। যদি শাণিত বুদ্ধির দ্বারা শোষণের জাল কাটে তবে তোর এই শান দেওয়া তরবারি ব্যর্থ হবে না, ভাই।"

"ইনটেলেকটের অক্ষমতা কত তা কি আমি বুঝিনে, সুধীদা ?" বাদল আর্ত স্বরে বলল। "কিন্তু আমার যে আর অন্য অস্ত্র নেই। প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শাণিত করছি ওকে, কিন্তু জলন্ত বিশ্বাস ভিন্ন কে ওকে চালনা করবে ?"

১০

সুধী চিন্তা করে বলল, "ঈশ্বরে কিংবা মানবে বিশ্বাস নেই, আত্মায় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তোর সেই সোশ্যাল জাস্টিসের কী হলো ? তাতে বিশ্বাস আছে নিশ্চয় ?"

"সে পথে সংঘাত অপরিহার্য।"

"হলোই বা !"

"না, ভাই, আমি সংঘাতের মধ্যে নেই। সংঘাত এ ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। যদি শ্রমিক পক্ষে যোগ দিই তবে আমার আপনার লোকদের ঘরে আগুন দিতে হবে, কারখানা ছারখার করতে হবে, খুন জখম লুটতরাজ তাও করতে হবে। যদি ধনিক পক্ষে যুক্ত থাকি তবে যাদের প্রতি আমার এত দরদ তাদের উপর গুলি চালাতে হবে, তাদের পাড়ায় বোমা ফেলতে হবে, তাদের জোট ভেঙে কাঁদুনে গ্যাস থেকে শুরু করে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর থেকে সব দেশের ধনিকরা সতর্ক রয়েছে। এখন তাদেরই এক্তারে সব চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র, যার সঙ্গে তুলনায় শ্রমিক-দের অস্ত্র অক্ষম।"

সুধী ধীরভাবে শুনছিল। বলল, "শ্রমিকরা যদি আত্মিক অস্ত্রের উপর আস্থা রেখে আর সব অস্ত্র বর্জন করে তবে তাদের সঙ্গে তুলনায় ধনিকদের অস্ত্র নিষ্প্রভ !"

"ওসব বুঝিনে।" বাদল বধির হলো। "বুঝি শুধু এই যে সংঘাত যেদিন বাধবে সেদিন দু'পক্ষেই আমাকে টানাহেঁচড়া করবে, না পেলে দু'খানা করবে। নিরপেক্ষতার অবকাশ দেবে না। মধ্য শ্রেণী যে মধ্যস্থতা করবে তেমন প্রতিপত্তিও তার নেই। মাঝ-খান থেকে তারই সব চেয়ে বিপদ, কারণ বাদুড়কে কোনো পক্ষই বিশ্বাস করে না। নাম ভাঁড়িয়ে, বুলি আউড়িয়ে, ভেক বদল করে বেশি দিন সে বাঁচবে না, বাঁচলেও পালিয়ে বাঁচবে। সুতরাং সংঘাত যাতে না বাধে সেই চেষ্টাই করতে হবে প্রাণপণে, যাতে এক পক্ষ আপোসে অপর পক্ষের দাবী মেনে নেয়, অর্ধেক ছেড়ে দেয়, তাই করতে হবে সময় থাকতে। অন্যথা সংঘাত অপরিহার্য। একবার আরম্ভ হলে আর রক্ষা নেই, সুধীদা। কোনো পক্ষই বাঁচবে না, যারা নিরপেক্ষ তারাও মরবে।"

বাদল এমন সবিস্তারে বলল যেন তৃতীয় নেত্রে দেখতে পাচ্ছিল। দেখছিল আর শিউরে উঠছিল।

"শ্রমিকেরা যেদিন প্রস্তুত হবে ধনীরা সেদিন অর্ধেক কেন, সমুদয় ছেড়ে দেবে, বাদল। কিন্তু প্রস্তুত হওয়া কেবল অহিংস অর্থেই সম্ভব, অন্য কোনো অর্থে তারা কোনো দিনই প্রস্তুত হবে না, কারণ প্রতিপক্ষ তাদের প্রস্তুত হতে দেবে না। তুই নিজেই তো বলছিস রাশিয়ার অভিজ্ঞতার পর থেকে ধনিকরা সতর্ক রয়েছে। আমিও তোর সে উক্তি সমর্থন করি।"

"তা হলেও," বাদল বলল, "শ্রমিকরা চিরকাল পড়ে পড়ে সইবে না। পায়ের তলার পোকাও পায়ে কামড় দেয়। শ্রমিকরা যেদিন মরীয়া হয়ে উঠবে সেদিন যা হাতে পাবে তাই দিয়ে মারবে—ও মরবে।"

সুধী স্বীকার করল না। "ধনিকেরা তাদের মরীয়া হয়ে উঠতে দেবে কেন? মজুরি বাড়িয়ে দেবে, ছেলেকে বিনা বেতনে পড়াবে, গুণের ছেলেকে জামাই করবে, যদি কিছুতেই তাদের মন না পায় তবে দেশে দেশে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তাদের বলবে, এবার সামলাও।"

বাদল রাগে ফোঁস ফোঁস করছিল। বলল, "অসম্ভব নয়। কিন্তু লড়াই একবার বাধলে যারা বাধাবে তারাও বাঁচবে না, দেখো। তাদের নিজেদের ফাঁদে তারাও পড়বে নির্ঘাত।"

সুধী হেসে বলল, "পড়া উচিত, পড়লে ন্যায়বিচার হয়। কিন্তু পড়বে কি? ওরা যে বড় সাবধানী পাখী।"

"পড়বেই, পড়বেই, পড়বেই।" বাদল যেন অভিসম্পাত দিল। "দেশে দেশে যদি যুদ্ধ বাধে তবে এক পক্ষের ধনীর অস্ত্রে অপর পক্ষের ধনীও মরবে। বিষবাষ্প তো ধনী দরিদ্র বিচার করে না। বোমাও সে বিষয়ে নির্বিচার।"

"কে জানে! আমার তো মনে হয় ওতে ওরা জব্দ হবে না। বরং ওতে ওদেরই সুবিধা হবে। দু'পক্ষেই মোড়লি করবে ওরা, মোড়লরা দরকারী লোক, দরকারী লোক পিছনেই থাকে, মরে কম।"

"মরবেই, মরবেই, মরবেই।" বাদল আবার অভিসম্পাত দিল। "তুমি লিখে রাখতে পারো আমার কথা। মিলিয়ে দেখো। ওরাও মরবে, গরিবরাও মরবে। যারা বাঁচবে তারা কিছুদিন বাদে ফের লড়বে ও মরবে। এ ব্যবস্থায় কেউ বাঁচতে পারে না। এতে লিপ্ত রয়েছে যারা তাদেরও মরণ অনিবার্য। হয় শ্রেণী সংগ্রামে মরবে, নয় জাতি সংগ্রামে মরবে। হয় এক সংগ্রামে মরবে, নয় একাধিক সংগ্রামে। কিন্তু মরবেই, যদি না এ ব্যবস্থা বদলায়।"

বাদলকে চটানো তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সুধী শুধু বলল, "অন্যান্য দেশের ভার আমার উপরে নয়। আমি কেবল ভারতের জন্যেই দায়ী। আমি আমার দেশ-বাসীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করব যে এক পক্ষ যখন নিতে প্রস্তুত হবে অপর পক্ষ তখন দিতে প্রস্তুত হবে। চাষীরা যখন জমির মালিক হতে চাইবে মালিকরা তখন জমি ছেড়ে দিতে চাইবে। জমি ছেড়ে দিয়ে কারুশিল্পে মন দেবে।"

"তাতেও শোষণ চলে।" বাদল সহজে ছাড়ল না। "সেটাও শোষণব্যবস্থার অঙ্গ। সুধীদা, তুমি বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করতে শেখ।" পরামর্শ দিল বাদল।

"আমি হাতে কলমে কাজ করব, বাদল। বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা বৈজ্ঞানিকরাই করুন।"

"উহুঁ। হাতুড়ের কর্ম নয়।" বাদল ঘাড় নাড়ল। "খুব ভালো করে বুঝে দেখতে হবে ক্যাপিটালিজম বস্তুটা কী। জমি থেকে মূলধন উঠিয়ে নিয়ে তুমি চরকায় ঢালবে, কিন্তু তোমার মুনাফা তো তুমি মকুব করবে না। মুনাফার জন্যে চাষীর রক্ত শুষছিলে, তাঁতীর রক্ত শুষবে। মশা এক জনের গা থেকে উড়ে গিয়ে আরেক জনের গায়ে বসে। তাতে রক্ত শোষণের পাত্র বদলায়, শোষণ যায় না। সমস্ত মূলধন ব্যক্তির তহবিল থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের তহবিলে রাখতে হবে, এ হচ্ছে প্রথম কাজ। তার পরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব জনকতক শাসকের মুঠোর ভিতর থেকে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের আয়ত্তে আনতে হবে, এ হলো দ্বিতীয় কাজ। রাশিয়ায় এখনো দ্বিতীয়টা হয়নি, স্টালিনের দল জনসাধারণের বকলমে নিজেদের খেয়ালমতো অর্থব্যয় করছে। তবু সে দেশে প্রথমটা তো হয়েছে। বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত বাদ দিয়ে তোমরা যদি ও দুটো কাজ করতে পারো তা হলেই জানব তোমরা চাষী ও তাঁতী উভয়েরই মিত্র। নতুবা তোমরা মিত্র কারো নও, শোষক একের পর অপরের। তুমি, সুধীদা, অবশ্য আদর্শবাদী। কিন্তু যাদের সঙ্গে তোমার কারবার তারা কেউ আদর্শবাদী নয়। চাষী ও তাঁতী তোমার আদর্শবাদ বুঝবে না। বুঝবে তুমি মুনাফা নিচ্ছ কি নিচ্ছ না, সেই অনুসারে তোমাকে বিচার করবে।"

সুধী মনঃস্থির করেছিল। স্থির কণ্ঠে বলল, "মুনাফা আমি চাষীর কাছ থেকে না নিলে তাঁতীর কাছ থেকে নেব। নিয়ে ওদের জন্যেই খরচ করব, অবশ্য নিজেকে একেবারে বঞ্চিত করব না। মশা তো রক্ত ফিরিয়ে দেয় না, কেন তবে মশার সঙ্গে তুলনা করছিস ?"

"তুলনাটা যদি তোমার মনে লেগে থাকে আমাকে মাফ কোরো, ভাই সুধীদা। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা যদি কাম্য হয় তবে মুনাফার জড় মারতে হবে। প্রাইভেট প্রফিট হচ্ছে এ ব্যাধির ব্যাসিলি। তবে, হাঁ, রোগের জড় মারতে গিয়ে রোগীর ধড়

মারতে যাওয়া বেকুবি ! কোনো কোনো ডাক্তার ঠিক হাতুড়ের মতোই বেকুব। সেইজন্যে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে ধরে নিতে নেই রক্তগঙ্গা বইয়ে না দিলে প্রাইভেট প্রফিট ভেসে যাবে না।"

"আমি কিন্তু প্রাইভেট প্রফিটকে রোগের জড় বলে ভুল করব না।" সুধী দৃঢ়তার সহিত বলল। "তোর বৈজ্ঞানিকরা রোগ নির্ণয় না করেই রোগের জড় মারছেন। ওটা আন্দাজী চিকিৎসা। টাইফয়েডে যেমন কুইনিন।"

"তবে তোমার মতে রোগটা কী ?"

"আমিও মানছি যে শোষণ চলেছে, আমিও চাই যে শোষণের অবসান হোক, কিন্তু আমার মতে," সুধী সবিনয়ে বলল, "অন্তরের পরিবর্তন না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। যদি অন্তরের পরিবর্তন হয় তবে প্রাইভেট প্রফিট থাকলে ক্ষতি কী ? রাষ্ট্র কি আমার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ ? আমার চেয়ে বেশি দরদী ? ওটা তো একটা মেশিন। চাষীরা ও তাঁতীরা আমার কাছে যদি দু'চার পয়সা ঠকে তো সে পয়সা আমাকে ঠকিয়ে ফেরৎ নেবে। কিন্তু রাষ্ট্র যে নিজের খোশখেয়ালে চাষীকে মিলহ্যাণ্ড তাঁতীকে মেকানিক বানিয়ে ভিটেমাটি ছাড়াবে। সংস্কার হারিয়ে, সংস্কৃতি হারিয়ে, নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতো তারা কোথায় তলিয়ে যাবে ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।"

"বুঝেছি।" বাদল একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলল, "তোমার মনোগত অভিপ্রায় এই যে চাষীরা চাষীই থাকুক, তাঁতীরা তাঁতী। প্রগতি হবে না, মানব সভ্যতা চিরকাল পায়চারি করতে থাকবে ফিউডাল যুগে। ধিক্ !"

"না, প্রগতি হবে না, প্রগতি বলতে যদি বোঝায় দিশেহারা দরিয়ায় গা ভাসানো। পশ্চিমের লোক যে drift করছে তা তুই নিজেই বলেছিস। ভারতের লোক দিশেহারা হবে না, দৃষ্টিমান হবে। অন্তরের পরিবর্তনই মুখ্য, আর সব গৌণ।"

বাদল কানে হাত দিয়ে বলল, "থাক, প্রগতিনিন্দা শুনব না।"

১১

সুধী কিন্তু আনন্দ বোধ করল। বলল, "ওরে, তোর অসুখ সারবে।"

বাদল আশ্চর্য হলো। "সারবে ? কী করে বুঝলে ?"

"এখনো যে তোর একটা বিশ্বাস রয়েছে। প্রগতিতে বিশ্বাস।"

"ওহ্ !" বাদল সংশোধন করল। "প্রগতি যে হবেই, এ বিশ্বাস আর নেই। কিন্তু প্রগতি যে হওয়া উচিত, এ বিশ্বাস এখনো আছে। বোধ হয় এই বিশ্বাস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

"তা হলে তোর বিশ্বাসে আঘাত লাগে এমন কিছু বলা অন্যায় হবে। যদি তেমন

কিছু বলে থাকি তবে ক্ষমা চাইছি, বাদল।"

"না, না। ক্ষমা চাইতে হবে কেন?" বাদল ব্যস্ত হয়ে বলল। "আমি কি জানিনে তুমি প্রগতিবাদী নও। তুমি তো নতুন কিছু বলনি।"

দু'জনে অনেকক্ষণ নির্বাক থাকল। মনে হল সব কথা ফুরিয়েছে।

তার পরে বাদল প্রশ্ন করল, "তুমি আজকাল কী ভাবো, সুধীদা? তোমার বিশ্বাসের কি তিলমাত্র পরিবর্তন হয়েছে?"

"আমার?" সুধীর ধ্যান ভাঙল। "হাঁ। আমিও মানুষ। আমারও একটা-আধটা ইস্ক্রুপ আলগা হয়েছে।" এই বলে হাসল।

"যে শক্ত মানুষ তুমি!" বাদলও হাসল, "ইস্ক্রুপ আলগা হওয়াও অলৌকিক ঘটনা।"

"একদিক থেকে আমি তোর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি।" সুধী বাদলকে খুশি করে তুলল। "আগে আমার ধারণা ছিল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির ঠোকাঠুকি বাধলে সমাজ সব সময় অভ্রান্ত, ব্যক্তি সব সময় ভ্রান্ত। এখন সে ধারণা শিথিল হয়েছে।"

"তাই নাকি?" বাদল উচ্ছ্বসিত স্বরে অভিনন্দন জানাল।

"হাঁ। আমাদের দেশে আমরা বহু শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রের মালিক নই। আমাদের যা কিছু কর্তৃত্ব সমাজকে ঘিরে। সমাজের উপর আমরা সেই সব গুণ আরোপ করেছি যে সব গুণ রাষ্ট্রের উপর আরোপ করা হয় ইউরোপের কোনো কোনো দেশে। কোনো কোনো দার্শনিকের রচনাতেও।"

"আমার নাচতে ইচ্ছা করছে, সুধীদা।" বাদল করুণ স্বরে বলল। "কিন্তু নাচব কী করে! কোমরে ব্যথা।"

সুধী তাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, "তুই নাচতে চাস কোন সুখে? তুই না বলছিলি ব্যক্তির ধন সমাজের তহবিলে দিতে?"

"কিন্তু এই শর্তে যে ব্যক্তি তার উপর খবরদারী করবে।" বাদল উত্তর দিল সপ্রতিভ ভাবে।

সুধী চিন্তান্বিত হলো। বলল, "থিওরী হিসাবে মন্দ নয়। কার্যত অচল। কিন্তু আমার কথা চলছিল, আমার কথাই চলুক।"

"বেশ, আমি কান পেতেছি।"

"বলছিলুম, রাষ্ট্র বা সমাজ সব সময় অভ্রান্ত এ ধারণার ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়েছে। রাষ্ট্র আমাদের দেশ পরহস্তগত, সুতরাং রাষ্ট্র সম্বন্ধে এমন ধারণা সহজেই শিথিল। সমাজ আমাদের স্বহস্তে, সেই জন্যে সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণার শৈথিল্য আমার নিজের কাছেই অপ্রীতিকর। কিন্তু কী করব, সত্য কি সকলের ঊর্ধ্বে নয়!"

বাদল মাথা নেড়ে তারিফ করল। সুধী বলতে লাগল।

"বস্তুত সমাজ ও রাষ্ট্র একই মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ। আমরা যে ওদের বিচ্ছেদ কল্পনা করেছি তা কেবল বিদেশীর দ্বারা হৃতরাষ্ট্র হয়ে। ভুল রাষ্ট্রেরও হয়, সমাজেরও হয়। অন্যায় রাষ্ট্রও করে, সমাজও করে। রাষ্ট্রের বিধান অমান্য করা বিধেয় হলে সমাজের বিধি অমান্য করাও বৈধ। তা হলে আমি কোন স্পর্ধায় বিচার করতে যাব উজ্জয়িনীকে?"

ওর জন্যে বাদল প্রস্তুত ছিল না। কেন ও কথা অসময়ে উঠল? বাদলের জিজ্ঞাসু ভাব লক্ষ করে সুধী বলল, "শোন, সেদিন উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখেছিলুম আসতে। লিখেছিলুম, স্বামীর অসুখ, স্ত্রীর কর্তব্য সেবা। তার জবাব পেয়েছি। সে বলে, বাদলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সেবা করতে পেলে ধন্য হব। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে নয়। আমি স্বকীয়া।"

"ঠিকই বলেছেন।" বাদল উজ্জয়িনীর পক্ষ নিল। "কিন্তু চিরকৃতজ্ঞ কেন? আমি তো তাঁর উপকার করিনি, বরং অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাসত্ত্বে অপকার করেছি।"

"যাক, সে তো আসছে। তখন বোঝাপড়া হবে। কিন্তু সধবা মেয়ের মুখে স্বকীয়া শুনলে আমার সংস্কারে আঘাত লাগে। শুধু সধবার মুখে কেন, কুমারীর মুখে, বিধবার মুখেও। ও কথা মুখে আনতে পারে তারাই যারা সমাজের বাইরে চলে গেছে। যারা পতিতা।"

"অত্যন্ত বর্বর সংস্কার।" বাদল উত্তেজিত হলো। "পুরুষ যদি বলে, আমি স্বকীয়, সকলে সাধুবাদ দেয়। নারী বললেই সংস্কারে বাধে।"

"আমি তোকে সেই জন্যেই বলেছিলুম যে নারীকে বিচার করবার অধিকার আমার নেই, যদিও সে নারী আমার সহোদরার অধিক।"

"তোমার অন্তরের পরিবর্তন হয়েছে। এইটেই মুখ্য, আর সব গৌণ।" বাদল সুধীর উক্তি সুধীকে ফিরিয়ে দিল, দিয়ে কৌতুক অনুভব করল।

সুধী কিন্তু হাসল না। তলিয়ে গেল চিত্তের অতলে।

"তুমি যে আমার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছ," বাদল বলল, "আমি এতে খুশি। তুমি বোধ হয় খুশি নও।"

"না, আমিও। তোর কাছে আসতে কি আমি কম উৎসুক, বাদল? তুই আর আমি কি ভিন্ন? কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ইনটেলেকট ছাড়া তুই অন্য কোনো ভাষা বুঝিসনে, ইনটুইশনকেও ইনটেলেকটের দ্বারা তর্জমা করে নিস। তোর প্রাণ যদি বলে, এটা সত্য, তোর মন বলে, প্রমাণ কী? আমি কিন্তু মনের প্রাধান্য স্বীকার করিনে। আমার ধ্যান যদি বলে, এটা সত্য, আমার মন

সেটা মেনে নেয়। নিতে বাধ্য। মনকে আমি সেই ভাবে তালিম করেছি। তুই যদি তোর মনটাকে ডিসিপ্লিন করতে পারতিস তবে কি তোর সঙ্গে আমার লেশমাত্র ব্যবধান থাকত রে!" সুধী সস্নেহে তাকাল।

বাদল ভাবল। ভেবে বলল, "সত্যি আমার মনটা উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল বলেই সে নিত্য নতুন আইডিয়া আবিষ্কার করে। তোমাদের কাছে আমি ক'টাই বা প্রকাশ করতে পারি! দিন রাত কত অজস্র আইডিয়া আসে কী জানি কোনখান থেকে—ভিতর থেকে কি বাইরে থেকে! সেই সব রঙিন প্রজাপতি কি আসত আমার কাছে, বসত আমার হাতে, যদি না আমি শিশুর মতো কৌতূহলী হতুম? শিশুর মতো উচ্ছৃঙ্খল?"

"আছে তোর মধ্যে একটি চির শিশু।" সুধী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল। "আর আমার মধ্যে একজন চির স্থবির। আমি যে অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আর তুই কোনো রকম উত্তরাধিকার মানিসনে। না পিতৃধনের, না পৈত্রিক বিত্তের, না পৈত্রিক সত্যের।"

"অনেক সময় শিশুর মতো অসহায় বোধ করি, সুধীদা।" বাদল কবুল করল। "উত্তরাধিকারের নিরাপদ আশ্রয় একটা মস্ত বড় জিনিস।"

সুধী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল. "পাখীরা আকাশে ওড়ে। কিন্তু উড়তে পারত কি, যদি না তাদের নীড় থাকত মাটিতে? তেমনি মানুষেরও একটা দেশ থাকা দরকার। তুই যদি ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী হতে পারতিস তবে কথা ছিল না. কিন্তু তুই দুই দেশের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। ভারতের ধন থেকে স্বেচ্ছায়, ইংলণ্ডের ধন থেকে অনিচ্ছায়।"

বাদল একটু উষ্ণ হয়ে বলল, "ইংলণ্ডের ধন থেকে বঞ্চিত কী করে জানলে?"

"কারণ. না কন্‌সারভেটিভ, না লিবারল. না লেবার. কারো সঙ্গেই তোর খাপ খায় না। তোর নিজের অলক্ষ্যে তোর মনের ধাঁচ কন্টিনেন্টাল হয়েছে। কতকটা কমিউনিস্ট. কতকটা য়্যানার্কিস্ট। তুই যখন লিবার্টির কথা বলিস তখন সেটা ক্রোচে কথিত লিবার্টি। বাদল, তোর ইংলণ্ডে থাকা না থাকা সমান।"

বাদল বিষম শক্ পেল। সামলে নিতে তার সময় লাগল।

"সুধীদা." সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল. "সত্য সকলের উর্ধ্বে। ইংলণ্ড একদা আমার দেশ ছিল। এখন নয়।"

"তা হলে," সুধী আবেগভরে বলল. "তুই আমার সঙ্গে ভারতে ফিরে চল।"

"ভারত," বাদল প্রতীতির সহিত বলল, "কোনো দিন আমার দেশ হবে না।"

"তবে তুই যাবি কোথায়? কন্টিনেন্টে?"

"না, সেখানেও আমার খাপ খাবে না। আমি সব জায়গায় বেখাপ। কাজেই

কোনো জায়গায় যাব না। যেখানে আছি সেখানেও থাকব না।"

স্থধী বিহ্বল স্বরে সুধাল, "তার মানে কী. পাগল ?"

"জানিনে।" বাদল তার চুল টানতে টানতে বলল, "আমার দেশ নেই, এ যুগ আমার কাল নয়। আমার কেউ নেই, আমি একক। কেন তবে আমি থাকব ? কে আমাকে চায় ?"

"ও কী বকছিস্, বাদল !" সুধী তাকে শাসন করল। "তোর কেউ নেই কী রকম ! আমি রয়েছি, তোর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তোর কত কাছাকাছি এসে পড়েছি, আরো কাছে আসব, তুই সঙ্গে চল।"

"বৃথা সান্ত্বনা দিচ্ছ, সুধীদা। তোমাদের এই শৃঙ্খলাবদ্ধ **determined** জগতে আমার ঠাঁই নেই। আমি উচ্ছৃঙ্খল **free will.**"

আমার কথাটি ফুরাল

১

চার সপ্তাহ পূর্বে সে যখন যায় তখন বালিকা। চার সপ্তাহ পরে সে যখন ফেরে তখন পূর্ণবয়স্কা নারী। কার্ল্‌স্‌বাডের জলে কি যাদু আছে ? বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সুধী।

স্তম্ভিত হলো যখন উজ্জয়িনী তাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। ট্যাক্‌সি তখনো দাঁড়িয়ে. যদিও পথে তেমন লোক চলাচল ছিল না। সুধীদের পাড়াটি নিস্তব্ধ, শনিবারের বন্ধে প্রতিবেশীরা শহরের বাইরে। তা হলেও গেটে ঢুকতে না ঢুকতে আচমকা একটা প্রণাম—নেহাৎ গাছপালার আড়াল ছিল বলেই রক্ষা—একেবারে অভূতপূর্ব ব্যাপার।

স্তম্ভিত হয়েও তার সেদিন নিষ্কৃতি নেই। উজ্জয়িনী একান্ত শান্তভাবে নিতান্ত লক্ষ্মীটির মতো সুধাল, "দাদা, ভালো আছো তো ?"

সুধী বলল, "হ্যাঁ। তুই ?"

"যেমন দেখছ।" এই বলে একটু মিষ্টি হেসে উজ্জয়িনী প্রশ্ন করল "বাদলদা কেমন আছেন ?"

হতভম্ব সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করল, "কী বললি ?"

"বলছিলুম," উজ্জয়িনী স্নিগ্ধস্বরে পুনরুক্তি করল, "বাদলদা কেমন বোধ করছেন ?"

বাদল কবে থেকে এর দাদা হলো ! সুধীর রক্তে সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার টগবগিয়ে উঠছিল। সে একটা গর্জন ছাড়বে কি না চিন্তা করছে এমন সময় যা শুনল তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, ব্রহ্মতালুতে তাল পড়ল।

"মহিম খুড়োকে খবর দেওয়া হয়েছে?" উজ্জয়িনী নিরীহভাবে বলল।

মহিম খুড়ো! শ্বশুরকে খুড়ো বলা কবে থেকে ফ্যাশন হলো! সাম্প্রতিক মেয়েরা কি ভাশুরকে দাদা বলেই শান্ত নয়, শ্বশুরকে খুড়ো বলে? ওঃ! একেই কি বলে প্রগতি!

বাদল তখন বাগানে শুয়ে মনে মনে বোতাম টিপছিল। উজ্জয়িনী তার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "বাদলদা, প্রণাম।"

বাদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে বসল। বলল, "প্রণাম? নমস্কার। হাউ ডু ইউ ডু?"

ওদিকে সুধী দে সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করছিল। এসব কী! ও মেয়ে তো এমন ছিল না।

ভিজে বেড়ালটি সেজে দে সরকার বলছিল, "কী জানি! আমিও তো তাজ্জব বনেছি। দেখছ না, আমার গা দিয়ে কেমন ঘাম যাচ্ছে।"

"সেদিন ওকে নিয়ে এলুম লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে।" সুধী গজগজ করছিল। "এখনো একটা মাস পুরো হয়নি। এর মধ্যে কী এমন ঘটল! ওর দুষ্টুমি আমার বেশ ভালো লাগত, কিন্তু এই শিষ্টামি — ওঃ!"

দে সরকার সহানুভূতির স্বরে বলছিল, "ওঃ! মহিম খুড়ো!"

"সত্যি অসহ্য।"

"আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম। রীতিমতো অসহ্য।"

"আমার মাথা ঘুরছে হে।"

"তোমার তো শুধু মাথা, আমার সর্ব শরীর। ওঃ! মহিম খুড়ো!"

মাথায় জল ছিটিয়ে সুধী যখন বাদল উজ্জয়িনীর কাছে এলো তখন ওরা দিব্যি জমিয়ে বসেছে।

উজ্জয়িনী বলছে বাদলকে, "আপনার ও চিঠি আমি পাইনি। পেলেও বিয়েতে মত দিতুম। বিয়ে না করলে মা বাপের অধীনতা থেকে মুক্ত হতুম কী উপায়ে!"

"কিন্তু বিয়ে করেও যে পরাধীন হলেন।" বাদল মন্তব্য করল।

"আপনি যে তার থেকেও আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমার মতো সুখী কে?"

"আমার কিন্তু ধারণা ছিল আপনি সুখী হননি।"

"আমারও সে ধারণা ছিল। এখন বুঝেছি স্বাধীনতাই সংসারের সেরা সুখ। একবার যে এ সুখের আস্বাদন পেয়েছে সে অন্য কোনো সুখ চায় না, বাদলদা।"

"তা হলে আমাকে মার্জনা করেছেন?"

"আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে বার বার আঘাত করে আমার

অধীনতার মোহ ভাঙিয়েছেন, আমাকে স্বাধীনতার দীক্ষা দিয়েছেন।"

"আঘাতের জন্যে আমি লজ্জিত।"

"সে আপনার মহত্ত্ব। তা ছাড়া নারী হিসাবেও আমি আপনার কাছে ঋণী। আমাকে আপনার দখলে পেয়েও আপনি কোনোরূপ সুযোগ নেননি। এর দরুন একদা আমার অভিমান ছিল। এখন দেখছি খুব বেঁচে গেছি। নইলে নিজেকে মনে হতো ভ্রষ্টা।"

সুধী যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। বসল না। সে কি শুনতে প্রস্তুত ছিল এ ধরনের কথা! ছি ছি! কত আশা করে সে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখেছিল। ভেবেছিল এক বাড়িতে থেকে হামেশা মেলামেশা করে পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে তারা অবশেষে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছবে। হা হতোঽস্মি!

দে সরকার ইতিমধ্যে রন্ধনশালায় অনধিকারপ্রবেশ করে চায়ের আয়োজন করছিল। সুধীকে দেখে বলল, "তুমি তো নিমন্ত্রণ করবে না। অগত্যা নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করেছি।"

সুধী জানতে চাইল, "কই, বাদলের শাশুড়ী এলেন না যে?"

"বাদলের শাশুড়ী!" দে সরকার যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার ইচ্ছা করছিল বলতে, আমার শাশুড়ী। কিন্তু সাহস ছিল না। বলল, "মিসেস গুপ্ত কী করে আসবেন? তাঁর যে হপ্তায় হপ্তায় বাথ নিতে হয়। তিনি তোমাকে চিঠি লিখেছেন। দেব।"

"কিন্তু বাড়িতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই যে। উজ্জয়িনীর অসুবিধা হবে।" সুধী উদ্‌বেগ প্রকাশ করল।

"ওঃ! এই কথা!" দে সরকার বলল, "কী চাও? ঝি, না র'াধুনি, না শাপেরোন? কবে চাও? আজ, না কাল, না দু'দিন পরে?"

সুধী এ বিষয়ে চিন্তা করেনি। বিবেচনার জন্যে সময় নিল।

"বেশ, দরকার হলেই সরকারকে বোলো। কিন্তু আমি কী অভদ্র। পেটের সেবায় লেগে গেছি, ওদিকে বাদলের সেবা দূরে থাক, সে কেমন আছে খবরটাও নিইনি। চল হে, চায়ের ভেট নিয়ে তাকে সন্দর্শন করি।"

বাদলের সম্মুখীন হতে তার যেমন সঙ্কোচ তেমনি কুণ্ঠা। গিয়ে হাজির হলো বটে, কিন্তু শরমে নীরব রইল। উজ্জয়িনীর কিন্তু কণামাত্র গ্লানি ছিল না। সে পরম অকপটে আলাপ করছিল, যেন লুকোচুরির কিছু নেই, সবই খোলাখুলি।

"কুমার, এস, বাদলদাকে প্রণাম কর।" উজ্জয়িনী হাটে হাঁড়ি ভাঙল।

বাদল তো মহাদেব। বুঝল না কি ব্যাপার। শশব্যস্তে বলল, "না, না, প্রণাম কেন? আমি যে বয়সে ছোট।"

দে সরকার প্রমাদ গনল। সুধীর দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখল মুখখানা কালো হয়ে গেছে, যেন অপমানে বিবর্ণ।

উজ্জয়িনী তেমনি অখলভাবে বলল, "শুনবে সুধীদা? আমাদের আশ্রমে বাগান তো থাকবে। মালী হবে কে জানো? এই লোকটি।"

সুধী উচ্চবাচ্য করল না। বাদল বলল কুমারকে, "তুমি বুঝি মালীর কাজে ওস্তাদ?"

"কোন কাজে নয়?" উজ্জয়িনী প্রশংসার ভঙ্গীতে তাকাল।

বেচারা বাদল! সরল মানুষ, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। তার জন্যে সুধীর মায়া হয়। অথচ উজ্জয়িনীও তেমমি সরলা। সুধীর রাগ পড়ল গিয়ে দে সরকারের উপর।

দে সরকার থাকতে সুধীর তিষ্ঠানো দায় হল। সে এক সময় সরে পড়ল। কেবল বাগান থেকে নয়, বাড়ি থেকে। বলতে ভুলে গেছি যে ওটা একটা ফ্ল্যাট নয়, একটা semi-detached বাড়ি। যাঁদের বাড়ি তাঁরা গরম কালটা বাইরে কাটাচ্ছেন, ততদিন সুধী-বাদলের ভাড়ার মেয়াদ। ততদিনে, সুধীর বিশ্বাস, বাদল সেরে উঠবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুধী যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলল। কল্পনা করতে বিশ্রী লাগছিল সেই দৃশ্যটা—একটা মেয়ে তার পতি ও প্রণয়ী উভয়ের মাঝখানে ব'সে দু'জনকেই চা পরিবেষণ করছে।

কিন্তু সুধীর শিক্ষানবীশী কিসের জন্যে যদি একদিনের ঝড়ে এত দিনের সংযম ভেঙে পড়ে! রাগ করা অশোভন, তা ছাড়া রাগ করে লাভ কী! জীবনের অন্যান্য সমস্যার মতো এটাও একটা সমস্যা। শীতল মস্তিষ্কে এটারও একটা সমাধান করতে হবে। রাগের মাথায় চণ্ডীমণ্ডপবিহারীরা ভাবতেন বহিষ্কারের বিধানটাই সমাধান। আসলে ওটা প্রতিবেশী সমাজের পুষ্টিবিধান। অমনি করে চণ্ডীমণ্ডপ নিজেই নিজেকে দুর্বল করেছে, ক্ষয় রোগে ভুগছে হিন্দু সমাজ।

তা হলে এই ঘোর অসামাজিক প্রণয়ের প্রশ্রয় দিতে হবে? কিছুতেই না। সুধীর মধ্যে এতদিন অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, এই বুঝি আরম্ভ হলো। তার খেয়াল যাচ্ছিল ছুটে কোথায় পালাতে। অথচ শুভবুদ্ধি বলছিল, না, বাসায় ফিরে যেতেই হবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে। সব তালা এক চাবীতে খোলে না, প্রত্যেকের চাবী আলাদা। এই তালাটার চাবী খুঁজে বের করতে হবে। চাই ধৈর্য। বহিষ্কার নয়, পলায়ন নয়, সধৈর্য সন্ধান।

২

সুধী যখন ফিরল তখন বাদলের ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে উজ্জয়িনীর বিছানা পাতা

হয়েছে, সুধীর বিছানা সেখান থেকে তার নিজের ঘরে সরানো হয়েছে। ভালো। তার মনটা একটু নরম হলো। মেয়েটি মুখে যাই বলুক কাজে এখনো ঠিক আছে।

তারপরে সুধীর মনে পড়ল রান্নার ব্যবস্থা হয়নি। তারই তো কর্তব্য। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে দেখল দে সরকার কোমরে এপ্রন জড়িয়ে রাঁধুনি সেজেছে। গনগনে আগুনের আভায় তার চোখ রাঙা। সুধী মনোযোগ ভঙ্গ করল না। নিজের ঘরে গিয়ে বই খুলে বসল। উজ্জয়িনী তখন বাদলের সঙ্গে পায়চারি করছিল বাগানে।

আইন অমান্য সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে সুধী Thoreau লিখিত "Civil Disobedience" আবিষ্কার করেছিল। সেই অপূর্ব প্রবন্ধ পড়তে পড়তে সে দেশকাল ভুলে আর এক দেশে ও আর এক যুগে উপনীত হলো।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটল সময়ের হিসাব ছিল না। সুধীকে সচকিত করল উজ্জয়িনীর আহ্বান। "দাদা, এস। খাবার দেওয়া হয়েছে।"

"আমি খাব না।" সুধীর ক্ষুধা ছিল না।

"খাবে না? রাগ করেছ?"

"না, রাগ করিনি।" সুধী আনমনে বলল।

"আমি জানতুম তুমি ভুলেও মিথ্যা কথা বল না।"

"বেশ," সুধী চোখ তুলে বলল, "রাগ করেছি তো করেছি।"

"কী করি, বল। একটু দেরী হয়ে গেছে। আমারই উচিত ছিল রান্না ঘরে যাওয়া। কিন্তু বাদলদা—"

সুধী বাধা দিয়ে বলে উঠল, "ফের যদি বাদলদা শুনি তো পাগল হয়ে যাব। বাদল কবে থেকে তোর দাদা হলো? স্বামীকে কোন দেশে দাদা বলে ডাকে?"

উজ্জয়িনী তার হাত ধরে বলল, "চল, খাবে চল। খেলে আপনি রাগ পড়ে যাবে। তার পরে বলব তোমাকে আমার যা বলবার আছে। লক্ষীটি, চল। আর বাদলদা বলে ডাকব না।"

উজ্জয়িনী কথা রাখল। খাবার টেবলে বাদলকে ডাকল খালি বাদল বলে। 'আপনি' থেকে এক সময় 'তুমি'তে নামল। বাদলেরও তাতে সহযোগিতা দেখা গেল। সেও শুরু করল 'উজ্জয়িনী', 'তুমি'।

আহারাদির পর উজ্জয়িনী বলল সুধীকে নিভৃতে, "তুমি আসতে লিখেছিলে, তাই এসেছি। আমি তোমার ও তোমার বন্ধুর অতিথি। অতিথির উপর রাগ করা কি সুনীতি, না সুরুচি?"

"সে কী রে!" সুধী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "অতিথি কেন হবি? তোরই তো স্বামী, তোরই তো সংসার।"

"তোমার মতে হয়তো তাই। বাদলের মতে ?"

"বাদলের মতামতে কিছু আসে যায় না। বিবাহ একটা সামাজিক ক্রিয়া, ওতে কেবল বরের একার নয়, সমগ্র সমাজের যোগাযোগ। সমাজের মতে সে তোর স্বামী, তুই তার স্ত্রী। তোর যদি কোনো নালিশ থাকে তবে তা সমাজের বিরুদ্ধে।"

"নালিশ আমার নেই কারো বিরুদ্ধে।"

"তবে ?"

"তবে কী ?"

"তবে তুই তার স্ত্রী, সে তোর স্বামী।"

উজ্জয়িনী চুপ করে থাকল। তার পরে বলল, "বিয়ের সময় আমি বালিকা ছিলুম। শুধু বিয়ের সময় কেন, এই সেদিন পর্যন্ত। আমার অঙ্গীকার কি নীতির আমলে আসবে ?"

সুধী চট করে জবাব দিতে পারল না। ভেবে বলল, "কেন, তুই তো মেনে নিয়েছিলি তোর বিয়ে।"

"মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু তত দিন মেনে নিয়েছিলুম যত দিন আমার মনের বয়স হয়নি। স্বপ্ন মানুষ ততক্ষণই দেখে যতক্ষণ না তার জাগরণ হয়।"

"আচ্ছা, কাল একথা হবে। এখন যা, ঘুমিয়ে পড়। ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি নিশ্চয়। তোকে আর জাগিয়ে রাখব না। যা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ, যতক্ষণ না জাগরণ হয়।" এই বলে সুধী চিন্তা করবার সময় নিল।

কত কাল পরে বাদল আর উজ্জয়িনী এক কক্ষে শুচ্ছে, পাশাপাশি শয্যায়। অথচ কেউ কাউকে কামনা করছে না। অদৃষ্টের পরিহাস।

তাদের দাম্পত্য আলাপের নমুনা শুনুন। উজ্জয়িনী বলছে, "রাত্রে যদি দরকার হয় আমাকে নাড়া দিলেই সাড়া দেব। নাড়া দিতে ইতস্তত কোরো না, বাদল।"

"দরকার হলেও আমি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করব না, উজ্জয়িনী। নিদ্রার যে কী দুর্লভ সুখ তা কি আমি জানিনে! তোমার সুনিদ্রা হোক।" বলছে বাদল।

"তোমারও।"

"আমার!" বাদল উপহাস করছে। "এ জন্মে নয়!"

"তোমার জন্যে," উজ্জয়িনী বলছে, "আমার বড় দুঃখ হয়।"

"আমার জন্যে," বাদল বক্তৃতা আরম্ভ করছে, "দুঃখ করা বৃথা। বরং দুঃখ কোরো তাদের জন্যে যাদের জন্যে আমি দুঃখিত।" এর পরে বাদল শোষিতের পক্ষে ও শোষকদের বিপক্ষে কী যেন বলছে, কিন্তু উজ্জয়িনী অসাড়।

"ঘুমিয়ে পড়লে?" বাদল সুধায়।

উজ্জয়িনী ততক্ষণে অর্ধেক পারাবার পার হয়েছে। বাদলের বক্তৃতার অর্ধেকও শোনেনি। বাদল মর্মাহত হয়। এর চেয়ে সুধীদা ছিল সমঝদার শ্রোতা। কাল থেকে আবার সুধীদাকেই তার কাছে শুতে বলবে।

অথচ বাদল নারী সম্বন্ধে নির্বিকার নয়। নারীর আকর্ষণ অনুভব করেছে, দিনের পর দিন দর্শনপ্রার্থী হয়েছে, স্পর্শের জন্যে উন্মুখ রয়েছে। কিন্তু যাকে তাকে কামনা করেনি, যার তার কামনা পূরণ করেনি। তার অনুরাগের পাত্রী অল্‌গা। অল্‌গা যদি ডাকেন তো অল্‌গা যেতে রাজি আছে। অল্‌গা বোটম্যান হতে রাজি। দাঁড় টানবে আর গান গাইবে—বিপ্লবের গান। সুধী যে সেদিন বলছিল বাদলের মনের ধাঁচটা কন্টিনেন্টাল হয়েছে সে-কথা মিথ্যা নয়। অল্‌গার আঁচ লেগেছে। তার আগে মারিয়ানার। সেই যে ভিয়েনার মেয়ে মারিয়ানা ভাইস্‌মান। যার নৃত্যের উল্লাস তার শোণিতে মিশে তার শিরায় শিরায় নৃত্য বাধিয়েছিল।

কিন্তু উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন। যেমন পীচ সম্বন্ধে। এরা তার ছোট বোনের মতো। এদের প্রতি স্নেহ জন্মায়। এদের সেবা নিতে স্বতই সাধ যায়। কিন্তু এদের সঙ্গে এক কক্ষে রাত্রি যাপন করলেও সঙ্গকামনা জাগে না। অথচ এরা দেখতে সুশ্রী, বোধ হয় অল্‌গার চেয়েও, মারিয়ানার চেয়ে তো নিশ্চয়।

পরের দিন উজ্জয়িনী বলল সুধীকে, "বাদল কাল সারা রাত ঘুমায়নি। যত বার আমার ঘুম ভেঙেছে ততবার দেখি ও জেগে আছে।"

"তোমার ঘুম," সুধী জানতে চাইল, "এতবার ভাঙল কেন?"

"সে যদি ডেকে আমার সাড়া না পায় এইজন্যে আমি ঘুমের মধ্যেও হুঁশিয়ার ছিলুম।"

"হুঁ।" সুধী দরদের স্বরে বলল, "ওর এ দশা অনেক দিন থেকে চলছে। এইটেই ওর রোগ, অন্য যা কিছু সব এর উপসর্গ অথবা আনুষঙ্গিক। ওর ইনসমনিয়া সারলে নিউরাসথীনিয়াও সারবে।"

উজ্জয়িনী বাদলের জন্যে উদ্বিগ্ন হলো। শুনেছিল সমুদ্রের হাওয়ায় অনিদ্রা সারে। সমুদ্রতীরে যাওয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করল। সুধী বলল, "না, সেখানে কোন দিন কী ভেবে ঝাঁপ দেবে শ্রীচৈতন্যের মতো।"

"বলতে চাও, অচৈতন্যের মতো।"

"একই কথা।" সুধী করুণ হাসি হাসল।

বাদলকে নিয়ে তারা দু'জনে এমন ব্যাপৃত থাকল যে উজ্জয়িনী কিংবা সুধী কেউ তুলল না পূর্ব রাত্রের সেই অসমাপ্ত প্রসঙ্গ। বালিকার বিয়ে কি তার জাগরণের পরেও নীতির দৃষ্টিতে বলবৎ? নীতি অবশ্য দেশকালনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ নীতি। দেশাচারমিশ্রিত

ব্যবহারিক নীতি নয়।

উজ্জয়িনীর সন্দেহ ছিল না যে বিশ্বমানবের মহত্তম নীতি তার সহায়। সেইজন্যে তার মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। সে প্রকাশ্যে কুমারকে প্রসাদ বিতরণ করে, কে কী ভাবছে ভ্রূক্ষেপ করে না। সখার কণ্ঠলগ্ন হয়ে পায়চারি করে, খেয়াল চাপলে পায়ে পা মিলিয়ে নাচের ভঙ্গী করে। খাবার টেবলে, এমন ভাব দেখায় যেন ওদের দু'জনের একজনের খাওয়া হলে আর একজনের খাওয়া হয়ে যায়।

"আমার জন্যে তুমি খাও, কুমার।"

"না, না। ও কী করছ, বেবী?"

"বেশ করছি, তোমাকে পাস করে দিচ্ছি। সকালে আমার ক্ষিদে পায় না।" এই বলে নিজের গ্রেপ ফ্রুট, ফোর্স, বেকন ও ডিম চালান করে দেয় টেবলের ওপারে। নিজের জন্যে রাখে স্রেফ এক পেয়ালা চা।

"তোমারও কি মনে হয় না, সুধীদা, কুমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে যথেষ্ট না খেয়ে? আর আমি দিন দিন মোটা হচ্ছি?"

সুধী অন্যমনস্ক থাকে। জবাব দেয় না।

৩

সুধী দেখেশুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অথচ কিছু করতেও পারছিল না। উজ্জয়িনী আসায় বাদলের অনেক বেশি হেপাজৎ হচ্ছিল। আর দে সরকার আসায় বাদলের পাতে আমিষ পড়ছিল। বাদলের সেবার দিক থেকে বিবেচনা করলে ওরা দু'জনে সুধীর চেয়েও দরকারী। সুধীর পড়াশুনার দিক থেকে বিবেচনা করলেও ওদের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

যেতে হলে সুধীরই যাওয়া উচিত, ওদের নয়। কিন্তু সুধী কেমন করে যাবে? সুধীর কাছ থেকে বাদলের দায়িত্ব কে নেবে? সে বাদলের বাবাকে জরুরি তার করেছিল। তিনিও সংবাদ দিয়েছিলেন যে রওনা হচ্ছেন। তাঁর পৌঁছতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগবে। ততদিন এই অনাচার সইতে হবে তো।

ওটা যে অনাচার সে বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না। অথচ উজ্জয়িনী যে নীতির প্রশ্ন তুলেছে সুধী তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর খুঁজে পায়নি। বিয়েতে উজ্জয়িনীর মত ছিল, মত না থাকলে যে সে বিয়ে অসিদ্ধ হতো তা নয়, তবু মত ছিল বলে তা আরো অনিন্দ্য। এত বড় একটা ঘটনাকে ও মেয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, যেহেতু বিয়ের সময় ওর মনের বয়স ছিল অপরিণত।

কিন্তু সত্যই তাই। চার পাঁচ সপ্তাহ আগেও তাকে দেখলে মনে হতো বালিকা। এখন মনে হয় যুবতী। এই কয় সপ্তাহে যে সে কয়েক বছর বেড়েছে তা সত্যের খাতিরে

মানতেই হবে। এখন সে ধীর স্থির শান্ত সমাহিত সহিষ্ণু। বাদলের জন্যে কি সে কম চিন্তিত! মায়া মমতা দরদ বিনয় সবই তার স্বভাবে বিকশিত হয়েছে। অথচ যে গুণ না থাকলে বাকি সমস্ত গুণ থেকেও না থাকার সমান সেই গুণটি নেই। নেই সতীত্ব। সুধী তার জন্যে প্রার্থনা করে।

এখনো খুব বেশি বিলম্ব হয়নি। এখনো শোধরানো সম্ভব। এখনো সে কায়িক অর্থে সতীই রয়েছে। বাচনিক ও মানসিক অর্থে নয়। সুধী তার জন্যে প্রার্থনা করে। বলে, প্রভু, তুমি আমার বোনটিকে রক্ষা কর। বাঁচাও। সে বোঝে না সে কী করছে। যখন বুঝবে তখন হয়তো বড় বেশি বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাকে যুক্তি দাও, যে যুক্তি দিয়ে আমি খণ্ডন করব তার উক্তি। এমন যুক্তি দাও যা সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে, যা সে অস্বীকার করতে পারবে না। আমি তাকে সাংসারিক দুর্গতির ভয় দেখাতে চাইনে, ভয় পাবার মেয়ে সে নয়। তাকে লজ্জা দিতে গেলে সে গর্বিত হয়। কলঙ্ক তার কাছে চন্দন। কী করে জাগাব তার কল্যাণবোধ, তার সামাজিক বিবেক!

সুধীর যে ইস্কুপটা আলগা হয়েছিল সেটা কখন এক সময় আপনা থেকেই আঁট হয়েছিল। উজ্জয়িনীর দাবি যদি হতো বাদলের সঙ্গে অসামঞ্জস্যের দরুন স্বতন্ত্রবাস তা হলে সুধী সে দাবী সমর্থন করত। ততদূর উদার হতে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু উজ্জয়িনীর দাবী বাদলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অপরের সহবাস! এ দাবী এমন চরম দাবী যে সুধী এর জন্যে কোনোকালেই প্রস্তুত হবে না। এ বিষয়ে তার সংস্কার এমন বদ্ধমূল যে মহত্তর নীতিও তাকে উন্মূল করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে আপোসের আশা নেই।

সুধী অবশেষে দে সরকারকে পাকড়াল। বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভায়া, তোমার তো দয়ামায়া আছে, কেন তবে ওর সর্বনাশ করছ?"

দে সরকার পাল্টা গাইল, "সুধীদা, তোমারও তো দয়ামায়া আছে, তুমি কেন ভাবছ না যে আমারও সর্বনাশ হচ্ছে।"

"তোমার সর্বনাশ!" সুধী আশ্চর্য হলো।

"নিশ্চয়! আমি তো তোমার মতো মহাপুরুষ নই, আমি সামান্য পুরুষ। পুরুষ-মাত্রেরই শখ জাগে ঘরসংসার করতে, ঘরণী পেতে। এটা তো মানো?"

"মানি বৈকি।"

"কিন্তু উজ্জয়িনী আমাকে সাফ বলে দিয়েছে কোনো দিন আমার ঘর করবে না। দেশের কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমিও মাঝে মাঝে দেখা করতে যাব তার ও তোমার আশ্রমে না আস্তানায়। তুমি যদি আমাদের মিলতে না দাও তবে সে বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি যদি পারি তো তার

সহচর হব।"

"তাই নাকি?"

"শোন। এটা তো মানো যে পুরুষমাত্রেরই সন্তানকামনা আছে?"

"মানি।"

"কিন্তু উজ্জয়িনী আমাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে ইহজন্মে মা হবে না। যদি আইন অনুসারে আমার স্ত্রী হয় তা হলেও না। তা হলে বুঝে দেখ আমার কত সুখ।"

সুধী শুধু শুনল। দে সরকার বলে চলল, "তার পরে এটা অবশ্য মানবে যে আমারও আত্মীয়স্বজন আছেন। আমার মা বাবা দু'জনেই বেঁচে। কুলাঙ্গার বলে তাঁরা কি আমার মুখ দর্শন করবেন, না কুলটা বলে আমার বধূর?"

সুধী আকুল স্বরে বলল, "থাক।"

"না, শোন। মানো কি না বল, মানুষমাত্রেরই আছে লোকনিন্দার ভয়? সমাজের দশজন আমাকে চরিত্রহীন বলে অপাংক্তেয় করবে, যদি চাকরি পাই সহকর্মীরা আমার সঙ্গে মিশবে না, যদি বই লিখি সমালোচকরা এক হাত নেবে। অপমান হবে আমার দৈনিক বরাদ্দ, খাদ্য জুটবে কি না জানিনে।"

সুধী বলল, "থাক, হয়েছে।"

"না, হয়নি।" দে সরকার ভাবপ্রবণ মানুষ। বলে চলল, "তার পরে যার জন্যে চুরি করছি সেই যদি বলে চোর তবে আমার সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ হবে। সেই যদি অবিশ্বাস করে তবে আমার জীবন ব্যর্থ।"

সুধী মৌন থাকল। দে সরকার থামল না। বলল, "অথচ আমি এমন কিছু কুপাত্র নই যে আমাকে আর কেউ বিয়ে করত না। আমি আর কোনো সুন্দরী মেয়ের স্বামী হতুম না। বাংলাদেশে কুমারীর অভাব?"

"তোমরা," সুধী ব্যথিত স্বরে বলল, "দু'জনেই দু'জনের সর্বনাশ করছ। ইচ্ছা করলেই এড়াতে পারতে।" আরো বলল, "এখনো পারো।"

"আমরা", দে সরকার গদগদ স্বরে বলল, "জানি আমাদের নিস্তার নেই। সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণীরা সকলেই আমাদের ঢিল ছুঁড়ে মারবেন। একটু মমতা, বুঝে দেখা— এটুকুও ক'জনের কাছে পাব? তথাপি উজ্জয়িনীর জেদ দেশে ফিরতে হবে। ওর সাহস দেখে আমারও ভয় ভেঙে যায়। এখন আমার যা কিছু ভয় ওর জন্যেই। কেমন করে ওকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাব তাই ভেবে আমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি, সুধীদা।"

সুধী কোমল স্বরে বলল, "বাঁচাবার পথ একটি মাত্র। সে পথ নিবৃত্তির।"

"তুমি কি মনে করেছ," দে সরকার ফণা তুলল, "প্রবৃত্তির স্রোতে আমরা তৃণের মতো ভাসছি? আমাদের বিয়ের উপায় থাকলে তুমিই স্বীকার করতে আমরা নর্মাল নরনারী।

সমাজের চোখে আমরা দোষী, তাই নীতির চোখেও দোষী। কিন্তু আমরা তো জানি আমরা আমাদের বয়সের অন্যান্য তরুণ তরুণীর চেয়ে অধিক আসক্ত নই।"

"আমি সে অর্থে বলিনি।" সুধী সংশোধন করল। "আমি ইঙ্গিত করেছিলুম আত্ম বিসর্জনের। যারা ভালোবাসে তারা কি সব ক্ষেত্রে মিলিত হতে পারে? যেখানে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সেখানে আত্মবিসর্জনই শ্রেয়। করে দেখ, তাতে অপার্থিব আনন্দ।"

"আত্ম বিসর্জনের কথা যদি উঠল," দে সরকার গলা পরিষ্কার করল, "তবে বলি, কার আত্ম বিসর্জন বেশি? আমাদের না তোমার? তোমাকে তোমার পৈত্রিক ঘরবাড়ি ধনদৌলৎ ত্যাগ করতে হবে না। আমরা গৃহহীন সম্পত্তিহীন। তোমাকে তোমার আত্মীয়স্বজনরা ত্যাগ করবেন না। আমরা সর্ববিবর্জিত। তোমার সুনাম রটবে, তুমি হবে দেশমান্য সুধীন্দ্রনাথ। আমাদের কলঙ্কের দাগ মুছবে না, লোকের মঙ্গল করলেও তারা ভুলবে না যে আমরা দাগী আসামী। তা হলে আত্ম বিসর্জনের কথা ওঠে কেন? আমাদের সম্বল তো আমাদের পারস্পরিক সঙ্গসুখ। তাও বিসর্জন দিতে হবে?"

সুধীও বিচলিত হল। সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। দু'জনে স্তব্ধ হয়ে দু'জনের দিকে তাকাল।

"কিন্তু কেন?" সুধী বলল, "কেন এ সবের মধ্যে যাওয়া? কেন প্রেমে পড়লে?"

"তুমি কি কখনো পড়নি যে প্রাকৃত জনের মতো প্রশ্ন করছ? তুমি যে অপার্থিব আনন্দ পাচ্ছ তারই বা প্রয়োজন কী, বল?" সে সুধীকে জেরা করতে লাগল। "তফাৎ কোথায়, সুধীদা? দৈবক্রমে উজ্জয়িনী বিবাহিতা, অশোকা অবিবাহিতা। তুমি কি হলফ করে বলতে পারো যে তোমার আগে স্নেহময়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল জেনেও তুমি প্রেমে পড়নি? মাফ কোরো যদি রূঢ় শোনায়, এখন তো সে পরের বাগ্‌দত্তা, বলতে গেলে পরস্ত্রী। এখনো কি তুমি তাকে কম ভালোবাস, কোনো দিন কি কম ভালোবাসবে? তফাৎটা তবে কোনখানে?"

সুধীর মুখে উত্তর জোগাল না। কিন্তু ছিল উত্তর। সে অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করল প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা না পেয়ে।

সুধী কোনো দিন এ দিক থেকে ভাবেনি। ভেবে দেখল, তাই তো। স্নেহময়ের চোখে সুধী একজন বৌ-চোর। আর একটু হলেই তার বহুদিনের মনোনীতাকে বাগ্‌-দানের পূর্বেই অপহরণ করত। এখনো তাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে ডাকা চলে না। তাকে বিশ্বাস করলেও অশোকাকে বিশ্বাস কী! এই তো সেদিনও সে সুধীকে চিঠি লিখেছে টরকী থেকে। তাতেও কি তার হৃদয়ভাব অব্যক্ত রয়েছে?

যীশু বলেছেন, "Judge not, that ye be not Judged." সুধী ভেবে দেখল, পরকে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

বাদল জানত না যে তার বাবা তার অসুখের খবর পেয়ে রওনা হয়েছেন। যেদিন শুনল তিনি এডেন থেকে তার করেছেন সেদিন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। সুধীকে ধরে বসল, "এর মানে কী, সুধীদা ?"

"মানে আবার কী ! তোকে দেখতে আসছেন।"

"দেখতে, না নিতে ?"

"সে কথা পরে।"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হয়, তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।"

"না রে। ধরে নিয়ে যাবেন কেন ? ডাক্তারের পরামর্শ শুনে যা হয় করবেন।"

বাদল সেদিন সমস্তক্ষণ উন্মনা হয়ে রইল। পরের দিন তার প্রথম কথা, "বাবা কত দূরে ?"

"বোধ হয় লোহিত সাগরে।"

"এর মানে কী, বলতে পারো, সুধীদা ? বল, বল, লুকিয়ে রেখো না।" বাদল আব্দার ধরল।

"মানে কী ! বাপ কি ছেলেকে দেখতে আসেন না ? আমি কেন জেরার্ডস্ ক্রস থেকে ছুটে এসেছি ?"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হয়, তিনি আমাকে না নিয়ে ফিরবেন না।"

বাদল তার বাবাকে জুজুর মতো ডরাত। তিনিই তার ডিক্‌টেটর কম্‌প্লেক্‌সের মূলে। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাকে এমন ভাবে শাসন করেছেন যে শাসনের আড়ালে তাঁর আন্তরিক স্নেহপ্রবণতা ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি যে ছেলেকে মারধর করতেন তা নয়। বকতেন বললেও বেশি বলা হয়। ছেলের পিছনে খরচ করতেন দেদার, তার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখতেন না। অমন লাইব্রেরী ক'জনের আছে ? কিন্তু সব সময় তাঁর মনে এই এক চিন্তা—আমার ছেলে আমার মতো হবে, আমার মতে চলবে। ছেলে যে তার নিজের মতো হবে বা নিজের পথে চলবে এটা তিনি বরদাস্ত করা দূরে থাক, কল্পনাই করতেন না। অথচ বাদল ঠিক ওই অধিকারটি দাবী করে। নিজের মতো হওয়াই তার আদিম দাবী, মধ্যম দাবী, অন্তিম দাবী। বাদল চায় বাদল হবার লিবার্টি। রায়বাহাদুর স্বরাজ মঞ্জুর করবার পাত্র নন, প্রাদেশিক অটোনমি দিয়ে মনে করেন খুব দিয়েছেন। বাদলও নাছোড়বান্দা। বিলেতে পালিয়ে এসেছে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে। আই সি এস'এর আশা দেখিয়ে।

যেদিন পোর্ট সৈয়দ থেকে তার এলো সেদিন বাদল সন্ত্রস্ত হয়ে সুধীকে বলল, "যদি ধরে নিয়ে যান ?"

"অত ভাবছিস কেন, বাদল? যদি ধরে নিয়ে যানই তবে কিছু দিন দেশে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধা কিসের?"

"না, সুধীদা। তুমি বুঝবে না। গেলে ফিরে আসা দুর্ঘট। বাবা আমার জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন, জোর করে—ঐ যে বাঙালীদের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে থাকে, **settled in life**—তাই করাবেন। তার মানে ডেপুটি কি সাব ডেপুটি।"

"বেশ তো! ডেপুটি সাবডেপুটিরা কি মানুষ নন? তোর যদি মন না লাগে ইস্তফা দিতে কতক্ষণ! তিনি কি তোকে জোর করে চিরকাল চাকরি করাতে পারেন?"

"অসম্ভব।" বাদল ক্রোধে ক্ষোভে নিরাশায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বিংশ শতাব্দীর বাদল আমি, আমার পক্ষে আই সি এস'এর চাকরিই যথেষ্ট অধঃপতন। তাও নয়, ডেপুটিগিরি! আমায় রক্ষা কর, সুধীদা।"

সুধী তাকে শান্ত হতে বলল। তার যদি রুচি না থাকে তবে তার বাবা কি তাকে জোর করে চাকরিতে বহাল করতে পারবেন, তিনি কি চাকরির মালিক?

"তুমি কি জানো না, সুধীদা, বাবার কী রকম প্রভাব! তিনি চেষ্টা করলেই আমার বহালের হুকুম আসবে, কিন্তু তার চেয়ে ফাঁসির হুকুম ভালো। বিংশ শতাব্দীর—"

"ছি বাদল, অতটা অহঙ্কার শোভা পায় না। তোর অহমিকাই তোর বৈরী। এই যে তুই অসুখে ভুগছিস এর গোড়ায় রয়েছে বিশ্বের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেওয়া। আমি তো মনে করি ইংলণ্ডেই হোক আর ভারতবর্ষেই হোক, ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টারি করাই তোর প্রকৃষ্ট জীবিকা। ওর সংকীর্ণ সীমাই তোর যথার্থ বিশ্ব।"

বাদল বিমূঢ় হয়ে সুধীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার মতো উচ্চাভিলাষী কিনা ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টার হয়ে জীবন কাটাবে! তবু যদি কোনো দিন পার্লা-মেণ্টের মেম্বর ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব হবার ভরসা থাকত!

"সত্যি, বাদল, সীমা অতিক্রম করে কেউ সার্থক হয় না। ব্যর্থই হয়। ছোট্ট একটি পত্রিকার সম্পাদক হতে পারিস, যদি লিখে তৃপ্তি পাস।"

"তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন ব্যারিস্টার," বাদল যোগ করল, "হতে পারি।"

"ব্যারিস্টারিও কিছু মন্দ নয়, যদি মফঃস্বলে প্র্যাকটিস করে সন্তুষ্ট থাকিস। চল, ভাগলপুরে বসবি।"

বাদলের মুখভাব দেখে সুধী নিরস্ত হলো।

বাস্তবিক জীবিকার মানদণ্ডে মাপলে বাদলের ভবিষ্যৎ কী! শরীর সারলেও দেশলাই বেচা চলবে না, তেমন কিছু করা তার পক্ষে প্রাণদণ্ড। বিলিতী ডিগ্রী নেই,

প্রোফেসারি জুটবে না। তা হলে বাকি থাকে সম্পাদক, মাস্টারি ও ডেপুটিগিরি. যদি না আসছে বছর পাস করে ব্যারিস্টারি। আই সি এস'এর বয়স নেই, বোধ হয় ডেপুটিগিরির বয়সও উত্তীর্ণপ্রায়। বাদলের জন্যে সুধী উদ্বিগ্ন হয়। **High thinking** বেশ ভালো কথা, কিন্তু **plain living**এরও একটা ব্যবস্থা চাই।

মহিমচন্দ্র ওরফে মহিম খুড়ো আসছেন শুনে উজ্জয়িনী একটুও বিচলিত হলো না। বরং একটু উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল। এই মানুষটিকে একদা সে শ্বশুর না বলে অসুর বলত, ভয় করত অসুরেরই মতো। কিন্তু এখন আর সে ভীত নয়, তার মনে হয় সে তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে. দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, "এই যে খুড়ো, কেমন, ভালো আছেন তো ?"

"বাদল," সে বলল বাদলকে বিমর্ষ দেখে, "তুমি অমন মুষড়ে পড়ছ কেন ? নিয়ে যাবেন তো কী হয়েছে ?"

"উজ্জয়িনী," বাদল জানাল, "নিয়ে যদি যান তো সব মাটি হবে।"

"বুঝিয়ে বল, যদি আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তি কিছুমাত্র নেই।" বাদল তো বলতেই ব্যগ্র। "তুমি তো জানো, বিলেত আসবার জন্যে আমি কী পরিমাণ উৎকণ্ঠিত ছিলুম। বিয়ে করতে যে রাজি হয়ে গেলুম সেও এই কারণে। তোমার প্রতি যে অসহনীয় অন্যায় করলুম তার অন্য কোনো অজুহাত ছিল না। বলতে গেলে তোমার জীবনটাকে ব্যর্থ করলুম আমার জীবনটাকে সার্থক করতে।"

"আমার জীবন," হাসল উজ্জয়িনী, "অত সহজে ব্যর্থ হবার নয়। তবে তোমার জীবনটা যে সার্থক হয়েছে এটা একটা মস্ত লাভ।"

"এখনো হয়নি। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল হবে।"

"এখনো হয়নি ?" উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "সত্যি ?"

"কোন অর্থে জিজ্ঞাসা করছ ?"

"যে অর্থে মেয়েরা করে।" সে হঠাৎ বাদলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "থাক, বলতে হবে না। আমি শুনতে চাইনে।"

"অর্থাৎ ?" বাদল ভাবতে লাগল।

"অর্থাৎ ?" উজ্জয়িনী হাসতে থাকল।

"কোন অর্থে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে ?" বাদল জল্পনা করল।

"থাক, কী বলছিলে বল।"

"না, আমি এ রহস্য ভেদ করতে চাই।"

কথাবার্তা এগোয় না দেখে উজ্জয়িনী বলল, "কমরেড জেসী কেমন আছেন ? কই, দেখতে এলেন না যে ?"

এতক্ষণে বাদলের ঠাহর হলো। সে একটু রেগে উঠল। বলল, "কে তোমাকে কী বলেছে, জানিনে। কিন্তু জেসী বড় মিষ্টি মেয়ে। ও যে এখনো আসেনি এর একমাত্র কারণ ও ঠিকানা পায়নি।"

"কাজ নেই ঠিকানা পেয়ে।" উজ্জয়িনী ত্রস্ত স্বরে বলল। "তুমি কি তোমার হারেম-সুদ্ধ সবাইকে হাজির করবে নাকি ?"

বাদল অত্যন্ত অপ্রতিভ হলো। যে অর্থটা সে এতক্ষণ ধরে অন্বেষণ করছিল সেটাও সঙ্গে সঙ্গে ধরা দিল। "তোমাকে কে কী বলেছে জানিনে। কিন্তু সত্যি আমি কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক পাতাইনি।" বাদল আন্তরিকতার সহিত জ্ঞাপন করল।

"একদিনের জন্যেও না ?" উজ্জয়িনী কৌতূহলী হলো।

"এক মুহূর্তের জন্যেও না। তা বলে মনে কোরো না আমি সাধু পুরুষ। আশা করেছি কারো কারো কাছে। পাইনি। পেলে অনুতাপ করতুম না। কাজেই তোমরা আমাকে পাপীর পর্যায়ে ফেলতে পারো।"

"পাপ না করেও পাপী ?" উজ্জয়িনী বিস্মিত হলো।

"পাপ করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও করতে পাইনি বলে পাপী।" বাদল ব্যাখ্যা করল।

"তা হলে জেসী তোমার Sweetheart নয় ?"

"না, জেসী আমার Sweetheart নয়, যদিও ওর মতো sweet আমি দেখিনি। ওকে দেবে একটা খবর ?"

উজ্জয়িনী বলল, "আচ্ছা।"

৫

উজ্জয়িনী বাদলকে সন্দেহ করত। ঐ সন্দেহ যে ভিত্তিহীন তা জেনে লজ্জিত হলো। বাদলের কাছে তার মার্জনা ভিক্ষা করা উচিত। এই মনে করে সে বাদলের দুটি হাত নিজের দুটি হাতে ভরে আধো আধো স্বরে বলল, "ক্ষমা কোরো।"

বাদল অবাক হলো। বুঝতে না পেরে সুধাল, "কেন ?"

"আমি তোমাকে সন্দেহ করেছি। সন্দেহ করে হারেমসুদ্ধ বলেছি। তুমি তো তেমন নও।"

"কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তাও তো ঠিক নয়। আমি আমার স্বাধীনতা এখনো প্রয়োগ করিনি বটে, কিন্তু কোনটা সন্দেহজনক ? স্বাধীনতা, না তার প্রয়োগ ?"

"আমি মাফ চাইছি আমার পাপ মনের জন্যে।" উজ্জয়িনী ঘুরিয়ে বলল। "তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে, বাদল। দোষ দিচ্ছি নিজেকে।"

"কেউ সন্দেহ করলে অন্যায় করত না, কেননা আমি যা আশা করেছি তা কপালে

না জুটলেও তা ঘটনারই শামিল। সন্দেহ করবার অধিকার কারো নেই। তুমি যদি অনধিকারচর্চা করে থাক তবে ক্ষমা চাইতে পার। ক্ষমা করলুম।"

"ধন্যবাদ। এখন আমার বিবেক পরিষ্কার।" এই বলে উজ্জয়িনী আরো কী চিন্তা করল।

"কী বলছিলুম ? বলা বন্ধ হলো যে। শুনবে না ?" বাদল বলতে ব্যগ্র হয়েছিল তার বিলেত আসার কথা।

"আমারও কিছু বলবার আছে, সেটা আগে বলি। কেমন ?"

"উত্তম।" বাদল একটু বিরক্ত হয়ে অনুমতি দিল।

"দেখ," উজ্জয়িনী ধীরে ধীরে অবতারণা করল, "তোমার আজকের উক্তি যদি মাস কয়েক আগে শুনতুম তা হলে হয়তো এত দূর যেতুম না। কিন্তু আমি যে অনেক দূর এগিয়েছি। বলব ?"

"বলে যাও।"

"আমি আর তোমার স্ত্রী নই।"

"এই কথা ? কেন, এ কি খুব নতুন কথা। আমি স্বাধীন হলে কি তুমিও অগত্যা স্বাধীন হও না ? বিয়ের বাকি থাকে কী আর ?"

"শুধু তাই নয়, আমি—"

"বলে যাও।"

"আমি আরেকজনকে ভালোবাসি।"

"এই কথা।" বাদল ফুৎকার করল। "তুমি যদি বুর্জোয়াদের মতো প্রেম বলে একটা আকাশকুসুমের আবাদ করতে চাও তাতে আমার কী। বুর্জোয়াদের বিশ্বাস ওরই নাম নাকি অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া।"

"আর তুমি ? তুমি কি বুর্জোয়া নও ?"

"না, উজ্জয়িনী।" বাদল দীপ্তকণ্ঠে বলল, "যে প্রচণ্ড প্রেরণা, যে élan vital, জীব-সৃষ্টির মূলে তাকে আমি ক্ষীয়মাণ বুর্জোয়াদের মতো ক্ষীণ করতে চাইনে। সে তো খেলা নয়।"

"কী জানি !" উজ্জয়িনী রহস্যমগ্ন চিত্তে মৌন রইল। অস্ফুট স্বরে বলল, "খেলা নয় তো কী ?"

"যদি খেলা হয় তো তার জন্যে আমার সময় নেই। কঠোর মননেই আমার জীবনের রোদটুকু ফুরাল। যদি বাঁচি তো কারো সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রেরণার দুর্জয় বেগে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করব। তারই নাম অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া, সে যাওয়া কালের বর্ত্মে।"

উজ্জয়িনী বিশেষ কিছু বুঝল না। যেটুকু বুঝল সেটুকু এই যে বাদল বাঁচবে বলে আশা করে না।

"যদি বাঁচি বলছ কেন ?" সে অনুযোগ করল।

"কারণ, বোধ হয় বেশি দিন বাঁচব না। কেন বাঁচব, যদি বাঁচাতে না পারি ?"

"কাকে বাঁচাতে চাও তুমি ? কোনো বন্ধুর অসুখ করেছে ?" সে স্নিগ্ধ স্বরে সুধাল। "আমি সাহায্য করতে পারি ?"

"না, উজ্জয়িনী। কোনো বন্ধুর নয়, সারা দুনিয়ার অসুখ। সে রোগের নাম ক্যাপিটালিজম, তার ব্যাসিলির নাম প্রাইভেট প্রফিট। তারই দাওয়াই খুঁজতে গিয়ে আমার অসুখ বাধল। সেও মরবে, আমিও বাঁচব না।"

উজ্জয়িনী তাকে কথা বলতে বারণ করল। বাদলের মুখে ঐ অলক্ষুণে বাক্যটা শুনে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বাদল! সবাই নিজের নিজের সুখ নিয়ে ব্যাপৃত, সে কিনা দুনিয়ার অসুখ নিয়ে। এখন তার এই অসুখের কী প্রতিকার ? যে মানুষ দুনিয়াকে বাঁচাত দুনিয়া কেন তাকে বাঁচাবে না ? উজ্জয়িনী পণ করল একা যত দূর পারে বাঁচাবে।

সে জেসীর সন্ধানে কুমারকে পাঠাল, যদি জেসীকে দেখলে তার বাঁচতে সাধ যায়।

কুমার ফিরে এসে যে সংবাদ দিল তা শুনে উজ্জয়িনীর চক্ষুস্থির।

"হ্যাঁ! মারা গেছে!" তার মুখ ফুটে বেরোল!

"কে মারা গেছে, উজ্জয়িনী ? কে মারা গেছে ?" বাদল বায়না ধরল। নাছোড়-বান্দা!

উজ্জয়িনী বলল, "পরের কথায় তোমার কাজ কী, বাদল ? তুমি যা ভাবছিলে ভাবতে থাক। হাঁ মানবের একমাত্র ভরসা রাশিয়া, যদি যাত্রা মানে ও ডিক্‌টেটরশিপ ছাড়ে।"

"না, বল না আমাকে—কে মারা গেছে ?"

"কেউ না বাদল। একটা পোষা বেড়াল ছিল, সেটা মারা যায়নি, তবে মারা যাবার দাখিল।"

"থাক, বানিয়ে বলতে হবে না। আমি কচি খোকা নই যে রূপকথায় ভুলব। বল আমাকে কে মারা গেছে।" বাদল রাগ করল।

কুমার বলল, "শুনলে তুমি উত্তেজিত হতে, তাই তোমাকে শোনাইনি। মারা গেছে মুসোলিনি।

বাদল আহ্লাদে উঠে বসল। কিন্তু কুমারের দিকে চেয়ে তার কী জানি কেন

বিশ্বাস হলো না। সে আবার শুয়ে পড়ল বিষণ্ণ হয়ে। হাজার সাধলেও সেদিন সে ওষুধ পথ্য খেল না, কথা কওয়া বন্ধ করল, সমস্তক্ষণ আপন মনে গুজ গুজ করতে থাকল, কে ? কে ? কে ?

উজ্জয়িনী সুধীর সঙ্গে পরামর্শ করল। সুধীও অনেক চিন্তা করল। শেষে সুধী নিজেই বাদলের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তার কানে কানে বলল, "বাদল, জেসী চলে গেছে।"

"কে ? কে ?" সুধীর হাত সবলে সরিয়ে উঠে বসল বাদল। চেঁচিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা।"

উজ্জয়িনী তার বিছানায় বসে তাকে ধরে থাকল। সে পাগলের মতো বকতে লাগল, "মিথ্যে কথা। জেসী কখনো চলে যেতে পারে না। সে যে এখনো ছেলেমানুষ, দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে তার সমুখে। তার তো যাবার কথা নয়। না, না, তোমরা ভুল শুনেছ। মিথ্যে নয়, ভুল।" তারপরে বলল, "সুধীদা, তোমাকে মিথ্যুক বলেছি বলে মাপ চাইছি। তুমি মিথ্যুক নও, ভ্রান্ত।"

কুমার মানল, "হ্যাঁ, সুধীদা ভুল শুনেছে। জেসী নয়, তার পিসী।" উজ্জয়িনী চোখ টিপে বলল, "তুমিও ভুল শুনেছ। পিসী নয়, পুষি।" বাদল মিনতি করল, "তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। তোমরা দয়া করে যাও।"

তখন অন্য দুজনে গেল, রইল কেবল সুধী আর বাদল। সুধী গেল না, পাছে বাদল একটা কিছু অনর্থ বাধায়।

বাদল মেজের উপর গা মেলে দিল, হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল। এই ভাবে কতকাল কাটাল। সুধী তার পাশে বসে মনে মনে প্রার্থনা করল তার জন্যে, জেসীর জন্যে। বায়ু যেমন করে অন্তরীক্ষে চলে, শব্দ যেমন করে ঈশ্বরে চলে, আলো যেমন করে শূন্যে চলে, প্রাণও তেমনি করে আরো এক বৃহত্তর অয়নে চলে। এরা কেউ কোনোখানে এক মুহূর্ত থামে না। যেখান থেকে চলে যায় সেখানকার সাথীরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুসরণ করতে পারে না বলেই কাঁদে। কল্পনা করে সে বুঝি কোথাও থেমেছে। না, সে প্রাণের রথে চড়ে চলেছে এক ভুবন হতে আর এক ভুবনে। জয় হোক।

বাদল বলল কাতর কণ্ঠে, "সুধীদা, সমাজে অবিচার আছে, তাই নিয়ে ভেবে মরছি। কিন্তু এই যে অবিচার—কার অবিচার জানিনে, বিধাতার কি প্রকৃতির কি নিয়তির কি নিখিলব্যাপী অরাজকতার—এই অবিচার চোখে পড়লে কি আর কোনো অবিচার চোখে লাগে !"

সুধী বলল, "কার বিচারে অবিচার ? আমাদের বিচারশক্তি কতটুকু ? আমরা বিচার করবার কে ? আয়, বিচার না করে প্রার্থনা করি।"

বাদল সাড়া দিল না। তেমনি পড়ে থাকল।

উজ্জয়িনী পা টিপে টিপে এলো। জিজ্ঞাসা করল, "ও কিছু খাবে না?" সুধী বলল, "থাক, ওকে আজ উপোস করতে দে। আমিও কিছু খাব না।" জুড়ল, "তবে ওষুধের কথা আলাদা। আমার হাতে দিস, আমিই খাওয়াব। আর শোন, আজ রাত্রে আমি এ ঘরে শোব।"

উজ্জয়িনী তেমনি সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

বাদল বলল আর্ত স্বরে, "সুধীদা, আমাকে certitude দাও। বল, জেসী আছে, চিরকাল থাকবে, এই আলো এই আকাশ এই ফুল এই পাখী এই সবই তার। বল, এই অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করেনি, করবে না।"

সুধী বলল, ''সে আছে, থাকবে, ভোগ করবে আবহমানকাল।"

৭

সে রাত্রে বাদল বা সুধী দু'জনের কারো ঘুম এল না। সুধী জেগে থাকল বাদলকে পাহারা দিতে।

বাদল যখন উঠে জানালার কাছে গেল সুধীও উঠল। বাদল বলল, "সুধীদা, তোমারও কি ইনসমনিয়া হলো?"

"না রে। আমি ইচ্ছা করেই জেগে আছি তোকে চোখে চোখে রাখতে।"

"তোমার ভয় নেই, আমি জানালা দিয়ে ঝাঁপ দেব না।" বাদল বলল ভিজে গলায়। "আমার কী মনে হচ্ছে বলব?"

"বল।" সুধী তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারাদের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হলো। "মনে হচ্ছে," বাদল থেমে থেমে বলল, "সমাজের চেয়ে বড় জীবন। জীবনের চেয়ে বড় মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গতা। 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।' সত্য শুধু আমি নিজে, আর আমাকে ঘিরে এক পরম রহস্য।"

সুধী তার কাঁধে হাত রাখল। বলল, "কিছুই মিছে নয়। সমাজ সংসার জীবন আত্মা পরলোক সবই সত্য। কোথায় যাবি রে তুই? যেখানেই যাস দেখবি এমনি সাদায় কালোয় আঁকা পূর্ণতার ছবি। রূপগুলি নতুন, কিন্তু রূপকার তো সেই একই, সুতরাং নতুনের তলে তলে চিরন্তন।"

"বলছিলুম," বাদল নির্লিপ্তভাবে বলল, "আমি শেষ পর্যন্ত একা। সেইজন্য সামাজিক চেতনার দ্বারা আবিষ্ট থাকতে মন যায় না। ওর মধ্যে একটা মাদকতা আছে, ওতে ভুলিয়ে রাখে যে অন্তিম মুহূর্তে আমি একা, আমি নিবলে কেউ আমার সঙ্গে নিববে না।"

সুধী বলল, "কিন্তু সম্পর্ক তা সত্বেও থাকে। এই যে তুই জেসীর কথা ভাবছিস এই ভাবনার ঢেউ জেসীর গায়ে লাগছে, যদিও সে অশরীরী। ভাবনার চেয়ে আরো সূক্ষ্ম প্রেম। প্রেমের অনুরণন প্রিয়জনের অন্তরে পৌঁছয়।"

"না, এসব বিশ্বাস করিনে। এসব রূপকথা।" বাদল জানালার ওপারে একটুখানি ঝুঁকে দেখল। সুধী তাকে জড়িয়ে ধরল।

"আচ্ছা, এখন বিছানায় ফিরে যাওয়া যাক। তুমি যখন কিছুতেই ঘুমাবে না তখন তোমাকে আর একটা কথা বলি।"

তারা যে যার বিছানায় ফিরল।

বাদল বলল, "তুমি তো জানো আমার একে একে সব বিশ্বাস লোপ পেয়েছে, লোপ পায়নি কেবল এই বিশ্বাস যে প্রগতি জিনিসটা কাম্য। কিন্তু সেটা সামাজিক চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যার সামাজিক চেতনা গেছে—অন্তত সামাজিক চেতনার আবেশ কেটেছে—তার কাছে সে বিশ্বাস মূল্যহীন।"

সুধী শঙ্কিত হলো। কিছু বলল না।

"তা হলে আমি শেষপর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিনে।" বাদল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পরে বলল, "এক যদি বল যে আমি আছি এও তো একটা বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক এটা একটা বিশ্বাস নয়! এটা একটা অনুভূতি।"

"বাদল," সুধী তাকে প্রগাঢ় প্রত্যয়ভরে বলল, "বিশ্বাস কর যে এই অনুভূতি মরণের পরেও থাকে, কাল স্পর্শ করে না এর কেশ, space এর কাছে অবান্তর। এই একটিমাত্র বিশ্বাস যদি থাকে তবে সব থাকল। জেসী, ন্যায়বিচার, সার্থকতা, সামঞ্জস্য—সব।"

"কী জানি!" বাদল কায়ক্লেশে বলল, "আর ভাবতে, হিসাব মিলাতে, ভালো লাগে না, ভাই। আমার শরীরে আর দম নেই, ঘড়ির টিক টিক মৃদু হয়ে আসছে। আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?"

সুধী তাড়াতাড়ি উঠল, উঠে বাদলের হাতে জল দিল। তার জল খাওয়া শেষ হলে বলল, "তুই এখন চুপ কর দেখি। ঘুম না আসে না আসুক, ক্ষতি নেই, তুই চুপ করে জেসীর ধ্যান কর।"

বাদল জল খেয়ে একটু শান্ত হলো। তখন সুধী কুমারকে জাগিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। তার পরে নিজে বাদলকে মাসাজ করতে বসল। তাতে বোধ হয় কিছু ফল হলো। বাদলের তন্দ্রার ভাব এলো।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বাদল আবার উঠে জানালার দিকে চাইল। সুধী তাকে খাট থেকে নামতে দিল না, একটু জোর খাটিয়ে শুইয়ে রাখল।

সে বলল, "জল।"

সুধী জল খাওয়াল।

জল খেয়ে সে বলল, "সুধীদা, আমি সরে দাঁড়ালুম। বিবর্তনের মিছিল চলছে, চলতে থাক, আমি তাতে নেই।"

সুধী তাকে কথা বলতে বারণ করল। সে শুনল না। ক্লান্ত করুণ স্বরে বলল, "আমার বিশ্বাস গেছে, বাকী আছে ইচ্ছা। বিশ্বাসহীন ইচ্ছা তো মিছিলের উপর খাটে না। তাই নিজের উপর খাটালুম। সরে দাঁড়ালুম।"

সুধী ডাক্তারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। উজ্জয়িনীকে জাগিয়ে বলল হট ওয়াটার বটল আনতে, কোকো তৈরি করতে।

বাদল জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিল আর বলছিল, "সরিয়ে নিলুম আপনাকে এই পদার্থ জগৎ হতে, ঘটনাশৃঙ্খল হতে, ভালোমন্দের দ্বৈত হতে। অপসরণ করলুম দায়িত্ব ও অধিকার হতে, ব্যর্থতা ও সিদ্ধি হতে, সর্ব ফলাকাঙ্ক্ষা হতে। চলতে থাক এই মিছিল, এই স্বপ্ন। আমি সরলুম।"

ডাক্তার এসে তাকে মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়ালেন। সে একটি শান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল। তখন ভোর হয়ে আসছে।

দুপুরের দিকে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে জানতে চাইল, "বাবা কত দূরে?"

খবরটা কাল থেকে চাপা দেওয়া হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাল মার্সেল্‌স্ থেকে তার করেছিলেন যে তিনি প্যারিসের পথে আসছেন। আজকেই তাঁর পৌঁছনর কথা। তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সুধী যাবে।

"ওহ্!" বাদল পরম নির্ভয়ে বলল, "আচ্ছা, দেখতে চান, দেখবেন। কিন্তু ধরতে পারবেন না।"

এর পরে উজ্জয়িনীর হাতে খেতে খেতে বাদল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। উজ্জয়িনী সুধীকে ডাকল, "দাদা, একবার এস তো।"

সুধী কুমারকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে বাদলের ভার নিল। আধ ঘণ্টা পরে বাদল চোখ মেলল। ক্ষীণ স্বরে বলল, "আঃ! এতকাল পরে…একটু…ঘুমিয়ে বাঁচি।" তারপরে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

একটু পরেই ডাক্তার এসে পড়লেন। কিন্তু ততক্ষণে বাদল বেঁচে গেছে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত।

উজ্জয়িনী ডাক্তারের সামনেই বাদলের পায়ে মাথা রেখে দুই বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টন করল। ডাক্তার তা দেখে চোখে রুমাল চেপে কুমারের সঙ্গে বাইরে গেলেন। সুধী নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে।

সে কী কান্না উজ্জয়িনীর! ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে এমন বিকল হয়ে কাঁদছিল যে কুমার পর্যন্ত অবাক হয়ে ভাবছিল, ও কি কোনো দিন বাদল ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে সত্যি ভালোবেসেছে! বাদলই ওর সত্যিকার স্বামী, কুমার শুধু ওর সখা। কুমারের মনে শোচনা, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে হয়তো সেই এই ঘাতকতা করেছে। সেও বাদলের পায়ের কাছে বসে চোখের জলে ভাসতে থাকল।

কিন্তু সকলের চেয়ে মর্মন্তুদ হলো পুত্রহারা বৃদ্ধ পিতার বুকফাটা বিলাপ। "বাবুয়া? বাদল বাবুয়া? নেই? চলে গেছে? হায় হায় হায়!"

সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা পড়লে কেমন হয়?

৭ই এপ্রিল ১৯৪২

পুতুল নিয়ে খেলা

পূর্ণিমা প্যাক্ট

১

'আগুন নিয়ে খেলা'র নটোরিয়াস সোম ব্যালার্ড পিয়ারে জাহাজ ভিড়লে তল্লাস করে দেখল তার নামে এসেছে একখানা তার ও তিনখানা চিঠি।

তার করেছে কুণাল-ললিতা-কল্যাণ। "Welcome to India and us." বিলেত যাবার আগে সোম কুণাল-ললিতার বিয়ে দিয়ে গেছল। ইতিমধ্যে তাদের একটি ছেলে হয়েছে আর তারা সেই ছেলের নাম রেখেছে বন্ধুর নামানুসারে 'কল্যাণ'। বন্ধুপ্রীতির এহেন নিদর্শন দুর্লভ বলে সোমের চোখ সিক্ত করলে সুখে।

একখানা চিঠি কোন এক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর, সোম ওখানা কোপদৃষ্টিতে ভস্ম করল। অন্য একখানা চিঠি তার তৃতীয়া প্রিয়ার, সেই যিনি বলতেন মনের মিলনই হচ্ছে স্থায়ী মিলন, দেহের মিলনে কেবল গ্লানি ও অবসাদ। তাঁর স্বভাব বদলায়নি, অভিজ্ঞতাও বাড়েনি। মণীন্দ্রলাল বসুর 'মায়াপুরী' থেকে চুরি করা ভাব ও চোরাই ভাষা দিয়ে তিনি পূর্ণ পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে এই কথাটি বিশদ করেছেন যে বেলা জানে তার তরুণ তার কাছে একদিন ফিরবে, লালমণি রাজপুত্র আনবে রাজকন্যা পদ্মাবতীর বাঞ্ছিত পদ্ম, রাজকন্যার কানে কানে বলবে, 'তুমি যে পদ্ম চেয়েছিলে, রাজকন্যা, সে পদ্ম আমার বুকেই ফুটে আছে, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরে তবে তার সন্ধান পেলুম।'

শেষ চিঠিখানা পড়ে তার ক্রোধ ও অপমানের পরিসীমা রইল না লিখেছে তার বিধবা বোন সুমিত্রা।

"দাদা, সুদীর্ঘ তিন বছর পরে সুদূর বিদেশ থেকে জয়ী হয়ে তুমি ফিরেছ, ভগবান তোমাকে নীরোগ ও নিরাপদ রেখে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে এখন সেটা দিন গুণে বলা যায়, আশা করি পথে কোথাও নামবে না, সোজা এখানে চলে আসবে, সোমবার পৌঁছানো চাই।

পৌঁছে যা দেখবে তার জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে সাহায্য করা আমার উচিত। সেইজন্য লিখছি যে একখানা বেনামী চিঠি পেয়ে বাবা যারপরনাই লজ্জিত বিমর্ষ ও বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। চিঠিখানা আমাকে পড়তে দিলেন না, ছোট মা-কেও না। গম্ভীর ভাবে বললেন, খারাপ চিঠি। আমরা তাঁকে কত বুঝিয়ে বললুম যে দাদার কোনো শত্রু তার নামে কলঙ্ক আরোপ করেছে, নইলে বেনামী লিখল কেন? বাবা বললেন যে সব খুঁটিনাটি দিয়েছে সে সব কখনো বানানো হতে পারে না, তার এক আনাও যদি সত্য হয় তবে অমন ছেলের মুখদর্শন করলে পাপ হবে।

চিঠিখানা তিনি তাঁর দুই একজন উকীল বন্ধুকে দেখিয়ে পরামর্শ চাইলেন। কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে তুমি কাকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেছলে। এতে অন্যায়টা

যে কী ঘটল আমি তো তা স্থির করতে পারলুম না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চাল আমাদের কল্পনার বাইরে, তাই আমরা তার কদর্থ করে থাকি। ওরাও তো আমাদের বৈধব্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে কলুষিত দেখে, আমাদের পক্ষে যা সহজ ওদের চক্ষে তা কুটিল!

কার পরামর্শে জানিনে, বাবা তোমার জন্মে অপেক্ষা না করে কাগজে এক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বসেছেন। তার কাটিং তোমাকে পাঠালুম। তার উত্তরে রোজ তিন চারখানা করে চিঠি আসছে। গোষ্ঠবাবু বলে দিনাজপুরের এক ভদ্রলোক তো সশরীরে ও সবান্ধবে এসে সহরে কোথায় বাসা নিয়ে দুবেলা বাড়ীতে হাজিরা দিচ্ছেন। অধম আমিও দু চারখানি চিঠি পেয়েছি এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। আমাদের থার্ড মুন্সেফের স্ত্রী সেদিন ছোট মা-কে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তোমার একচোট নিন্দা শুনিয়ে দিলেন ও দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে প্রস্তাব করলেন যে তাঁর মেজ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে চরিত্র শোধরাতে পারে।

বিজ্ঞাপনটি এই :—

WANTED A HANDSOME, EDUCATED AND accomplished Kayastha bride for a graduate educated in London University, aged 25, of excellent health and very fair complexion being the eldest son of a District Judge.

For details write to :—

J. K. SHOME, ESQ.,
District Judge. Purnea."

সোম একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তিনবার পড়ল। বাবা কি ভুলে গেছেন যে তার রংটা বেশ একটু কালো। না ধরে নিয়েছেন যে তিনবছর বিলাতবাসের পুণ্যে কালো রং কটা হয়। স্বাস্থ্য অবশ্য তার গর্ব করবার মতো, কিন্তু বরের স্বাস্থ্যের জন্য কোন মেয়ের বাপ মাথা ঘামান? আর কী ইংরাজীজ্ঞান! Being কথাটা ওখানে বসিয়ে দেবার ফলে মানে দাঁড়ায় এই যে, ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো ও রং ধবধবে, যেহেতু সে একজন জেলা জজের প্রথম কুমার।

সোম চটবে কি হাসবে ঠিক করতে পারল না। বিয়ে করতে তার অনিচ্ছা নেই, কিন্তু বিয়ের আগে সে তার ভাবী বধূকে তার জীবনের আদি পর্ব নিরালায় শোনাতে চায়—এই তার ন্যূনতম দাবী। শুনে যদি মেয়েটি বলে, অন্যায় কিছুমাত্র হয়নি, অমন অবস্থায় পড়লে আমিও তাই করতুম, তবে সোম মেয়েটির রূপ, বিদ্যা ও গুণীত্ব নিয়ে চুল চিরবে না, মেয়েটি কায়স্থ না হয়ে কলু কিংবা কামার হলেও সোমের দিক থেকে

আপত্তি থাকবে না। মোট কথা, বাবা যদি তার ন্যূনতম দাবী স্বীকার করে তাকে ঐ দাবী পেশ করবার স্বাধীনতা দেন তবে সে রূপ গুণ জাতি ইত্যাদির বিবেচনা বাবার উপর ছেড়ে দেবে।

তিন বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে প্রেম সম্বন্ধে সে এই সিদ্ধান্ত করেছিল যে ওটা অন্য দশটা ধুয়ার মতো একটা ধুয়া। Liberty, equality, world peace, disarmament, ইত্যাদির মতো ওটাও একটা তরুণ-ভুলানো বুলি। আগে ঘাট মণ ঘি পুড়বে তারপর রাধা নাচবেন। প্রথমত ব্যাঙ্কে সুযথেষ্ট সঞ্চয়, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যকর পল্লীতে বাড়ী না হোক বাসা, তৃতীয়ত মূল্যবান আসবাব ও বাসন—ন্যূন পক্ষে এতখানি ঘি পুড়লে বিবাহের যজ্ঞানল জলবে। আর যে প্রেম বিবাহান্ত নয় সে প্রেম হয় একপ্রকার সখ, নয় একটা মনোবিকার। সাবধানী ইংরাজ ও দুটোকে চল্লিশ হাত দূরে রেখে পথ চলে। অলস ধনী ও মাথা পাগলা বোহিমিয়ান এই দুই মণ্ডলীতে ঐ দুই শৃঙ্গী আবদ্ধ। এ ছাড়া একটা নতুন মণ্ডলীর উদ্ভব হয়েছে, তাতে প্রেম হচ্ছে শনি রবিবারের খেলাধুলার সামিল, প্রসাধনের অঙ্গ। ওকে প্রেম বললে মানে হয় না, ও হচ্ছে পরিমিত দেহচর্চা। মণ্ডলীটা ব্যবসায়ব্যস্ত নাগরিক নাগরিকার। ওদের মস্ত গুণ এই যে ওরা ধুয়া ধরে নিজেদের ভোলায় না, বুলি আওড়ে পরকে ভোলায় না। ওরা বোঝে না তত্ত্ব, বোঝে তথ্য। সোম এই মণ্ডলীকে আপনার করেছিল। এরা কাজের সময় করে কাজ, উদ্বৃত্ত সময়ে করে পরস্পর বিনোদন। অন্তরে এরা কেউ কারুর নয়, অন্তর্মুখী হতে এরা নারাজ। এদেরই জন্যে মহাকবি "ক্ষণিকা" রচনা করেছেন।

টিপ করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রু। মুখে সুগম্ভীর হাস্য। কত কী জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, কিন্তু প্রবল আনন্দের বেলায় তুচ্ছ কথাই মুখে আসে।—"পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?"

সোম বলল, "অসুবিধা যা হবার তার এখনো বহু বাকী। এত বড় দেশে একটানা রেলপথ যাত্রা শেষ হয়েও শ্রান্তির তৃষ্ণা রেখে যায়। কী গরম!"

"ওমা, গরম কাকে বলছ, দাদা," সুমিত্রা প্রণাম করে বলল, "এখন তো শীত পড়তে আরম্ভ করেছে।"

"বিলেতফের্তাদের," জাহ্নবীবাবু সবজান্তার ভঙ্গীতে বললেন, "প্রথম-প্রথম তাপ-বোধটা কিছু বেশী হয়ে থাকে, মা।"

বাবার অসাক্ষাতে সুমিত্রা বলল, "কই আমার জন্যে কী এনেছ, দেখি বাক্সের চাবী।"

তেমনি পাগলীই আছে। ওর জন্যে সোমের অন্তরে সমব্যথার অন্তঃস্রোত চক্রাকারে ঘুরছিল, মোহানা পাচ্ছিল না। ওকে খুশি করে ওর ব্যথা ভোলানোর জন্যে সোম বলল,

"তোর জন্যে এনেছি একটা নতুন রকমের ফাউন্টেন পেন। তা দিয়ে অন্য কিছু লিখতে নেই, লিখতে হয় শুধু প্রেমপত্র।"

"যাও," বলে স্থমিত্রা নিজেই গেল পালিয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। এসে সোমের পায়ের কাছে একতাড়া চিঠি ঝুপ করে ফেলে দিল। তার কাছে লেখা সোমের বিয়ের প্রস্তাব। বলল, "দাও না, দাদা, চাবীটা। দেখি আমার বিলিতী বৌ-দিদির ফোটো।"

এই বার সোমকে বলতে হলো, "যা," কিন্তু না ভাই না বোন কেউ ওখান থেকে নড়বার নাম করল না। মাঝখান থেকে হাজির হলেন তাদের বিমাতা—কানাই বলাইয়ের মা। তিনি এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিলেন, সেখানে যে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিলেন তার চিহ্ন ছিল তাঁর কপোলে। কল্যাণ ফিরে এল কোনো অচিন্ত্যনীয় বিদেশ থেকে, কিন্তু তাঁর কানাই আর ফিরবে না, সে গেছে বি-জগতে।

সোম তাঁকে প্রণাম করলে তিনি "বাবা কল্যাণ—" বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তারপর এলেন সস্ত্রীক ও ত্রিকন্যক গোষ্ঠবাবু। সোম আড়চোখে একবার মেয়ে তিনটিকে দেখে নিল। না রূপসী, না স্বাস্থ্যবতী, না সবাক্, না সপ্রতিভ। ঐ ভীতসন্ত্রস্ত মূঢ় মেয়ের পালকে সর্বদা তাদের মায়ের মুখপানে নিবদ্ধদৃষ্টি দেখে সোমের হাসি পেয়ে গেল। সে হাসি আরো দুর্দম হলো মা'টির স্বভাবকোপনতা গোপন করবার আয়াস দেখে। আর গোষ্ঠবাবুর চক্ষুতারকা এমন যে মানুষকে দৃষ্টিসূত্রে সুড়সুড়ি দেয় আর তাঁর কথাগুলি যেন কাতুকুতু। এঁরা এতদিন জাহ্নবীবাবুকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর কন্যাকে, তাঁর পুরাতন ভৃত্য নিধিরামকে, তৎপত্নী মোক্ষদাকে তোষামোদ করে প্রলোভন দেখিয়ে সোমের বৈলাতিক লীলারহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন বলে শাসিয়ে কিছুতেই কার্যোদ্ধার করতে পারেননি, কারণ মেয়েগুলি বিজ্ঞাপন মাফিক 'handsome, educated and accomplished' নয়, তাদের একমাত্র যোগ্যতা—তারা কায়স্থকন্যা।

সোম কোনোমতে হাসি চেপে বহুকষ্টে বলতে পারল, "দেখুন, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বাবা, দেশশুদ্ধ লোক জেনেছে যে তিনিই মালিক, আইনত যদিও আমি চার বছর থেকে সাবালক। আর ওদেশে আমি হয়ত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিলুম, এদেশে আমি পুনর্মূষিক। আমার কাছে আবেদন পেশ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।"

গোষ্ঠবাবু তখন নাক মুখ ঘুরিয়ে ঢোক গিলতে গিলতে বললেন, "আ-আ-আমি স-স-সব স্-অ-ব স্-অ-ব জ্-জ্-জ্-আনি। আ-আ-আ—"

গোষ্ঠগৃহিণী স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সগর্বে বললেন, "প্রদ্যোত আমার ভাই।"

চমক দমন করে সোম শুধাল, "কোন প্রদ্যোত? প্রদ্যোত সিং?"

"সেই।"

সোমের মনে পড়ছিল পেগী ও সে যেদিন ম্যানরবিয়ের থেকে লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করে সেদিন আয়ার্লণ্ড থেকে প্রদ্যোত সিং ফিরছিল। সেই যে সোমের বাবাকে বেনামী চিঠি লিখেছে ও গোষ্ঠবাবুর গোষ্ঠে গল্প করেছে সোমের এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। কিন্তু দু বছর আগের ঘটনা মাস খানেক আগে জানানোর কী কারণ ঘটল? কারণটা সম্ভবতঃ এই যে শিকারকে বন্দুকের গুলির গতিসীমার মধ্যে আনতে হলে চারিদিকে তুমুল সোরগোল করে তাকে খেদিয়ে নিয়ে আসতে হয়। সোমের প্রত্যাবর্তনপ্রাক্কালে জাহ্নবীবাবুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা উপস্থিত হলে সোমের প্রত্যাবর্তনমুহূর্তে সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে গোষ্ঠবাবু হানবেন প্রাজাপত্য বাণ, এক এক করে তিন গুলি, তার একটা না একটা লাগবেই। জন্তুর প্রতি কী উদারতা! তার যে গুলিটাতে খুশি সেই গুলিটাতে মরবে—তার সামনে wide choice!

জাহ্নবীবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে প্রথম ধাক্কা সামলে উঠেছিলেন। বিজ্ঞাপনের সাড়া পাওয়া গেছল আসমুদ্র হিমাচল থেকে। ভারতবর্ষে যে এমন সব জায়গা আছে আর এ সব জায়গায় যে বাঙালী কায়স্থ আছে পূর্ণিয়ার জেলা জজ অত জানতেন না। কুস্তোড় কলিয়ারি, মঙ্গলদই, রেহাবাড়ী, মৌলবী বাজার, মহেঞ্জোদারো, তেজগাঁও, নওগাঁ, আকিয়াব, পোর্ট ব্লেয়ার, কোলাবা, নেলোর, ভুসাওল, খাণ্ডোয়া; যে সব জায়গার নাম জানতেন সেগুলিও সংখ্যায় কম নয়। কলকাতা থেকে এসেছে উনপঞ্চাশখানা দরখাস্ত। কাজেই হাজার দুর্নাম রটলেও ছেলের পাত্রীর অভাব নেই, এর জন্য তিনি নিজেকেই অভিনন্দন করলেন। কেমন লোকের ছেলে!

পাত্রী দেখতে বেরোলে ওর সঙ্গে দেশ দেখাও হয়, তীর্থ করাও হয়। কিন্তু জাহ্নবীবাবুর ছুটি ছিল না। তিনি ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন, "তুমি তো দেশ ভ্রমণ ভালোবাসো বলে জানতুম। পরের দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলে; এবার নিজের দেশটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। চাকরীর নিকট সম্ভাবনা তো নেই, ঘরে বসে বসে করবে কী!"

ততদিনে সোমেরও শ্রান্তি মোচন হয়েছিল। করবার মতো কাজও ছিল না হাতে। বলল, "যে আজ্ঞে।"

জাহ্নবীবাবু আলবোলার নল মুখে পুরে খানিক ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় আওয়াজ করলেন। বললেন, "কুস্তোড় কলিয়ারি, মঙ্গলদই, নান্দিয়ার পাড়া, ভাওয়ালী, মাউ জংসন, কুকিচেরা, ঢেঙ্কানাল, মেমিও, তুলসীয়া—এসব না দেখলে ভারতবর্ষের দেখলে কী!"

সোম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "তা তো বটেই।"

"ডিব্রুগড় থেকে পণ্ডিচেরী পর্যন্ত একটা দৌড় দাও।" জাহ্নবীবাবু যেন নিজে অমন একটা দৌড় দিয়ে অভিজ্ঞ হয়েছেন এইরূপ ভঙ্গীতে বললেন, "তারপর পণ্ডিচেরী থেকে রাওলপিণ্ডি।" পিণ্ডির কথায় মনে পড়ল গয়া। "তারপর রাওলপিণ্ডি থেকে গয়া হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।"

সোম বলল, "একখানা Indian Bradshaw কেনা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। তারপর ঐ সব প্রসিদ্ধ স্থানে—কুন্তোড় কলিয়ারিতে, মাউ জংশনে, ঢেঙ্কানালে—কোন কোন হোটেলে উঠতে হবে তাদের ঠিকানা—"

"হোটেলে উঠতে হবে না," জাহ্নবীবাবু আরাম কেদারায় শায়িত অবস্থা ছেড়ে ছিন্ন-গুণ ধনুকের মতো পিঠ সোজা করে বসে বললেন, "ওসব জায়গায় আমাদের স্বজাতীয় ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁদের বাড়ী আতিথ্য স্বীকার করাতে লজ্জার কিছু নেই।"

সোম ভাবল মন্দ না। রেলের পাথেয় জোটাতে পারলে বছর খানেকের মতো অন্নের ভাবনা থেকে মুক্তি।

সব আগে কোন খানে যাবে স্থির করতে না পেরে সোম দিনের পর দিন টাইমটেবল ও মানচিত্র অধ্যয়ন করে কাটালো। তার ছোট মা একদিন তার কাছে এসে বসে সেই শীতান্ত কালে তাকে পাখা করতে লাগলেন।

সোম বলল, "মা, তুমি কি কিছু বলবে?"

তিনি বললেন, "মানুষের জীবন। কোন দিন আছে, কোন দিন নেই। নলিনীদলগত জলের মতো তরল। কানাই—" তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আর একবার বললেন, "কানাই", তার-পর কাপড়ে মুখ ঢাকলেন।

সোম সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সাত বছর হয়ে গেল, কানাই কি এতদিন অন্য কোনো মায়ের কোলে জন্ম নেয়নি ভাবছ? ও কি তোমার কান্নার জন্যে কেয়ার করে? যারা কেয়ার করে তাদের কথা ভাবো—আমার কথা, বলাইয়ের কথা।"

"বলাই," ছোট মা চোখ মুছে বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চেয়েছিল, কলেজের কর্তারা আসতে দিল না, টেষ্ট এগজামিনের আর দেরি নেই বলে।"

"তা হোক, আমিই ওর সঙ্গে দেখা করবো এখন।" সোম বলল।

"মানুষের জীবন," ছোট মা আবার সুরু করলেন, "মানুষের জীবন অতিশয় চপল। তোমার বাবা তাই আমাকে বলছিলেন যে আসছে বছর যখন তিনি পেন্সন নেবেন তাঁর সময় কাটবে কেমন করে। নাতি নাতনীর সঙ্গে খেলা করার বয়স হলো, কিন্তু কই নাতি নাতনী?"

সোম বুঝল। যেন বোঝেনি এমন ভাব দেখিয়ে বলল, "কেন? আমার দুই দিদির সাত ছেলে মেয়ে। তাদের দুই একটিকে আনিয়ে নিতে বাধা কী?"

"পাগল ছেলে!" মা বললেন, "তা কি কখনো হয়! ওদের নিজেদের বাড়ী আছে, ওদের ঠাকুমা ঠাকুরদাদারা ছেড়ে দেবে কেন?"

"তা তো বটেই।" সোম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তা তো বটেই। তা হলে আমাকেই নাতি নাতনী তৈরি করবার ফরমাস নিতে হয় দেখছি। এদিকে যে বাবা আমাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কুস্তোড় কলিয়ারি ডিব্রুগড় ফরাক্কা-বাদ পাঠাচ্ছেন।"

"তুমি বাবা আমার কথা শোনো," মা বললেন, "অত ঘুরতে হবে না। উনি কেবলই খুঁৎ খুঁৎ করছেন, কোনো পাত্রীই ওঁর বৌ মা হবার যোগ্য বলে ওঁর মনে হচ্ছে না, তাই ঐ সব সৃষ্টি ছাড়া জায়গায় পাওয়া গেলেও যেতে পারে ভাবছেন। অত বাছলে তুষের সঙ্গে সঙ্গে ধানও যাবে ফেলা। আমি বলি তুমি দুটি কি তিনটি মেয়ে দেখো—কাশীরটি, শ্যামবাজারেরটি আর ঐ দেওঘরেরটি। ও নাকি সুন্দর বীণা বাজায়, সাক্ষাৎ বীণাপাণি।"

"আর কাশীর মেয়েটি।"

"কাশীরটি হলো ওঁর বন্ধু দাশরথি মিত্তির মশাইয়ের ভাই-ঝি। উনিও ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ, এখন পেনসেন নিয়ে কাশীবাস করছেন। এঁরও ইচ্ছা কাশীতে বাড়ী করেন। দুই বন্ধুর দুবেলা দেখাশোনা হবে বিশ্বনাথের মন্দিরে আর দশাশ্বমেধ ঘাটে!"

"দাশরথিবাবুর নাম শুনেছি। শ্যামবাজারের মেয়েটি কার ভাই-ঝি?"

"কার ভাই-ঝি জানিনে, কিন্তু ভূষণবাবুর মেয়ে, বি-এ পাস্, কোন বিষয়ে নাকি ফার্ষ্ট হয়েছে। ভূষণবাবু তাকে এম-এ পড়াতে চান না, বলেন এম-এ পাস মেয়ের বর পাওয়া যাবে না, এক আই-সি-এস্ ছাড়া। আর আই-সি-এস্ই বা এত আসে কোত্থেকে।"

"তা আমিও তো বি-এ'র চেয়ে বড় নই। আমাকে ভূষণবাবু মেয়ে দিতে যাবেন কেন?"

"পাগল ছেলে! কিসে আর কিসে! বিলেতের বি-এ আর এদেশের বি-এ। তোমাকে পাবার জন্যে তাঁর কত আগ্রহ।"

বিলেতফেরত কৃতী পুত্রকে জাহ্নবীবাবু মনে মনে ভয় করতেন। সে যদি বেঁকে বসে সেইজন্যে সোজাসুজি তাকে আদেশ করতে পারেন না। অনুরোধ করতেও তাঁর পিতৃ-সম্মানে বাধে। মনোগত অভিপ্রায় সংকেতে বোঝানো ছাড়া কী উপায়! এসব বিষয়ে গৃহিণীর সাহায্য নিতেও তিনি কুণ্ঠিত। পাছে কেউ ফস্ করে ঠাওরায় যে দ্বিতীয় পক্ষের

স্ত্রীর কথায় তিনি ওঠেন বসেন, তিনি স্ত্রৈণ, সেইজন্তে তিনি সে বেচারির সঙ্গে ভালো করে কথাই কন না। পাছে এমন অপবাদ রটে যে তিনি প্রথমার চেয়ে দ্বিতীয়াতে অধিক অনুরক্ত সেই আশঙ্কায় তিনি সে বেচারির সঙ্গে লোকদেখানো কঠোর ব্যবহার করেন। বিধবা কন্যাকে যতসব বাহারে শাড়ী কিনে দেন, সধবা স্ত্রীকে কিনতে দেন তার স্যাদাসিধে সংস্করণ। সে বেচারির যদি কোনো সখ থাকে সেটা মেটে সুমিত্রার সৌজন্যে। তিনি সুমিত্রার কোনো কিছুর তারিফ করলে সুমিত্রা তখনি প্রস্তাব করে, "মা, তোমাকে এটা দিই ?" তিনি আপত্তি করেন, "না, না, তা কি হয় ? আমি বুড়ো মানুষ, আমার গায়ে এটা মানাবে কেন ?" সুমিত্রা তাঁকে জোর করে পরিয়ে দিয়ে বলে, "চমৎকার মানিয়েছে ; আজ আমরা মুন্‌সেফ বাবুদের বাড়ী বেড়াতে যাবো।"

সোম এ সব জানত। তাই ছোট মা তাকে যা বলেছেন তা যেন তার বাবার বক্তব্য নয় এই ভাণ করে বাবার সামনে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

জাহ্নবীবাবু চোখের চশমা নাকে নামিয়ে তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন।

সোম বলল, "ভারি ভাবনায় পড়ে গেছি। কোনখান থেকে যাত্রারম্ভ করি স্থির করতে পারছিনে। আগে যাবো পূব মুখে লালমণির হাট, না আগে যাবো পশ্চিম মুখে লাহেরিয়া সরাই—একেই বলে উভয় সংকট।"

"হুঁ।" কিছুক্ষণ চিন্তার ভাণ করে জাহ্নবীবাবু বললেন, "সর্বসিদ্ধিপ্রদ কাশীধাম। সেইখান থেকে যাত্রারম্ভ হলে শুভ। দেওঘরও পুণ্য পীঠ। যিনি বিশ্বেশ্বর তিনিই বৈদ্যনাথ। কালীঘাটের কালীও জাগ্রত দেবতা। তোমরা তো প্রায়শ্চিত্ত করবে না। দেবদর্শনে প্রায়শ্চিত্ত আপনা থেকে হয় তাও করবে না ?"

সোম শশব্যস্তে বলল, "নিশ্চয় করবো। কেন করবো না ? তবে শুনছি দেবদর্শনের সঙ্গে আরো কী দর্শন করতে হবে।"

"আমিও তোমাকে তাই বলব-বলব করছিলুম।"

"আমার অনিচ্ছা নেই। তবে আমার একটি ব্রত আছে।"

"ব্রত আছে !"

"আজ্ঞে হাঁ। ব্রত আছে। আমার নিজের কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই, আপনারা যাকে পছন্দ করবেন আমি তাকেই বিয়ে করবো। কিন্তু—"

জাহ্নবীবাবু কান খাড়া করে রইলেন।

"কিন্তু বিয়ের আগে তাকে আমি গোপনে কিছু বলতে চাইব।"

"কী বলবে ?"

"বলবো আমার নিজের ইতিহাস।"

"না, না, না, না।" তিনি ক্রমাগত মাথা নাড়তে থাকলেন দম দেওয়া কলের

পুতুলের মতো, আর গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো তাঁর মুখ থেকে ছুটতে থাকল, না, না, না, না।

"বেশ। আমি বিয়ে করবো না।"

"আহা, আমাকে বলতে দাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি গোপনে কিছু বলবে, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু সেটা বিয়ের আগে নয়, বিয়ের পরে।"

"না, বাবা।"

"কেন, অন্যায় কী বললুম ?"

"অন্যায় এই যে, বিয়ের পরে যদি ও কথা শোনাই তবে সে হয়ত বলবে, আগে শুনলে আমি বিয়েই করতুম না।"

"হা-হা-হা-হা। অমন কথা কোনো হিন্দু স্ত্রী বলতে পারে ? বিলেত গিয়ে তুমি ক্রিশ্চান হয়ে এসেছ দেখছি।"

"বেশ। আমি বিয়ে করবো না।"

"হুঁ।" তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আমাদেরই দোষ। ভালো চাকরীর মোহে ছেলেগুলোকে বিলেত পাঠাই, চাকরীও আর হয় না, হয় শুধু শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর।"

সোমের ইচ্ছা হলো বলে, আমি তো স্কলারশিপ নিয়ে গেছি কিন্তু ঐ আগুনে ইন্ধন দিয়ে কী হবে !

"এখন বুঝতে পারছি," জাহ্নবীবাবু আবিষ্কার গৌরবে বললেন, "কেন লোকে ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে বিয়ে দিয়ে রাখে। দাশরথি তাই করেছেন, দৈবকীও তাই বলেছেন। আমি আমাদের সিবিলিয়ান কবির ভাষায় ভাবলুম, 'চাকরী না করে বিয়ে করা গরু ভেড়ার ধর্ম'। এখন দেখছি চাকরীও হলো না, ধর্মও গেল।"

সোম আর সেখানে দাঁড়ালো না। শ্রোতার অভাবে জাহ্নবীবাবু অগত্যা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন।

দাদাকে জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করতে দেখে সুমিত্রা সকৌতূহলে শুধালো, "কোথায় আগে যাওয়া স্থির করলে ?"

সোম বলল, "রাজপুতানায়। সেখানে এতোগুলো মহারাজা মহারাণা মহারাও আছে, কেউ না কেউ আমাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী রাখবে। চাকরী যার উপজীবিকা সরকারী প্রোফেসারী ছাড়া কি তার নাস্তি গতিরন্যথা ?"

"সে কি, দাদা," সুমিত্রা বলল, "আমরা যে আশা করেছিলুম তুমি বৌ আনতে যাবে।"

সোম হেসে বলল, "আমি কি দিব্যি দিয়ে বলছি যে রাজপুতানায় বৌ পেলে আনবো না ? কে জানে কোন রাজপুতানী আমার শৌর্য্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ম্বরা হবে।"

"বা কী মজা ! রাজপুতানী বৌদি আসবে। নাম তার মীরাবাঈ কি তারাবাঈ। দাদার শ্বশুরের পাকানো গোঁফ কানের কাছে চুলের সঙ্গে বাঁধা। দাড়িতে সিঁথি কাটা, দুদিকে দুই চাঁপা ফুল গোঁজা। নাম হয়ত তলোয়ার সিং। কী মজা !"

সুমিত্রা তালি দিতে দিতে ছোট মা'র কাছে গিয়ে খবরটা দিল। তিনি ছুটলেন স্বামীর কাছে। বললেন, "ওগো শুনেছ ? ছেলে যাচ্ছে রাজপুতানা, চাকরীর খোঁজে। ওদেশে নাকি বাঈজী বিয়ে করবে।"

"কী বিয়ে করবে ? কী বিয়ে করবে ?"

"বাঈজী !"

"কুমাণ্ডটাকে বলো চাকরীর জন্যে অতদূর যেতে হবে না সরকারী চাকরীর আশা আছে।"

ছোট মা সোমের কানে ওকথা পৌঁছে দিলে সোম বলল, "সে চাকরী যখন হবে তখন হবে। ততদিন বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

তিনি তখন স্বামীর কানে ওকথা তুললেন। স্বামী বললেন, "ওর ভাবী স্ত্রীকে ও যদি কিছু নির্জনে বলতে চায় তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

সোম এর উত্তরে ছোট মা'র মারফৎ বলল, "যাকে ওকথা নির্জনে বলবো সে ভাবী স্ত্রী হতে অস্বীকৃত হতে পারে।"

ছোট মা'র মধ্যস্থতায় বাবা বললেন, "মেয়ে অস্বীকৃত হলে কী আসে যায় ? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তা অর্থে বরকর্তা ও কন্যাকর্তা।"

ছোট মা'র মধ্যস্থতায় সোম এর উপর মন্তব্য করল, "তবে বরকর্তা কন্যাকর্তার পাণিগ্রহণ করুন। মন্ত্রপাঠপূর্বক নারীধর্ষণ আমার দ্বারা হবে না।"

এ ঘর ও ঘর করতে করতে ছোট মা পড়লেন হাঁফিয়ে। বাপও ছেলের মুখ দেখবে না, ছেলেও বাপের সুমুখে দাঁড়াবে না। ছোট মা সুমিত্রাকে ডেকে বললেন, "আমি আর পারিনে। তুমি হও এ'দের টেলিফোন।"

সুমিত্রা বলল, "বাহবা বাহবা বেশ।"

সুমিত্রা কানে শুনল, "ওকে বল, ও যা বলবে তা শুনে মেয়ে যাতে বিয়ে করতে অস্বীকৃত না হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে।"

মুখে বলল, "বাবা বলেছেন, তোমার কাহিনী শুনে মেয়ে রাগ করবে কি, উল্টে ভাববে যার কলঙ্ক আছে সেই চাঁদ, তাকে বিয়ে না করলে কাকে বিয়ে করবো, জোনাকিকে ?"

সোম জেরা করল। বলল, "বাবা কখনো অমন কথা তোর সাক্ষাতে বলেননি। বাবার নাম করে মিথ্যা বললি ?"

তখন সুমিত্রা আর কী করে, সত্য বলল।

সোম বলল, "মেয়ের আন্তরিক স্বীকৃতি না পেলে শেখানো স্বীকৃতি আমার কোন কাজে লাগবে ?"

সুমিত্রার দ্বারা পল্লবিত হয়ে বাবার কানে উঠল, "দাদা বলছে তোতাপাখীর মতো যে মেয়ে না বুঝেসুঝে 'হাঁ' বলবে দাদা তার অভিভাবককে বেশ বুঝেসুঝে 'না' বলবে।"

বাবা চটেমটে বললেন, "কী ! বলেছে কল্যাণ ও কথা !"

তখন সুমিত্রা ডালপালা ছেঁটে মূল উক্তিটি আবৃত্তি করল।

বাবা বললেন, "জিজ্ঞাসা কর আন্তরিক স্বীকৃতি যদি পায় তবে বিয়ে করবে তো ? না, অন্য ওজর আপত্তির আশ্রয় নেবে ?"

সুমিত্রার আর ভালো লাগছিল না টেলিফোন হতে। যাতে কল্পনার দৌড় নেই সে কি খেলা ?

দাদাকে বলল, "কথোপকথনের এই শেষ। তিন মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় টেলি-ফোন-গার্ল সতর্ক করে দিচ্ছে।"

সোম বলল, "আন্তরিক স্বীকৃতির পিছনে কী প্রকার মনোভাব রয়েছে সেটাও ধর্তব্য। তা যদি হয় করুণা, কিংবা সংশোধনেচ্ছা, কিংবা ব্যবসায় বুদ্ধি—অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করলে কত সুবিধা তাই নিয়ে হিসাবীয়ানা—, কিংবা Cynicism—অর্থাৎ পুরুষ-মানুষের ইতিহাস ও ছাড়া আর কী হবে—, তবে আমার বিদায়।"

বাবাকে দাদার শেষ বার্তা দিয়ে সুমিত্রা বলল, "এবার দাও তোমার শেষ বার্তা। টেলিফোনের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।"

জাহ্নবীবাবুর ইচ্ছা করছিল বলতে, আমার মাথা আর ওর মুণ্ডু। কিন্তু শেষ বার্তারূপে ঐ বাক্যটির উপযোগিতা ওঁকে সন্দিগ্ধ করল। ছেলে যদি টং হয়ে রাজপুতানা চলে যায় ও বাঈজীকে ঘরে আনে—কিছুই বলা যায় না, আজকালকের ছেলে—তবে নিজের ইহকাল ও পূর্বপুরুষের পরকাল দুই এক সঙ্গে খাবে। অমন খানা ওর মুখরোচক হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওর মুখে বাড়িয়ে দেওয়া কি সঙ্গত ?

চিন্তা করে বললেন, "পুত্রবরের নিকট আমার শেষ নিবেদন এই যে, উনি আপাতত কাশী দেওঘর প্রভৃতি দু চার স্থলে পরীক্ষা করে দেখুন ওঁর প্রিন্সিপ্ল, আমার পলিসীর থেকে কোন অংশে কার্যকরী ও ফলপ্রদ।"

সোম ভেবে দেখল পিতা প্রকারান্তরে তার লঘিষ্ঠ দাবী মেনে নিয়েছেন, অতএব

পিতার গরিষ্ঠ দাবী—কাশী দেওঘর ইত্যাদিতে প্রিন্সিপ্লের পরীক্ষণ—অসংকোচে স্বীকার করা যায়। অল্পে সন্তুষ্ট হলে চাকরী যে কোনোদিন যে কোনোখানে জোটে, একশো টাকার হেড মাষ্টারী দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু যে মেয়ে তাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করবে তার সন্ধানে যাত্রা করা তো কঠিন য়্যাডভেঞ্চার।

রাত্রে বাবার পাশে বসে খাবার সময় সোম বলল, "কাশী যাবো স্থির করলুম।"

জাহ্নবীবাবুর মুখভাবে সুখের লক্ষণ ছিল না। তিনি বললেন, "যাবার আগে একটা তার করে দিও দাশরথিকে। ঠিকানা ভেলুপুরা।"

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা জমল না। সুমিত্রার সঙ্গে যখন দেখা হলো সোম বলল, "সুমি, রাজপুতানার জন্যে খাক্স বিছানা বেঁধে শেষে চললুম কাশী।"

"কেন যে ওখানে যাচ্ছ, দাদা। ওখানে তোমার হবে না।"

"তুই কেমন করে জানলি?

"তোমার যেমন ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা তুমি ভীষ্মের মতো আইবুড় থেকে যাবে।"

"সেও ভালো, তবু ঠকিয়ে বিয়ে করবো না।"

"তুমি কি সত্যি অন্ধ, না অন্ধতার ভাণ করছ, না বিলেত যারা যায় তারা সবাই এমনি?"

"তোর কী মনে হয়?

"আমার মনে হয় তুমি সত্যি অন্ধ। নইলে তুমি কখনো ধরে নিতে না যে কোনো মেয়ে তোমার কাহিনী শুনে বাস্তবিক শক্ পাবে। নেহাৎ যদি অপোগণ্ড না হয়।"

"তুই আমার কাহিনীর কী জানিস! আমার আসল কাহিনীর প্রদ্যোত সিং-ই বা কী জানে! বাবা আমাকে যতটা খারাপ বলে জানেন আমি তার বেশী খারাপ এবং সে জন্যে অনুতাপ করিনে।"

"বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তোমার স্ত্রী শক্ পেতো না, যদি বিয়ের পরে জানতো।"

"তার মানে তুই বলতে চাস যে নারীর মন স্বভাবত অসাড়। আমি কিন্তু নারীকে পাষাণী বলে ভাবতে আজো প্রস্তুত হইনি, সুমি। ওইটুকু রোমান্টিসিজম এখনো আমার চিত্তে অবশিষ্ট, মানুষের শরীরে যেমন য়্যাপেণ্ডিক্স।"

"আমি বলতে চাইনে যে আমরা পাষাণী। আমরা কাজের লোক,আমরা খুদ কুঁড়ো যা পাই তাই নিই ও তাই দিয়ে রান্না চড়াই। স্বামী কুষ্ঠরোগী হলেও আমরা তাকে দোষ দিইনে, সমাজকেও দুষিনে, কাঁদি অদৃষ্টের কাছে, তাও স্বামীকে খারিজ করবার জন্যে নয়, স্বামীর কুশলের জন্যে। জগতে এক পক্ষকে সয়ে যেতে হয়, আমরা সেই সহিষ্ণু পক্ষ। নইলে কোনো পক্ষেই শান্তি থাকতো না, এক পক্ষ হতো বুনো ওল আর অপর পক্ষ হতো বাঘা তেঁতুল।

সোম হাসল। বলল, "বুনো ওলের নায়িকা বাঘা তেঁতুল। জগতে যখন আমি আছি তখন সেও আছে। সে শক্ পাক বা না পাক, তার মধ্যে ঝাঁজ থাকবে, প্রাণ থাকবে। নারী তো কত আছে, আমার সবর্ণা না হলে কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করবো? এ সব কথা বাবা বুঝবেন না। তাই তার সঙ্গে করতে হলো এমন একটা প্যাক্ট যে আমার দিক থেকে রইল না কোনো প্রতিশ্রুতি অথচ তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললুম কাশী।"

"ও! এই তোমার মতলব?" সুমিত্রা কৌতুক কলরোলে গৃহ মুখরিত করল। ছোট মা ছুটে এলেন সোম বলল, "এই চুপ, চুপ, চুপ।"

ছোট মা বললেন, "বলো, বলো কী নিয়ে এত হাসাহাসি হচ্ছিল!"

'জানো না বুঝি? দাদা কাশী যাচ্ছে একটি বাঘা তেঁতুলের খোঁজে। আমি বলি অতদূর যেতে হবে না থার্ড মুন্সেফের মেয়ে নন্দরাণী থাকতে।"

ছোট মাও হাসলেন। চলে যেতে যেতে বললেন, "নন্দরাণীর মা'টিও সেই জাতের।"

২
শিবানী

কাশীতে বাড়ী করায় বিপদ আছে। পরিচিত, অপরিচিত, অর্ধ পরিচিত, পরিচিতের পরিচিত, অপরিচিতের পরিচিত, অর্ধ পরিচিতের পরিচিত, যিনিই সদলবলে তীর্থ করতে আসেন তিনিই দিব্য সপ্রতিভ ভাবে গাড়ী থেকে স্থাবর ও অস্থাবর পোঁটলা-পুঁটলি নামিয়ে গাড়োয়ানকে বিদায় করতে করতে হতভম্ব দাশরথি বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেখুন, এটা কি দাশরথি বাবুর বাড়ী?"

দাশরথি বাবু প্রশ্নকর্তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ও ঘোমটা-দেওয়া পুঁটলিগুলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। বলেন. "আজ্ঞে হ্যাঁ। এইটেই দাশ-রথি বাবুর ছত্র। আমিই দাশরথি।"

প্রশ্নকর্তা বিনয়াবনত হয়ে একটি নমস্কার করেন। তারপর পোঁটলাপুঁটলির দিকে ফিরে উচ্চকণ্ঠে বলেন, "প্রণাম করো। প্রণাম করো। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ জজ দাশরথি বাবু।"

দাশরথি বাবু এর পর কেমন করে এতগুলি ভক্তকে তাড়িয়ে দেন? অন্দরে গিয়ে গিন্নীকে ডাকেন, "ওগো যাদুমণি।"

যাদুমণিকে খুলে বলতে হয় না। তিনি সম্বোধনের সুর থেকে আন্দাজ করেন যে বাড়ীতে অভ্যাগত এসেছে। অর্ধেক জীবন কোথায় রাউজান কোথায় হাতিয়া কোথায় জাজপুর কোথায় জামুই এইসব দুর্গম জায়গায় কাটল, একটিও অভ্যাগত এলো না। এখন কাশীতে তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে লাখে লাখে এসে সঞ্চিত অর্থ টুকু খুঁটতে খুঁটতে নিঃশেষ

করে দিল। হায়, এমন দিন গেছে যেদিন তাঁরা মাছ খেতে পাননি, সপ্তাহে দুদিন হাটে মাছ পাওয়া যায়। মাছ না খেয়ে মিষ্টি না খেয়ে বছরের পর বছর যা বাঁচালেন কাশীতে বাড়ী করে পরকে পাঁচরকম খাইয়ে তার অবশিষ্ট থাকল না।

সাধে কি যাদুমণির দাঁত দিয়ে বিষ ক্ষরিত হয়? দাঁতও আক্রহীন, অধরের অবগুণ্ঠন মানে না। যাদুমণি ঝঙ্কার দিয়ে লঙ্কামরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। দু দিন বাদে অভ্যাগতের তীর্থদর্শন ফুরিয়ে যায়, পোঁটলাপুঁটলি বাড়ী ছেড়ে গাড়ীতে ওঠে।

তবু দাশরথি বাবুর ছত্রে লোকাভাব ঘটে না। তাঁরও পুণ্য হয়, লোকেরও ধর্মের জন্যে অর্থ দিতে হয় না।

এই ধারায় জীবন প্রবাহ বইছিল কাশীতে। এদিকে দাশরথি বাবুর দেশে মুর্শিদাবাদে তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রী শিবানী মাসে আধ ইঞ্চি করে বাড়তে বাড়তে চোদ্দ বছর বয়সে লম্বায় চওড়ায় চৌকষ হয়ে উঠছিল। শিবানীর বাড় দেখে তার বাবা মৃগেন্দ্র বাবুর ব্লাড প্রেসার যাচ্ছিল বেড়ে। ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দাশরথি বাবু শিবানীকে আনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। উদ্দেশ্য এই যে কাশীতে যখন এত বাঙালীর আসা যাওয়া, শিবানীকে দেখে তাদের কারুর পছন্দ হতে সময় লাগবে না। যাদুমণি দেওরের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, কারণ দেওর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার অনুগত না হয়ে নিজের স্ত্রীর অনুগত। তবু শিবানীকে পাত্রস্থ করবার দায়িত্ব নিলেন শুধু অতিথিদের উপর যে খরচটা হচ্ছে সেই খরচটাকে সার্থক বলে মনে করতে। অপব্যয় নয়, প্রয়োজনীয় ব্যয়, দেওরের হিতার্থে। ভাই হয়ে ভাইয়ের এমন উপকার কলিযুগে আর কে কোথায় করেছে? কার ভাইঝিকে দেখবার জন্যে দেশসুদ্ধ মানুষ কাশীতে এসে অতিথি হচ্ছে? কে এই ভ্রাতৃবৎসল কলির দাশরথি এবং কে তাঁর সীতা?

অতিথিদেরও এতে মুখ রক্ষা হল। তাঁরা আশ্রয়ের যাচক হয়ে আসেননি, তাঁরা মেয়ে দেখতে এসেছেন, মেয়ে দেখে অনুগৃহীত করতে। গাম্ভীর্যের ভাণ করে শিবানীকে যাচাই করেন, বিস্ময়ের ভাণ করে মন্তব্য করেন, "বাস্তবিক আজকালকার বাজারে এমন পাত্রী দেখা যায় না।" কথা দিয়ে যান বাড়ী পৌঁছেই চিঠি লিখে দিনক্ষণ স্থির করবেন। তারপর তাগাদা দিলেও চিঠি লেখেন না। তবু দাশরথি বাবু অভ্যাগতকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা যখন গাড়ী থেকে গোষ্ঠীসমেত নামেন ও দু চার কথার পর বলেন, "দাশ-রথি বাবু, আপনার সেই প্রসিদ্ধ ভাইঝিটিকে দেখতে কাশীতে এলুম" তখন দাশরথিবাবু অন্দরে প্রবেশ করে গৃহিণীকে ডাক দেন, "ওগো যাদুমণি।"

যাদুমণি বিদুষী না হলেও নারী, ইনটুইশন তাঁর জন্মগত ও মর্মগত। তিনি সবই বোঝেন, তবু মনকে প্রবোধ দেন এই বলে, "জীবনে যত মাছ হলো না খাওয়া তাদের দাম মিছে জমাতে যাওয়া। টাকা জমিয়ে কী হবে? সঙ্গে যাবে?"

পাড়ায় থাকতেন এক সিবিল সার্জনের স্ত্রী—অবসর প্রাপ্ত। (স্ত্রী অবসর প্রাপ্ত নন, সিবিল সার্জন স্বয়ং অবসর প্রাপ্ত।) মহিলাটি মহিলা মহলের মোড়ল। শিবানীকে কেউ পছন্দ করছে না শুনে দু চারটে টোটকা বাৎলে দিলেন। বললেন, "বিজ্ঞানের অসাধ্য কী আছে? আর বিজ্ঞান খাটে না কোন বিষয়ে? মেয়ে দেখানো কাজটি বৈজ্ঞানিক ভাবে করে দেখুন, ফল অবশ্য পাবেন।" তিনি ফী দাবী করেন না, পাড়ার মহিলারা তাঁকে ধরাধরি করে নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর নির্দেশমতো দর্শনীয়া কন্যার প্রসাধন করেন। (টীকা।—'ধরাধরি করা' এখানে দ্ব্যর্থ বাচক।)

"ও শাড়ী পরালেই হয়েছে! মরি মরি কী রুচি! খোঁপাটা অমন কুকুরের ল্যাজের মতো হলো কেন শুনতে পারি? ব্রোচটা ওখানে বসবে না, বিশ্রী বেমানান দেখায়।"

সিবিল সার্জনের স্ত্রীর টোটকা অনুসারে দ্রৌপদীর মতো প্রতিদিন দুবেলা শাড়ী বদলাতে বদলাতে শিবানী একটি পুতুলের মতো অসাড় হয়ে উঠল। তার মাথার চুলও ক্রমাগত খোলা হচ্ছে, বাঁধা হচ্ছে, তৈলাক্ত হচ্ছে, ধৌত হচ্ছে। তার হাত পায়ের নখ ঘসা হয়, কাটা হয়, পালিশ করা হয়, রঙীন করা হয়। তবু ফল পাওয়া যায় না। গাঙ্গুলী গৃহিণী বলেন, "সবুরে মেওয়া ফলে। বিজ্ঞান তো ভোজবাজি নয় যে দেখতে দেখতে বীজ থেকে গাছ গজিয়ে সেই গাছে আম ফলবে।"

বেনারসী শাড়ীতে ফল হয় না, সুতরাং কাশ্মীরী শাড়ী পরো। কাশ্মীরীতে ফল হয় না, অতএব বোম্বাই শাড়ী পরো। তাতেও ফল হয় না, মাদ্রাজী শাড়ী পরো!

কে এক অর্বাচীন টিপ্পনী করলেন, "তার মানে একশোটা গুলি মারলে একটা লেগে যাবে। তা হলে বিজ্ঞান আর কী হলো।"

গাঙ্গুলী গৃহিণী সিডিশনের গন্ধ পেয়ে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "হয়েছে! হয়েছে! মা মাসিমার চেয়ে তুমি বেশী জানো দেখছি! তবে তুমিই সবাইকে পরামর্শ দাও। আমরা তা হলে এখান থেকে উঠি।"

বলা যত সহজ ওঠা তত সহজ নয়। গাঙ্গুলী গৃহিণী রথের পথে পুরীর জগন্নাথ মূর্তির মতো দুলতে থাকলেন, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে এগিয়ে দেবার উদ্যোগ করল না।

বোঝা গেল তাঁর প্রতিপত্তি—বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি—অস্তমিত হয়েছে। যার পরামর্শে ফল হয় না তাকে মোড়ল বলে মানতে কেউ প্রস্তুত নয়।

শিবানীকে দেখে যাদের অনুমান হয় যে ওর বয়স উনিশ কুড়ি তারা মূর্খ। তার দেহে এখনো লাবণ্যের বন্যা আসেনি। তার সর্বাঙ্গ ভরে উঠে টল টল করেনি ও দুকূল ছাপাতে উদ্যত হয়নি। সে হচ্ছে সেই জাতীয় লতা যার বৃদ্ধি দ্রুত ও ঘন হলেও যে

পুষ্পিতা হবার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

প্রৌঢ়রা একটি রাঙা টুকটুকে বৌমা পেলে খুশি হন, তাঁদের পক্ষে শিবানী যথেষ্ট কমনীয় নয়, কচি নয়। আর যুবকরা চান শ্রীসম্পন্না বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণী বধূ, শিবানীকে তাঁরা ছ সেরা বেগুনের মতো একটা অপরূপ পদার্থ জ্ঞান করেন। তার রং ময়লা। কালো মানুষদের দেশে সেটা তার এক মস্ত অপরাধ। কিন্তু সে জন্যে সে নিজে চিন্তিত নয়, চিন্তিত তার বাবা মৃগেন্দ্র, মা সৌদামিনী, তার জ্যাঠামশাই দাশরথি। কেবল তার জ্যাঠাইমা বাদুমণি বলেন, "পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে সব কটাই ধলা হবে এ তোমার ইংরেজের দেশে হয় কি না বলতে পারিনে, কিন্তু কালা ধলা দুই না থাকলে ভগবানের সৃষ্টি একাকার হয়ে যেতো।" একথা যখন তাঁর মুখে তাঁর স্মরণে তখন তাঁর দাঁতের কথা।

চিন্তা করতে, উদ্বিগ্ন হতে, বিরক্ত হতে শিবানী জানে না। তাকে যে যা করতে বলে সে তাই করে, তবু খাটুনির চাপে তার বাড় থামে না। ওজন কমাবার জন্যে তার ভোজন কমানো হয়, কিন্তু শরীর তার যেন মনসা সিজের ঝাড়। পড়াশুনা সে তার সাধ্যমতো করেছে। মেয়ে ইস্কুলে ক্লাস-ওঠা বাড়ীতে সিঁড়ি-ওঠার চেয়ে সোজা, দেশে ফোর্থ ক্লাস অবধি উঠেছিল। তারপর কাশীতে এসে দু বেলা সাজতে ও সাজ খুলতে ব্যাপৃত থাকায় ইস্কুলে হাজিরা দেবার সময় নেই বলে ভর্তি হয়নি। দাশরথি বাবুর একমাত্র দুহিতা—যিনি প্রকৃতপক্ষে বিধবা হলেও কলেজে কুমারী বলে আখ্যাতা —তাঁরই কাছে শিবানী মুখে মুখে ইংরেজী কথোপকথন শিখছে। তাকে গান শেখানোর জন্যে সপ্তাহে তিন দিন একজন আসেন—ওস্তাদ নন, কারণ ওস্তাদের ধৈর্যের সীমা আছে, যদিও অন্যের ধৈর্যের সীমা সম্বন্ধে ওস্তাদ হচ্ছেন নাস্তিক।

এই যার মোটামুটি পরিচয় সে যে সোমের মতো পাত্রের উপযুক্ত নয় তা কি দাশরথি বাবুরা জানতেন না? জানতেন। তবে সম্বন্ধ করলেন কেন? কারণ দাশরথি বাবুর এক ছেলে বিলেত ঘুরে এসেছে, আর এক ছেলে বিলেতে সাত বছর থেকে Accountancy শিখছে, মেয়েকেও তিনি বিলেত পাঠাবার কল্পনা করেছেন—যদি সে সরকারী স্কলারশিপ পায়। কাজেই দাশরথিবাবুর ভাইঝিকে যে বিয়ে করবে তার স্ত্রীভাগ্য যাই হোক শ্যালক ও শ্যালিকাভাগ্য গৌরবময়। শ্যালক ও শ্যালিকা সম্পদই তার যৌতুক। আর স্ত্রীও তো কাঁচামাল, তাকে দিয়ে যা বানাবে সে তাই বনবে। নিজের হাতে গড়ে নাও। কোনো আফশোষ থাকবে না। সেই তো গার্হস্থ্য স্বরাজ। আজকাল ঘরে ঘরে এত দাম্পত্য অশান্তি কেন? লোকে পরের হাতে তৈরী মেয়ে বিয়ে করে বলে। সব ম্যানুফ্যাকচারের কলে প্রস্তুত।

কাজেই সোমকে শিবানীর বর করতে দাশরথি বাবুদের দ্বিধা ছিল না, তাঁরা মনে

মনে বলছিলেন, উপযুক্ত নয় ? তবে উপযুক্ত করে নাও। শত শত ভদ্রলোক যাকে দেখে না-পছন্দ করলেন সোম যে তাকে পছন্দ করবে এতটা ভরসা তাঁদের ছিল না। তবে ও সব ভদ্রলোক আসলে হচ্ছেন কশাই, ওঁরা দাশরথিবাবুকে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, পণ কত দেবেন। দাশরথিবাবু প্রকারান্তরে বলেছিলেন, এক পয়সাও না। এমন সব শ্যালক শ্যালিকা থাকতে পণ ? দাশরথিবাবু ক্রমশ বুঝলেন যে পণ অনুসারে পছন্দ। তবু তাঁর মতো মানী ব্যক্তি পণের কড়ি নিয়ে দরদস্তর করবেন এ কি কখনো সম্ভব ? আর কৃপণও তিনি কম নয়। সবদিক থেকে খতিয়ে দেখলে সোমের মতো পাত্রই তাঁর আশার স্থল। জাহ্নবীবাবুও দাশরথিবাবুর কথা ঠেলবেন না, যদি তাঁর ছেলের দিক থেকে কোনো আপত্তি না থাকে।

দাশরথি বাবু মনে মনে একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা মুসাবিদা করলেন, যেন জুরির প্রতি জজের চার্জ। বাবা কল্যাণ, তোমরা নব্য তরুণ, তোমরা ভাবী ভারত, তোমরা পণ নিতে পারো না। কী চাও তোমরা ? রূপ ? দেহের রূপ যে দেহের চেয়েও নশ্বর। বিদ্যা ? দুজনের মধ্যে একজন বিদ্বানই যথেষ্ট, নইলে বিরোধ অনিবার্য। ডিগ্রী ? হায়রে দেশ ! ডিগ্রীর মোহ এখনো ঘুচল না! ভেবে দেখ কল্যাণ, পৃথিবীতে শাশ্বত যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে বনেদিয়ানা। আমরা বনেদি বংশ, কুলীন। আমাদের এভল্যুশনের জন্যে বহু শতাব্দী লেগেছে। এ বাড়ীর মেয়ে কেবলমাত্র জন্ম সূত্রে এত বাঞ্ছনীয় যে চন্দনকাঠের বাক্সের মতো রঙীন প্রলেপের অপেক্ষা রাখে না। বাজারের মেয়ে হলে accomplishmentsএর আবশ্যক থাকত। তোমরা গৃহশ্রী চাও না নটী চাও ?

সোম দাশরথি বাবুর পরিচয় পেয়ে রেলষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি একেবারে গলে গেলেন। বললেন, "থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে।" নিজের বিলেতফেরত ছেলেও তাঁকে সকলের সাক্ষাতে এমন মর্যাদা দেয়নি। ষ্টেশন থেকে বাড়ী পর্যন্ত তাঁর বাক্‌স্ফূর্তি হলো না—উত্তেজনায়। তারপর হাঁক দিলেন, "ওগো যাদুমণি।" যাদুমণি বেরিয়ে আসতেই সোম তাঁকে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম ঠুকে দিল। তিনিও হতবাক্। সোম এদিকে একধার থেকে প্রণাম করতে লেগেছে। বাড়ীতে দুইতিনজন অভ্যাগত ছিলেন, তাঁরাও বাদ গেলেন না। দাশরথিবাবুর বিধবা মেয়ে কুমারী কাননবালা মিত্র চোখে চশমা এঁটে ঐ পথ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, যেন সোমকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না—সোম তাঁর পায়ের কাছে ঢিপ করে প্রণাম করলে তিনি প্রথমে চকিত ও পরে এমন বিনম্রভাবে নমস্কার করলেন যে পাঠক ওখানে উপস্থিত থাকলে পাঠকের মনে হতো মিস মিত্র ঐ নমস্কারের মহলা দিয়ে আসছিলেন পরশু থেকে তাঁর শোবার ঘরের আয়নার সম্মুখে।

কৌতূহলী হয়ে শিবানী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, পাছে সোমের ভক্তির আবেগ

সাগরলহরীর মতো সেই সামান্য বালিকার চরণে চূর্ণ হয় এই আশঙ্কায় যাদুমণি বিশ্রী একটা নিষেধ বাক্যের দ্বারা সেই বালিকাকে স্বস্থানে স্তম্ভীভূত করে দিলেন। দেখেশুনে সোমও তার ভালো-ছেলেমির বেগ সম্বরণ করল।

কে একটি চাকর এসে তাকে পাখা করতে লাগল। যাদুমণি বললেন, "বোসো, বাবা বোসো।" দাশরথি বললেন, "তোমাকে দেখেছিলুম মুন্সীগঞ্জে, তখন তুমি চার পাঁচ বছরেরটি।" যাদুমণি আপত্তি করে বললেন, "না, না, আমার রবি তখন কোলে, আর এ ছেলে তখন হামাগুড়ি দিচ্ছিল।" দাশরথি বাবু বললেন "সে কী করে হয়?" স্বামী স্ত্রীতে এই নিয়ে ঘোরতর বচসা উপস্থিত। দুজনেই স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে কার কখন চোখ উঠেছিল, হাম হয়েছিল, কাকে কোনখানে কাঁকড়াবিছেতে কামড়েছিল, ভূতে পেয়েছিল, কে কোন বার গলায় মাছের কাঁটা আটকে প্রায় পটল তুলেছিল—এই সকল অলিখিত তথ্য উদ্ধার করতে থাকলেন।

বাড়ীর বুড়ী ঝি—বুড়ী ঝিদের নাম যা হয়ে থাকে তাই অর্থাৎ মোক্ষদা—তর্কের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক মায়ের মতো দেখতে—তেমনি চোখ, তেমনি ভুরু, তোমার—"

যাদুমণি বললেন, "তুই ভারি মনে রেখেছিস মোক্ষদা। অবিকল বাপের মতো মুখ, যেন ঠাকুরপো নিজেই এসেছেন এত কাল পরে! হাঁ বাছা, তোমার বাবার খবর দিলে না যে? ভালো আছেন তো? তোমার নতুন মাকে আমি দেখিনি। বেশ ভালো ব্যবহার করেন তো? নতুন ভাইবোন ক'টি?"

দাশরথি বললেন, "আহা, এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে কেন?" এই বলে তিনি নিজেই আর একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। "ওহে, লণ্ডনে ধূর্জটির সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ হতো?"

সোম ধূর্জটির নাম শুনেছিল, কিন্তু চেহারা দেখেনি। বলল, "লণ্ডনের মতো বিরাট শহরে পাঁচ শো বাঙালী ছাত্র কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হওয়া অসম্ভব। তাঁর ঠিকানাই জানতুম না।"

কর্তা গিন্নী দু জনেই ক্ষুণ্ণ হলেন। আশা করেছিলেন যে খবর চিঠিতে পাবার নয়, সে খবর দূতের মুখে পাবেন।

যাদুমণি দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ গা, রবি কোথায় পড়ত, গেলাস না বাটি কী তার নাম?"

মিস মিত্র ফিক করে হেসে বাপের হয়ে উত্তর দিলেন, "ও মা, গ্লাসগো তোমার মনে থাকে না।"

যাদুমণি বললেন, "এই তো তুই নিজ মুখে বললি গ্লাস গো। আমিও বলেছি গ্লাস—

তবে আমি মুখখু মানুষ, আমি গ্লাস না বলে গেলাস বলেছি। এই তো?"

"ওগো না গো, "দাশরথি বুঝিয়ে বললেন, "গ্লাস নয়, গ্লাসগো।"

যাদুমণি আগুন হয়ে বললেন, "তামাসা করবার আর সময় খুঁজে পেলে না। গ্লাস নয় গো, গ্লাসগো, চুলো নয় গো, চুলো গো।"

দাশরথি বাবু পলায়ন করলেন। কাননবালা সোমকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "কত বার চেষ্টা করলুম, all in vain. তোতাকে কৃষ্ণ নাম শেখালে সে শেখে, কিন্তু to teach Mother English !"

মা কী বুঝলেন তিনিই জানেন, মুখ ভেঙিয়ে বললেন, "বুঝেছি লো বুঝেছি। আমারই ঘরে বসে আমারই খেয়ে আমার নিন্দে। আমার শিল আমার নোড়া, আমার ভাঙে দাঁতের গোড়া।"

মোক্ষদা বলল, "হাঁ রে খুকী, তুই কী বলছিস ইঙ্গিরিজিতে? মায়ের দাঁত ভাঙবি?"

"তুই বের হ এখান থেকে হারামজাদী," বলে যাদুমণি মোক্ষদার গায়ে যেন বিষ দাঁত বসিয়ে দিলেন। কাননবালার পিছু পিছু মোক্ষদাও দৌড় দিল।

বাকী থাকল সোম। যাদুমণি তাকে ব্যথার ব্যথী করলেন। লেখাপড়া যে তিনি জানেন না সেটা কি তাঁর দোষ? দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে, বারো বছর বয়সে তিনি মা—এক এক করে পাঁচটি সন্তান হারিয়ে তিনি যখন বিশের কোটায় পা দিলেন তখন যমরাজ তাঁকে দয়া করলেন, তাঁকে তিনটি সন্তান ভিক্ষা দিলেন। তারপর সেই সন্তান তিনটিকে মানুষ করতে করতে আটাশ বছর অতীত হলো, অতীতের স্মৃতি নিয়ে দুদণ্ড কাটাবেন তার অবসর পেলেন না। মেয়েটিই সকলের বড়, তার কপাল পুড়ল বিয়ের মাস ছয় না যেতে। শ্বশুর শাশুড়ী গরীব, নিজেরাই খেতে পান না, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এলো। ওর বাপ বললেন, একটি মাত্র মেয়ে, তার বিষণ্ণ মুখ দেখতে পারিনে, যাক ও ইস্কুলে, যে ক্লাসে পড়ছিল সেই ক্লাসে পড়ুক, ইস্কুলের খাতায় যে নাম লেখা ছিল সেই নাম বাহাল থাকুক। পড়াশুনায় মেয়ের খুব মন, কিন্তু মাঝখানে হল পেটের ব্যারাম। ভুগতে ভুগতে বেচারির চারটি বছর নষ্ট। এই বার এম-এ দেবে।—যাদুমণি সগর্বে ভ্রূ বিস্তার করলেন। ততক্ষণে ভুলে গেছলেন যে মেয়ে তাঁর মূর্খতা নিয়ে পরিহাস করেছে।

সোম বলল, "ধূর্জটিবাবু ও রবিবাবুর সঙ্গে বিলেতে পরিচয় হলো না বলে আমি দুঃখিত।"

"রবি তো দেশে ফিরেছে। দুই ভাই এক সঙ্গে ওদেশে যায়, রবি ছোট। আর সেই রবিই কি না পাঁচ বছরের মধ্যে পড়া শেষ করে বরোদায় কাজ পেয়ে গেল।" যাদুমণি সোমকে জিজ্ঞাসু দেখে যোগ করলেন, "ইঞ্জিনিয়ার।"

"আর ধূর্জটিবাবু ?

"ওকথা তুমি ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরো, বাবা। আমার এখনো দোরস্ত হলো না। পাস করলে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করবে, না কী করবে। এদিকে তো বাপের পেনসনটা সেই একলা গ্রাস করলো। সে আর এই সব"—এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি —"কুটুম্বুরা।"

সোমও গলার স্বর নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "ওরা সব কুটুম্বু বুঝি ?"

চোখ টিপে যাদুমণি চুপি চুপি বললেন, "বুঝতে পারলে না ? কাশী বেড়াতে এসে ছত্রে খাবার ফন্দী এঁটেছে। কুটুম্বু নয়, কুটুম্বুর কুটুম্বু, তার কুটুম্বু। তাও নয়, কোথায় ওঁর নাম শুনেছে, এসে বলেছে আপনি আমার মামলা ডিসমিস করেছিলেন তেইশ বছর আগে আরামবাগে।"

সোম ফিস ফিস করে বলল, "ভাগিয়ে দেন না কেন ?"

"ওরে বাপ রে। কাশীধামের পুণ্য যেটুকু হচ্ছে এই বুড়ো বয়সে সেটুকুও হবে না।" যাদুমণি অঙ্গভঙ্গি সহকারে উক্তিটাকে সচিত্র করলেন।

সোম আসবে এই খবর পেয়ে শিবানীকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, অঙ্কের কাছে পরীক্ষা দেবার তার দরকার ছিল না। সোমের পৌঁছানোর পর আবার সাজ সাজ রব উঠল। ধূর্জটির স্ত্রী এই বাড়ীতেই থাকেন, রবির স্ত্রী বরোদায়। ধূর্জটি তিন বছর আগে একবার দেশে এসে স্ত্রীকে দেখা দিয়ে গেছল, ফলে তাঁর একটি খোকা হয়, সেই খোকাটিকে বুকে করে তাঁর বিরহবেদনার উপশম হচ্ছিল। শিবানীকে সাজানোর ভার তাঁরই উপরে পড়েছে।

কাননবালার কলেজ থাকায় তিনি এ বিষয়ে দায়িত্ববিরহিত। তিনি এসব বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। ভালো ছেলেরা যেমন টেরি কাটে না, সাবান মাখে না, সৌখিন পোষাক পরে না কাননবালারও তেমনি কেশ আলুথালু বসন এলোমেলো ধরন অগোছালো।

আবার সাজ সাজ রব উঠল। এবার এসেছে বিলেতফের্তা পাত্র, পাড়ার পরোপকারিণীদের দ্বারে ডাকাডাকি করতে হলো না ; তাঁরা সাজ সাজ রবাহূত হয়ে নিজেরাই সেজেগুজে সমুপস্থিত হলেন। গাঙ্গুলীগিন্নী সেবারকার অপমানের কথা ধর্তব্য মনে করলেন না, তবে এবার মাদুরের উপর আসন না নিয়ে একখানা প্রশস্ত মজবুৎ চেয়ারে আসীন হলেন, যদি আবার অপমানিত হন তবে গাত্রোত্থানের জন্য পরমুখাপেক্ষী হবেন না। এবার শিবানীর সঙ্কট এত বিষম যে তাঁকে উপেক্ষা করবে কি সকলে তাঁকেই সঙ্কটের তারিণী ভেবে স্তুতি করতে সুরু করে দিল।

সোম স্বপ্নাক্ষরে জানত না যে এত বড় একটা আয়োজন চলেছে শুধু তারই মনোহরণের জন্যে। সে আরাম করে সারা দুপুর জুড়ে নিদ্রা দিল। কে একটি ছোট ছেলে তার শোবার ঘরে ঢুকে ছুটাছুটি করে তাকে যখন জাগিয়ে তুলল তখন পাঁচটা বাজে। চোখ মুখ ধুয়ে সে বসবার ঘরে গিয়ে দেখে দাশরথিবাবু সপার্ষদে তার প্রতীক্ষা করছেন। "এই যে, কল্যাণ। বসো, কেমন ঘুম হলো। এতক্ষণ তোমার কথা এঁদের বলছিলুম। একেবারে মনে হয় না যে বিলেত থেকে ফিরেছ। কী ভক্তি কী বিনয় কী স্বদেশপ্রীতি —আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলুম প্যাণ্ট কোট পরা সাহেবকে কী খাইয়ে কোথায় বসিয়ে আদর আপ্যায়ন করবো।"

সমাগত অবসরপ্রাপ্তগণ নাকের উপর চশমা চড়িয়ে সোমকে পর্যবেক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। দুবছর বিলেতে থেকে তার গায়ের রং যতটা ফরসা হয়েছিল এই কয় দিনেই প্রায় ততটা ময়লা হয়েছে। তার চামড়ার নীচে যে বিদেশী প্রভাব উহ্য ছিল টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপেও তার পাত্তা পাওয়া যায় না, চশমা তো ছার। কাপড় চোপড় বাঙালীর মতো দেখে তাঁরা চশমা খুলে রাখলেন। কতকটা হতাশ স্বরে বললেন, "না, আদৌ মনে হয় না যে বিলেত প্রত্যাগত।"

তবু তাঁরা সে দেশ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চললেন। সোম সাধ্যানুসারে উত্তর দিতে থাকল। তার অন্য দিকে হুঁশ ছিল না। হঠাৎ এক সময় পর্দা সরিয়ে দুই তিন জন মহিলা একটি বালিকাকে ঘরের ভিতর জোরে ঠেলে দিলেন। পর্দা ছেড়ে দিলেন। বালিকাটি দুই হাতে একটি ট্রে ধরে তীরের মতো সোজা সোমের দিকে এগিয়ে এলো। সোম যদি হঠাৎ উঠে তার হাত থেকে ট্রে-টি তুলে নিয়ে নিকটবর্তী টিপয়ের উপর না রাখত তবে টাল সামলাতে না পেরে সে হয়ত সোমের গায়ে চা ঢেলে দিত।

সোমকে একটি সরল চাহনি অর্পণ করে সে নত মুখে দাঁড়িয়ে কী যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করলো। যেন তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই-এই করতে হবে. শেখানো কর্তব্য ভড়কে গিয়ে ভুলে গেছে। সোম যে হঠাৎ তার হাত থেকে ট্রে-টি কেড়ে নেবে এমন সম্ভাবনার জন্যে তাকে কেউ প্রস্তুত করে দেয়নি। সে যে ভূমিকায় অভিনয়ের তালিম পেয়েছিল তাতে কেউ ট্রে ছিনিয়ে নিলে ধন্যবাদ দিতে হয় এটুকুরও উল্লেখ ছিল না।

তাকে তদবস্থ দেখে কারুর করুণা উপজাত হওয়া দূরে থাকুক সোম ছাড়া সকলের কোপ উদ্রিক্ত হলো, অভিনেতা পার্ট ভুলে গেলে অডিয়েন্সের যা হয়। দাশরথিবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "নমস্কার করো।" মেয়েটি বার-এক চোখ মিট মিট করে শশব্যস্তভাবে নমস্কার করল। তখন সোম তার দশা হৃদয়ঙ্গম করে তার উপর থেকে সকলের মনোযোগ ছাড়িয়ে নিল। বৃদ্ধ কুঞ্জমোহন বাবুর কাছে ট্রেশুদ্ধ টিপয়টি স্থাপন করে করজোড়ে বলল, "আগে বয়ঃ প্রাচীন।"

কুঞ্জবাবুর মজোলীয় নয়ন যুগল বিনা নেশায় ঢুলু ঢুলু। তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও সন্মিত হলেন। কিছু না বলে একটি রসগোল্লা তুলে নিয়ে টপ করে মুখে ফেলে দিলেন। দুই ঠোঁট একত্র হয়ে "আঁপ্‌ প্‌" বলে একটা শব্দ সৃষ্টি করল। তারপর গণ্ডদ্বয়ের স্ফীতি প্রশমিত হলো ও চোখের কোণ থেকে খানিকটে জল ঝরে গেল। তখন দাদা বললেন, "বেশ বানিয়েছে তো। একটা মুখে দিয়ে দ্যাখ না, দাশরথি।" অতঃপর সুসজ্জিতা অন্য কয়েকটি মেয়ে ঘরে যতগুলি ভদ্রলোক ছিলেন ততগুলি থালা হাতে করে প্রবেশ করলেন ও সকলের হর্ষ বর্ধন করলেন।

সোম এতক্ষণে টের পেয়েছিল যে এই সব সজ্জন তাকে পরীক্ষা করতে আসেননি, এসেছেন পরীক্ষার্থীনার পক্ষীয় হয়ে পরীক্ষককে তোষামোদ করতে। কিন্তু কোনটি পরীক্ষার্থীনা ? একটি না সব ক'টি ? কেউ তো কারুর চেয়ে কম সাজেনি। যেন সকলের জীবনে আজ পার্বণ। হয়ত প্রত্যেকেই ভাবছে সোম কী মনে করে তাকেই পছন্দ করবে। বলবে, দেখতে এসেছিলুম বটে শিবানীকে কিন্তু পছন্দ হলো আমার (জ্যোৎস্নার মনে মনে) জ্যোৎস্নাকে, (লিলির মনে মনে) লিলিকে, (শান্তিলতিকার মনে মনে) শান্তিলতিকাকে।

কিন্তু মরীচিকার মতো ঐ সকল মায়াললনা কোথায় মিলিয়ে গেল। সোম দেখল, সেই সর্ব প্রথম মেয়েটি (সেইটি শিবানী বুঝি) তখনো তেমনি নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে —নিশ্চল প্রতিমার মতো। সুরূপা নয়, বেশ ভূষা তার অঙ্গের সঙ্গে অসমঞ্জস, যেন তার নিজের নিত্যকার নয়। কেবল দীঘল ঘন চুল এলায়িত হয়ে তার মধ্যে যা কিছু লাবণ্য যোজনা করেছে। মেয়েটির মুখ ভাব বড় সরল। মনে হয় এ মেয়ে রূপকথা শুনে তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী ঋজু, সরল। মনে হয় এ মেয়ে আরাম কেদারায় বই হাতে করে ললিতা নয়, খাটতে অভ্যস্ত।

সোম নরম সুরে বলল, "বসুন।"

মেয়েটি সত্যিই বসল। হুকুম যে। হুকুমের অবাধ্য হতে জানে না। ওদিকে দাশরথিবাবুরা মেয়েটার স্পর্ধা দেখে রুষ্ট হলেন। কিন্তু পাল্টা হুকুম করলেন না।

ভদ্রতার খাতিরে সোম দুটো একটা প্রশ্ন করল। দাশরথিবাবু বললেন, "অতবার ওকে 'আপনি' 'আপনি' বলছ কেন বাবা। ও তোমার অনেক ছোট।"—

কাঙ্গালীবাবু বললেন, "সব দিক দিয়ে।"

সরোজিনীবাবু বললেন, "লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্রের সঙ্গে আমাদের ওই পল্লীবালিকার তুলনা হয়! তবে ইনি যদি ওকে নিজ গুণে গ্রহণ করেন—যদি ওর নির্গুণতা গ্রাহ্য না করেন তবে দুই জেলা জজের পারিবারিক সংযোগ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হবে।"

চাটুভাষণ সমানে চলল।

পরদিন যাদুমণি প্রসঙ্গটা তুললেন।

বললেন, "কেমন লাগল, বাছা, শিবানীকে ?"

সোম গত রাত্রে ভেবে রেখেছিল এর উত্তর। মেয়েটি এমন অবোধ যে ওকে প্রবঞ্চনা করা নিতান্ত সহজ এবং সেইজন্যে সর্বথা পরিহার্য্য। ওকে বিয়ে না করলেই চুকে যায়, কিন্তু বিয়ে করতে সোমের অনিচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ ওর প্রতি সোমের প্রগাঢ় মমতা বোধ হচ্ছিল। কে জানে কার হাতে পড়বে, শাশুড়ী দেবে ছ্যাঁকা, ননদ করবে চিলেকোঠায় বন্দী, স্বামীটি গোপালের মতো সুবোধ, প্রতিবাদ করবে না। ওর মতো অবোধ মেয়েরাই তো অত্যাচারকে আমন্ত্রণ করে।

বলল, "ভালোই লেগেছে। তবে—"

"তবে ?"

"তবে আমার একটি ব্রত আছে।"

"ও মা পুরুষ মানুষের কী ব্রত !" যাদুমণি তাঁর কন্যা কাননবালার দিকে তাকিয়ে সোমের দিকে ফিরে তাকালেন।

কাননবালা উৎকর্ণ ভাবে ছিলেন : বাক্য প্রক্ষেপ করলেন না।

সোম বলল, "আমার ব্রত এই যে যার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হবে তার সঙ্গে আগে একবার আমি নির্জনে কথা বলতে চাইব। কথাবার্তার পরে স্থির করব তাকে বিয়ে করব কি না।"

"কী বললে !" যাদুমণি যেন হালুম হালুম করতে লাগলেন বাঘিনীর মতো। "কী বললে তুমি। নির্জনে কথাবার্তার পর বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখবে। ওগো শুনছ ! খুকীর বাবা। ডাক দেখি খুকী তোর বাবাকে।" যাদুমণি গজরাতে থাকলেন।

দাশরথিবাবু এক পায়ের একপাটি চটি বৈঠকখানায় ফেলে এলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে বললেন, "কী হয়েছে ? কী ? কী ?"

যাদুমণি ততক্ষণে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েছেন এবং সেই মিশ্র সামগ্রীকে সোমের উপর আরোপ করে আরো কুপিত হয়েছেন। বললেন, "তোমার বন্ধুর ছেলে বলছেন তোমার ভাইঝির সঙ্গে আগে নির্জনে কথা বলবেন কি আর-কী করবেন, পরে বিয়ে করবেন কি আর-কী করবেন। ভাইঝি, না বাঈজি—কী দেখতে আসা হয়েছে কাশীতে ?"

দাশরথিবাবু লজ্জিত অপদস্থ অপমানিত সোমকে ইঙ্গিতে বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।" বৈঠকখানায় পাশে বসিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিষম বদরাগী মানুষের

পাল্লায় পড়েছিলে। আমি জানি উনি তিলকে বাড়িয়ে তাল করেছেন। আমাকে বলো তো আসল কথাটা।"

তখনো সোমের হৃৎকম্প হচ্ছিল। অপমানে তার বাক্‌রোধ হয়েছিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকল। এই সময় কাননবালা এসে দাশরথিবাবুর কাছে আসন নিলেন।

"বলো বাবা, বলো। আমাকে তোমার বাবার মতো মনে করতে পারো।"

তবু সোম নির্বাক।

কাননবালা সোমের পক্ষ নিয়ে বললেন, "বিলেতফের্তা আধুনিক যুবকদের এ বাড়ীতে আসতে বলবার সময় মা'র মুখে gag দেওয়া উচিত, যেমন দুষ্ট কুকুরের মুখে।"

"কী হয়েছে, তুই বল না খুকী।"

খুকী বললেন, "হয়েছে যা তার জন্যে এই ভদ্রলোকের কাছে আমাদের মাফ চাওয়া উচিত। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস বশত যদি ইনি বলেই থাকেন যে শিবানীকে বিয়ে করবেন কি না স্থির করবার আগে একবার ওর সঙ্গে নির্জনে আলাপ করতে চান—যা ওদেশের একটা অতি নির্দোষ রীতি—তবে অন্যায় কিছু বলেননি। যে-কোনো মডার্ণ যুবক তাই বলে থাকতেন ও যে-কোনো মডার্ণ মেয়ে তাই প্রত্যাশা করে থাকত।"

দাশরথিবাবু শেষ পর্যন্ত শুনলেন কি না সন্দেহ। একমনে ও দুই হাতের দশ আঙুলে দাড়ি বুরুষ করতে লাগলেন। যৌবনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। ভাব গেছে, প্রভাব আছে ও পরিপুষ্ট হয়ে আননভূমিতে কানন রচনা করেছে।

বহুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, "যে সমাজে বাস করতে হচ্ছে সে সমাজের রীতি মান্য করতে হয়। নইলে তোর আমি পুনরায় বিয়ে দিইনি কেন?"

সোম আড় চোখে কাননবালার মুখে তাকিয়ে দেখল তিনি সরম-সিন্দুর বদনে কী যেন ধ্যান করছেন। নিশ্চয়ই তাঁর লোকান্তরিত স্বামীর মর্ত্যরূপ নয়।

"আমার স্ত্রীর কথায়," দাশরথিবাবু বলতে লাগলেন, "তুমি কিছু মনে কোর না, কল্যাণ। এদেশে যা সম্ভব নয় তা ওদেশ থেকে ফিরে সম্ভব করতে চাও তো আর-এক পুরুষ অপেক্ষা করো। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের উপর অধীত বিদ্যার প্রয়োগ না করে আমাদেরকে শান্তিতে মরতে দাও।"

সোম সাহসের সহিত বলল, "কিন্তু মেয়েগুলি যে আপনাদের হাতে।"

"সেইজন্যেই তো বলছি আর-এক পুরুষ অপেক্ষা করো, তোমাদের নিজের নিজের মেয়ে হোক।"

"কিন্তু," সোম উষ্মার সহিত বলল, "আমি যা সম্ভব করতে চাই তা এমন কিছু নয়, একটু বাক্যালাপের নিভৃত অবকাশ।"

"না, না," দাশরথিবাবু দাড়ি নাড়লেন। "তুমি যে শুধু বাক্যালাপই করছ একথা পরে পাড়ার লোক বিশ্বাস করবে না।"

"আপনার ভাইঝির মুখে শুনেও বিশ্বাস করবে না?"

"না হে, না! ওদের মধ্যে যারা দুর্মুখ তারা ও মেয়ের যাতে অন্যত্র বিয়ে না হয় সেই চেষ্টা করবে, বেনামী চিঠি লিখে পাত্র ভাঙিয়ে নেবে। ওদেরও তো বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। এক যদি তুমি কথা দেও যে শিবানীকে পরে বিয়ে করবে তবে লোকনিন্দা আমরা সামলে নিতে পারব, যদিও এত বড় বনেদি বংশের পক্ষে ওটা যেন বনস্পতির পরগাছা—বনস্পতিরই মতো দীর্ঘজীবী। আরো তো ছোট ছোট ভাইঝি আছে, ওদেরও একদিন বিয়ে দিতে হবে। না, হবে না?"

কাননবালার পাণ্ডুর মুখ যেন এই কথাটি বলতে চাইছিল যে, ঐ সব আগত অনাগত শিশুদের বিয়ে হবে না বলে আমারও ভালো করে বিয়ে হলো না।

সোম বলল, "কথা আমি দিতে পারব না নিভৃতে কথা বলার আগে।" আপনাকে অহেতুক লোকনিন্দাভাজন করতেও আমার রুচি হবে না। অতএব বিদায়।"

"সে কী হে! তুমি এখনি উঠবে! য়্যাঁ!"

"যা অসম্ভব তার জন্যে আমি আর-এক পুরুষ কেন আর-এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে পারবো না।"

"সে কী হে! য়্যাঁ!"

"যেতে হবে আমাকে সম্ভবের সন্ধানে—কুন্তোড় কলিয়ারি, নান্দিয়ার পাড়া, লালমণির হাট, ভূসাওল, কোলাবা। একশো সাতচল্লিশটা ঠিকানায় খোঁজ করতে হবে সম্ভবকে। এক জায়গায় বসে থাকলে চলে?"

দাশরথিবাবু বুদ্ধি ধার করবার জন্যে অন্দরে উঠে গেলেন। ডাকলেন, "ও যাদুমণি।" স্বামীস্ত্রীতে যতক্ষণ ধরে বুদ্ধি দেওয়া নেওয়া চলল ততক্ষণ বৈঠকখানায় সোম ও কাননবালা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

কাননবালা সোমের দিকে না তাকিয়ে বললেন, "বাস্তবিক, লোক নিন্দাকে এতটা ভয় করা অনুচিত।"

সোম কাননবালার দিকে বিশেষ করে তাকিয়ে বলল, "লোকনিন্দার ভয়টা গৌণ। ভয় মুখ্যত আমাকে।"

কাননবালা ঘাবড়ে গেলেন। সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "কেন, আপনি কি বাঘ না ভালুক যে আপনাকে ভয় করতে হবে? এই তো আমি নিভৃত বাক্যালাপ করছি নির্ভয়ে।"

কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত সোম বলল, "সাবধান, মিস মিত্র। একাকিনী নারীর পক্ষে

পুরুষ হচ্ছে বাঘ ভালুকের চেয়ে ভয়াবহ। কারণ বাঘ যদি আঁচড় দেয় তবে সে আঁচড় একদিন শুকোতে পারে। কিন্তু আমি যদি হাতখানি ধরে একটু নেড়ে দিই তবে সে ব্যথার চিকিৎসা নেই।"

নার্ভাস হাসি হেসে মিস মিত্র বললেন, "মডার্ণ ইয়ংম্যানদের অহঙ্কার দেখে এমন হাসি পায়। যেন আমরা কাঁচের পুতুল যে নাড়া পেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবো।"

সোম তেমনি গম্ভীর ভাবে বলল, "একবার নাড়া দিয়ে দেখবো নাকি?"

"বেশ তো। দেখুন না।" কাননবালা মুচকি হেসে চোখ নামালেন।

সোমের সহসা স্মরণ হলো যে, না, আগুন নিয়ে খেলা আর নয়। যথেষ্ট বার প্রেম করা হয়েছে। এবার করতে হবে বিয়ে।

দাশরথিবাবু যেন আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। "তোমার কথাই রইল, কল্যাণ। শিবানী ও তুমি এই ঘরে বসে নির্জনে কথাবার্তা কইবে, আর তিন পাশের তিন ঘরে থাকব আমি, খুকীর মা ও খুকী।"

সোম বিরক্তি দমন করে ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, "তিন দিকের দরজা বন্ধ থাকবে, না খোলা থাকবে?"

"খোলা থাকবে।"

"তা হলে আর নির্জন কী হলো?"

"না, না, বন্ধ থাকবে।"

"কোন দিক থেকে বন্ধ থাকবে—বাইরের দিক থেকে না ভিতরের দিক থেকে?"

দাশরথি বাবু বললেন, "তাই তো! তাই তো! ওগো যাদুমণি।" আবার অন্দরে চললেন।

ইত্যবসরে কাননবালা বললেন, "মডার্ণ ইয়ংম্যানদের ধরন হচ্ছে মেঘের মতো যত গর্জায় তত বর্ষায় না।"

সোম চুপ করে থাকল।

তিনি বললেন, "নাড়া দেবো, নাড়া দেবো। কই নাড়া? কেবল words, words, words."

সোম আত্মসম্বরণ করে সহাস্যে বললে, "মনে হয় স্বপক্ক অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন।"

তিনি সকরুণ স্বরে বললেন, "আপনারা সকলেই সমান হৃদয়হীন। পরের হৃদয় সম্বন্ধে সমান উদাসীন।"

সোমের মধ্যেকার খেলোয়াড় ঐ চ্যালেঞ্জ শুনে বলল, "শিবানীর হৃদয়ের প্রতি উদাসীন থেকে অন্যায় করবো না বলেই তো তাঁর সঙ্গে প্রাইভেট ইন্টারভিউ প্রার্থনা

করছি। তবে কোন অপরাধে আমাকে হৃদয়হীন বললেন ?"

কাননবালা এর উত্তর দিতে না পেরে অপ্রতিভ বোধ করলেন। আরক্ত মুখমণ্ডল অবনত করে অস্পষ্ট ভাবে বললেন, "আমি শিবানীকে লক্ষ্য করে বলিনি।"

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। বেচারিকে আর নির্যাতন করে কী হবে! তাঁর দুঃখ দূর করা সোমের অসাধ্য। রোমান্সের উপর তার অশ্রদ্ধা ধরে গেছল। ওর পরিণাম ভয়াবহ না হোক দুর্বহ। অথচ রোমান্সের সাহায্য ব্যতিরেকে এত বেশী বয়সের নারীকে বিবাহ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

সোম নীরব রইল। আর খেলা নয়।

পাঠ মুখস্থ করতে করতে দাশরথিবাবুর পুনঃ প্রবেশ। তিনি বললেন, "বাইরে থেকে বন্ধ থাকবে।"

"বাইরে থেকে যে বন্ধ থাকবে সারাক্ষণ তার স্থিরতা কী!"

"তুমি তো ভারি সন্দেহী লোক হে!"

"কে সন্দেহী লোক তা নিয়ে তর্ক করতে চাইনে।" সোম উঠে দাঁড়ালো। "আচ্ছা, আসি।"

"য়্যাঁ!" দাশরথিবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "য়্যাঁ! বসো, বসো। আমার কথাটার সবটা শোনো আগে। তুমি বলছ, স্থিরতা কী ? আমি বলছি, আমি প্রতিশ্রুতি দিলুম।"

"আপনি তো দিলেন, আপনার স্ত্রী ?"

"আমার স্ত্রী পতিপ্রাণা।"

সোম মনে মনে বলল, "আর আপনার কন্যাটিও ভাবী ভগ্নীপতি-প্রাণা।" মুখে বলল, "আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলুম।"

তাই হলো। শিবানীকে সোমের সঙ্গে রেখে তিন দিকে তিন দরজার আড়ালে পাহারা দিলেন কেবল ওঁরা তিন জন না, ওঁদের বৌমা, ওঁদের দাসী মোক্ষদা এবং আরো অনেকে। সোমকে শুনিয়ে শুনিয়ে দরজাগুলো সশব্দে বন্ধ হলো। ক্রমশ গোলমাল থেমে এলো। কিছুক্ষণ ফিসফিসানি চলল। তারপর সব চুপ। সকলে কান পেতে রইলো সোম-শিবানী সংবাদ শুনতে।

সোম বলল, "শিবানী"। তার পর পাঁচ মিনিট স্তব্ধ থেকে ওঁদের উৎকর্ণতাকে ক্ষুরধার করল।

সোম বলল, "শিবানী, একটি দরজা খোলা আছে। চলো আমরা পালাই।"

ওঁরা কাশলেন। কাশির কাশি, মহাকাশি।

সোম বলল, "ওঁরা সবাই ঐ তিন ঘরে বন্ধ, কে আমাদের আটকাবে ? এই যে,

ধরো আমার হাত। ধরলে তো? চলো।"

কপাটের খিল খসিয়ে টান মেরে হুড় মুড় করে ওঁরা এসে সোমের ঘাড়ে পড়লেন। সে দুষ্ট তখনো তেমনি ভাবে যথাস্থানে উপবিষ্ট। শিবানীও তার থেকে তেমনি দূরে।

প্রথমে মুখ ফুটল যাদুমণির। তিনি বিনা গৌরচন্দ্রিকায় বললেন, "ছোটলোকের ব্যাটা, বেজন্মা।"

দাশরথি ইস্কুলে একটি মাত্র গালাগালি শিখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঐ ছিল তাঁর সম্বল। এমনি তাঁর একনিষ্ঠতা। বললেন "Donkey, monkey, robber."

মিস মিত্র আমতা আমতা করে বললেন, "হৃদয়হীন, উদাসীন।"

বৌমা শিবানীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। মোক্ষদা বলল, "ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। কাল যখন এসে পেরণাম করল আমি ভাবনু সোনার চাঁদ ছেলে। ওমা, এর পেটে এত ছিল। আগুনমুখো, ড্যাকরা।"

সোম এ সবের জন্যে একরকম প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, "প্রতিশ্রুতি এমনি করে রাখতে হয়।"

দাশরথিবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "যাও, যাও, সাধু পুরুষ। প্রতিশ্রুতির যোগ্য বটে!"

যাদুমণি তাড়া দিয়ে বললেন, "ভাগ, ভাগ, আমার বাড়ীর থেকে। নইলে—"

"নইলে?"

"নইলে পুলিশ ডাকব।"

"তবে তাই ডাকুন। আমি সহজে গা তুলছিনে।" এই বলে সোম একটা চুরুট ধরালো। এই লোকগুলির উপর তার ভক্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

ঘরে পুলিশ ডাকলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দাশরথিবাবু গিন্নীকে বললেন, মেজাজ ঠাণ্ডা করতে। সোমকে বললেন, "ভদ্রলোকের ছেলে মানে মানে বিদায় হও।"

সোম বলল, "অপমানের কী বাকী রেখেছেন? কেন চোরের মতো সরে পড়বো? ডাকুন পুলিশ, একটা এজাহার লেখাই, পাড়ার লোক ভিড় করুক, একটা বক্তৃতা দিই। বলি সবাইকে ডেকে নির্জন ঘরে কী করেছি—"

"কী করেছ!" দাশরথিবাবু আঁৎকে উঠলেন।

"কী করেছি তা আপনার ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

দাশরথিবাবু মেঝের উপর ধপ করে বসে পড়লেন। মোক্ষদা পাখা নিয়ে ছুটে এলো। মিস মিত্র চিৎকার করে "স্মেলিং সল্ট" হেঁকে এ ঘর ও ঘর করতে থাকলেন। যাদুমণি এক ঘটি জল এনে স্বামীর মাথায় উজাড় করলেন। মোক্ষদাকে বললেন, "তুই আমার

হাতে পাখাটা দিয়ে যা, আরো জল নিয়ে আয়।"

দাশরথিবাবু অনেক কষ্টে বললেন, "আজ আমি আত্মঘাতী হবো, তোমরা কেউ বাধা দিয়ো না। গিন্নী, তুমি এতদিনে বিধবা হলে। বাড়ীতে থান কাপড় আছে তো? দেখো, বৈধব্যের কোনো উপকরণের কমতি হলে বাজারে রাম দুশমন সিংকে পাঠাতে ভুলো না।"

সোম পায়ের উপর পা রেখে নির্বিকারভাবে চুরুট ফুঁকতে থাকল। যেন ফোটোর জন্যে pose করেছে।

৩

সুলক্ষণা

কাশীতে এক বনেদী বংশের এইরূপ সর্বনাশ সাধন করে বাঙালী Casanova কল্যাণ কুমার সোম দেওঘরে উপনীত হলেন। তাকে নিতে এসেছিল সত্যেনবাবুর মেজ ছেলে শুভ্র আর সত্যেনবাবুদের বাড়ী আড্ডা দিয়ে থাকে একটি যুবক, তার ভালো নাম যে কী তা কেউ জানে না, ডাক নাম মাকাল।

মাকালকে সোম একদা চিনত। আই-এতে দু বছর একসঙ্গে একঘরে বসেছিল, এই পর্যন্ত। এতদিনে উভয়েরই আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অবস্থা ঘুরে ফিরে সেই একই—দু জনেই বেকার। মাকাল জিজ্ঞাসা করল, "চিনতে পারছেন?"

"পারছি বৈকি," সোম বলল, "কিন্তু 'আপনি' কেন? 'তুমি'র কী হয়েছে?"

মাকাল খুশি হয়ে বলল, "বাপরে, তোমরা হলে বিলেতফেরত। তোমাদের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটতে পারা আমাদের মতো অস্পৃশ্যদের সৌভাগ্য।"

শুভ্র ছেলেটি স্কুলে পড়ছে। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তার মুখমণ্ডল। তার জীবনে প্রভাতকাল। শুভ্রকে দেখে সোম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইচ্ছা করলে ঐ বয়সের স্ত্রী পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা করলে ঐ বয়সকে ফিরে পাওয়া যায় না। যৌবন আনে ক্ষমতা, কৈশোর দেয় শ্রী। ক্ষমতার নেশায় শ্রীকে থাকা যায় ভুলে, কিন্তু নেশার ফাঁকে হঠাৎ একদিন তার উপর দৃষ্টি পড়লে ক্ষমতাকে নিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তাই ব্রজের গোপবালক চিরদিন আমাদের প্রীতি পেয়ে আসছে, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে আমরা চিনিনে। বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।

সত্যেনবাবু বাতে পঙ্গু অবস্থায় সোমকে অভ্যর্থনা করলেন। "তুমি এসেছ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। আমাদের এ দিকে তোমার মতো কৃতী, কালচারড যুবকের আসা একটা event. বুলুকে তোমার পছন্দ হোক বা নাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, তোমার আসাটাই আমার পক্ষে ধন্বন্তরীর আগমন।"

ভদ্রলোক বলে চললেন—বলা ছাড়া তাঁর করণীয় আর কী ছিল ?—"ইয়োরোপ ! ইয়োরোপের আকর্ষণ আবাল্য আমাকে অস্থির করেছে, কিন্তু এ জন্মে হয়ে উঠল না, যাওয়া হয়ে উঠল না। মা বুলু, শুনে যাও তো মা।"

আঠারো উনিশ বছর বয়সে একটি সুগঠিতা সুমধ্যমা তরুণী সোমকে নমস্কার করে বলল, "কী বাবা।"

"সেই পুরোনো মোটা ছবির বই দুটো একবার আনতে পারো, মা ? ইনি দেখবেন। সেই যে ১৮০৪ সালের ছাপা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত।"

"বুঝেছি," বলে বুলু বই আনতে গেল।

সত্যেনবাবু নিম্ন স্বরে বললেন, "আমার বড় মেয়ে সুলক্ষণা। এরই কথা তোমার বাবাকে লিখেছি।"

মোটা মোটা দু খানা ভল্যুম বুলু একা বয়ে আনছে দেখে সোম ছুটে যেতে দ্বিধা করল না। "দিন, দিন, আমার জন্যে আনা বই আমাকে দিন। এ কি অবলা জাতির কর্ম !" সুলক্ষণার মৃদু আপত্তি সোম গ্রাহ্য করল না।

সত্যেনবাবু খুব হেসে বললেন, "অবলাজাতিকে অবজ্ঞা কোরো না হে। তুমি নিজেই দেখে এসেছ ওঁরা সমুদ্রে সাঁৎরে পার হচ্ছেন, আকাশেও ওঁরা উড্ডীন। আর আমাদের বুলুর বীণাখানি দেখবে এখন।"

১৮০৪ সালে ইংলণ্ডে মুদ্রিত সেই গ্রন্থে পটের মতো রংচঙে ছবির ছড়াছড়ি। নানা দেশের নানা বেশভূষাধারী মানুষের প্রতিকৃতি ও বর্ণনা। সেকালের যানবাহন তৈজস আসবাব ইত্যাদির অনুকৃতিও ছিল। সত্যেনবাবু সোমের মনোযোগ ভঙ্গ করে বললেন, "আমার সংগ্রহে এর চেয়ে পুরাতন চিত্রপুস্তকও আছে, কল্যাণ। দেখবে তুমি ক্রমে ক্রমে। এখানে থাকা হবে তো কিছুদিন ?"

"সেটা গৃহস্বামীর ইচ্ছাধীন।"

"বেশ, বেশ, তোমার যতদিন খুশি ততদিন থাকো। তোমাদেরই জন্যে তো এ বাড়ী করেছি। আমার স্ত্রী নেই, আমারও থাকা না থাকা সমান। তান শুনতে শুনতে প্রাণটা আছে বীণার তারে বাঁধা। তুমি স্পিরিচুয়ালিসম বিশ্বাস করো তো ?"

"আজ্ঞে, না।"

"বিশ্বাস যখন করো না তখন তোমাকে বোঝানো অসম্ভব কী পথ্যের উপর আমি বেঁচে আছি।"

ভদ্রলোকের চলৎশক্তি নেই, কিন্তু বলৎশক্তি বিলক্ষণ। বকবক করতে ভালোবাসেন বলে যেকেউ একটু মন দিয়ে বা মন দেবার ভাণ করে তাঁর কাছে একঘণ্টা বসল সেই তাঁর বয়স্যের মতো প্রিয় হলো। মাকাল এদের অন্যতম। ভদ্রলোক যৌবনে কবিতা

লিখতেন। শিশুপাঠ্য পুস্তকে কবি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া আছে, "কবি—যে কবিতা লেখে।" অতএব সত্যেনবাবু ছিলেন কবি। শোনা যায় তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতির সতীর্থ। তারপরে একটি মহকুমা শহরে এম-এ বি-এল উকীল রূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটল। বাগ্মিতা ও বিদ্যা প্রথম কয়েক বছর রজতপ্রসূ হলো না। রজতের অভাবে রন্ধনগৃহে ইন্ধনের অভাব হলে গৃহিণী একদিন কবিতার খাতাগুলির দ্বারা সে অভাব দূর করলেন। এমন সময় রাজায় প্রজায় বাধল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা। সব উকীল জমিদারের মুঠায়। একা সত্যেন রক্ষা করেন প্রজাদের স্বত্ব। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন এক কানা মোক্তার। প্রজারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে মামলার খরচা জোগালো আড়াই বছর। সত্যেন উকীল ও সরফরাজ হোসেন মোক্তার পকেট ও জেব বোঝাই করে আর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারলেন না, গাড়ী কিনে ফেললেন। আর বাড়ী ফিরে কি আরাম আছে—মহকুমা শহরের বাড়ী! হোসেন চললেন হজ করতে। সত্যেন দালান দিলেন দেওঘরে। জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করে ওকালতী করা যায় না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারও তাঁর বিস্বাদ বোধ হলো। আড়াই বছরে উপার্জন যা করেছিলেন তা পঞ্চাশখানা গ্রামের পঁচিশ হাজার কৃষকের সঞ্চয় ও ঋণ। তার সুদের সুদে পুরুষানুক্রমে বীণা বাজানো যায়।

যৌবনে যখন তিনি কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন থেকেই তিনি অনুকরণ করে আসছিলেন। অবশ্য সদরে। অন্দরে তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর স্বকীয়। তবে সোমের আগমনে তাঁর সদর অন্দর একাকার হয়ে গেছে। মাকাল যা বর্ষাধিক কালের সাধনায় লাভ করতে পারল না সোম শুধুমাত্র বিলিতী ডিগ্রীর জোরে তাই দখল করল। সোমের জন্য রান্না করল স্বয়ং বুলু। পাতা পড়ল বিশেষ একটি ঘরে। পর্বতকে মহম্মদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিনি যে পথ্য গ্রহণ করলেন বলা বাহুল্য তা স্পিরিচুয়ালিসম নয়।

"ওরে বুলু", তিনি খেতে বসে বললেন, "তোর হাতের অমৃত ভুঞ্জন যে ফুরিয়ে এলো আমার। বাবা কল্যাণ, আশা করি অমৃতকে তুমি অমৃত বলবে।"

সোম বলল, "আর একটু ঝোলামৃত পেলে মন্দ হতো না।"

সত্যেনবাবু ব্যস্ত হয়ে রবীন্দ্রেতর স্বরে বললেন, "আর-একটু, আর-একটু ঝোল দিয়ে যা তো এঁকে।"

রাত্রে সঙ্গীতের জলসা। হিন্দী ও বাংলা গানের ওস্তাদদের পালা সাঙ্গ হলে সুলক্ষণা শ্রোতৃমণ্ডলীকে নমস্কার করে বীণা হাতে নিল। চতুর্দিকে ধ্বনিয়ে উঠল, ঝনন ঝনন ঝন। বীণাবাদনের দ্বারা সে একটি মায়াময় পরিমণ্ডল সৃজন করতে থাকল। যেন আদেশ

দিল, "Let there be light." অমনি আলোকের জন্মরহস্যে পূর্বদিকে উদ্ভাসিত হলো। তারপর হুকুম করল, "Let there be a firmament." অমনি প্রকাশিত হলো মহাকাশ।

গান বাজনার ভালোমন্দ সোম বোঝে না, সঙ্গীতে তার প্রবেশ নেই। সেই যে তার এক বন্ধু প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামের গ্যালেরীতে লম্বমান আলেখ্যরাজি সম্পর্কে বলেছিল, "এ আর কী দেখবো? এর একটা অন্যটার মতন। হুবহু এক।" তেমনি রাগরাগিণী সম্বন্ধে সোমেরও পার্থক্যভেদ ছিল না, ওসব হুবহু এক। তা সত্ত্বে সঙ্গীতের সম্মোহন সরীসৃপকে বশ করতে পারে, সোম তো মানুষ। সুলক্ষণা যেন তাকে মন্ত্র পড়ে বন্দী করল। বীণাবাদনের সঙ্গে জড়িয়ে বীণাবাদিনীকে সোম অসামান্য রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা জ্ঞানে পুরস্কার স্বরূপ তার হৃদয় নিক্ষেপ করল। চেয়ে দেখল সত্যেনবাবু চোখ টিপে মাথা নেড়ে তারিফ করছেন, মাকাল ঢুলু ঢুলু, ফটিকবাবু প্রবোধবাবুরা হাত দিয়ে উরুর উপর তাল ঠুকছেন।

সুলক্ষণা বাদন সারা করে আবার একটি নমস্কার করে বীণা নামিয়ে রাখল সকলে গর্জে উঠলেন, সাধু সাধু সাধু। প্রশংসা বাক্যের কোলাহলমুখর হট্টস্থলী ত্যাগ করে সোম বাইরে নক্ষত্র সভামণ্ডপের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মনে হতে লাগল সে অমন একটা ব্রত গ্রহণ না করলেই পারত, কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল। এই মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে পাবার প্রস্তাব আজই করা যায়, সত্যেনবাবু তো তাই প্রত্যাশা করছেন। বিয়ের পরে কোন মেয়ে স্বামীকে ভালো না বাসে যদি স্বামীর ভালোবাসা পায়? সোম তাকে খুব—খুব—খুব ভালোবাসবে, তার বীণা শুনে তার কোনো খুঁৎ মনে আনবে না।

খাবার সময় সত্যেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে! বুলুর তানালাপ তোমার কেমন লাগল তা তো বললে না?"

সোম শুধু বলতে পারল, "আমি মুগ্ধ হয়েছি।" তার তখন একমাত্র চিন্তা তার ব্রতের কী হবে।

"ওরে বুলু, শোন, ইনি কী বলছেন। তোর শিক্ষা সার্থক। তুমি বোধ হয় জানো না, কল্যাণ, ওকে আমি শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলুম। কবি বড় স্নেহ করতেন। ওকে স্বহস্তে একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন, দেখবে এখন।"

প্রতিভা ও সাধনা বিয়ের বাজারে না বিকালে সার্থক হয় না, এ কথা থেকে সোম এই সিদ্ধান্ত টেনে বার করল। তখন তার অন্তর বিষিয়ে উঠল প্রতিবাদের তীব্র তাড়নায়। ব্যাঙ্গোক্তি তার মুখের প্রান্তে টলমল করল। সে বলতে চাইল, 'বীণা বোধ করি এত ভালো করে বাজত না যদি না তার উপর ঘটকালির ভার থাকত।' কিন্তু তাতে সুলক্ষণা আঘাত পাবে। আনন্দদায়িনীকে আঘাত করতে সোমের মুখ ফুটল না।

সোমের মোহ অপগত হলো। সে ভাবল, মেয়েদের কলানুশীলন বিবাহান্ত। বিবাহের পরে কাব্য তোলা হয় শিকায়, বীণা জমা হয় মালগুদামে। বিবাহের দু বছর পরে শিবানী যা সুলক্ষণাও তাই—গৃহিণী এবং জননী। ওদের যে কোনো একজনকে নিয়ে সুখে দুঃখে গৃহকোণে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। তবে কেন সুলক্ষণার বেলায় ব্রতের ব্যতিক্রম হবে ? না, হবার কোনো কারণ নেই। হবে না।

পরদিন সত্যেনবাবুকে তার ব্রতের কথা বলবে-বলবে করছে এমন সময় তিনি আপনি প্রস্তাব করলেন, "যাও তোমরা, বুড়ো মানুষের কাছে বসে থেকো না। একটু বেড়িয়ে এসো।"

সোম শুভ্র সুলক্ষণা ও মাকাল বেড়াতে বেরলো। সোমের আশা হলো যে মাকাল ও শুভ্র একটু দূরে দূরে হাঁটবে ও নিজেদের মধ্যে গল্প করতে থাকবে। সোম শুনতে পেলো মাকাল শুভ্রকে বলছে, "আমি রেস খেলি তার আসল কারণ কি জানো ? জীবনের সর্ব-বিধ প্রকাশে আমার সমান আগ্রহ।" শুভ্র তা নিয়ে তর্ক করছে। ছেলেমানুষী তর্ক—নীতিবচন আওড়ে হিতাহিতের ভাগবাঁটোয়ারা। মাকালের সর্ববিধ প্রকাশে সমান আগ্রহ যে খাঁটি মাকাল তা প্রতিপন্ন করছে পোষাকে। তার পরনে টেনিস্ ট্রাউজার্স, কোটের বদলে ড্রেসিং গাউন, হ্যাটের বদলে পশমের টুপি। তার পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। সোমের হাসি পেল। সে সুলক্ষণাকে বলল, "সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে ওরূপ পোষাকের কোনো উপযোগিতা আছে কি ?"

সুলক্ষণা মৃদু হেসে বলল, "ওঁর বিশ্বাস উনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তন করছেন মহাকবি জুতো ভেঙে চটির মতো করে পায়ে দেন, পরেন পায়জামা ও চড়ান আলখাল্লা তাঁর টুপিরও মাকালদা নকল করেছেন। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে মাকালদা ঐ পোষাকে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন।"

সোম অবশ্য অবাক হলো না। সবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কবি তাঁর পরিচ্ছদের প্যারডি দেখে কী বললেন ?"

"কী আর বলবেন ? বোধ হয় ভাবলেন যে সব হয়েছে, দাড়িটি হয়নি।"

সোম কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনে গেছল। তখন সুলক্ষণা ওখানে ছিল কি না, থাকলে সোম তাকে দেখেছে কি না তাই নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। ততক্ষণে মাকালরা অনেকদূর গেছে। ইচ্ছাপূর্বক কি অন্যমনে তা কে বলবে ?

"আপনার সঙ্গে," সোম চলতে চলতে বলল, "নির্জনে আমার কিছু কথা ছিল

এতক্ষণ যে কথাবার্তা হচ্ছিল সেও নির্জনে, তবু সেটা নির্জনে বলে সুলক্ষণার খেয়াল ছিল না। "নির্জনে" শব্দটার প্রয়োগে সে সহসা সচেতন হয়ে সচকিত ভাবে

এদিক ওদিক চেয়ে নিল। পুরুষ মানুষের সঙ্গে সে কতবার কথা কয়েছে, কিন্তু এক ঝাঁক পাখীর মধ্যে একটি পাখীর মতো। শান্তিনিকেতনের মেলামেশা ঝাঁকে বদ্ধ থেকে, তাই বাড়ীতেও মেলামেশার সময় ঝাঁক না থাকলে ফাঁক বোধ হয়, গা ছম ছম করে।

যে মেয়েটি এতক্ষণ বেশ সপ্রতিভ ছিল তার ব্যবহারে কেন এলো আড়ষ্টভাব, সোম তা বুঝতে পারল না। কিন্তু লক্ষ করল। বক্তব্যটাকে এমন মানুষের গ্রহণযোগ্য করবার জন্যে সে নীরব থেকে নিজের মনে বহু বার মহলা দিল, মোলায়েম করল।

বলল, "সুলক্ষণা দেবী, আপনাদের বাড়ীতে আমি কেন অতিথি হয়েছি তা হয়ত জানেন, অন্তত অনুমান করেছেন। আপনাকে আমার কেমন লাগল আপনার বাবা প্রকারান্তরে এই প্রশ্নই করেছিলেন, আমি যে উত্তর দিয়েছি আপনি তা শুনেছেন। এখন আমাকে আপনার কেমন লাগল এই আমার জিজ্ঞাস্য।"

সুলক্ষণা তার সপ্রতিভতা ফিরে পেল, কিন্তু ভাষা ফিরে পেল না। এবার শঙ্কা নয়, লজ্জা।

"বুঝেছি, সুলক্ষণা দেবী," সোম বলল, "আপনার ছিল বীণা, সেই দিল আপনার পরিচয়। আমার তো তেমন কিছু নেই, আমি আপনার অপরিচিত। অপরিচিতকে কেমন আর লাগবে!"

সুলক্ষণার কুণ্ঠিত দৃষ্টি থেকে এর অনুমোদন পেয়ে সোম বলে গেল, "আপনার পরিচয় বীণাতে, আমার পরিচয় বাণীতে। বীণা চেয়েছিল জনতা, বাণী চায় বিজনতা। এখন বুঝলেন তো কেন নির্জনে কিছু কথা ছিল?"

'নির্জনে' শুনে সুলক্ষণা আবার চমকালো। কিন্তু এবার সে ঔৎসুক্য বোধ করছিল। সোমের পরিচয় বিজ্ঞাপনে যা পড়েছিল তার বেশী কী হতে পারে শোনা যাক। সে কি শিকারী, না সে বাঁশী বাজায়, না সে খুব বেড়িয়েছে ও বেড়াতে ভালোবাসে?

সোম বলল, "সুলক্ষণা দেবী, আমি গুণী নই। গানবাজনার সারে গামা ও পর্তু-গালের ভাস্কোডাগামা এদের মধ্যে কে কার মামা জানিনে। হাসছেন? তবে কেউ কারুর মামা নয়। বাঁচা গেল। গামার কথায় মনে পড়ল আমি পালোয়ান নই। পালের কথা যখন উঠল তখন বলি গোষ্ঠ পাল হয়ে থাকলে দেওঘরের বল কিক করে গিরিডিতে ফেলতুম, সেই হতো আমার পরিচয়। খুব হাসছেন। তা বলে মনে করবেন না যে আমি হাস্যরসিক। লেখকও নই, অভিনেতাও না। আর হাসাতে যদিও পারি হাসতে তেমন পারিনে। ভাবছেন, হয়ত সৈনিক। না, সুলক্ষণা দেবী, বিধাতা ও তাঁর বিধানের উপর আমার আক্রোশ কি অভিমান কি সংশয় কি অশ্রদ্ধা নেই।"

এই পর্যন্ত এসে সোম হঠাৎ থামল। শুধালো, "শুনতে আগ্রহ বোধ না করলে বলুন বন্ধ করি।"

সুলক্ষণা সলজ্জভাবে বলল, "না।"

সোম দুষ্টুমি করে বলল, "শুনবেন না? তা হলে বন্ধ করি।"

সুলক্ষণা আবার তেমনি সলজ্জভাবে বলল, "না।"

"কোনটা না? শোনাটা, না বন্ধ করাটা?"

নাছোড়বান্দার হাতে পড়েছে, খুলে বলা ছাড়া গতিরন্যথা। কিন্তু কথাটা যেই তার মুখ ছেড়ে রওনা হলো মনটা অমনি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে গেল।

সোম হৃষ্ট হয়ে বলল, "বেশ, এখন আমার সাত খুন মাপ। তবে খুন আমি হিসাব করে দেখতে গেলে ছয় বার করেছি—"

সুলক্ষণা "উঃ" বলে উঠে থমকে দাঁড়ালো। তার পাংশু মুখে আতঙ্কের নিশান।

সোম হেসে বলল, "ভয় নেই, আপনাকে খুন করবো না। খুন খারাবি জীবনের মতো ত্যাগ করেছি, সুলক্ষণা দেবী।"

এতক্ষণে সুলক্ষণার ঠাহর হলো যে খুন করা অর্থে অ..কিছু বোঝায়। নিজের মূর্খতায় লজ্জিত হওয়ায় আবার তার মুখে রক্ত সঞ্চার হলো। সে অস্বস্তির স্বরে বলল, "ওঃ!"

"ওঃ!" সোম বলল পরিহাস ভরে। "আপনাকে সবই বিশ্বাস করানো যায় দেখছি। যেমন অকস্মাৎ বললেন 'উঃ' তেমনি অবলীলাক্রমে বললেন 'ওঃ!' এবার আমি যদি ঘোষণা করি যে আমি লোকটা কেবল যে নির্গুণ তাই নয় আমি রীতিমতো চরিত্রহীন তা হলে আপনি বোধ করি তৎক্ষণাৎ বলবেন 'ইস'! কেমন?"

সুলক্ষণা নিরুত্তর।

"কিন্তু," সোম গম্ভীরভাবে বলল, "এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা যার জন্যে করা গেল সেটা ও ছাড়া আর কিছু নয়, সুলক্ষণা দেবী!"

"বুঝতে পারলুম না," সুলক্ষণা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলল।

"বলছিলুম," সোম সভয়ে বলল, "আমি চরিত্রহীন।"

"ছি," সুলক্ষণা বিরক্ত হয়ে বলল, "যা তা বলবেন না।"

"বিশ্বাস করলেন না?" সোম কাতর স্বরে শুধালো।

"না।" সুলক্ষণা বলল দৃঢ়ভাবে।

"কিন্তু," সোম অনুযোগের স্বরে বলল, "পরে আমাকে দোষ দেবেন না এই বলে যে আমি আপনার সঙ্গে সত্যাচরণ করিনি।"

সুলক্ষণা বাস্তবিক বুঝতে পারছিল না। সরোষে বলল, "বুঝতে পারছিনে, কল্যাণবাবু।"

সোম হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "চলুন, ফেরা যাক। বিয়ে যে আমাকে করবেন সে

ভরসা আমার নেই। খামকা আপনাকে আমার বিশ্বাসভাগী করি কেন?"

সুলক্ষণা বিমনা হয়ে রইল, বাড়ীতে কারুর সঙ্গে কথা কইল না সহজে। সত্যেনবাবুর মনে ধোঁকা লাগল। মাকালকে ডাকিয়ে গোপনে তদন্ত করলেন। সে বলল "ওঁদের মধ্যে কী নিয়ে আলাপ হলো, কি আলাপ একেবারে হলোই না, তা তো আমি জানিনে। আমার কি স্বার্থ, বলুন, কেন চরবৃত্তি করবো?"

মাকালের মতো মহা ভক্তের মুখে এমন রূঢ় বিদ্রোহের কথা সত্যেনবাবু এই প্রথম শুনলেন। কিছু একটা ঘটেছে, বেশ একটা রহস্যময় ঘটনা, রোমহর্ষকও হতে পারে, এই সন্দেহ পঙ্গুকে একান্ত অসহায় বোধ করালো। এমনিতেই তিনি বিষম অভিমানী মানুষ, অভ্যস্ত ভক্তি শ্রদ্ধার এক ছটাক কম পড়লে তাঁর চক্ষু ক্রমশ জলাশয় হয়ে ওঠে, কেউ যদি তাঁর বাগ্মিতার প্রতি অমনোযোগী হলো অমনি তাঁর কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা উপস্থিত হয়। আর প্রতিবাদ যদি কোনো হতভাগা কোনো কথার করল তবে তিনি এক নিমেষে হুতাশন। "আমি মূর্খ? আমি মূঢ়? আমি অকবি? আমি অতরুণ? এই তো তোমার—না, না, আপনার—মনোগত ধারণা? এই তো? এই তো? ধিক, পিতৃবয়সী পিতৃকল্প ব্যক্তির প্রতি ঈদৃশ অনাস্থা, অশ্রদ্ধা, অশিষ্টতা, অর্বাচীনতা। গুরুদেবকে সেদিন আমি টেলিগ্রাম করে আপত্তি জানিয়েছি, জানিয়েছি যে তিনি বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করে আমাদের দফাটি সেরেছেন, ঐ সর্বনেশে ছোকরার সুখ্যাতিতে সর্বনেশে ছোকরাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যে কতখানি বেড়ে গেছে তার দৃষ্টান্ত তুমি—না, না, আপনি।"

মাকাল যে তার সমবয়সীদের মতো দুর্বিনীত দুর্নীত দুঃশীল নয় এর দরুন তার জন্যে সত্যেনবাবুর হৃদয়ের এক কোণে একটু জায়গা ছিল। তিনি তাকে কিছু স্নেহ করতেন। তাই তার ঐ অনাত্মীয়ের মতো উক্তি যেন পাহারাওয়ালার "ভাগ যাও, হামকো কুছ মৎ পুছো"র মতো তাঁর কানে ও প্রাণে বাজল। তিনি মুখে রুমাল চেপে ক্রন্দনবেগ রোধ করলেন। তাঁকে প্রকৃতিস্থ করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সে রাত্রেও বীণা-বাদনের অপেক্ষাকৃত ঘরোয়া বন্দোবস্ত ছিল, তা বিগড়ালো।

সত্যেনবাবু শুভ্রকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর দিদির সঙ্গে কল্যাণবাবুর কথাবার্তা কী হয়েছে রে?"

"তা তো আমি," শুভ্র ঢোক গিলে বলল, "বলতে পারবো না। আমি মাকালদার সঙ্গে তর্ক করতে করতে ওদের সঙ্গ ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছলুম, ফেরবার সময় ঠিক ততখানি পেছিয়ে পড়তে বাধ্য হলুম।"

বোনের বিমনাভাব, বাপের কাতরতা, সোমের বিস্ময়, মাকালদার মৌন—এত কাণ্ডের পরে শুভ্রও মনে হতে লাগল যে কিছু একটা ঘটেছে, বেশ একটা রহস্যময়

ঘটনা, রোমাঞ্চকরও হতে পারে। সে দিদিকে একাকিনী পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "দিদি ভাই, কী হয়েছে ?"

দিদি বলল, "আমিও তাই জানতে চাই তোর কাছে, যদি তুই জানিস।"

সোমের সঙ্গে তার তেমন আলাপ হয়নি। তবু সে সঙ্কোচ কাটিয়ে সোমকে চুপটি করে বসে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, "কল্যাণবাবু, আপনি কি জানেন কী হয়েছে ?"

"কী হয়েছে ?" সোম শুভ্রর প্রশ্নের পুনরুক্তি করল।

"আপনি জানেন না ?"

"তুমি জানালেই জানব।"

"বা রে, আমি নিজে জানতে এলুম যে।"

"তাই বল। আমি এতক্ষণ ধরে ভাবছি কার কাছে জানতে চাইলে জানতে পাবো। আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? আমরা সবাই যদি সমবেত হয়ে যে যতটুকু জানি ততটুকু বলি।"

শুভ্র উৎফুল্ল হয়ে সম্মতি দিল। বলল, "তা হলে গ্র্যাণ্ড হয়। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স।"

সে গেল সভা ডাকতে।

সভা বসল।

সত্যেনবাবু প্রথম বক্তা। তিনি বললেন, "বুলু মাকে কেমনতর আনমনা দেখে কী যেন একটা ভাব বেণুবনে দখিন হাওয়ার মতো আমার মর্মে গুঞ্জরিত হতে থাকল, মাকালকে ডেকে বললুম, হ্যাঁ হে কী হয়েছে বলতে পারো ? তা তিনি চোখ রাঙিয়ে তর্জন করে বললেন, আমি কি গুপ্তচর ? অমন তাড়না পেয়ে আমি তো বেত্রাহত কুক্কুরের মতো কেঁা করে উঠলুম। অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো হয়েছিল, সামলে নিতে পেরেছি এই ঢের।"

মাকাল তাঁর ভ্রম সংশোধন করল না। মজনুর মতো দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে বেড়াবে কি না এই তার তখনকার চিন্তা। তার মতো বেকার যুবকের যাঁহা দেওঘর তাঁহা হিমালয়। তবে দেওঘর অঞ্চলে তার বাবা খানকয়েক বাড়ী করে গেছেন, সে দেওঘর ছাড়লে ভাড়াটা ঠিকমতো আদায় হবে কি না এই সন্দেহ থেকে দেওয়ানা হওয়া নিয়ে দ্বিধা।

"দেখ মাকাল," সত্যেনবাবু তাকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি আমার পুত্রপ্রতিম, আমি তোমার পিতৃবয়সী না হই মাতৃবয়সী। অমন তেরিমেরি করে তেড়ে আসা তোমার কাছে প্রত্যাশা করিনি। অত্যাধুনিক সাহিত্যিকদের ও দোষ একচেটে বলে জানতুম।"

মাকাল এবার যথার্থ উত্তপ্ত হয়ে বলল, "অতিরঞ্জনের দ্বারা সুলক্ষণার নিকট আমাকে লঘু করবেন না। তিনি অন্তকে বিয়ে করতে পারেন কিন্তু," বলব কি বলব না করতে করতে বলে ফেলল, "আমার মানসী।"

সত্যেনবাবুর সাহিত্য ও জীবন উভয় স্বতন্ত্র ছিল। পরের বেলায় যাই হোক না কেন তাঁর ঘরের বেলায় এর ব্যত্যয় তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মেয়ে মাকালের মানসী এ কথা শুনে তিনি পঙ্গু না হয়ে থাকলে লম্ফ দিয়ে ধৃষ্টের চুল চেপে ধরতেন। অধুনা অদৃষ্টের উপর অভিমান করলেন, কিন্তু তাই করে ক্ষান্ত হলেন না, কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "তবু যদি ডিগ্রী থাকত, ওদেশী না হোক এদেশী। বড় মুখে ছোট কথা সইতে পারা যায়, কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা!"

মাকাল বেপরোয়া ভাবে বলল, "A man's a man for a' that!"

সত্যেন বাবু পরাস্ত হয়ে আর্ত্ত স্বরে বললেন, "কল্যাণ, তোমার সাক্ষাতে ঐ মূর্খ আমার কন্যার কাছে প্রেম নিবেদন করছে তুমি সহ্য করছ! তুমি কি শিশুপাল?"

সোম বলল, "নিজে প্রেমিক না হলেও প্রেমিককে আমি বড় বলে মর্যাদা দিয়ে থাকি। মাকালের নিবেদন আমার নিবেদনের চেয়ে বড়। সুলক্ষণা যদি ছোটকে অগ্রাহ্য করে বড়কে বরণ করেন তবে আমি সাহ্লাদে বরযাত্রী হবো।"

সত্যেনবাবু চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। সোম সুলক্ষণার দিকে চেয়ে দেখল সে মাথা নীচু করে দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলছে। অপমানে তার কর্ণমূল আরক্ত।

পরদিন সত্যেনবাবু সোমকে কাছে বসিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "কাল কী ছেলে-মানুষি করেছ বলো দেখি। তোমার সঙ্গে মাকালের তুলনা! ওটা যে গ্রাজুয়েটই নয়, আধখানা মানুষ।"

"কিন্তু," সোম বলল, "ওর বিষয় সম্পত্তি যা আছে তা অনেক গ্র্যাজুয়েটের নেই এবং হবে না।"

"তা ছাড়া," সত্যেনবাবু চুপি চুপি বললেন, "ও রেস খেলে।"

"রেস খেলা," সোম বলল, "ক্যানসার সদৃশ অসাধ্য ব্যাধি নয়। সুলক্ষণার চিকিৎসায় সারতে পারে।"

অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাবো কেন? তুমি বিদ্যায় বিত্তে ও চরিত্রে কেবল মাকালের কেন দেশের সহস্র সহস্র যুবকের ঊর্ধ্বে। তোমাকে না দিয়ে ওকে মেয়ে দিতে কোন মেয়ের বাপের দুর্মতি হবে?"

"বিদ্যার ও বিত্তের বিষয় হয়ত ঠিক। কিন্তু চরিত্রে যে আমি মাকালের তথা দেশের সহস্র সহস্র যুবকের ঊর্ধ্বে এর কি আপনি কোনো প্রমাণ পেয়েছেন? না আপনার

চারিত্রিক মান কৌমার্য্যের দাবী মানে না ?"

"কী বললে ?" সত্যেনবাবু কানের গোড়া রগ্‌ড়ালেন।

"অর্থাৎ লোকে যাকে চরিত্রহীন বলে আপনি কি তাকে সচ্চরিত্র বলেন ?"

সত্যেনবাবু তিক্ত স্বরে বললেন, "ও প্রশ্ন কেন উঠল ?"

সোম অকুণ্ঠিত ভাবে বলল, "এইজন্য যে আমি লৌকিক অর্থে চরিত্রহীন।"

"যা তা বোলো না, কল্যাণ।" সত্যেনবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। "আমি জানি তোমরা অত্যাধুনিকরা আমাদের ক্ষ্যাপাবার জন্তে অযথা দুর্বৃত্ততার ভাণ করে থাকো। আমাদের সময় আমরা বিধবা বিবাহের ভয় দেখিয়ে গুরুজনকে জব্দ করতুম।"

সোম বলল, "আপনি বিশ্বাস করুন না করুন আমার নষ্ট কৌমার্যের সংবাদ আমি সময় থাকতে জানিয়ে রাখলুম, সত্যেনবাবু।"

"ওহো!" বলে সত্যেনবাবু যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন, তাঁর মুখে কপাট পড়ল না, চোখে পলক পড়ল না। আকস্মিক পক্ষাঘাত যেন তাঁর সকল অঙ্গ অসাড় করে দিল।

"ও কী!" বলে সোম চেঁচিয়ে উঠল। শুভ্র সুলক্ষণা ও বাড়ীর চাকর বাকর ছুটে এলো। কিছুক্ষণ ঝাড়ফুঁকের পর সত্যেনবাবুর হাঁ বুজল ও চোখ বন্ধ হলো। সোম এতক্ষণ ভাবছিল কাশীর দাশরথি বাবুর দোসর জুটল নাকি ? সে যেখানে যায় সেখানে শনির অভিশাপ বহন করে নিয়ে যায়।

সে ওঠবার উদ্যোগ করলে সত্যেনবাবু তা দেখে ইশারায় জানালেন বোসো। ইশারায় অন্যান্যদের জানালেন ঘর থেকে যেতে।

ভাঙা গলায় বললেন, "চারিত্রিক আদর্শ অনুচ্চ হলে পত্নীর মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করে থাকতুম।"

সোম বিনীতভাবে বলল, "কিন্তু সেটা তো চরিত্রের নয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা।"

সত্যেনবাবু খুশির ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললেন, "চরিত্র ও প্রেম ভিন্ন নয়, বাবাজী। তোমরা যতই আধুনিক বলে বড়াই করো না কেন তোমরা এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করোনি। আমার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যাবার কথা, কায়াহীনের প্রতি কিসের অনুরাগ ? আর তিনি যখন এ বাড়ীতে নেই ও প্রত্যাবর্তন করবেন না তখন অন্য কেউ তাঁর স্থান পূরণ করলে তাঁর আপত্তির কী হেতু থাকতে পারে ?"

"কিন্তু তাঁর স্মৃতি," সোম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "আপনার মন থেকে এক দণ্ড অন্তর্হিত হয়নি। অন্যকে স্পর্শ করতে গেলে সেই স্মৃতি মারবে চাবুক।"

"ঠিক বলেছ, বাবাজী" তিনি পৃষ্ঠপোষকের মতো বললেন. "কিন্তু শুধু তাই নয়।

স্মৃতি লোপ পেলেও তিনি ওপারে বসে আমার প্রতীক্ষা করতে থাকবেন। আমি যে স্পিরিচুয়ালিসম মানি। ওপারে যেন তিনি বাপের বাড়ীতে আছেন আর এপারে আমি অন্য-স্ত্রী সঙ্গ করছি—হোক না সে বনিতা, নাই বা হোল সে পণ্য স্ত্রী—ছি ছি ছি। না, আমার চারিত্রিক আদর্শ এত নীচ নয়।"

"এর জন্যে," সোম গম্ভীরভাবে বলল, "আমি আপনাকে সাধুবাদ দেবো না, সত্যেন-বাবু। যিনি ওপারে গেছেন তিনি যে ইতিমধ্যে পত্যন্তর গ্রহণ করেননি তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমি পাইনি। যদি পাই তবুও স্বীকার করব না যে তাঁর প্রতি আপনার সেই চারিত্রিক দায়িত্ব আছে যা তাঁর প্রতি ছিল তিনি যখন বাপের বাড়ী থাকতেন। স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামীরা সৎ থাকেন এই প্রত্যাশায় যে তাঁদের অবর্তমানে স্ত্রীরা থাকবেন সতী। আপনার সৎ থাকার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ," সোম অতি সন্তর্পণে বলল, "আপনার স্ত্রী এখন কায়াহীন।"

সত্যেনবাবু রাগ করলেন না, সোমের প্রতি করুণা প্রকট করলেন তাঁর চাউনিতে। যেন নীরবে বললেন, হায়রে পাশ্চাত্য materialist!

সোম এটা ওটার পর এক সময় বলল, "তা হলে আমি কলকাতা চললুম কাল। এখানকার কাজ তো হলো না।"

সত্যেনবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হলো না কি রকম?"

"আমি যে চরিত্রহীন।" উত্তর দিল সোম।

"আহা," সত্যেনবাবু সর্বজ্ঞের মতো বললেন, "বিলেত জায়গাটাই অমন। সেখানে চরিত্র নিয়ে ক'জন ফিরতে পেরেছে? তুমি তো তবু স্পষ্ট কবুল করলে।"

"আমি," সোম উঠতে উঠতে বলল, "এই কথাটাই আপনার কন্যাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বলেছিলুম।"

"কী সর্বনাশ!" সত্যেনবাবু চোখ বুজে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর ক্রমাগত মাথা নাড়তে থাকলেন। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করতে থাকলেন, রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মা পাহি নিত্যম্।

সোম সেখানে দাঁড়ালো না।

সত্যেনবাবু যে সাধু ও ভণ্ডের অপরূপ সমাহার এই আবিষ্কারের পর সোমের সুলক্ষণাকে বিবাহ করবার বাসনা শিথিল হয়ে এলো। কে জানে সুলক্ষণাও হয়তো তাই। সোম যাত্রার আয়োজন করল। হতভাগ্য ম্যাকালের বিষয় তার মনে ছিল। সোম চলে গেলে ম্যাকাল হয়তো আবার এ বাড়ীতে প্রবেশ পাবে আর পাবে আদর। সে যে সচ্চরিত্র।

একবার সুলক্ষণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে সোম শুভ্রর কাছে আবেদন পেশ করল। "তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করো তো তাঁর সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে, যদি হয়।"

শুভ্র ঘুরে এসে বলল, "এখনি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

সুলক্ষণা শুভ্রর জন্যে কি কার জন্যে একটা পুলোভার তৈরি করছিল। সেলাই রেখে সোমকে নমস্কার করল। "বসুন।" শুভ্রকে মিষ্টি করে বলল, "তুমি গিয়ে বাবার কাছে বসতে পারো।"

সোম ইতস্ততঃ করে বলল, "সেই কথাটার কী হলো জানতে পারি?"

সুলক্ষণা সেলাইয়ের থেকে চোখ না তুলে বলল, "অবশ্য।" তার পর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "আমার মা নেই, ভাই বড় হলে যেখানে কাজ পাবে সেখানে যাবে, বাবার সেবার ভার আমাকেই বইতে হয়। বিয়ের দায়িত্ব কি এই অবস্থায় নেওয়া উচিত?"

সোম একটু বিস্মিত হয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপরে বলল, "যদি ভেবে চিন্তে এই স্থির করে থাকেন তবে আমাকে ও প্রশ্ন করা বৃথা। আর যদি আমার উত্তর শুনলে আপনার স্থির করা সুকর হয় তবে বলি, রোগীর শুশ্রূষা নার্সের কাজ, আপনি নার্সের ট্রেনিং পাননি বোধ করি। পর ধর্ম সব সময়েই ভয়াবহ।"

"কিন্তু" সুলক্ষণা বলল, "বাইরের নার্স কি আপনার লোকের মতো হবে? মমতা যে শুশ্রূষার প্রধান উপাদান।"

সোম হেসে বলল. "বনের পাখীও পোষ মেনে আপনার হয়, নার্স তো নারী।"

সুলক্ষণা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল. "তার মানে নার্স হবে এ বাড়ীর গৃহিণী। এই তো?"

সোম বলল, "এই।"

সুলক্ষণা দৃঢ়ভাবে বলল, "না, তা হতে পারে না, কল্যাণবাবু। আমার মায়ের স্থান অন্যের অধিকারে আসতে পারে না।"

"How sentimental!" সোম বলল ঈষৎ অবজ্ঞাভরে।

সুলক্ষণা ভ্রূ কুঞ্চন পূর্বক সোমকে নিরীক্ষণ করে বলল, "স্ত্রী-বিয়োগের পর গুরুদেব যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি তিনিও তাহলে সেন্টিমেন্টাল?"

সোম হাসতে হাসতে বলল, "গুরুদেবই দেখছি নাটের গুরু। অন্য সকলে গড্ডলিকা।"

"দেখুন," সুলক্ষণা উষ্মা গোপন করে বলল, "গুরুদেবের নিন্দা কানে বড় বাজে।"

"কিন্তু," সোম বুঝিয়ে দিল, "আমি তো গুরুদেবের নিন্দা করিনি, করেছি শিষ্যবৃন্দের নিন্দা।"

"আপনার চেয়ে," সুলক্ষণা উষ্মা প্রকাশ করে বলল, "আমার বাবা বয়সে অনেক বড়, চরিত্রেও। তাঁর বিচার আপনি না করলে পারতেন।"

সোম থ হয়ে রইল।

"বিলেত ঘুরে এসে লোকে ষত্ব ণত্ব ভুলে যায়। (সোম মনে মনে বলল, ব্যাকরণ কৌমুদীখানা আরেকবার খুলে দেখতে আলস্য বোধ করে।) অহংকারে ফুলতে ফুলতে সেই গল্পের ব্যাঙের মতো হাতীকে লাথি মারতে চায়। (সোম মনে মনে বলল, গল্পে শেষের টুকু নেই।)"

"আর কিছু বলবেন ?" সোম প্রশ্ন করল।

"না।" সুলক্ষণা যেন সশব্দে কপাট দিল।

"আমি", সোম যথেষ্ট বিনয়ের সহিত বলল, "এমনি বেশ ভালোমানুষ। কিন্তু কোনো মেয়ের উপর যদি ও যখন রাগ করি তবে ও তখন আমি রাবণ। আমার ইচ্ছা করে তাকে সীতার মতো লুট করে নিয়ে যেতে।"

সুলক্ষণা এর উত্তরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে আলমারির একটি দেরাজ থেকে বের করলে একটি ছোরা। সোমকে দেখিয়ে বলল, "এই আমার উত্তর।"

সোম একটু ভড়কে গেছল। সামলে নিয়ে বলল, "ব্যবহার জানেন তো ?"

"সেটার পরীক্ষা নির্ভর করছে আপনার ব্যবহারের উপর।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন। রাবণের ব্যবহারের মূলে ছিল প্রেম। লোকটা সীতাকে এত ভালোবাসত যে অন্তঃপুরে না পুরে অশোক বনে ছেড়ে দিয়েছিল। অন্য কারুর প্রতি এমন অনুগ্রহ করেনি। আমার নেই প্রেম। হবেও না।" এই বলে সোম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

সুলক্ষণা তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। কী ভাবল সেই জানে। বলল, "আপনার কিছু একটা ব্যথা আছে। তা বলে আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না। মার্জনা অবশ্য করতে পারি—কিন্তু বিবাহের প্রতিষ্ঠা মার্জনার উপর নয় বিশ্বাসের উপর।"

"মার্জনা," সোম হেসে বলল, "কে চায় ? কল্যাণকুমার সোম মার্জনার চেয়ে গঞ্জনা পছন্দ করেন।" তারপর বলল, "আচ্ছা, উঠি।"

সুলক্ষণা কোনোমতে নমস্কার করল। সোমের প্রস্থানের পর চাপা কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল।

শুভ্র দিদির পড়ার ঘরে গিয়ে দেখল দিদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার টেবিলের উপর একখানা ছোরা। এক সেকেণ্ডের জন্যে শুভ্র ভয়ে বিস্ময়ে দ্বিধায় থমকে দাঁড়াল। তারপর কী মনে করে ছোরাখানাকে খপ করে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। এক নিঃশ্বাসে

বাবার ঘরে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বাবা, দিদি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।"

সত্যেনবাবু একসঙ্গে এতগুলো চমক কোনো দু'দিনের ভিতর পাননি এর আগে। ক্রমশ তাঁর অভ্যস্ত হয়ে আসছিল। তিনি আচ্ছন্নের মতো বললেন, "দেখি কত কাঁদাতে পারো।"

শুভ্রর পিছু পিছু সুলক্ষণাও ছুটেছিল। সে তার বিপর্যস্ত কেশবেশ নিয়ে পাগলীর মতো ঘরে ঢুকল। বলল, "না, বাবা, আত্মহত্যা নয়।"

"তবে কী ? তবে কী !"

"আত্মহত্যা নয়। সত্যি বলছি।"

"তবে কেন ঐ ছোরা ?"

সুলক্ষণার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আত্মরক্ষা।"

সত্যেনবাবু ও শুভ্র দুজনেই চীৎকার করে প্রতিধ্বনি করলেন, প্রশ্ন সূচক স্বরে। শুভ্রর রাগ হচ্ছিল তার অত বড় একটা আবিষ্কার ভেস্তে যাওয়ায়। সত্যেনবাবু তো মনে মনে প্রলয়নাচন নাচছিলেন সোম-রস পান করে।

সত্যেনবাবু হুকুম করলেন, "আন ওর মুণ্ডুটা পেড়ে।"

শুভ্র বলল, "শুধু মুণ্ডু কেন ? ধড়টাও।"

সোম তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। যে শুভ্র তার সঙ্গে মাথা সোজা করে কথা বলতে ভরসা পেতো না সেই গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে বলল, "আসুন।"

সোম আশ্চর্য হয়ে শুধালো, "কী ব্যাপার ?"

ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারায় হঠাৎ যে আনন্দ হয় শুভ্র সেই আনন্দের পীড়ন গাম্ভীর্যের দ্বারা প্রতিহত করে বলল, "ব্যাপার গুরুতর।"

সত্যেনবাবু ন্যায়ের সঙ্গে করুণা মিশ্রিত করে হাকিমী ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী বলবার আছে ?"

সোম কিছু বুঝতে না পেরে সুলক্ষণার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। সুলক্ষণা ততক্ষণে লজ্জায় মরে গেছে। কেমন করে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বাবার কাছে আবৃত্তি করবে, তাই তাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছিল। সে সোমের চাউনির পথ থেকে নিজের চাউনিকে সরিয়ে নিল।

সত্যেনবাবু একটা মস্ত বক্তৃতার পাঁয়তারা কষছিলেন মনে মনে। শুভ্র ভাবছিল হুকুম পেলে সোমের পিঠে কোন লাঠিখানা ভাঙবে। ওসব অপ্রিয় কর্তব্য চাকরকে দিয়ে করাতে নেই, হাজার হোক সোম ভদ্রলোকের ছেলে—বিলেতফেরত।

সত্যেনবাবুর বক্তৃতা সুরু হলো। "পাপিষ্ঠ", তিনি সোমকে সম্বোধন করলেন, "পাপিষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম, শিক্ষা তোমার সাধারণের দুষ্প্রাপ্য, তুমি সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে

কৃতী। কিন্তু চরিত্রে তুমি ছাগল—(ছাগলের সংস্কৃত স্মরণ করে) হ্যাঁ, চরিত্রে তুমি ছাগ, তুমি অজ।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি চেয়ে দেখলেন কোনো এফেক্ট উৎপন্ন হলো কি না। সোম বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে ভাবছিল সকালে সত্যেনবাবুর সঙ্গে যখন কথাবার্তা হয়েছিল তখন তো তিনি তার চরিত্রহীনতার স্বীকৃতি শুনে ক্রুদ্ধ হননি, বিলেতফের্তাদের অমন হয়ে থাকে বলে প্রকারান্তরে অনুমোদন করেছিলেন ! তবে সুলক্ষণাকে ওকথা বলেছি বলায় তিনি আঘাত পেয়েছিলেন বটে। সেই অপরাধে এই দণ্ড ? তাকে কল্পনার অবকাশ না দিয়ে আপনি সত্যেনবাবু তার অপরাধের চার্জ তাকে শোনালেন।

বললেন, "আমার বাড়ীতে অতিথি হয়ে আমার কন্যার উপর প্রশস্ত দিবালোকে বলপ্রয়োগ—হে পাপিষ্ঠ, নারীধর্ষণের ইতিহাসে এমন অঘটন ঘটেছে বলে শুনিনি কিংবা পড়িনি, উকীল হিসাবে এমন মামলা পাইনি। ওরে, আন তো পীনাল কোড্খানা। দেখি কোন ধারায় পড়ে—৩৫৪ কি ৩৭৬। না, পুলিশে দেবো না, কেলেঙ্কারীতে কাজ নেই। বলো, তুমিই বলো, পাপিষ্ঠ প্রবর, ঘরোয়া সাজার মধ্যে কোনটা তোমার উপযুক্ত।"

সোম ইতিমধ্যে ছোরাখানাকে লক্ষ করে কতকটা আঁচ্তে পেরেছিল তার অপরাধ। সাজা ? তার ইচ্ছা করল বলে, আপনার মেয়েটিকে আমাকে দিন, উনিই আমার শাস্তি-রূপিণী, সারাজীবন অবিশ্বাসের কারাকক্ষে আমাকে কয়েদী করে রাখবেন। সুলক্ষণা যে পিতার নিকট তার নামে নালিশ করেছে এতে তার সন্দেহ ছিল না।

বলল, "অপার আপনার কৃপা। সত্যযুগের মহারাজ হবুচন্দ্র কলিযুগে কবি সত্যেন্দ্রচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ। সাজা ? অপরাধীকে সাজা দিতে গিয়ে স্বয়ং শূলে চড়ে সশরীরে স্বর্গে গেছলেন মনে পড়ে না কি ?"

"পাষণ্ড !" সত্যেনবাবু তর্জনী উদ্যত করে তর্জন করলেন। "লিখব আমি তোমার বাবা জাহ্নবীবাবুকে। তিনি যদি তোমার উপর ইচ্ছা প্রয়োগ করতে অসম্মত হন, যদি তোমাকে এই মেয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে না দেন, তবে তোমার বল প্রয়োগের সাজা দিতে অক্ষম সেই জেলা জজকে অকর্মণ্য বলে জানব। জানব যে তিনি সেই পণ্ডিতের মতো ভণ্ড যিনি বলেছিলেন, আমার ছেলে মাকড় মেরেছে ? মাকড় মারলে ধোকড় হয়।"

মামলার রায় শুনে সোম ফেলল হেসে। শুভ্রও হলো নিরাশ—কোথায় "শালা হিঁদুয়ানি নিকলো" বলে দু ঘা বসিয়ে দেবে, না নিজেই বনবে শালা। সবচেয়ে বিস্মিত হলো সুলক্ষণা। এত তদ্বির পর এই তামাসা ! তাকে সোমের কাছে এমন হাস্যাস্পদ করবার প্রয়োজনটা কী ? না, তার বিবাহ। সোমের মতো পাত্র যেন আর হয় না। 'চেষ্টা

করিলে কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর ?'

সব শিক্ষিতা মেয়ের মতো তারও ছিল স্তব স্তুতির ক্ষুধা। কেউ তাকে 'মানসী' বলুক, 'সাকী' বলুক, বলুক 'Eternal Feminine'—তবে তো সে করবে বরদান। সে কি দেবে বরণমালা ? না। সে দেবে বরমাল্য। কেউ কি তার বর হবে ? না। সকলে হবে তার বরপ্রার্থী, তাদের একজন হবে তার বরপ্রাপ্ত।

এমন যে সুলক্ষণা—যার বীণাবাদন একদিন দেশবিশ্রুত হতে বাধ্য—যার চরণে এখনি মাকালের মতো কত অকর্মা দুবেলা পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে—তাকে একদিন সোমের চেয়ে নিষ্কলুষ অথচ সোমেরই মতো কৃতকর্মা কেউ কি দেবে না অর্ঘ্য ? সে অপেক্ষা করবে।

সুলক্ষণা বলল, "আসুন, কল্যাণবাবু, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। অমন সাজা আপনাকে পেতে হবে না, কারণ আপনার বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগটা সম্পূর্ণ আনুমানিক। আমি যে এই প্রহসনের সূত্রধার নই তা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কল্যাণবাবু।"

৪

অমিয়া

"এই, তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম কল্যাণ। তোমার ?"

খোকা হেসে লুটোপুটি খায়। হি হি হি হি। হা হা হা হা। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে,

"এই, তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম কল্যাণ। তোমার ?"

খোকা আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। হো হো হো হো। তারপর আবার সেই প্রশ্ন—

"এই, তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম কল্যাণ।" সোম হাল ছাড়ে না। "তোমার ?"

"আমার নামও কল্যাণ।" খোকা দাঁত বের করে চোখ অর্ধেক বুঁজে আধো আধো ভাষায় বলে।

সোম তাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করে। বলে "আমাদের দু জনের এক নাম। না ?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবার নাম কি কুণাল ?"

সোম এই লজিকের কাছে হার মানল। বলল, "না।"

তখন খোকা জিজ্ঞাসা করল, "তবে তোমার নাম কল্যাণ হলো কেন ?"

এর আর উত্তর হয় না। সোম বলল, "তুমিই বলো না, আমার নাম কল্যাণ হলো কেন।"

খোকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাবল। জানালা দিয়ে দেখল একটা পায়রা। ভাবনা ভুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল, "ধর ধর" করতে করতে।

"ওহে তোমার ছেলেটা তো ভয়ানক তুখোড়।" কুণালকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোম বলল, "প্রথমে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল, তারপর আমাকে লজিকে হারিয়ে দিল।"

পুত্রের কৃতিত্বে কুণাল বিনীতভাবে গৌরব বোধ করল। বলল, "আগে এক পেয়ালা খাও। ওর দুষ্টুমির গল্প অষ্টাদশ পর্বেও শেষ হবার নয়, ধীরে ধীরে শুনো পরে।"

আদর্শ স্বামী। স্ত্রীর শ্রমলাঘব করবার জন্য একটা আস্ত ট্রে বয়ে এনেছে—ওর মতো ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে ঐ এক গন্ধমাদন।

ললিতা এলো খাবার হাতে করে। সে কত কী তৈরি করেছে। সমস্ত তার নিজের হাতের। সোম বলল, "জানো ললিতা, তোমার ছেলেটা কী সাংঘাতিক সেয়ানা। ও ছেলে বড় হলে মোক্তার হবে দেখো।"

"হুঁ।" ললিতা অভিমান করে বলল, "সেই আশীর্বাদ কোরো। মোক্তার! মোক্তার না দারোগা!"

"কেন, মোক্তার পছন্দ হলো না ? কুণাল যদি মাষ্টার না হয়ে মোক্তার হতো তা হলে কি তুমি তাকে নিরাশ করতে ?"

"যাও!" ললিতা ধমক দিয়ে বলল, "খাও, খাও, বিলেতফের্তা বক্তিয়ার। বাপ মোক্তার হলে ছেলের উকীল হওয়া উচিত। বাপ উকীল হলে ছেলের ব্যারিষ্টার হওয়া দরকার।"

কুণাল ফোড়ন দিল, "নইলে এভল্যুশন কিসের ?"

"সত্যি।" ললিতাটা স্বভাবত সীরিয়াস। বলল, "মেয়ে বি-এ পাস হলে লোকে খোঁজে জামাই আই-সি-এস। কেন ?"

"ওটাও কি হলো এভল্যুশন ?" বলল সোম।

"নিশ্চয়। পারিবারিক মর্যাদার এভল্যুশন।" তারপর কী মনে করে ফিক্ করে হাসল। বলল, "ভবনাথবাবু যে এ বাড়ীতে ধন্না দিতে দিতে 'ভবধাম' ছাড়তে বসেছেন, তাঁর একটা গতি করো।"

"বাস্তবিক" কুণাল ইতস্তত করতে করতে বলল, "তোমাকে বলতেও কেমন-কেমন লাগে, অথচ একই প্রোফেশনের লোক, আমাদের অল বেঙ্গল টীচার্স এসোসিয়েশনের পাণ্ডা।"

"আমি জানি," সোম গম্ভীরভাবে বলল। "ভবনাথবাবু বাবাকেও চিঠি লিখেছেন। কী যেন তাঁর মেয়েটির নাম?"

"অমিয়া।"

"হ্যাঁ, অমিয়া। অমিয়ার একখানি ফোটোও পাঠিয়েছেন!"

"তা হলে," ললিতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "বলো তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা। হুঁ, হুঁ, বলতেই হবে।"

"হায়।" সোম কপট ক্ষোভ ব্যক্ত করল, "এই তো দুনিয়ার রীতি। তোমরা বিয়ের আগে পুরো দু বছর প্রেম করলে। আমাদের কি প্রাণে সাধ আহ্লাদ নেই, রস কষ নেই?"

ললিতা ভুরু কপালে তুলে বলল, "হয়েছে। ভবনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম। জানো, ও বাড়ীতে একখানা মাসিকপত্র পাবার জো নেই? পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বইও যদি পাও তবে সে স্বামী বিবেকানন্দের বই।"

"ভবনাথবাবুর," কুণাল তার স্বাভাবিক নম্রতার সহিত বলল, "ডিসিপ্লিনেরিয়ান বলে নামডাক আছে। আর-এক যুগের মানুষ। এ কালের মহাস্বাধীন ছাত্ররাও তাঁর চোখের দিকে তাকালে একেবারে ভিজেবেড়ালটি।"

"অথচ," সোম বলল, "এই ভবনাথবাবু মেয়ের বিয়ের জন্যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র-বয়সীর বাড়ীতে ধন্না দিতে ইহধাম ছাড়তে বসেছেন।"

"ইহধাম নয় গো," ললিতা শুধরে দিয়ে বলল, "ভবনাথবাবুর বাড়ীর নাম 'ভবধাম'। তাই ছাড়তে বসেছেন।"

সোম সশব্দে হেসে বলল, "বুঝেছি। তুমি একটা pun দিয়েছিলে! খোকার উপযুক্ত মা।"

ললিতা এতে পুলকিত হয়ে সোমের পাতে আরো পাঁচ খানা লুচি তুলে দিল।

"করো কী! করো কী!"

কিন্তু কে কার কথা শোনে।

"স্কুলের বই লিখেই," কুণাল বলল, "ভবনাথবাবু তিন তিনটে ভবধাম বানিয়ে ফেললেন—কলকাতায়, পুরীতে, দার্জিলিঙে।"

"ভেবে দেখ, কল্যাণদা," ললিতা বলল, "অমিয়াকে তিনি একটা না একটা বাড়ী দেবেনই। বাকী দুটোতেও তুমি বিনা ভাড়ায় থাকতে পারবে। ভবধামে যত দিন আছো

বাড়ীওয়ালাকে খুব ফাঁকি দিলে। আর আমরা," সে মাথা দুলিয়ে সহাস সকরুণ স্বরে বলল, "আমরা তো ভগবানের চেয়ে ওকেই বড় বলে মানি। যেহেতু ভগবান যদি অবতাররূপে কলকাতায় বাসা করেন তাঁকেও বাড়ীওয়ালার গঞ্জনা শুনতে হবে।"

"তা হলে," সোম বলল, "দাঁড়ায় এই যে বাড়ীওয়ালাকে ফাঁকি দেবার জন্যে বাড়ীওয়ালা শ্বশুর চাই। শ্বশুরকন্যার প্রেম সংসারী মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক।"

"প্রেমিক প্রেমিকাকে," ললিতা বলল, "রেল কোম্পানী কন্‌সেশন টিকিট দেয় না, গয়লা দেয় না খাঁটি দুধ, মুদি তাগাদা দিতে ছাড়ে না, ধোপা ছাড়ে না তাগাদা দেবার কারণ দিতে। রোগবীজাণুরা তেমনি আশ্রয় করে, পাগলা কুকুরে তেমনি তাড়া করে, মোটরওয়ালা তেমনি চাপা দেয়।"

সোম কুণালকে ফিস ফিস করে অথচ ললিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "বিয়ের পর ললিতা বিজ্ঞ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আগে হলে বিয়েই করত না, অন্তত তোমাকে।"

"যাও," বলে ললিতা গোসা করে থালা ও ট্রে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খবর পেয়ে ভবনাথবাবু স্কুল থেকে 'ভবধামে' ফিরলেন না, সোজা এলেন সোমকে দেখতে।

রাশভারি মানুষ। আধখানা কথা মুখে রাখেন। বললেন, "দেখে এলে?"

সোম বলল, "আজ্ঞে?"

"ইউরোপ দেখে এলে?"

"আজ্ঞে।"

"কোনটা ভালো? ওদেশ না এদেশ?"

"আজ্ঞে এদেশ।"

"ঠিক বলেছ।" যেন ক্লাসে ছাত্রের উত্তর শুনে পিঠ চাপড়ে দিলেন। "ঠিক। কেন এদেশ ভালো? (যেহেতু) এদেশ আমাদের দেশ। 'এই দেশেতেই জন্ম (আমার) এই দেশেতেই মরি।' কোন (বিষয়ে) অনার্স?"

"ইংরাজীতে।"

"বেশ, বেশ। আমার অমিয়াও সেই (বিষয়ে) অনার্স। ভালো মেয়ে। রাঁধতে জানে। (কী কী) খেতে ভালোবাসো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে ভালোবাসি।"

"(কী কী) খেতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে আর শুতে।"

তিনি বিষম কটমট করে তাকালেন। "কী বললে? (আবার) বলো।"

"আজ্ঞে, খেতে ভালোবাসি।"

"কী খেতে ?"

"চানাচুর।"

"চানাচুর ? রোসো, (অমিয়াকে) জিজ্ঞাসা করে দেখি। চানাচুর ? (রোসো) জিজ্ঞাসা করে দেখি। আর কী (খেতে ভালোবাসো) ?"

"আলুর দম।"

"হুঁ ! ওদেশে মেলে না। আলুর দর কি রকম ?"

সোম মুস্কিলে পড়ল। কোনোদিন আলু কেনেনি। বলল, "একটা এক পেনী করে।"

"পেনী তো আনা। এত !"

"আজ্ঞে।"

"ওদেশ ভালো নয়। **Plain living** নেই। (সুতরাং) **High thinking** নেই।"

সোম মনে মনে বলল, তাই কেউ **Translation** ও **Essay Writing** এর বই লিখতে পারে না।

ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এরোপ্লেন ?"

"এরোপ্লেন কী ? দর কত ?"

"না। চড়েছ ?"

"আজ্ঞে না।"

"আহা (ওটা) বাকী রেখে এলে !"

"হবে একদিন।"

"না, না। বিয়ের পরে (হতে) পারে না। **Crash** করলে (বৌ বিধবা হবে)।"

ভবনাথবাবু চিন্তা করে বললেন, "গান ?"

"আজ্ঞে।"

"ভালোবাসো ?"

"আজ্ঞে।"

"অমিয়া (গান) জানে। শ্যামা সঙ্গীত। ওর নাম কী ? ঐ মুসলমান ?"

"কোন মুসলমান ?"

"ইসলাম।......নজরুল ইসলাম। ওর গান— (ভবনাথবাবু ঘাড় নাড়লেন)।"

"কেন ?"

"কেন আবার ? মুসলমান। গানেন অর্ধভোজনং। কে জানে কী খায় !"

সোম মনে মনে বলল, আমিও তো ওদেশে ও জিনিষ খেয়েছি, অতি উপাদেয় গব্যপদার্থ, পঞ্চগব্যের অতিরিক্ত ষষ্ঠ গব্য। শুনেছি স্বামীজীও খেতেন।

এতক্ষণ কুণাল চুপ করে ছিল। মানুষটি সে মুখচোরা, কুণো, সংকোচশীল। ভবনাথবাবু তাকে বললেন, "একে (নিয়ে) একদিন আমাদের ওখানে (এসো)।"

"যে আজ্ঞে।"

"তোমার স্ত্রীও (আসুন)।"

"তাঁকে বলবো।"

"আর সেই বাচ্চাটা (কোথায়) ? (তাকে তো) দেখছিনে ?"

"খেলা করছে।"

"উঁহু। (সব সময়) খেলা ভালো নয়। একটু একটু এ বি সি ডি শিখুক।"

"মোটে তিন বছর বয়স।"

"বলো কী! তিন বছর নষ্ট করেছে।···আচ্ছা উঠি! কাল রাত্রে ওখানেই (খাওয়াদাওয়া) হবে। আসি।" তিনি নমস্কারের প্রতিনমস্কার করলেন।

ভবনাথবাবু প্রস্থান করলে ললিতা ছুটে এলো। "কি কল্যাণদা। শ্বশুর পছন্দ হলো ?"

"শ্বশুরের পছন্দ হলো কি না তাই ভাবছি।"

কুণালের মুখ ফুটেছিল। সে বলল, "ভয় পেয়ে গেছো তো ?"

"ভাবছি এই বাঘার সঙ্গে ইয়ার্কি খাটবে না। দাশুবাবুকে যা করে রেখে এসেছি আর সত্যেনবাবুকেও করেছি যেমন জব্দ!"

ললিতা ও কুণাল একত্র জিজ্ঞাসা করল, "সে কেমন ?"

সোম বলল সমস্ত কথা। শুনে ললিতা বলল, "অমন একটা পণ করা সঙ্গত হয়নি। ও যে ভীষ্ম হবার পণ!"

"কিন্তু তুমিই বলো, কুণাল যদি দুশ্চরিত্র হতো ও তুমি যদি না জেনে তাকে বিয়ে করতে তবে কি তোমাদের অহরহ মনে হতো না যে তার চেয়ে ভীষ্ম হওয়া ছিল ভালো।"

কুণাল লজ্জিত ও ললিতা কুপিত ভাবে পরস্পরের দিকে তাকালো। যেন 'যদি' নয়, সত্যি। তারপর ললিতা শুষ্ক হাসির সঙ্গে বলল, "তবু ভীষ্ম হবার চেয়ে সে ভালো।"

"কিন্তু কে চায় ভীষ্ম হতে। আমি আমার পণের মতো স্ত্রী পেলে রূপগুণ নির্বিচারে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করি। প্রেমফ্রেম বাজে—কেবল সময়ক্ষেপ ও হৃদয়যন্ত্রণা।

এবার প্রেমের পক্ষ নিয়ে ললিতা লড়াই করল। তখন সোম বলল, "তুমিই তো বলেছ প্রেমিক প্রেমিকা God's chosen people নয়, রেল কোম্পানি তাদের কনসেসন টিকিট দেয় না ইত্যাদি।"

"কিন্তু," ললিতা বলল, "তুমিও তো বলেছো তোমার প্রাণে কি সাধ আহ্লাদ নেই, রসকষ নেই। তুমি দেখছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাও।"

"যাক," কুণাল থামিয়ে দিয়ে বলল, "ঝগড়া করে কাজ নেই। ভবনাথবাবু প্রেমেরও বিরোধী, পণেরও। কল্যাণ ওঁর কাছে কথাটা কী ভাবে পাড়ে তাই দেখব আমরা।"

পরদিন ভবনাথবাবু তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র মনুর হাতে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থের এক সেট উপহার পাঠালেন। একখানির নাম, "Intelligent Children's Guide to English Grammar and Idiom." তার ভূমিকায় আছে, "The author begs to acknowledge with fervent appreciation the labour of love bestowed by his beloved eldest daughter Miss Amiya Bose, B. A. student······"

আর একখানির নাম, "1000 Unseen Passages by Bhabanath Bose, B. A., Head master of·· ···Institution (29 years' experience), author of ······(২৯ খানা কেতাব) and Miss Amiya Bose, B. A. (Hons)."

তৃতীয় একখানা বইয়ের নাম "Easy Conversations at Home and School". সেটার উৎসর্গ পত্র এইরূপ—"To my dutiful eldest daughter Miss Amiyakana Bose on her passing the Matriculation Examination in the First Division".

এতদিন যে সোম অমিয়কণার মতো বহু বিজ্ঞাপিত পাত্রীর পরিচয় পায়নি এই এক আশ্চর্য। এক Intelligent Children's Guide-এরই ইতিমধ্যে ৭০০০ খানা বিক্রী হয়েছে। মনু বলল, "লোকে স্বদেশী ফেলে বিদেশী কিনবে কেন? Nesfieldএর দফা রফা। ম্যাকমিলান বাবাকে কত offer করেছে জানেন?"

শুনে সোম মনুকে একটা সিগ্রেট offer করল। মনু কি তা নিতে পারে! ভবনাথবাবু জানতে পারলে তার দফা রফা। সোম বলল, "আমি কি আপনার বাবাকে বলতে যাচ্ছি? নিলেন, খেলেন, ফুরিয়ে গেল।" একজন বিলেতফের্তা তাকে সমকক্ষ ভেবে সিগ্রেট নিতে বলছেন, গৌরবে তার বুক ফুলে উঠেছিল, সে একটা নিল, নিয়ে টান দিতেই তার মাথা ঘুরে গেল নেশায় এবং দম্ভে। দুদিন পরে হয়তো এঁরই শালা হবে, খাতির করে কথা বলবে কেন? সে যা তা বকতে সুরু করে দিল। সোমও তাকে প্রশ্রয় দিল। জিজ্ঞাসা করল, "অমিয়কণা আপনার বড়, না?"

"হ্যাঁ—বড়। দেড় বছরের বড় আবার বড়। ওর নাম অমিয়কণা কবে হলো? সে আমার জন্মের বছর পরে।"

"কী রকম ?"

"ওকে আমরা টুলী বলেই ডাকতুম। যদিও ভালো নাম শুভঙ্করী। স্কুলে নাম লেখাবার সময় হেড মিসট্রেস বললেন, ও নাম রাখলে কেউ বিয়ে করবে না। তিনিই নামকরণ করলেন অমিয়কণা। তারপর সে নাম সংক্ষেপ করা হয়েছে, আজকাল আবার লম্বা নাম কেউ পছন্দ করে না।"

"লম্বা ন্যাকের মতো।"

"হ্যাঁ—যা বলেছেন। আমার নাম ছিল জগদানন্দ বসু। আমি ওটাকে ছেঁটেকেটে করেছি জগদা বসু। তবু সকলে আমাকে মনু বলেই ডাকে।"

"আমি কিন্তু জগদা বলে ডাকব।"

"সৌভাগ্য!"

"দেখুন জগদাবাবু, আপনি তো ধরতে গেলে আমার বন্ধুই—কেমন ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি আমার only best friend, মাইরি।"

"নিন, আর একটা সিগ্রেট নিন। 'না' বলবেন না। বিলিতী নয়, ইটালিয়ান! অনেক যত্নে এনেছি কাস্টমস-এর চোখে ধুলো দিয়ে।"

মনু শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল, "তা হলে দিন। আপনার মতো বন্ধুর মহার্ঘ দান মাথায় করে নিই।"

সোম মনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে স্বর নামিয়ে বলল, "দেখুন জগদাবাবু, জগদাবাবু কেন বলি, জগদা, বন্ধুর জন্যে একটা কাজ করে দিতে হবে।"

জগদা তড়িৎ স্পৃষ্টের মতো কান সরিয়ে নিল। পর মুহূর্তে কানটা আরো একটুখানি ঝুঁকিয়ে ব্যগ্রভাবে বলল, "হুকুম করুন।"

"দেখ," সোম ইতস্তত করে বলল, "তোমাকে আমি বিশ্বাস না করলে একথা বলতুম না।"

"আমি শপথ করছি," জগদা দুই চোখে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "যদি বিশ্বাস রক্ষা না করি তবে আমার দুই চোখ—হ্যাঁ, দুই চোখ কাণা হয়ে যাবে।"

"ছি, ছি," সোম বলল "শপথ কে চায় ? মনের জোর।"

"হ্যাঁ! মনের জোরে আমার সঙ্গে ক'জন পারে। জানেন আমি একটা ভুতুড়ে বাড়ীতে তিন রাত ছিলুম। তেরাত্রিবাসের পর আমার চেহারা যা হয়েছিল, যদি দেখতেন তবে আমাকেই ভূত বলে ঠাওরাতেন।"

"বেশ, বেশ। অমনি মনের জোর চাই।" কিছুক্ষণ পরে সোম বলল, "আজ আমি আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। আপনার দিদিকে দেখব। কিন্তু শুধু দেখলে তো হবে না। একটু কথাবার্তা কওয়া দরকার তাঁর সঙ্গে।"